পাতালে এক ঋতু

দ্বিতীয় খণ্ড

দীপক চৌধুরী

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

শিল্পী : শ্রীঅন্নদা মুন্সী

মূল্য : পাঁচ টাকা

১ থেকে ১৫ নম্বর ফর্মা—
মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা
১৬ থেকে ২৩ নম্বর ফর্মা—
মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্‌ লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলিকাতা ১৩

শ্রদ্ধেয় সার্ল পেগির কথা মনে ক'রে—

সর্ব-বিত্ত-বিরহিত হ'য়েও যারা

সর্ব-হারা নয়—তাদের হাতে।

১০, বালিগঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা-১৯

দীপক চৌধুরী

এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র ও
ঘটনা আপাতত কাল্পনিক।

"A fish always rots first at the head."

—DUNS SCOTUS

গতানুদর্শন

কমরেড, গোয়াবাগান থেকে পাটোয়ারবাগান কতদূর ?

ট্রামের প্রথম শ্রেণীতে চেপে এলে হয়তো পাঁচ পয়সায় পৌঁছান যায়, কিন্তু সভ্যতার সৌরজগতে গোয়াবাগানকে যদি বুধগ্রহ ধরা যায়, পাটোয়ারবাগান তবে নিশ্চয়ই প্লুটো।

বিনয়প্রকাশ থাকত এই পাটোয়ারবাগানের বস্তিতে। বিপ্লবের শেষ মুহূর্তে স্থকুও এল পাটোয়ারবাগানে। বিনয়প্রকাশের শয্যায় সে আশ্রয় নিল ভারতবর্ষের বিপ্লব দেখবার জন্যে। স্থকু এসেছে ইতিহাসের রাস্তা ধরেই, নতুন সভ্যতার পরমেষ্ঠী কার্ল মার্কস প্রদর্শিত রাস্তা, যে-রাস্তার শেষ সীমায় বিনয়প্রকাশের শয্যা পাতাই ছিল। স্থকু তাই ধর্ম-অধর্মের সীমান্ত দেখতে পেল না। রোগাক্রান্তা ব'লেই হয়তো বা ওর দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে থাকবে। ঘটাই স্বাভাবিক, নইলে নেপালের আগুনে ওর পুড়ে মরবার কথা ছিল।

আজ সাত দিন হয়ে গেল স্থকু নেপাল থেকে ফিরে এসেছে। প্রথম দু'দিন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল। মাঝে মাঝে হঠাৎ নিদ্রাতুর চোখ খুলে সে বিনয়প্রকাশকে প্রশ্ন করেছে, "বিপ্লব স্থরু হতে আর কতদিন লাগবে ?"

চেয়ারে ব'সে দু'হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বিনয়প্রকাশও গত আটচল্লিশ ঘণ্টা ধ'রে ঘুমচ্ছিল। স্থকুর প্রশ্নের সে জবাব দেয় নি। দেওয়া সম্ভব ছিল না। স্থকুর দেহটাকে নিজের কাঁধে তুলে নেপালের পার্বত্য-রাস্তা দিয়ে রক্সোলের সীমা অতিক্রম করতে ওর লেগেছিল দু'দিন। পায়ের আঙুল ফেটে রক্ত পড়েছে প্রচুর। তারপর সবগুলো আঙুলেরই ফাঁক দিয়ে পুঁয পড়তে লাগল অবিরাম। দু'দিন আগে অনীতা ছুটে এসেছিল এই বস্তিতেই নিঃশব্দে সে বিনয়প্রকাশের পায়ের পুঁজ পরিষ্কার ক'রে দিয়ে চলে গেছে।

হয়তো বা অনীতার প্রার্থনার জোরে বিনয়প্রকাশ পুরোপুরি আরোগ্যলাভও করবে।

দু'দিন পরে হঠাৎ ওর হুঁশ ফিরে এল। পায়ের নীচে গরম জলের ভেকচিটা দেখে ওর মনে পড়ল অনীতার কথা। মনে পড়ল বিপ্লব-বর্জিত আবহাওয়ায় সে গত আটচল্লিশ ঘণ্টা ধ'রে ঘুমচ্ছে!

ধীরে ধীরে পা দু'টো চেয়ার থেকে নামিয়ে বস্তির মেজেতে আলগাভাবে ফেলে রাখল দু' মিনিট। ব্যথার উপশম হয়েছে, কিন্তু হাঁটতে গিয়ে সে দেখতে পেল পুঁজ পড়া বন্ধ হয় নি। কমরেড, আমি জানি ফাটা আঙুলের পুঁজ শুকতে আটচল্লিশ ঘণ্টা যথেষ্ট নয়, হয়তো বা আটচল্লিশ বছরের পরিচর্যায় ওর ফাটা আঙুলের ক্রমোন্নতি সম্ভব হবে।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল বিনয়প্রকাশ। কমিউনিস্টরা পেছন দিকে চায় না, আজ কিন্তু দরজায় দাঁড়িয়ে সে পেছন দিকে একবার চাইল। মুকু ওর নিজের ব্যবহৃত চৌকির ওপর শুয়ে নিরুদ্বেগে ঘুমচ্ছে। মাথার দিকে চৌকির দু'টো পা-ই ভাঙা। দশ ইঞ্চি মাপের চারখানা ক'রে ইট দিয়ে চৌকির ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে। বিনয়প্রকাশ হয়তো ভাবল যে, গোয়াবাগানের মুকু যখন পাটোয়ারবাগানে ঘুমতে পেরেছে, তখন ভারতবর্ষের বিপ্লব জয়যুক্ত হবেই। মুকুর দিকে ভাল ক'রে নজর দিতেই বিনয়প্রকাশ এগিয়ে এল চৌকির সন্নিকটে। হঠাৎ যেন ওর মনে হ'ল মুকুর মাংসহীন দেহাভ্যন্তরেও বিপ্লবের অঙ্কুর সম্প্রসারিত হতে চাইছে; ফলেচ্ছু দৈহিক স্ফীতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে নির্ভুলভাবে। বিনয়প্রকাশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ের পীড়ন অনুভব করতে লাগল। বিপ্লব পিছিয়ে পড়ছে, অতএব বিনয়প্রকাশ আর দাঁড়াতে পারল না। ঘরে এক রত্তি অতিরিক্ত বস্ত্র ছিল না, নিজের পরনের ধুতি থেকে কোচার অংশটা ফস্ ক'রে ছিঁড়ে ফেলে সে মুকুর অনাবৃত পেটের অংশটা ঢেকে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মুকুর পেটে ঠাণ্ডা লাগবার আর কোন ভয় রইল না।

দ্বিতীয় দিনে সন্ধ্যের দিকেই মুকুর ঘুম ভাঙল। ঘুম অবশ্য অনেকবারই

ভেঙেছিল, কিন্তু সে-ভাঙার মধ্যে মনের সচেতনতা ছিল না, দেখা জিনিসকে সত্ত্বেও সে চিনতে পারে নি। বিনয়প্রকাশ চলে যাওয়ার পরে, ঝুকু শূন্য চেয়ারটার দিকে চেয়ে রইল। ওর মনে পড়ল বিনয়প্রকাশের কথা। মনে পড়ল, বিনয়প্রকাশের ঘাড়ে চেপে সে গন্ধমাদনের মত পাটোয়ারবাগানের বস্তিতে এসে গচ্ছিত হয়েছিল। চোখ রগড়ে ভাল ক'রে চেয়ে দেখল, সে বিনয়প্রকাশের শয্যাশ্রিতা। কিন্তু বিনয়প্রকাশ নেই। অসহায় বোধ করা ঝুকুর চরিত্রের বিশেষত্ব নয়। অতএব সে শয্যা ত্যাগ ক'রে পাটোয়ারবাগানের প্রতিবেশীদের খোঁজ-খবর নেবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠল। দেহটাকে একটা হেঁচকা টান দিয়ে উপরের দিকে তুলতেই, ঝুকু মূর্ছিতা হয়ে গড়িয়ে পড়ল বিছানায়। কতক্ষণ যে সে মূর্ছিতা হয়ে পড়েছিল ঝুকুর তা মনে নেই। মূর্ছা কাটবার পর সে বার তিনেক বমি করেছে। মগ্ন চৈতন্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মধ্যে সহসা গাড়োয়াল পাহাড়ের কথা ঝুকুর মনে পড়ল। একটা ছোট্ট ঘটনা সময়ের গা বেয়ে নিজের দেহে বড় হয়ে উঠেছে। শারীরবৃত্তের সংস্কার সাধন করা উচিত হবে কি না, তাই নিয়ে ভাবতে ভাবতে ঝুকু নিজের পেটের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। মার্কসিষ্ট মনোভাব নিয়ে সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা বৈজ্ঞানিক স্ফীতি ব'লে সে উড়িয়ে দিতে পারত, কিন্তু পুনরায় গল্‌গল্‌ ক'রে সে বমি করতে লাগল। ভাববার আর সময় পেল না।

প্রতিবেশীর সাহায্য এবার চাই।

নাভিদেশ থেকে একটা যন্ত্রণা পাক খেয়ে খেয়ে ওপরের দিকে ধাক্কা মারছে। ঝুকু চিৎকার ক'রে কাঁদতে লাগল। পাটোয়ারবাগানের প্রতিবেশীরা লুঠ করতে গেছে, কেউ সাড়া দিল না। সবাই লুঠ করতে গেলেও, দু'একজন সদ্বিবেচক সামারিটান কি ভগবানের রাজ্যে পাওয়া যাবে না?

পাওয়া গেল। বাইশ বছরের যুবক বসন্ত দাস বারোয়ারি কলতলায় দাঁড়িয়েছিল এক গণ্ডূষ জলের জন্যে। কলের জল বন্ধ হয়ে গেছে। বসন্ত দাসের হাতে একটা কুড়িয়ে পাওয়া সিগারেটের টিন ছিল। পাটোয়ারবাগানের অনেকেই সিগারেটের টিনে ক'রে জল খায়। বসন্ত এল ঝুকুর ঘরের দিকেই।

একটু জল চেয়ে নেবার উদ্দেশ্য নিয়েই সে এসেছিল। এমন সময়, হুকুর চিৎকার তার কানে গেল।

ঘরের দরজায় সিগারেটের টিন দিয়ে ধাক্কা মারতেই, হুকু জিজ্ঞাসা করল, "কে?"

"আমি।"

"আমি কে?"

"আমি বসন্ত দাস।"

"কি চাও? ভেতরে এস।"

বসন্ত ঘরে ঢুকে কিছুই দেখতে পেল না। অন্ধকার।

হুকু বলল, "দেশলাই জ্বালাও।"

"দেশলাই?" প্রশ্নবোধক শব্দ ক'রে বসন্ত মিনিটখানেক সময় চুপ ক'রে রইল।

"কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে?" প্রশ্ন করল হুকু।

"হিসেব করছি। হ্যাঁ—ঠিক মনে পড়েছে। উনিশ-শ' তিপান্ন সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে আমি আর দেশলাই কিনি নি। যাক গে, আপনি কাঁদছিলেন কেন?"

"পেটে কি রকম একটা ব্যথা হচ্ছিল, আর—আর—চার পাঁচবার বমি করেছি। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। কুঁজো থেকে এক গেলাস জল গড়িয়ে দাও।" হুকু অন্ধকারের মধ্যেই মুখটা বাড়িয়ে দিল বসন্তর দিকে। বসন্ত দাসের তেষ্টা হুকুর চাইতে কম নয়। কুঁজোর সংবাদ পেয়ে সে অন্ধকার ঘরে পাগলের মত এদিক-ওদিক হাত ছুঁড়তে লাগল। কুঁজোর সঙ্গে ওর হাতের যোগাযোগ হ'ল না।

"আমি দেখি, আলোর ব্যবস্থা করতে পারি কি না।" বসন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ট্রাম পোড়াতে আর লুঠ করতে বেরিয়ে গেছে গোটা পাটোয়ারবাগান। দু'টো গলি পেরিয়ে এসে সে দাঁড়াল মেছুয়াবাজারের মোড়ে। ডানদিকের পান-সিগারেটের দোকানটাও বন্ধ। দেয়ালের গায়ে নারকেলের দড়িটা তখন পর্যন্ত জ্বলছিল। পেরেকের ওপর থেকে দড়িটা

হালগা ক'রে নামিয়ে নিল সে। মুকুর ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করল, "লণ্ঠন কোথায় ?"

"লণ্ঠন আছে না কি ?" অল্প আলোতেই বসন্ত দেখল মুকু জিভ দিয়ে তার নিজের শুকনো ঠোঁট চাটছে।

"ঘরের খবর আপনি রাখেন না দেখছি !"

"না। আমি ঘরে ঢুকেছি পরশুদিন সন্ধ্যেবেলা। — ঐ তো কুলঙ্গিতে একটা মোমবাতি রয়েছে !" মুকু প্রায় উঠে বসল।

কুলঙ্গির কাছে এগিয়ে গিয়ে বসন্ত দেখল মোমবাতির তলায় একটা শক্ত মলাটের বই। মলাটের ওপরে লেখা রয়েছে 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো।' দড়ির আগুন দিয়ে মোমবাতি জ্বালাতে পারল না সে। বইখানার একটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে নিয়ে দড়ির মুখে তুলে ধরল। তারপর কাগজের আগুন দিয়ে মোমবাতি ধরাল বসন্ত।

"ঐ যে কুঁজো, এবার একটু জল গড়িয়ে দাও। কি নাম তোমার ?"

"বসন্ত দাস।"

"তোমার ঘরটা এখান থেকে কতদূর ?"

কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে বসন্ত বলল, "আমার কোন ঘর নেই।"

গেলাস থেকে সবটুকু জল খেয়ে মুকু বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করল, "ঘর নেই ? তবে থাকো কোথায় ?"

"এর আশপাশে পড়ে থাকি। পাটোয়ারবাগানে স্থানের অভাব হয় না। আজ বড্ড শীত, কি বলেন ?"

বসন্ত ঘরখানা ভাল ক'রে দেখতে লাগল।

তারপর সে সিগারেটের টিন ভর্তি ক'রে কুঁজো থেকে জল ভরল।

"গেলাস রয়েছে, টিনে ক'রে জল খাচ্ছ কেন ?"

"গেলাস তো আপনার ; পরের জিনিসের প্রতি লোভ করতে নেই।"

"পুঁজিবাদীদের লুঠ করতে সুবিধে হয় ব'লে, ওরা তোমায় ভুল শিক্ষা দিয়েছে বসন্ত।"

"পুঁজিবাদী কোত্থেকে এল ? শিক্ষা পেয়েছি তো বাপ-মার কাছে।"

সহসা মুকু ঝিমিয়ে পড়ল।

বসন্ত তাড়াতাড়ি বিছানার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ও কি? কি হ'ল? আপনাকে আমি কি বললুম!"

হতাশদৃষ্টি মেলে বসন্ত চেয়ে রইল মুকুর দিকে। একটু পরে মুকু চোখ খুলল। ধীরে ধীরে বলল, "আমি বড্ড দুর্বল বসন্ত। বোধহয় সাতদিন থেকে কিছু খাই নি। কিছু খাবার আনতে পার?"

"খাবার?" বসন্ত নিজের ঠোঁট দু'টো ওপর-নীচে যথাসাধ্য বিস্তার ক'রে শব্দটা উচ্চারণ করল। মনে হ'ল বসন্ত নিজেই যেন খাবার জন্য হাঁ ক'রে রয়েছে।

"ক'দিন খান নি বললেন?"

"সাত দিন। চীনে-রেস্তরাঁ চেন?"

"ঠিকানা দিলে সাইনবোর্ড প'ড়ে বার করতে পারব।"

মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত বসন্তের দিকে এগিয়ে দিয়ে মুকু বলল, "চার টাকা দিয়ে এক প্লেট চিকেন-রোল, দু'টাকা দিয়ে এক বাটি চাউ-সুপ্—"

ঢোক গিলে মুকু পুনরায় বলল, "সুপটা যেন পাইপিং হট্ হয়—" মুকু গড়িয়ে পড়ল বিছানায়।

বসন্তর পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। শতাব্দীর বুভুক্ষায় বসন্তর বৃহদন্ত্র সংকুচিত হয়ে এসেছে, গ্রাসনালীতে ঘা হয়েছে অনেকদিন আগেই। বুভুক্ষা-ব্যাধি স্পর্শক্রামী, তাই বোধহয় ওর মনে হ'ল, জিভের ওপরেও দগদগে ঘা হয়েছে, গরম সুপের ফোঁটা পড়লে জ্বালা করবে।

মুকু জিজ্ঞাসা করল, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠোঁট চাটছ কেন?"

"গরম সুপ খাওয়ার জন্যে তৈরী হচ্ছি।"

"পরের জিনিসের প্রতি লোভ করতে নেই বসন্ত।"

"আমি ভেবে দেখলুম এখন আপনি আর পর নন। পাটোয়ারবাগানে কেউ কারুর পর নয়।"

"বসন্ত, কতদূর পর্যন্ত লেখাপড়া করেছ?"

"যতদিন সুযোগ ছিল, মায়ের কোলে শুয়ে শিখেছিলাম অনেক।

তারপর, উনিশশো পঞ্চাশ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। বসন্ত প্রাণপণে গলা দিয়ে থুথু টেনে বার করবার চেষ্টা করতে লাগল।

"থামলে কেন বসন্ত? তারপর কি হ'ল?" ঝুকু পাশ ফিরে শোবার জন্যে দেহটাকে ঘোরাতে গিয়ে হঠাৎ তার নজরে পড়ল, পেটের স্ফীতি গোপন করবার আর কোন উপায়ই নেই। কিংবা কোন দরকার নেই ভেবেই ঝুকু বলল, "আমার পেটে সন্তান এসেছে বসন্ত—তুমি যেমন তোমার মার পেটে এসেছিলে। ব্যাপারটা বিজ্ঞানসম্মত, অতএব তোমার কৌতূহলী দৃষ্টি আমারি পেটের ওপর থেকে সরিয়ে নাও। হ্যাঁ, তারপর আই-এ পড়লে না কেন?"

"তারপর রিফিউজী হয়ে চলে এলাম ভারত রাষ্ট্রের পাকা ধানে মই দেবার জন্যে।"

"চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, পাকা ধান তুমি চোখেও দেখ নি। ভারত রাষ্ট্রের গোলায় একমাত্র পাকা ধান পণ্ডিতজী নিজেই। কেমন লাল টুকটুকে চেহারা, দেখ নি?" মার্কসিস্ট ঝুকুর মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল লাল বিষ।

"খবরের কাগজে দেখেছি, তবে লাল ব'লে বুঝতে পারি নি।"

"বসন্ত, বাইরে এত হল্লা-চিৎকার কিসের?" ঝুকু বোধহয় বলতে চেয়েছিল, কিন্তু পারল না। মাথাটা ঝুলে পড়ল বালিশের পাশে।

বসন্ত বলল, "আজ দু' দিন থেকে ট্রাম পুড়ছে, দোকানপাট লুঠ হচ্ছে যখন-তখন।"

"সর্বনাশ! চীনে-রেস্তরাঁ লুঠ হয় নি ত? তুমি শিগগীর যাও বসন্ত।" ঝুকুর কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে এল। জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে লাগল, "আমায় একটু কিছু খাবার এনে দাও। আমি বড্ড দুর্বল—"

ঝুকুর কানের কাছে মুখ নিয়ে বসন্ত অনুরোধ করল, "আমার কাছে একটি পয়সাও নেই—একটা টাকা দিন না?"

ঝুকু ধীরে ধীরে ডান হাতটা গলা পর্যন্ত টেনে তুলল। তারপর বুক ও ব্লাউজের মাঝখানে হাত ঢুকিয়ে টাকা বার করতে গিয়ে ঝুকু মূর্ছিতা হয়ে পড়ল।

বসন্ত ভয় পেল।

কেবল ভয় নয়, একজন অপরিচিতা স্ত্রীলোককে জল খাওয়াতে এসে ওর নিজের জীবনে আর এক সঙ্কট বাড়ল। গত সাত দিন থেকে ওর এক মুঠো ভাত জোটে নি; চুরি করতে পারত, লুঠ করতে পারত, ডাস্টবিন থেকে বুর্জোয়া-সমাজের উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে আনতে পারত, কিন্তু বসন্ত তা করে নি—ধর্ম বাঁচিয়ে চলেছে। প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ বসন্ত দাসের ক্রাইসিস পেটের নয়, মনের। মার কোলে শুয়ে ধর্মের শিক্ষা পেয়েছে, বাঁচবার শিক্ষা পায় নি। বেঁচে থাকাই যে মানুষের সবচেয়ে বড় ধর্ম, সে-কথা বসন্ত জানে না। জানলে সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকত না। সুকুর বুক আর ব্লাউজের মাঝখানে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে টাকাগুলো টেনে বার ক'রে ফেলত।

সুকুর কোন সাড়াশব্দ নেই। বসন্ত ঝুঁকে পড়ল সুকুর মুখের ওপর। ডান হাতের উল্টো দিকটা সুকুর নাসারন্ধ্রের তলায় ধ'রে রাখল, পরীক্ষা ক'রে দেখল, নিশ্বাস পড়ছে কি না। বসন্তর হাতের চামড়ায় নিশ্বাসের স্পর্শ লাগল। বসন্তর চামড়ায় ধর্ম নেই। ওর বাইশ বছরের শরীরে 'ক্যালরি'র অভাব ঘটেছে। 'ক্যালরি'র অভাব মানেই ধর্মের অভাব।

ডান হাতের সবচেয়ে লম্বা আঙুলটা সুকুর চুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বসন্ত আস্তে আস্তে টিপে ধরতে লাগল। সুকু তবু সাড়া দিল না।

কুলঙ্গির দিকে নজর পড়তেই বসন্ত দেখল, চার পয়সার মোমবাতি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো'র মলাটের ওপর গলা-মোম প'ড়ে প'ড়ে নামটাকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। বাতিটা এত ছোট হয়ে এসেছে যে ওটাকে নিবিয়ে না ফেললে 'মেনিফেস্টো'র মলাটে আগুন ধরে যেতে পারে।

বসন্তর সামনে নতুন ক্রাইসিস্!

ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার সুকুর দিকে, একবার মোমবাতির দিকে সে দৃষ্টি দিতে লাগল। দু'দিক তার রক্ষা করা চলবে না।

বসন্ত ছোঁ মেরে টাকার বাণ্ডিলটা সুকুর বুকের ভেতর থেকে তুলে নিয়ে আসছিল, এমন সময় সুকু চিৎকার ক'রে উঠল, "কে?—কে?"

"আমি—আমি।" জবাব দিল বসন্ত।

"কি করছিলে ?"

"টাকা নিচ্ছিলাম।" টাকার বাণ্ডিলটা টুপ ক'রে ছেড়ে দিয়ে বসন্ত তার খালি হাতটা সরিয়ে নিয়ে এল বাইরে।

'মেনিফেস্টো'র মলাটের ওপরে মোমবাতির সলতেটা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে এবার—নিবনিব করছে।

মুকু তার মাথাটা বালিশের ধারে হেলিয়ে দিয়ে অতি অস্ফুটস্বরে বলল, "হাতটা অত জোরে টেনে নিলে কেন ? হাড়গুলোতে আমার ব্যথা লাগল। বসন্ত, সব টাকাই তোমার—তিনশো টাকা। আর ক'টা দিন আমায় বাঁচিয়ে রেখো ভাই—কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের প্রথম সূর্যোদয় আমি দেখতে চাই।" মুকু নিজেই এবার টাকার বাণ্ডিলটা বার ক'রে বসন্তর দিকে তুলে ধরল।

"গোটাকতক টাকা আপনি বার ক'রে দিন। কিছু খাবার আমি নিয়ে আসছি।" কথা শেষ হওয়ার আগেই বাতিটা নিবে গেল। 'মেনিফেস্টো'র মলাটে আগুন ধরল না।

দশটা টাকা হাতে নিয়ে বসন্ত গলিটার মুখে এসে দাঁড়াল। সামনের দিক থেকে বস্তা ভ'রে হাজার রকমের জিনিস নিয়ে বস্তির লোকেরা ফিরছে। লুঠের সময় বাছবিচার থাকে না। যে, যা পেয়েছে, তাই নিয়েই ওরা ফিরে এসেছে। বসন্তকে দেখে ওরা থামল।

মংলু দুবে তার বস্তাটাকে পিঠের ওপর থেকে একটানে সামনের দিকে নামিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কি চাই তোর ? টাকা ?"

বসন্ত জবাব দিল না।

"তোর গায়ে তাকত নেই—তুই খানিকটা গোস্ত খা। সাহেবের বাবুর্চিখানা আজ সাবড়ে দিয়েছি।" মংলু দুবে বস্তার মধ্যে হাত চালিয়ে দিয়ে একটা মস্তবড় টার্কি টেনে বার করল।

"লে, লে বসন্ত—কাঁচাই খেয়ে লে। এই দেখ্, খুন পড়ছে!" মংলু দুবে নিজেই টার্কির কাটা গলায় দাঁত বসিয়ে দিল। বসন্ত আর দাঁড়াতে পারল না।

দু'পা এগিয়ে এল মেছুয়াবাজারের দিকে।

পাটোয়ারবাগানের প্রতিবেশীদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। শম্ভু মাইতি ছুটে এসে বসন্তর হাত চেপে ধরল।

"নিবি নে কেন? আমরা বুঝি তোর খবর রাখি নে? সাত দিন থেকে তো উপোস করছিস। খা, পেট ভরে খা—"

শম্ভু মাইতি রাস্তার কাগজ কুড়িয়ে বেড়ায়। চৌরঙ্গি পাড়ায় এমন কোন ডাস্টবিন নেই যেখানে শম্ভু মাইতি হাত ঢোকায় নি। নোংরা ঘেঁটেঘেঁটে ওর হাতের চামড়ায় ঘা হয়েছে। আজ সকালেই বসন্ত দেখেছে, শম্ভুর হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ব্যাণ্ডেজের ন্যাকড়াটাও সে সংগ্রহ করেছে ডাস্টবিন থেকে। উপস্থিত সেই নোংরা হাত দিয়ে শম্ভু মাইতি একটুকরো কেক্ বসন্তর মুখের ওপর চেপে ধরল। হি হি ক'রে হাসতে হাসতে সে বলল, "মাইরি বলছি, কাল থেকে আর ডাস্টবিনে হাত দেব না। ফারপো কোম্পানির বড় বাবুর্চির কাজ মিলবে আমার। কি রে বসন্ত—"

চারদিকে হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে বসন্ত বড় রাস্তার দিকে হাঁটতে লাগল। পেছন থেকে জনতা হাসতে হাসতে নানাবিধ খাদ্যের শর নিক্ষেপ করতে লাগল বসন্তর দিকে। প্রতিবেশীকে এমন ক'রে ভালবাসতে ঐতিহ্যময় গোয়াবাগানের সম্মানবোধে বাধত। একতাল ভিজে ন্যাকড়ার মত কতগুলো খাবার ওর কপালে ছুঁড়ে মারল মংলুর দল। বসন্ত কপালে হাত দিয়ে অনুভব করল রস গড়িয়ে পড়ছে। কে, সি, দাশের রসকদম্ব! শুকনো ঠোঁটে রসের স্পর্শ লাগবার আগেই সে জামার আস্তিন দিয়ে ভিজে কপাল মুছে ফেলল। তারপর কণ্ঠনালী দিয়ে থুথু টেনে বার ক'রে লিপস্টিকের মত বসন্ত ঠোঁটের চারদিকটা চাটতে চাটতে পা বাড়াল বারোয়ারি কলতলার দিকে। সামনের দিক থেকে আর একদল লোক আসছিল। মায়ের কোলে শুয়ে ও শিখেছে, পরের জিনিসের প্রতি লোভ করতে নেই।

কলতলার ডান দিক দিয়ে একটা ছোট্ট রাস্তা পুনরায় বস্তির মধ্যে গিয়ে শেষ হ'য়ে গেছে। বসন্ত এসে ঢুকে পড়ল সেইখানে। লোকগুলো চলে গেলে সে আবার বড় রাস্তা ধরেই খাবার আনতে যাবে।

হঠাৎ ওর গায়ের সঙ্গে একটা উলঙ্গ নারীদেহের ধাক্কা লাগল! পেছন ফিরে

বসন্ত দেখল, শম্ভু মাইতির মা নিঃশব্দে ও অতি মনোযোগ সহকারে একখানা সোনার জরী-পাড় শাড়ীর ভাঁজ খুলছে। শম্ভুর মাকে বসন্ত ঠাকুমা ব'লে ডাকত। বয়েস হয়েছে ষাটের ওপর।

"কি হচ্ছে ঠাকুমা?" বসন্ত তাড়াতাড়ি উল্টো দিকে মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

"বেনারসী শাড়ী পরছি। তুই ছোঁড়া এখানে কি করতে এলি? লুঠ করতে যাস্ নি?"

"তুমি গিয়েছিলে না কি?"

"হ্যাঁরে ছোঁড়া। পুরো যৈবনটা ঘরের মধ্যে লুকিয়েছিলুম—দু' হাতের বেশী ন্যাকড়া জোটে নি। খোলাবুকের দুধ খেয়ে শম্ভু বড় হ'ল। শম্ভু ছোঁড়া হোথায় কাপড়ের কলে একবার চাকরি করতে গেছল, কিন্তু আমার বুকে দেবার জন্যে বারো ইঞ্চি কাপড় জোটাতে পারে নি। বলি হ্যাঁরে ছোঁড়া, দেখ্‌তো এবার—"

শম্ভুর মা বেনারসী প'রে এগিয়ে এল বসন্তর সামনে।

"সুন্দর মানিয়েছে তোমায় ঠাকুমা! দেহের কোন জায়গাই আর খোলা নেই।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শম্ভুর মা বলল, "ঢাকবার মত এক ছটাক তাজা মাংস নেই আর শরীরে!"

"ষাট বছর বয়সে থাকবার কথাও নয়! পাটোয়ারবাগানের সবাই আজ তোমার কাপড়টাই দেখবে, তোমাকে কেউ দেখবে না ঠাকুমা। কোথায় চললে?"

"করিমের পানের দোকান থেকে একটা পান খাব না! মেছোবাজারের গ্যাসবাতির নীচে দাঁড়িয়ে ছুঁড়ীর দলে গিয়ে মিশব আজ। বলি হ্যাঁরে বসন্ত, তোর বয়স কত রে?" শম্ভুর মা আরো খানিকটা এগিয়ে এল বসন্তর দিকে।

"বয়স?" বসন্ত ভয় পেয়ে গেল, "বলছি—চল, বড় রাস্তায় গিয়ে বলছি ঠাকুমা।"

"ঠাকুমা কিরে বসন্ত? তোর ঠাকুমা তো স্বগ্‌গে গেছে ষাট বছর আগে। আমি তোর—"

বসন্ত লাফিয়ে পড়ল কলতলার সামনে। তারপর ছুটতে লাগল বড় রাস্তার দিকে। আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের সামনে এসে থামল সে। পেছন ফিরে দেখল, শম্ভুর মাকে আর দেখা যাচ্ছে না।

বসন্ত এল কেশব সেন স্ট্রীট ধ'রে পশ্চিম দিকে। চারদিকে লুটপাটের ব্যাপার দেখে ও আর চীনা রেস্তরাঁ খুঁজে বার করবার দায়িত্ব নিতে চাইল না। চীনেরা হয়তো সাইনবোর্ড নামিয়ে নিয়েছে। সাইনবোর্ড না থাকলে ঠিকানা খুঁজে বার করা অসম্ভব। বিনোদ ঠাকুরের 'পাইস হোটেলের' প্রায় সামনে এসে উপস্থিত হ'ল বসন্ত। প্রতিদিন দু'দশবার ক'রে সে এই হোটেলের সামনে দিয়ে যাতায়াত করে। খিদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হ'য়ে বিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে খানিকটা সময় সে গল্প-গুজব ক'রে যায়। পকেটে পয়সা থাকলে সে আর পাঁচজনের মত ভাল খেয়ে ঢেঁকুর তুলে সারা কেশব সেন স্ট্রীটটা কাঁপিয়ে তুলতে পারত, কিন্তু আজ সাত দিন থেকে বসন্ত নিজেই কাঁপছে। আজও সকালে সে যথারীতি বিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে প্রায় দু'ঘণ্টা কাটিয়েছিল। জল চেয়ে খেয়েছে, এক ছটাক ভাত চেয়ে খেতে পারে নি। ভাত! ছোট ছোট দানাগুলোকে সিদ্ধ করলে কি হয়? ভাত! খাদ্যমন্ত্রীর খাতায় প্রতিটি দানার হিসেব লেখা আছে, বসন্ত তা জানে। এই নিয়েই সকালে বিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে তার খানিকটা আলোচনা হ'য়ে গিয়েছিল।

"আচ্ছা বিনোদদা, তোমার বাড়ি তো পূর্ববঙ্গে? দেশের কথা মনে পড়ে?"

খদ্দেরের হাত থেকে সতরটা পয়সা নিয়ে বিনোদ ঠাকুর প্রশ্নের জবাব দিল, "বলিস্ কি বসন্ত? মনে পড়বে না?"

"তুমিই একদিন বলেছিলে, প্রায় তিরিশ বছর হ'ল দেশে যাও নি।"

তেলচিটে ক্যাস-বাক্সটা খুলে বিনোদ ঠাকুর খুপরীর মধ্যে সতেরটা পয়সা গুনে গুনে রাখল। তারপর প্রতিবাদের সুরে বলল, "তিরিশ বছর না গেলে কি হবে, আমি তো রিফিউজী রে বসন্ত! কার্ড দেখবি?"

"দেখলেও চিনতে পারব না বিনোদদা। আমার নিজের কোন রিফিউজী কার্ড নেই।"

"নেই? কেন?"

দ্বিতীয় খদ্দের ভাত খেয়ে ট্যাঁক থেকে পয়সা গুনছিল। বিনোদ ঠাকুর খদ্দেরের পেটের দিকে চেয়েই জিজ্ঞাসা করল, "কিরে ভজুয়া, পেটের চামড়া তো আধ ইঞ্চিও ফুলে ওঠে নি? খাওয়া-দাওয়া সব ছেড়ে দিলি নাকি?"

"তুমি তো চামড়া দেখে পয়সার হিসেব কর ঠাকুর, কিন্তু—"

বিনোদ ঠাকুর ছোঁ মেরে ভজুয়ার হাত থেকে পয়সাগুলো নিয়ে ধমকে উঠল, "দিলি তো ন'টা তামার ফুটো পয়সা, আর বক্তৃমে দিচ্ছিস খুব লম্বা চওড়া! ব্যাটা প্রধান মন্ত্রীর ব্যামো পেয়েছে, সুরু করলে আর থামতে চায় না!"

"রিকসার চাকা খুলে গেছে, সমস্ত দিনে একটি পয়সাও রোজগার হয় নি ঠাকুর।"

বসন্ত চেয়েছিল অন্দরমহলের দিকে। দরজার ফাঁক দিয়ে ও দেখছিল, দু'জন লোক দাওয়ায় ব'সে ভাত খাচ্ছে, আর ট্যাঁক থেকে পয়সা বার ক'রে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছে। দরজার ওপরে বড় বড় ক'রে লেখা রয়েছে: 'পয়সা গুনিয়া ভাত খাইতে বসিবেন।'

"আচ্ছা বিনোদদা, এদেশের সবাই খুব হিসেবী লোক, না? উঠতে, বসতে, চলতে—কেবল হিসেব আর হিসেব! আমাদের দেশে মাঠ-ভর্তি ধান, গোলায় তোলবার সময় দু'দশ সের তো রাস্তা-ঘাটে পড়ে থাকে! প্রতিবেশীর কাছে হাত বাড়ালে শূন্যহাতে কেউ ফিরে আসে না।"

"এখানে তুই প্রতিবেশী দেখলি কোথায়, সব তো কালোয়ার। দিনরাত পুরনো লোহা পিটছে, বেহিসেবী হলেই, নতুন ব'লে চালিয়ে দেবে। এই যে শশধরবাবু, চিংড়ী মাছের কানন-কারী কেমন পেলেন? আজকের স্পেশালটা চেখেছেন তো? ফুলকপির মহাপুরুষ? খুব বিক্রি মশাই, খুব বিক্রি—চার আনার খেয়ে নিলে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার দরকার হবে না। পুণ্য তো পেটে মশাই, বই প'ড়ে কে কবে ঠাকুর-দর্শন করল?"

শশধরবাবু তেরো পয়সা বিনোদ ঠাকুরের হাতে দিয়ে বললেন, "নামগুলো সব মনে রইল। চার আনা যোগাড় করতে পারলেই ফুলকপির শ্রাদ্ধ ক'রে যাব। কেবল খেলেই তো চলবে না বিনোদ, হজম করা চাই।"

"মাত্র তেরো পয়সা! বিশ্ববিপ্লব দরজায় ধাক্কা মারছে! শশধরবাবু, সামলে-সুমলে চলবেন, রাস্তাঘাট ভাল নয়। ওরা এল ব'লে! পয়সা জমিয়ে রাখবেন কোথায়?"

শশধরবাবু উত্তর দিলেন না। আগামীকাল তেরো পয়সা জুটবে কিনা সে-সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ নন।

প্রায় দু'ঘণ্টা কেটে যাবার পর বসন্ত বলল, "তাহলে উঠছি বিনোদদা।"

"আবার আসিস ভাই। দিনকাল ভাল নয়। শ্রেণী-সংগ্রামের জগাই-মাধাইরা বড্ড বেশী 'কলসির কানা' ছুঁড়ছে।"

"তোমার ভয় করে না বিনোদদা? তোমার ঘরে তো অনেক চাল!"

"বলিস্ কি পাগলা! আমি তো রিফিউজী! তা ছাড়া দু'দিকে লোহার ডিপো, পুরনো লোহা পিটে পিটে ছুঁচলো ক'রে রেখেছে কালোয়াররা—"

দরজায় দাঁড়িয়ে বসন্ত বাধা দিয়ে বলল, "খিদে বড় সাংঘাতিক জিনিস বিনোদদা। চিবুতে পারলে কালোয়ারদের পুরনো লোহাও হজম হয়ে যাবে।"

বিনোদ ঠাকুরের প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্যে বসন্ত আর দাঁড়াল না।

ঝুকুর দেওয়া দশ টাকার নোটখানা হাতে চেপে বসন্ত এল বিনোদ ঠাকুরের হোটেলের দিকেই। দশ টাকার নোট ভাঙিয়ে দু'টাকার ভাত, তরকারি আর কিনলে পেট ভ'রে দু'দিন বসে খাওয়া চলবে। তা'ছাড়া পাইস-হোটেলে একশ' আটাশ পয়সার খাবার কিনলে বিনোদ ঠাকুর নিশ্চয়ই চার পয়সার ভাত ফাউ দেবে। বসন্ত ভাবল হোটেলে ব'সেই সে ফাউটুকু খেয়ে নেবে। চার পয়সার সাদা ভাত যে কতগুলো, বসন্ত তা আন্দাজ করতে পারল না। মনে মনে কল্পনা করতে লাগল, হয়তো একশ' আটাশটা ভাত! কলকাতা হিসেবের দেশ, খাদ্যমন্ত্রীর খাতা থেকে বিনোদ ঠাকুরের খাতা পর্যন্ত হিসেবের কোন ব্যতিক্রম নেই। একদানা ভাতের কমবেশি হওয়া মানেই মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে গেল, উকিল-সেপাই আদালত নিয়ে মহা হৈ-চৈ ব্যাপার! দিল্লীতে মিটিং বসল, ভারতবর্ষের সবগুলো মুখ্যমন্ত্রী উড়োজাহাজে চেপে ছুটলেন

রাজধানীর দিকে, কে কোথায় থাকবেন তাই নিয়ে বড় বড় রাজকর্মচারীদের হয়রানির একশেষ। একদানা ভাতের হিসেব মেলাতে গিয়ে দিল্লীর মিটিং ডাকতে দু' লক্ষ টাকা খরচ। বসন্ত ভাবল, পূর্ববঙ্গের মাঠ-ভর্তি ধান, বিশ তিরিশটা ধানের ছড়া টেনে ছিঁড়ে নিলেও চাষীরা হিসেব করতে বসে না। খাদ্যমন্ত্রীর হিসেবের খাতার কথা স্মরণ ক'রে বসন্ত নিজের অজ্ঞাতেই সশব্দে হেসে উঠল। কিন্তু হাসতে গিয়েই সে তলপেটে একটা ব্যথা অনুভব করল। ক্রমাগত উপোসের ফলে ওর তলপেট শুকিয়ে পিঠের সঙ্গে মিশে গেলেও ব্যথা-বেদনাবোধ খাদ্যমন্ত্রী একেবারে কেড়ে নিতে পারেননি! বসন্ত পা চালিয়ে ছুটে চলল হোটেলের দিকে।

বিনোদ ঠাকুর ক্যাশ-বাক্সের ওপর উঠে বসে আছে। কলকাতার অন্ধকার যতই কালো হোক, বিনোদ ঠাকুরের গায়ের রংয়ের চেয়ে বেশী কালো নয়। বসন্ত দেখল, বিনোদ ঠাকুর হাঁটুর সঙ্গে হাঁটু ঠেকিয়ে রাস্তার ল্যাম্প-পোস্টের দিকে হতাশভাবে চেয়ে আছে। অন্দরমহলে বাতি নেই।

"ব্যাপার কি বিনোদদা? খদ্দের আসে নি?"

"না। সব লুঠ হয়ে গেল!"

"বলো কি?"

"হ্যাঁ, আট টাকা আট আনার ভাত, পাঁচ টাকা ছ' আনার কানন-কারী, তিন টাকা ন' পয়সার ফুলকপির মহাপুরুষ, সেল্‌ট্যাক্স বাদ দিয়েই হিসেব কর, কত হ'ল?"

"সতের টাকা এক পয়সা।"

"পুরোটাই আমার মূলধন ছিল। বসন্ত, কড়াতে টগবগ ক'রে স্পেশালটা সেদ্ধ হচ্ছিল, উচ্ছৃঙ্খল জনতা কড়াটা বাদ দিয়ে সবকিছু খেয়ে গেল! দেখিস তো ওদের জিভে ফোস্কা পড়েছে কিনা?"

"আমি কি ক'রে দেখব বিনোদদা?"

"তোদের পাটোয়ারবাগানের বস্তির লোক ওরা। চিনি, সব ব্যাটাকেই সনাক্ত করতে পারব। হ্যাঁ রে বসন্ত, আইন ও শৃঙ্খলা বিভাগের মন্ত্রীর নাম কি রে?"

"জানি না তো।"

"যাক্‌, না জানলেও ক্ষতি নেই। সাক্ষী দিলেই চলবে—ওই ব্যাটা সর্বহারা শম্ভু মাইতিকে হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে যাব আদালতে। কড়া থেকে এক থাবা ফুলকপি তুলে নিয়ে ব্যাটা একেবারে গলার মধ্যে ভ'রে দিলে! তুই দেখিস্‌, কাল সকালে শম্ভুর জিভ ফুলে ঢোল হয়ে গেছে।"

বসন্তর আর সহ্য হচ্ছিল না। সে বলল, "ভাত কিনতেই এসেছিলাম—তা হ'লে অন্য কোন হোটেলের দিকেই যেতে হচ্ছে।"

"হোটেল তো কলকাতায় অনেক আছে রে, কিন্তু আজ আর কোথাও ভাত পাবিনে। সর্বহারার দল আজ সব হোটেলই লুঠ করেছে। বসন্ত, আমার যা চেহারা-চরিত্তির, ভাবছি কাল থেকে ওদের সঙ্গেই ভিড়ে পড়ব। তা তুই আজ ভাত কেনবার পয়সা পেলি কোথায়?"

"পয়সা নয়, টাকা পেয়েছি বিনোদদা। দশ টাকা!" ক্যাশ-বাক্সের ওপর থেকে নেমে বসল বিনোদ ঠাকুর। বসন্তের ঘাড়ের ওপর একটা দশ সের ওজনের হাত রেখে অন্তরঙ্গতার সুর তুলে সে জিজ্ঞাসা করল, "দশ টাকা? দশ টাকার ভাত কোথায় পাবি বল?"

"পঞ্চাশ পয়সার ভাত কিনব, আর আটাত্তর পয়সার মাছ মাংস। তোমাদের হিসেব মত, পঞ্চাশ পয়সায় ক' গণ্ডা ভাত পাওয়া যাবে বিনোদদা?"

"ওরে দাদা! গণ্ডা কি রে? ক্যাশ পেলে, সের দু'য়েক ওজন ক'রে দেব। বসন্ত, রাষ্ট্রবিপ্লব সুরু হয়েছে, সবাই কেবল ক্যাশ চাইছে। দেখি, টাকা দেখি?"

বসন্ত পকেট থেকে দশ টাকার নোটখানা বার ক'রে বিনোদ ঠাকুরের চোখের সামনে তুলে ধরল। লক্ষ লক্ষ পুঁজিবাদীর চোখের মত বিনোদ ঠাকুরের চোখ দু'টোও শোষণ লিপ্সায় বিস্ফারিত হ'ল মুহূর্তের মধ্যে। বসন্তকে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে গেল। স্নানঘরের শুকনো চৌবাচ্চার ভিতর থেকে টেনে তুলল একটা পেতলের হাঁড়ি। বসন্ত ব্যাপার দেখে একেবারে হাঁ হয়ে গেল। হাঁড়ি-ভর্তি ভাত! বিনোদ ঠাকুর কনুই পর্যন্ত ভাতের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, "দে টাকা দে—"

ধনুকের মত দেহটাকে বাঁকা ক'রে বসন্ত মাথাটা প্রায় হাঁড়ির কিনারা পর্যন্ত নামিয়ে নিয়ে এল। পরখ ক'রে দেখল, হাঁড়ির মধ্যে অনেক ভাত! বসন্ত প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, "বিনোদ-দা, গন্ধ আসছে! ভাতের গন্ধ!" ওর নাসারন্ধ্রের ছিদ্র সঙ্কুচিত হয়ে এল। ভাতের মধ্যে নাক ঢুকিয়ে দিয়ে নিশ্বাস টানতে লাগল ঘন ঘন। বসন্ত একেবারে ঐতিহাসিক জড়বাদের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে! ভাতের হাঁড়িতে ভগবান নেই, ইহলোকের কার্ল মার্কস গরম জলে সিদ্ধ হয়ে ধবধবে সাদা ভাতে রূপান্তরিত হয়েছে। বরাত আর ভগবানের ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই, সাপটাই দড়ি, না দড়িটাই সাপ সে-সব যুক্তিতর্ক বড়বাজারের গদিতে কিংবা বালিগঞ্জের ড্রইং-রুমে বসে সময়-সুযোগমত বুঝে করা যাবে। উপস্থিত বসন্ত নাকের সবটুকুই ভাতের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ফুসফুস ফাটিয়ে ফেলবার উপক্রম করল। বিড়লা কিংবা বিনোদ ঠাকুর এ-দৃশ্য কোন দিনই দেখে নি। তেত্রিশ-কোটি দেবতার হাঁড়ির খবর নাও, এ দৃশ্য কোথাও পাবে না। অনীতার যীশুখৃষ্ট যদি সত্যি হতেন, তাহলে বুভুক্ষার কুষ্ঠব্যাধি আরোগ্য করবার জন্যে তিনি পুনরায় নেমে আসতেন মর্তভূমিতে। কিন্তু আঠারশো আঠার খৃষ্টাব্দে মার্কস-জননী বেথেলহেমে ছিলেন না, ছিলেন প্রুসিয়াতে, এক ইহুদী উকিল সাহেবের বৌ হয়ে। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ফলে, গর্ভে তাঁর সন্তান এল, 'নিষ্কলঙ্ক গর্ভধারণের' আফিম দিয়ে কাউকে নেশাগ্রস্ত করার প্রয়োজন হলো না। সন্তানের নাম দিলেন তিনি কার্ল মার্কস।

মিনিট পাঁচেক পরে বিনোদ ঠাকুর ধমকে উঠল, "গন্ধ শুঁকেই তো পাঁচ টাকা খরচ ক'রে ফেললি, দে এবার পুরো নোটখানাই দিয়ে দে।" এই ব'লে সে বসন্তকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। বসন্তর হুঁস ফিরে এল। কিন্তু তার আগেই বিনোদ ঠাকুর বসন্তর হাত থেকে দশটাকার নোটখানা ছিনিয়ে নিয়েছে। স্নানঘরের চৌবাচ্চা থেকে কেবল ভাতের গন্ধই আসছিল না, শতাব্দীর সঞ্চিত দীর্ঘশ্বাসের প্রতিবাদও আসছিল। প্রতিবাদের তুফানে ভারতবর্ষের ইতিহাস বাত্যাহত। বসন্ত জানে না, জগতের প্রতিটি বাস্তব-সংঘটনের অপর নাম ইতিহাস। ইতিহাস মানেই গতিশীলতা, এবং গতিশীলতাই ডায়লেকটিকস-ধর্মী রূপান্তর।

অনীতা কাছে নেই। থাকলে ব'লে দিতে পারতুম যে, শূন্য আকাশে হাত বাড়িয়ে যদি প্রার্থনাই করতে হয়, তবে ও যেন চোখ খুলেই প্রার্থনা করে। কারণ, ভগবানের সিংহাসনে ভগবান আর অধিরূঢ় নেই, আছে মানুষ। মানুষের ওপরে আর কেউ নেই। বিচারের সর্বোচ্চ আদালত থেকে পরমেশ্বর হাওয়া হয়ে গেছেন, বিচারাসনে উপবিষ্ট ইতিহাস।

কিন্তু কমরেড, ভগবান-বর্জিত ভূখণ্ডের খুদে সামন্ত দীপক চৌধুরী যেদিন মার্কসের ওয়ারিসনামায় নাম লিখিয়েছিল, সেদিন সে জানত না যে, মার্কসের 'পুঁজি' বাত্যাহত ইতিহাসেরই এক স্বল্পায়ু সংস্করণ, সময়ের সমুদ্রে অসংখ্য বুদ্‌বুদের যে-কোন একটি।

পরের দিন বেলা বারোটা পর্যন্ত বসন্তর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। হুকুর ঘরের মেজেতে শুয়ে সে একটানা বারো ঘণ্টা ঘুমিয়েছে। পার্টিতে বাগানে স্থানের অভাব নেই বটে, কিন্তু ছাদের অভাব আছে। গত এক বছর থেকে বসন্ত খোলা আকাশের নীচেই ঘুমিয়েছে। ছয় ঋতুর কশাঘাত ওর অঙ্গে চিহ্ন রেখে গেছে অসংখ্য, তবু সে পরাজয় স্বীকার করে নি। ভবিষ্যতে আশ্রয় পাওয়ার বিশ্বাস হারায় নি ; ভেবেছে আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু আশ্রয় সে পাবেই। কলকাতার লোক যত হিসেবীই হ'ক, ভগবানের মত নির্ভুল হিসেব-রক্ষক দুনিয়ায় আর কেউ নেই। নিশ্চয়ই নেই। নইলে, গত রাত্রে পেট ভ'রে ও ভাত খেতে পেত না—লুঠের ভাত নয়, পয়সা দিয়ে কেনা চামনমুনি চালের ভাত!

চৌকির কিনারে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে হুকু ডাকল, "বসন্ত, ও বসন্ত—"

দ্বিতীয়বার ডাকতে গিয়ে হুকু তার ভাঙ্গা চোয়ালে সহসা শক্তির স্পর্শ অনুভব করল।

স্ফুটনাঙ্ক-স্পর্শী ফুটন্ত জলে চামনমুনি চাল বিনোদ ঠাকুরের হাঁড়িতে অদ্ভুত শক্তি সঞ্চয় করেছে। হুকু তাই খেয়ে বারো ঘণ্টার মধ্যেই বিছানায় উঠে বসল। চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, "বসন্ত, বসন্ত—"

হুড়মুড় ক'রে উঠে বসল বসন্ত! জিজ্ঞাসা করল, "কি? কি হয়েছে?"

"রাষ্ট্রবিপ্লব বোধহয় শেষ হয়ে গেল! বাইরে কোন হল্লা-চিৎকার শুনছি না তো!" মুকু মেজেতেই বসন্তের পাশে এসে বসল।

বসন্ত বলল, "এ-পাড়ায় আর দোকানপাট নেই। ওরা নিশ্চয়ই আজ বালিগঞ্জের দিকে গেছে।"

"তাহলে আজ ওরা বুর্জোয়া-সাম্রাজ্য মাথায় ক'রে নিয়ে আসবে। কি মজাই না হবে বসন্ত!"

"লুঠের মধ্যে মজা আছে না কি?"

"মজা না থাক, 'ক্যালরি' আছে। বেঁচে থাকতে হ'লে দেহের মধ্যে তাপের দরকার—খাদ্য থেকেই সেই তাপ আমরা গ্রহণ করি। যে-কোন মানুষের জীবন ধারণের পক্ষে প্রতিদিন তিন হাজার পরিমাণ তাপ অথবা 'ক্যালরি'র প্রয়োজন। বসন্ত, সারা পৃথিবী জুড়ে এক বিরাট প্যাটোয়ারবাগান সৃষ্টি হয়েছে, যার দেহ ব্যবচ্ছেদ করলেও দশ 'ক্যালরি'র বেশী হিসেব পাওয়া যাবে না। তবে সে-সব উদ্বৃত্ত 'ক্যালরি'গুলো গেল কোথায়? হিসেব তো একটা থাকবে।"

হাই তুলতে তুলতে বসন্ত বলল, "হিসেব নিশ্চয়ই আছে, আর আছে বোধহয় ভগবানের খাতায়।"

বসন্ত শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল। মুকু ওকে ধরে পুনরায় বসিয়ে দিয়ে বলল, "ভগবানের কোন খাতা নেই, কারণ ভগবান ব'লে কোন মানুষ কিংবা জানোয়ার আমরা আজ পর্যন্ত চোখে দেখি নি। কেন দেখি নি বসন্ত?"

"আমি দেখেছি।" দু'টো কথার সাহায্যে সংক্ষিপ্ততম জবাব দিয়ে বসন্ত শুয়ে পড়ল মেজেতে। মুকু ওর মুখের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে জিজ্ঞাসা করল, "দেখেছ? কখন এবং কোথায়?"

"কালকে এবং বিনোদ ঠাকুরের ভাতের হাঁড়িতে। ভগবান না থাকলে কাল রাত্রিতে আমি মরে যেতুম।—আপনি একটু সরে বসুন, নইলে বাচ্চার গায়ে ব্যথা লাগবে।"

লজ্জা পেয়ে মুকু সরে এল দরজার দিকে। ব'সে ব'সে ভাবতে লাগল। ভাবতে লাগল অনেক কথা। কবে, কোথায়, কেমন ক'রে বিনয়প্রকাশ নামে একটি যুবক ওকে ভালবেসেছিল, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল—কোনদিন ওদের বিচ্ছেদ

হবে না, আর আজ সে কতদূরে! চোখের সামনে দাঁড়ান দেখলেও বিনয়প্রকাশের দূরত্ব ঘোচবার নয়। হাত দিয়ে যাকে ছোঁয়া যায়, মনের শুচিতায় সে অস্পৃশ্য। রাষ্ট্রবিপ্লবের আগুনের চেয়ে সুকুর মনের আগুনের তেজ বড় কম নয়। কিন্তু রাষ্ট্রবিপ্লবের আগুনে সুকু হয়তো কোনদিনই পুড়ে মরবে না, যদি মরে, তবে মরবে নিজেরই অন্তর্দাহে।

বসন্ত আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। সুকু অবাক হয়ে বসন্তকে দেখছে। বাইশ বছরের জীবনে ছেলেটা বোধহয় বাইশ দিনও পেট ভরে খেতে পায়নি, অথচ সমাজ-সংসার কারুরই বিরুদ্ধে ওর এতটুকু অভিযোগ নেই। এ কেমন ক'রে হয়? ভগবান নামধারী কোন্ এক অদৃশ্য অবৈজ্ঞানিক অস্তিত্বের উপর নির্ভর ক'রে থাকবে এক মুঠো চালের জন্যে, হয়তো আরও বাইশ বছর, তবুও ধনিক দস্যুর শস্যভাণ্ডার লুঠ করতে যাবে না বসন্ত দাসের দল। সুকুর শুকনো হাড়ে মার্কসবাদের হাওয়া লাগল—উত্তপ্ত হাওয়া! গোয়াবাগানের ঐশ্বর্য-ভোগী বুর্জোয়া মাংসপিণ্ডের শুষ্ক সংস্করণ এই বসন্ত দাস কেমন ক'রে যে পাটোয়ারবাগানের ঐতিহাসিক জড়বাদের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, এটা ভেবে সুকু খুবই বিস্ময় বোধ করতে লাগল।

ডায়ালেকটিকসের মই ধ'রে দু-চার ধাপ উঠবার পরেই, সুকু পরিষ্কার দেখতে পেল, বসন্ত দাস মার্কসের ইতিহাস ব্যাখ্যার নির্ভুল এ্যান্টি থিসিস। বসন্ত দাস আছে ব'লেই থিসিস-রূপী শম্ভু মাইতির উপস্থিতি স্বীকার ক'রে নিতেই হবে। সুকু নিশ্চিন্ত হ'ল। নিশ্চিন্ত হ'ল এই ভেবে যে মার্কসের সর্বরোগনাশক 'মূলধন'-বটিকার উপাদানের মধ্যে বসন্ত দাসকে পাওয়া গেছে।

চৌকির নীচে সুকুর দৃষ্টি গেল। একটা মাটির হাঁড়ি রয়েছে, তার পাশেই রয়েছে একটা চিনেমাটির থালা। থালার ওপরে দু-রকমের তরকারি। এবার ওর মনে পড়ল, গতকালের নৈশভোজের অবশিষ্টাংশ বসন্ত যত্ন ক'রে রেখে দিয়েছে পরের দিনের মধ্যাহ্নভোজনের সংস্থান হিসেবে। ভালই করেছে বসন্ত। লুটপাটের হিড়িকে আজও হয়তো এক মুঠো খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হ'তো না।

হুকু হাত বাড়িয়ে হাঁড়িটা টেনে বার করল। হাঁড়ির গলা পর্যন্ত জল। জল কেন? হতাশভাবে হুকু বারবার ক'রে জলের দিকে চাইতে লাগল। ওর ভীষণ খিদে পেয়েছে, ভাতের খিদে। হুকু গোটা ভারতবর্ষটা দেখেছে, অথচ আজ পর্যন্ত ভাতের হাঁড়ি দেখেনি। ভাতের হাঁড়ি তো দূরের কথা, গোয়াবাগানের বিরাট বিস্তৃতির মধ্যে রান্নাঘরের সঠিক অবস্থান সে আজও জানে না।

মুহূর্তের জন্যে সে গোয়াবাগানে ফিরে গেল। মনে মনে বিচরণ করতে লাগল দু'তলা এক তলার প্রতি ইঞ্চি স্থান। কোথায় রান্নাঘর? দু'তলার দক্ষিণ সীমায় ঠাকুরদার শোবার ঘর। হুকু সেই সীমা থেকে হাঁটতে সুরু করল। লম্বা বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সবগুলো ঘরেই সে উঁকি দিল, কিন্তু রান্নাঘর নেই। বাঁ দিকেই এক তলায় নামবার সিঁড়ি। সিঁড়ির ডান দিকের দেয়ালে কোন ঘর থাকা সম্ভব নয়। ওর স্পষ্ট মনে পড়ল, দেয়ালে কি সব কতগুলো ছবি টাঙ্গানো আছে। অতি কুৎসিত ছবি! ঠাকুরদা আবার তাই নিয়ে গর্ব করতেন! কোমর সরু কতগুলো স্ত্রী-পুরুষের গায়ে রং লাগিয়ে অবনী ঠাকুর আর নন্দলাল বসু নাকি চিরস্মরণীয় হয়েছেন। 'চিরস্মরণীয়' শব্দটা দ্বিতীয় বার উচ্চারণ করতে গিয়ে হুকু নিজের মনেই হেসে উঠল। মানুষের স্মরণশক্তির তিনটি বিশেষ ক্রিয়ার কথা ঠাকুরদা জানতেন না। স্মরণশক্তির তিনটি ক্রিয়া হচ্ছেঃ গ্রহণ, ধারণ এবং পুনরুৎপাদন। সর্বহারা-শাসিত বিশ্বরাষ্ট্রে, মানুষের স্মরণশক্তির অপচয় হতে ওরা কিছুতেই দেব না। খাদ্য নিয়ন্ত্রণের মত স্মরণশক্তিও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নিয়ন্ত্রিত হবে। রেশন কার্ডে উল্লিখিত চাল, আটার মত স্মরণযোগ্য বিষয়-বস্তুগুলোও নির্ধারিত ক'রে দেবে রাষ্ট্র। অবনী ঠাকুর কিংবা নন্দলাল বসুর চিরস্মরণীয় হওয়ার পেছনে কোন যুক্তি নেই।' তা না থাক, উপস্থিত গোয়াবাগানের রান্নাঘরটা খুঁজে বার করবার জন্যে হুকু পুনরায় হাঁটতে আরম্ভ করল। বড় কাকার লাইব্রেরী ঘরের সামনে এসে একটু থমকে দাঁড়াল ও। তারপর হাত দিয়ে একটু ধাক্কা দিতেই দরজাটা ফাঁক হ'য়ে গেল। পাটোয়ারবাগানে বসেই হুকু তার শতছিন্ন শাড়ীর আঁচল দিয়ে নাক ঢাকল। ঘর থেকে গন্ধ আসছে,

পচনশীল বুর্জোয়া-সভ্যতার 'বদবু'। সুকু লাইব্রেরী ঘরের দরজাটা আরও একটু ফাঁক করল। শংকরাচার্যের 'জীব' এখনো হয়তো মৃৎপাত্রে আবদ্ধ আছে, ঠেলা দিয়ে ভেঙ্গে দিতে পারলে, মৃৎপাত্রের সীমাবদ্ধতা অনন্তকালের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। ভাবতে ভাবতে সুকু বাইরে চলে এল। বাইরে এসে ওর মনে পড়ল, ও খুঁজতে বেরিয়েছিল গোয়াবাগানের রান্নাঘর, শংকরাচার্যকে নয়।

বসন্ত ঘুমের মধ্যেই পাশ ফিরে শুলো। বেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। নিয়ন্ত্রিত স্মরণশক্তির মধ্যে যখন রান্নাঘরের অস্তিত্ব উহ্য হয়ে গেছে, তখন সুকু ধীরে ধীরে চীনেমাটির থালাটা চৌকির তলা থেকে বার ক'রে নিয়ে এল। অপেক্ষা ক'রে আর লাভ নেই। শুধু তরকারি দিয়েই আজকের মত খাওয়ার আয়োজন শেষ ক'রে ফেলা যাক। অসীম কুণ্ঠায় নিজের ক্ষুদ্র আয়োজনের ছবিটা দেখতে দেখতে, সুকুর মনে পড়ল মায়ের কথা। মায়ের একখানা ফোটো পর্যন্ত নেই। পাটোয়ারবাগানের বস্তিতে ফোটোখানার মূল্য কিছু নেই, সুকু তা জানে। সাময়িক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবার জন্যে অনেকা কমরেডের মায়ের ফোটোখানা নতুন সভ্যতার উপাদান নয়, সুকু তাও জানে। তবুও, বার বার ক'রে ওর আজ মনে হতে লাগল যে, স্মরণশক্তি যত কঠিনভাবেই নিয়ন্ত্রিত হোক না কেন, মায়ের ছবি সন্তানের স্মৃতিপটে চির-সমুজ্জ্বল।

সুকু বসন্তর গায়ে ধাক্কা দিয়ে ডাকল, "বসন্ত, ও বসন্ত—"

চোখ না খুলেই বসন্ত বলল, "ধাক্কা মারছেন কেন? বিশ্ববিপ্লব শেষ না হ'লে আমি উঠব না।"

"—বোধহয় শেষ হয়ে গেছে।"

"কখন না, শম্ভু মাইতি তবে ফিরে আসত।" ঠাণ্ডা হাত দু'টো গরম করবার জন্যে দু'হাঁটুর মাঝখানে চেপে ধরে বসন্ত পাশ ফিরল।

"উঃ মা গো! ছেলেটা কি ঘুমকাতুরে। বসন্ত—শিগ্‌গীর উঠে পড়।" সুকু বসন্তর গায়ে হাত বুলতে লাগল। বসন্ত উঠে বসতেই সুকু জিজ্ঞাসা করল, "খিদে পায় নি?"

"খিদে?" বসন্ত চোখ রগড়ে জবাব দিল, "উনিশশো পঞ্চাশ সালের

ফেব্রুয়ারী মাস থেকে আমার খিদে ছাড়া আর কিছুই পায় নি। সে যাক—ডাকছিলেন কেন?"

হাসির হিল্লোলে সুকুর ধ্বসেপড়া গালের চামড়া কুঞ্চিত হ'ল। সে বলল, "তরকারিটুকু খেয়ে নাও। তারপর কাল সকাল পর্যন্ত আমি আর তোমায় বিরক্ত করব না। কাল রাত্তিরে কখন খেয়েছ, আর কি যে খেয়েছ আমি তার কিছুই জানি না।" বসন্ত ভাতের হাঁড়িটা টেনে সামনে নিয়ে এল। সুকু তার কণ্ঠে আর্তনাদ তুলে বলল, "ওতে ভাত নেই, সব জল!"

"ভাত নেই? অনেকটা ভাতই রেখে দিয়েছিলাম যে! হাঁড়ির নীচে আপনি হাত দেন নি নিশ্চয়ই।" এই ব'লে বসন্ত নিজেই হাত ঢুকিয়ে এক মুঠো ভাত নিয়ে চীনেমাটির থালার উপরে রাখল। সুকু বলল, "ঠাণ্ডা জলে যে ভাত ডুবিয়ে রাখতে হয় আমি তা জানতুম না বসন্ত।"

"কেন, পান্তাভাতের নাম শোনেন নি বুঝি? পাড়াগাঁয়ে আমরা তো পান্তাভাত খেয়েই স্কুলে যেতুম।"

চোখ দু'টো খুব বড় ক'রে সুকু জিজ্ঞাসা করল, "বল কি? অসুখ করত না?"

"আজ্ঞে না।"

"ম্যাটিক পাস করলে কি ক'রে?"

"পান্তাভাত খেয়েই। শুকনো মসুর ডালের সঙ্গে দু' গণ্ডা কাঁচা লঙ্কা আর দু' ছড়া তেঁতুল বেটে নিতুম। এই বসন্ত দাসের পেটে এক এক বেলায় আধসের ক'রে চাল গেছে। বাজি রেখে তিন পোয়া পর্যন্ত খেয়ে দেখেছি।"

"তা সত্ত্বেও ম্যাট্রিক পাস করলে কি ক'রে বসন্ত? অত ভাত খেলে তো চব্বিশ ঘণ্টাই ঘুমবার কথা।"

"তাহলে আমি বোধহয় ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই ঢাকা জিলা থেকে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলাম। কিন্তু আমি ভাবছি, পান্তাভাতের নাম শোনেন নি, আপনি তবে কি ক'রে পার্টোয়ারবাগানে এলেন?"

"ইতিহাসের রাস্তা ধরেই এসেছি বসন্ত।"

"ইতিহাসের রাস্তা তাহলে ভুল। অথবা আপনি রাস্তা চেনেন না।"

এই পর্যন্ত ব'লে বসন্ত মুঠোমুঠো ভাত তুলে থালার উপ[illegible]য়ে দিয়ে থালাটা হুকুর দিকেই ঠেলে দিল।

"ভাত ক'টা খেয়ে নিন।"

"তুমি খাবে না?"

"থালা তো একটা। আপনি আগে খেয়ে নিন, তারপর আ[illegible]ব।"

"কেন, এস না আমরা এক সঙ্গেই খাই।—তোমার মা নেই [illegible]?"

"জানি না। রাখবার মালিক ভগবান, আর মারবার মালিকও [illegible]।"

ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক বসন্ত দাসের প্রতি হুকুর [illegible] এল। অবজ্ঞা এল এই ভেবে যে, নেহরুর নিরীশ্বরবাদের কামান-গ[illegible] সমগ্র পাটোয়ারবাগানকে আজও ধূলিসাৎ করতে পারে নি।

সন্ধ্যের একটু পরেই শম্ভু মাইতির দল বস্তিতে ফিরে এল। [illegible]ভাত খাওয়ার পর ঢেঁকুর তুলতে তুলতে বসন্ত ভেবেছিল, চুপিচুপি একবা[illegible]রের বিত্তের পরিমাণ দেখে আসবে। সমাজ সংসার এবং আত্মীয় [illegible]দের পারিবারিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কতগুলো স্বার্থপর লোক বা[illegible]রর দিকে বিশ ইঞ্চি পুরু প্রাচীর তুলে নিশ্চিন্ত মনে বসবাস করছিল। মন্বন্ত[illegible]দের স্পর্শ করে নি, বুভুক্ষু আত্মীয়স্বজনের গগনভেদী চিৎকার ওদের [illegible]ঞ্চি প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসেছে; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মহামৃত্যুতে অং[illegible] গ্রহণ করেনি ওদের কোন সন্তান-সন্ততি। শম্ভু মাইতির দল আজ গিয়েছিল ওদেরই পাড়ায়। মাদ্রাজী আর মারোয়াড়ীর কাছে এক তলা দু' তলা ভাড়া দিয়ে ওরা ভেবেছিল তৃতীয় তলায় শুয়ে 'বসুমতী'র পৃষ্ঠা ওলটাবে। শম্ভু মাইতি আজ তাদেরই ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে এসেছে। রক্তের চাপ আর বহুমূত্র রোগে ভুগে ভুগে ওরা সব ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত তিন তলার কার্নিশে ঝুলছিল অনেক দিন আগে থেকেই। আজ ওরা মুক্তি পেয়েছে। ডাস্টবিন আশ্রিত বুর্জোয়া-ন্যাকড়ার ঐতিহাসিক অন্তর্ধান আগামী দিনের ভারতবর্ষ সমর্থন করবে সর্বান্তঃকরণে। বড়লোকদের ক্রয়ক্ষমতায় যদি ভগবানকে পাওয়া যায়, তবে শম্ভু মাইতির লালসা দিয়ে নতুন ক'রে ভগবৎ শাস্ত্র লেখা হবে।

বসন্ত বলল, "ওরা আজ কাঁচা মাংস পায় নি। বালিগঞ্জের ছেলেদের সব তরী খাবার পেয়েছে।"

"কি ক'রে বুঝলে?" প্রশ্ন করল হুকু।

"গাওয়া ঘিয়ের গন্ধ পাচ্ছি।"

"ওটা শোষণ আর স্বার্থপরতার গন্ধ বসন্ত।"

"তাহলে একটু দেখেই আসি না?"

"না। তুমি শুয়ে শুয়ে তোমার জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা কর। আমি নব।"

"আর আপনারটা আমি শুনব না?"

"তোমার মত আমার অতীত থেকে কাঁচা মাটির গন্ধ আসবে না বসন্ত। আমার অতীত আমি পুড়িয়েছি কেবল তোমাদের ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করবার জন্যে। হলে পাটোয়ারবাগানে আসব কেন!"

"পান্তাবুড়ির মত চেহারা হ'লে কি হবে, আপনাকে দেখেই কিন্তু বুঝেছিলাম যে, আপনিও ও-পাড়ার কার্নিশ থেকে উড়ে এসেছেন।"

হুকু হেসে ফেলল। মর্মান্তিক হাসি!

একদা প্রেসিডেন্সি কলেজের ফটকে লোক দাঁড়িয়ে থাকত হুকুর স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য দেখবার জন্যে! ফটকের ঈষৎ দক্ষিণে যে ট্রাম-স্টপেজটা আছে, সেখানে শ্যামবাজারগামী ট্রামে উঠবার জন্যে ছেলেরা ভিড় জমাত প্রতিদিন। বালিগঞ্জের ছেলেরাও হুকুর সঙ্গে সঙ্গে বিডন স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত আসত। অনেকের জলখাবারের পয়সা খরচ হ'ত 'বিপথগামী' ট্রামের ভাড়া যোগাতে। আর আজ বাঁয়ত্রিশ বছর বয়সে কোন্ এক পূর্ববঙ্গের বসন্ত দাস ওকে 'পান্তাবুড়ি'র সঙ্গে তুলনা করছে! কেবল তাই নয়, হুকু পাটোয়ারবাগানের মার্কসীয়-মাটি থেকে গজায় নি, কার্নিশাশ্রিত পায়রার মত উড়ে এসেছে রাষ্ট্রবিপ্লবের শেষ মুহূর্তে।

বসন্ত মেজেতে শুয়েছিল। চৌকির ওপর থেকেই হুকু জিজ্ঞাসা করল, 'বসন্ত, ও-পাড়ার লোকদের ওপর তোমার খুব রাগ, না?"

"রাগ নয়, মমতা।"

"হাতের কাছে দু'চার জনকে পেলে খুন করতে পার?"

"হাতের কাছে তো আপনিই আছেন, কিন্তু খুন করতে পারি

"কেন ?"

"খুন করা পাপ।"

"পাপ-পুণ্যের বিচার-বিশ্লেষণ তোমায় কে শিখিয়েছে বসন্ত ?"

"মা।"

মুকু তার নিজের পেটের ওপর হাত রেখে বেশ খানিকটা ঝুঁকে পড়ল বসন্তর দিকে।

"তোমার মা বুঝি খুব শিক্ষিতা ছিলেন ?"

"হ্যাঁ, তিনি ভগবান ছাড়া আর কিছুই বিশ্বাস করতেন না। যতদূর জানি আমাদের দারিদ্র্য তিনপুরুষের, ঠাকুরদাও খুব গরীব ছিলেন। কিন্তু মা বলতেন, ভগবদবিশ্বাস আমাদের পুরুষানুক্রমের মহাসম্পদ। তাই দারিদ্র্য আমাদের গ্রাস করতে পারে নি, কিংবা পরের জিনিস লুঠ করবার প্রবৃত্তিও সৃষ্টি করতে পারে নি।"

বিছানায় এলিয়ে প'ড়ে মুকু বলল, "কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে তোমার রুজি-রোজগার থাকবে না বসন্ত।"

"কংগ্রেসী রাষ্ট্রেও ছিল না।"

"তাই ব'লে বংশানুক্রমে উপোস করবে, তবু লুঠ করবে না ?" মুকুর প্রশ্নের মধ্যে পার্টি-লাইনের ধমকানি ছিল।

বসন্ত তার জবাবের মধ্যে মাতৃশিক্ষার প্রত্যয়ের সুর তুলে বলল, "দারিদ্র্য কমবেশি সবার মধ্যেই আছে। এই দেখুন না, আপনার চেয়ে আমার দারিদ্র্য কত বেশী। অথচ আপনি লুঠ করতে পারেন, আমি পারি না। জজের বাড়িতেও দারিদ্র্য থাকে, জানেন ?"

"কি রকম ?" কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যে মুকু পুনরায় বসন্তর দিকে মুখটা বাড়িয়ে দিল।

"গত তিন বছর থেকে আমি অনেক রকমের কাজ করেছি। কিন্তু চাকরি জোটাতে পারি নি একটা। দিনমজুরি ক'রে দু'একটা টাকা যা রোজগার করতুম তাতে আমার স্বাস্থ্য রক্ষা হ'ত না। গত দু' মাস থেকে আমি অসুস্থ।"

"তোমার বাপ-মা নেই ?"

"আছেন। তাঁরা বুড়ো মানুষ। থাকেন ধুবুলিয়া সরকারী ক্যাম্পে। র সহায় সম্বল কিছু নেই, তাঁরাই কেবল সেই ক্যাম্পে থাকতে পারেন। মেণ্ট যদি জানতে পারে যে, আমার মত তাঁদের একজন বাইশ বছরের ন আছে, তাহলে—" বসন্ত হঠাৎ চুপ করে গেল।

সুকু বলল, "তাহলে ঘাড়ে হাত দিয়ে বুড়ো-বুড়িকে রাস্তায় বার ক'রে । এই তো ?"

"বোধহয় সেই রকমই কিছু একটা হবে। আমরা তো ইচ্ছে ক'রে উজী হই নি। আপনারাই আমাদের রাস্তায় বার ক'রে এনেছেন। বড় একটা সহজ সত্য ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী থেকে সুরু ক'রে রাস্তার ন সাধারণ লোক পর্যন্ত এরই মধ্যে ভুলে গেছেন।"

"বোধহয় এঁরা সবাই 'সত্য'র সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না গত শতাব্দীর র দিক থেকেই। বসন্ত, 'সত্য' কথাটার অর্থ শাসকদের সুযোগ-সুবিধে বদলায়।"

অবাক হয়ে বসন্ত প্রশ্ন করল, "কিন্তু এঁরা তো সবাই উচ্চশিক্ষিত ? সত্য ন করা মহাপাপ, তা কি এঁরা জানেন না ?"

"উচ্চশিক্ষিত ?" সুকু হেসে তার নিজের প্রশ্নেরই জবাব দিল, "শিক্ষিত এঁরা নন, সব নিরক্ষর।"

'তাহলে, দেশময় এত বই, এত বক্তৃতা, এত সব খবরের কাগজ ছাপা কি ক'রে ?"

'কালি আর টাইপ দিয়ে।" সুকুর সংক্ষিপ্ত উপসংহার বসন্ত বুঝল কিনা, তার জন্যে অপেক্ষা না ক'রেই পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, "বাপ-মার সঙ্গে তিন রর মধ্যে দেখা কর নি ?"

'ছ'মাস আগে লুকিয়ে গিয়েছিলাম ধুবুলিয়া ক্যাম্পে। আমাকে দেখে বাবা ভয়ে অস্থির। গভর্ণমেণ্টের 'মুষ্টিভিক্ষা' বন্ধ হয়ে যাবে মনে ক'রেই, ওঁরা রী খাতায় নিঃসন্তান স্বামী-স্ত্রী হয়ে কালাতিপাত করছেন। ক্যাম্পের খীদের মধ্যেও নীচতার অভাব নেই। একে অপরকে আঘাত করতে চায়।

হয়তো এরাই ক্যাম্পের কর্তাদের কানে কথা লাগিয়ে দিয়ে অ[illegible]থে যে, পশ্চিম বাংলার আড়াই কোটি জনসংখ্যার মধ্যে এক বুড়োবুড়ির জোয়ানমর্দ সন্তান পাওয়া গেছে! দু'টাকা ওঁদের হাতে দিতে পারি নি, আর দেখা করতে গিয়ে ওঁদের 'মুষ্টিভিক্ষা' আমি কেড়ে নিয়ে আসছিলাম! নিঃশব্দে পালিয়ে এলাম। পিতৃ-পরিচয়ের সত্য যত বড়ই হোক, রাষ্ট্রের আইনের চেয়ে বড় সত্য নয়।"

হাততালি দিয়ে মুকু অশ্বের হ্রেষা রবের মত চিঁহি ক'রে উঠল, "বলেছিলাম না, সত্য কখনও চিরন্তন নয়? বদলায়—বুর্জোয়া আর পুঁজিবাদীরা যখন লুঠ করে, তখন সেটা হয় রোজগার!"

বাধা দিয়ে বসন্ত বলল, "আমি জজের কথাই বলছিলাম!—উপোস ক'রে ক'রে মজ্জা পর্যন্ত আমার যখন শুকিয়ে আসছিল, তখন বড় বড় বাড়িতে গিয়ে উঁকি দিতে লাগলাম। ভিক্ষা করতে নয়, একটা যে-কোন রকমের চাকরির জন্যে। অনেকের দেখা পেলাম, অনেকের পাই নি। কেউ কেউ আশা দিলেন। কেউ কেউ বললেন, দেশের এই বিরাট বেকার-সমস্যা সমাধান করবার জন্যে তাঁরা ভোট দিয়ে এবং মাইনে দিয়ে একজন লোক রেখেছেন দিল্লীতে।"

"ঠিক কথাই বলেছেন ওঁরা। সোনার পাথরবাটি ব'লে একটা বস্তু গান্ধিজী মরবার আগেই ভারতবর্ষের বাজারে চালু ক'রে দিয়ে গেছেন। তারপর কি হ'ল বসন্ত?"

"একদিন সকালবেলা এক জজসাহেবের বাংলোতে ঢুকে পড়লুম। রাস্তায় তখন সবেমাত্র দু'চারখানা ট্রাম চলাচল আরম্ভ হয়েছে। ট্রাম চলবার আগেই, জজসাহেব শয্যাত্যাগ করেছেন। তিনি বাংলোর বারান্দায় আরাম-কেদারায় শুয়েছিলেন। আমি ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে?' 'আমি—আমি বসন্ত দাস।' এই ব'লে একেবারে বারান্দার সিঁড়ি পর্যন্ত আমি এগিয়ে গেলাম। আমার চেহারা দেখেই তিনি বললেন, 'কলকাতায় ভিখিরী চলে জানি, কিন্তু ট্রাম চলার সঙ্গে সঙ্গেই যে চলে তা জানতুম না।'

'আজ্ঞে, আমি ভিখিরী নই, বসন্ত দাস।'

'কি চাই তোমার?'

'এখনি কিছু খাবার চাই। তারপর একটা চাকরি চাই। ঢাকা জেলা থেকে আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলাম।'

'রিফিউজী?'

'কোন কার্ড নেই, অতএব কেউ আমায় রিফিউজী ব'লে স্বীকার করবে না। আমার পরিচয় কেবল বসন্ত দাস।'

'তা কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটে—'

বাধা দিয়ে বললুম, 'জানি, এম্প্লয়মেণ্ট ব্যুরো ইত্যাদি আছে। অম্নে ছাড়ি নি, ক্রমাগত যাচ্ছি। আপনি কোন সুবিধে ক'রে দিতে পারেন না?'

জজসাহেব জবাব দিলেন, 'আমার বিচার করার ক্ষমতা আছে, চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা নেই।'

'তাহলে কিছু খেতে দিন। আমি আট দিন ধ'রে কিছু খাই নি। কেবল জল খেয়ে আছি।'

'হামবাগ্!' এই ব'লে তিনি একেবারে সটান দাঁড়িয়ে পড়লেন।

'মানুষ একশো বিরেনব্বই ঘণ্টা না খেয়ে থাকতে পারে না। অন্তত সে ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে কিছু একটু খাবেই।'

'কলকাতার ডাস্টবিন তো আপনি দেখেন নি হুজুর, সেখানে রেশন কার্ড পাওয়া যায়, কিন্তু চারগণ্ডা ভাত পাওয়া যায় না।'

জজসাহেব এবার আরও রেগে গেলেন। বললেন, 'ভদ্রলোকের ছেলে, মিথ্যে কথা বলতে লজ্জা করে না?'

'ভদ্রলোকের ছেলে যদি হতুম, তবে মিথ্যে কথা বলতে অবশ্যই লজ্জা পেতুম না। বর্ণাশ্রম ধর্মের সবচেয়ে নীচে আছি, আমি দাস। কিন্তু মিথ্যে কথা আমি কি বললুম হুজুর?'

'আটদিন কেবল জল খেয়ে কেউ থাকতে পারে না, অসম্ভব! কংগ্রেসী মন্ত্রীদের ছোট করবার জন্যে কমিউনিস্টরা এসব প্রোপাগাণ্ডা করছে। ইউ আর এ লায়ার এণ্ড এ কমিউনিস্ট। আট দিন খায় নি—' এবার তিনি সশব্দে হেসে উঠবেন ভেবেছিলেন, এমন সময় তাঁর স্ত্রী ভেতর থেকে, 'ডারলিং, ডারলিং—' ব'লে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়। তিনি বাঙালী কিংবা ভারতীয় নন। জজসাহেব

স্ত্রীকে সম্বোধন ক'রে ইংরেজীতে বললেন, 'কোন ভদ্রলোকের ছেলে আটদিন কেবল জল খেয়ে থাকতে পারে, এ আমি বিশ্বাস করি না। লুক হিয়ার ইয়ং ম্যান, যদি সত্য বলবার সৎসাহস তোমার থাকত, তবে আমি তোমায় কিছু অর্থ সাহায্য হয়তো করতুম। খাদ্যের চেয়ে 'সত্য' বড়, আই মীন ট্রুথ।'

বললুম, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। পাউরুটির অভাবের চেয়ে যে সত্যের অভাবটাই বড় দারিদ্র্য সে আমি জানি। কিন্তু সত্য না চেনবার যে দারিদ্র্য, সেটা আপনি ঘোচাবেন কি ক'রে? ট্রাম চলার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কলকাতায় আলো ছড়িয়ে পড়ল, অথচ আপনার মনের অন্ধকার অপসারিত হ'ল না। আমি রিফিউজী, তবু আপনি আমার চেয়েও গরীব।' আমি বেরিয়ে এলাম ফটক দিয়ে।"

মুকু মাঝখানে চৌকি থেকে নেমে বসেছিল। সে বলল, "এর চেয়ে আর ভাল জবাব কেউ দিতে পারত না। জজসাহেবের উচিত ছিল, তখনি এসে আমাদের পার্টিতে নাম লেখান। আমরা ওঁকে জ্ঞানদান করতে পারতুম। যাই হোক, চাকরি তোমার জুটল না?"

বসন্ত বলল, "চাকরি আমার হয়তো জুটতো, যদি আটদিনের বদলে বলতুম, দু'দিন ধরে আমি উপোস ক'রে আছি। দেখুন, সত্য বলার ঝকমারি কত!"

"বলেছি না সত্য বদলায়? খেয়েদেয়ে সুখে থাকবার জন্যে বুর্জোয়ারা যুগযুগ ধ'রে নিজেদের সুবিধে মত 'সত্য' সৃষ্টি করে। থাক্ সে সব কথা। তোমার একটা চাকরি চাই, না?"

"হ'লে মন্দ হয় না।"

"আমি একটা চিরকুট লিখে দিলে, রেড গার্ডে তোমার এখনি চাকরি হয়ে যাবে।"

"রেড গার্ড?" প্রশ্ন করল বসন্ত।

"হ্যাঁ। আর দু'চার দিন মাত্র গোপনে গোপনে কাজ করতে হবে। তারপর, ব্যস্—একেবারে লালবাজারেই বসবে।"

একটু হেসে বসন্ত বলল, "সেখানে আমার চাকরি হবে না। ট্রাই নিয়েছিলাম। বুকের চওড়া আধ ইঞ্চি কম। অনেক ঘুরে ঘুরে ঘোড়দৌড়ের মাঠে পুলিশের বড়কর্তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি সেখানে গলফ্ খেলতে

যান। তিনিও একখানা চিরকুট লিখে দিয়েছিলেন। গেলুম সেপাই হওয়ার জন্যে। পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে হাজার রকমের পরীক্ষা হ'ল। তিন বছর মুটেগিরি করেও পরীক্ষায় পাস করেছিলুম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুকের মাপে আধ ইঞ্চি কম পড়ল। আশা তবু ছাড়লুম না। সেই গলফ্-মাঠেই বড়কর্তাকে দ্বিতীয় বার পাকড়াও করলুম। তাঁর চাকরির মর্যাদা এতবড় যে তিনি ইচ্ছে করলেই বিরক্ত-বোধ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হ'ল হে?'

বললুম, 'সব পরীক্ষায় পাস, কেবল বুকের মাপে আধ ইঞ্চি কম।'

'তাহলে আর কিছু করবার নেই।'

'দেখুন, আমি উপোস ক'রে ক'রে আধমরা হয়ে আছি। আমায় কেবল সাতটা দিন খেতে দিন, আপনার চাকরবাকরেরা যা খায়, তাই দেবেন—আমি কথা দিচ্ছি সাতদিনে বুকের ছাতি এক ইঞ্চি বাড়িয়ে দেব।'

হাতের লাঠি দিয়ে তিনি সাদা রংয়ের বল্‌টাকে আকাশের দিকে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'সেপাই হওয়া বড্ড কঠিন কাজ। আজকাল চোর না ধরলেও চলে, কিন্তু কমিউনিস্টদের ধরা চাই।'

এই ব'লে তিনি দ্বিতীয় নম্বর বল্‌টাকেও আকাশে উড়িয়ে দিয়ে মাঠের ভেতরের দিকে হাঁটতে লাগলেন। মুহূর্তের জন্যে আমি বড়কর্তার কথা ভুলে গেলুম। চেয়ে রইলুম আকাশের দিকে। একটা ছোট্ট বল্ বেদম মার খেয়ে প্রায় দু'শো গজ শূন্যতার মধ্যে দিয়ে পুনরায় গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। বল্‌টার প্রতিবাদশক্তি নেই। যতদিন না সে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত তাকে মার খেতে হবে। দু'শো গজ শূন্যতা লাফিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আমারও নেই, তাই আমিও যেন মাঠের কিনারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের লাঠির আঘাত খেতে লাগলুম। সেদিন মনে হয়েছিল, আধ ইঞ্চির অভাবটাই সবচেয়ে বড় অভাব। কিন্তু আজ পেটভরে ভাত খাওয়ার পরে মনে হচ্ছে, ভগবানের রাজত্বে সত্যিই কোন কিছুরই অভাব নেই। আমি অভাবের তাড়নায় একদিন কষ্ট পেয়েছি, আর অন্য একজন উদ্বৃত্তের বোঝায় কষ্ট পাচ্ছে। উপর থেকে ভগবান হাসছেন; আমরা সবাই খেলা করছি, কত রকমের ছেলেমানুষি খেলা! আপনি কি বলেন?"

হুকু গম্ভীর সুরে জবাব দিল, "তোমার বুকের ছাতি যদি দশ ইঞ্চিও বাড়ে, তবু রেড গার্ডে তোমার চাকরি হবে না। ভগবান-ব্যাধিতে তুমি ভুগছ বসন্ত।"

"আমার ব্যাধি যেন চিরস্থায়ী হয়।" এই ব'লে বসন্ত উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে রইল।

পান্তাভাতের নেশায় বসন্ত মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। পান্তাভাতের নেশা থাকা সত্ত্বেও হুকুর কিন্তু সারারাত ঘুম এল না।

ছ'দিন হুকুর সঙ্গে বসবাস করবার পর বসন্ত এসে একদিন সন্ধ্যের সময় খবর দিল, "শম্ভু মাইতির দল আজ আর লুঠ করতে যায় নি।"

হুকু জিজ্ঞাসা করল, "কেন?"

"বোধহয় যা চেয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশী পেয়েছে।"

"কিংবা খবর পেয়ে বুর্জোয়ারা বোধহয় ধনরত্ন সব মাটির তলায় পুঁতে ফেলেছে।" হুকু তার মন্তব্য পেশ ক'রে নিশ্চিন্তবোধ করল। কিন্তু বসন্ত বলল, "কিংবা এত লুঠের পরেও ওরা হয়তো ভাবছে যে, ও দারিদ্র্য কিছুতেই ঘুচবে না। সারা দুনিয়া লুঠ করলেও পাটোয়ারবাগে শ্রীবৃদ্ধি হবে না।"

"কেন হবে না বসন্ত?"

"ভগবানের বিধানে লেখা আছে যে, চুরি করা মহাপাপ। আর পাপের কোন শ্রী নেই।"

কি এক অজ্ঞাত কারণে হুকু হঠাৎ তার নিজের দেহের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে বসন্তর দৃষ্টির কৌতূহলী-পরিক্রমা হুকুর মনে পীড়া দিতে লাগল। বৈজ্ঞানিক স্বচ্ছতায় হুকু তার প্রশ্নের মধ্যে বিন্দুমাত্র গোপন-কুণ্ঠা রাখল না। জিজ্ঞাসা করল,—

"বসন্ত, কপালে আমার সিঁদুর নেই, ঘরে কোন মরদও নেই, ভাবছ, তবু কেমন ক'রে পেটে আমার সন্তান এল?"

"হ্যাঁ—গত ছ'দিন থেকে সেই কথাই ভাবছি।"

"পিতার নাম জানতে চাও বুঝি ?"

"আমার নিজের জানবার দরকার কিছু নেই। কিন্তু সন্তানের জন্ম-সৌধ যদি সন্দেহের ইট দিয়ে তৈরী হয়, তবে তা হয়তো দীর্ঘস্থায়ী হবে না।"

"পাটোয়ারবাগানের নব জাতকদের মধ্যে কেউ যদি কখনও কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের ডিক্টেটর হয়, তবে তার পিতৃপরিচয়ের প্রয়োজন হবে না।"

"আমি কিন্তু তেমন সন্দেহ নিয়ে ডিক্টেটারের পদও প্রত্যাখ্যান করতুম। কেবল জবালাকে সামনে রেখে আমি পরিতুষ্ট হতুম না।"

"ধুবুলিয়া ক্যাম্পে জবালার বিবাহিত স্বামীও বর্তমান, কিন্তু তা সত্বেও বুর্জোয়া-সমাজে তুমি তোমার পিতার পরিচয় দিতে পারছ না। তুমি তো শূদ্র নও বসন্ত, তুমি ব্রাহ্মণ।"

বসন্ত মুহূর্তের জন্যে হকচকিয়ে গেল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "রিফিউজী সমাজ থেকে বর্ণাশ্রম ধর্ম উঠে গেছে।"

বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে হুকু বলল, "কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে আমরা কাউকে রিফিউজী হতে দেব না।"

একটু ভেবে নিয়ে বসন্ত বলল, "কে জানে, কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে হয়তো বা আপনার নবজাতকই হবে প্রথম রিফিউজী।"

এই সময় পাটোয়ারবাগানের চতুর্দিক থেকে একটা বিরাট হল্লার আওয়াজ আসতে লাগল। আওয়াজের মধ্যে নারী-পুরুষের আর্তনাদও পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল। হুকু জিজ্ঞাসা করল, "ব্যাপার কি বসন্ত ? তুমি বললে ওরা আজ লুঠ করতে যায় নি ?"

"আপনাকে বলতে ভুলে গেছি যে, আজ সকাল থেকে ভারত রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর নাম বদলে গেছে। এ-আর্তনাদ হয়তো বা উল্লাসেরই অপভ্রংশ।"

হুকু প্রশ্ন করল, "নয়া প্রধান মন্ত্রীর নামটা কি ?"

"শ্রীজগৎ শেঠ। বিনোদ ঠাকুর রেডিওতে শুনেছে।"

উল্লাস না আর্তনাদ বসন্ত তা বুঝতে পারল না। জগৎ শেঠের নাম শুনে হুকুর গলা দিয়ে কি রকম একটা অদ্ভুত ধরনের আওয়াজ বেরুল। বসন্ত অসীম আগ্রহ নিয়ে চেয়ে রইল হুকুর দিকে। হুকু বলতে লাগল, "জীবনের

সর্বস্বত্ব পার্টির হাতে তুলে দিতে না পারলে জগৎ শেঠের হাতে ভারত রাষ্ট্র আসত কি ক'রে? বসন্ত, পুঁজিবাদী দস্যুর লুণ্ঠনের রাত শেষ হয়েছে। আমাদের সামনে এবার গড়বার প্রত্যুষ সমাগত। সবাই খেতে পাবে, ভাতের ফেনের মত ঐশ্বর্য উপচে পড়বে। মানুষ তার যোগ্যতার মূল্য পাবে ষোল আনা।"

ঝুকু গিয়ে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল। দু' মিনিটের জন্যে নৈঃশব্দ! তারপর সে পুনরায় বলতে লাগল, "ওরা সব পালিয়েছে। নিশ্চয় পালিয়েছে। শংকরাচার্য আর রামানুজের উত্তরসূরী কোথায় তারা? ভবশংকর চৌধুরীকে চেন বসন্ত? নবম শতাব্দীর কোন এক ব্রাহ্মণ বুর্জোয়া শংকরাচার্যের ধাপ্পায় প'ড়ে তিনি পালিয়ে গেলেন হিমালয়ের গুহাগহ্বরে। আমি তাঁর সন্তান মার্কসিস্ট ঝুকু! বড্ড শীত করছে বসন্ত—" হাত দু'টো সে বিছানার ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়ে কতক্ষণ চুপ ক'রে রইল। শুয়ে শুয়ে হয়তো বা ভাবতে লাগল, গোয়াবাগানের ভবশংকর চৌধুরী হরপ্পার ভগ্নাবশেষের মত যাদুঘরে রক্ষিত বুর্জোয়া-সম্পদ। কেমব্রিজ-ইতিহাসে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকলেও ঝুকুর ইতিহাসের পাতায় তা স্থান পাওয়ার যোগ্যই নয়। বিপ্লবের আগুনে প্রাচীন 'সত্যসমষ্টির' সঙ্গে সঙ্গে ঝুকুর বংশ-পরিচয়ের তাৎপর্যটুকুও পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ঝুকু শিখেছে, মার্কসের বিপ্লব কেবল রক্তপাতের ইতিহাস নয়। গোটা মানুষটার জন্ম-প্রক্রিয়া থেকে মৃত্যুর প্রত্যক্ষতা পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনার আমূল পরিবর্তনের বিজ্ঞান-স্বীকৃতিই হচ্ছে বিপ্লব। কুমারী ঝুকুর গর্ভসঞ্চারের স্বাভাবিকতায় বিপ্লবের অনিবার্যতা সুস্পষ্ট। ডারউইনের ক্রমবিবর্তনবাদ অনুন্নত সমাজকে হয়তো বা মহাজ্ঞান দান করেছে, কিন্তু মার্কসিস্ট প্রজ্ঞায় ডারউইন জনৈক সত্যানুসন্ধানব্রতী নাবালক বৈজ্ঞানিক মাত্র। তাই তাঁর ক্রমবিবর্তনবাদ পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকার ধারণ করতে বহু বছর সময় নিয়েছে। প্রতিটি ধাপে তার বিবর্তন আছে, বিপ্লব নেই। কিন্তু পাটোয়ারবাগানের ঝুকুর মাথা থেকে গর্ভ পর্যন্ত সবটাই বিপ্লব। মাত্র বিশ বছরের সাধনলব্ধ মার্কসিস্ট শিক্ষায় ঝুকু তার জন্মবৃত্তান্তের মূল খুঁজে পেয়েছে ভবশংকর চৌধুরীর প্রজনন প্রক্রিয়ায়। বিজ্ঞান-ধর্মী জড়বাদের কষ্টিপাথরে যাচাই ক'রে পিতৃত্বের মেকি সোনা ধরে ফেলতে

হুকুর পাঁচ ঘণ্টাও লাগে নি! মার্কসিস্ট দৃষ্টি দিয়ে যদি জীবতত্ত্বের সামগ্রীক সত্য পর্যবেক্ষণ করা যায়, তবে ভবশংকর চৌধুরী আর শম্ভু মাইতির মধ্যে প্রভেদ রইল কি? হুকু অন্তত কোন প্রভেদই দেখতে পায় নি। এই দেখতে না পাওয়ার মানসিকতাই হচ্ছে বিপ্লব।

বসন্ত চেয়েছিল হুকুর দিকেই। পাটোয়ারবাগানের কোলাহল ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছিল। হুকু আর বসন্ত কান খাড়া ক'রে শুনতে পেল, কোলাহলের মধ্যে নারীপুরুষের অসহায় আর্তনাদের ধ্বনিটাই সুস্পষ্ট।

হুকু জিজ্ঞাসা করল, "সন্ধ্যের আগে যে বাইরে গিয়েছিলে, কি দেখে এলে রাস্তায়?"

"রেড গার্ড। লরী বোঝাই হ'য়ে রেড গার্ডরা ছোটাছুটি করছে।"

হুকু উঠে বসল। বলল, "বলেছিলাম না, দু'দিন অপেক্ষা কর, তারপর রেড গার্ডরা সব রাস্তায় বেরুবে? ইচ্ছে করলেই তুমি একটা চাকরি নিতে পারতে বসন্ত।"

"নাঃ, ভাবছি এ-দেশে আর থাকব না।"

"কোন্ দেশে যাবে?"

"যে-দেশে একেবারে কোন গার্ড-ই নেই।"

খিলখিল ক'রে হেসে গড়িয়ে পড়ল হুকু। বলল, "আমাদের রাষ্ট্রে প্রতি ইঞ্চি জমির হিসেব থাকবে। আর প্রতি ইঞ্চির চতুর্দিকে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারায় থাকবে আমাদের কর্তব্যরত প্রাণপ্রতিম রেড গার্ডরা। তবে কোথায় যাবে?"

"পাড়াগাঁয়ে।"

"উদ্বৃত্ত জমি আমরা রাখব না বসন্ত। ট্রাক্টারের করাত দিয়ে পতিত জমির গর্ভ চিরে আমরা ফসল সৃষ্টি করব। কমিউনিস্ট সভ্যতার সবচেয়ে বড় ফসল কালচার'। আর কালচারের মূল হচ্ছে এগ্রিকালচার। কিছু বুঝলে বসন্ত?"

"বুঝলাম না বটে, তবে—" এই সময় বাইরে থেকে মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজ আসতে লাগল।

হুকুর চোখে ত্রাসের আভাস পাওয়া গেল। হুকু বলল, "বসন্ত দেখে এস তো ব্যাপারটা কি?"

দরজা খুলে বসন্ত চলে গেল বাইরে। মুকুর আর সময় কাটে না। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে শুনতে লাগল পাটোয়ারবাগানের গগনভেদী চিৎকার।

একটু পরেই বসন্ত ফিরে এল।

ব্যগ্রভাবে মুকু প্রশ্ন করল, "কি দেখে এলে বসন্ত?"

গম্ভীর স্বরে বসন্ত জবাব দিল, "মারের চোটে পাটোয়ারবাগান একেবারে ফ্ল্যাট। ভূমিসংলগ্ন হয়ে সবাই শুয়ে পড়েছে।"

"তার মানে?"

বসন্ত তার ছেঁড়া ধুতির কোঁচার দিকটা কোমরে ভাল ক'রে গিঁট বাঁধতে বাঁধতে বলল, "রেড গার্ডরা পাটোয়ারবাগানের নতুন সভ্যতার মাটি রাইফেল দিয়ে একেবারে চষে ফেলেছে। এও এক রকমের 'কাল্‌চার', কি বলেন?"

মুকু যেন নিজের দেহে আঘাত পেয়েছে এমন ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "রেড গার্ডরা এমন কাজ করল কেন বসন্ত?"

"আধ ঘণ্টা আগে রেড গার্ডদের এক লরীকে লক্ষ্য ক'রে এই বস্তি থেকে কে একজন বোমা ছুঁড়েছে। এখন ওরা সব এসেছে দলবেঁধে। অপরাধীকে ধরিয়ে দিতে হবে। নইলে পাটোরবাগানের সব ক'টি সর্বহারার মৃত্যু আজ কেউ ঠেকাতে পারবে না।"

"না না, এ হতে পারে না। এ অসম্ভব। তুমি ভুল শুনেছ।"

"তাহলে দু'চারজন 'প্রাণপ্রতিমদের' ডেকে নিয়ে আসব?"

বসন্ত যাওয়ার জন্যে উসখুস করতে লাগল। মুকু সহসা বসন্তর হাত চেপে ধ'রে বলল, "তুমি পালিয়ে যাচ্ছ নাকি?"

"পালিয়ে যাচ্ছি না, চলে যাচ্ছি।"

"আমার তাহলে কি হবে? তুমি আমার দায়িত্ব যখন নিয়েছ, তখন আমায় ফেলে তুমি পালিয়ে যেতে পারবে না।"

"ছ' সাতদিন একসঙ্গে রইলুম বটে, তবে পারিবারিক কিংবা পাতানো সম্পর্ক আপনার সঙ্গে আমার কিছুই নেই। আর আপনার ভয়টাই বা কিসের? পাটোয়ারবাগানে এই মুহূর্তে উশৃঙ্খলতা চলছে জানি, কিন্তু ওরা আপনাকে

ছোঁবে না। সরুন, আমাকে যেতে দিন।" বসন্ত এগিয়ে এল দরজার দিকে। মনে হ'ল, গুলির আওয়াজ আর কোলাহল ঘরের দরজায় বুঝি ধাক্কা মারছে।

ঝুকু একরকম মরিয়া হয়েই বলল, "কেউ একজন আমার কাছে না থাকলে আমি বাঁচব না বসন্ত।"

"সদাসর্বদা আপনার কাছে থাকবার মত সদগুণসম্পন্ন মানুষ আমি নই। রাস্তা ছাড়ুন, ওরা বোধহয় এই দিকেই আসছে।"

ঝুকু বসন্তর পায়ের কাছে বসে পড়ে বলল, "আমি তো আর এখন একা নই। আমায় ফেলে যেতে পার, কিন্তু একে—?" ঝুকু নিজের পেটের ওপর হাত রাখল।

এবার বসন্ত দরজার কাছ থেকে ফিরে এল ভিতরের দিকে। বোধহয় ভাবল, অনাগত শিশুরক্ষার দায়িত্ব নেওয়ার মধ্যে ভগবানের আদেশ আছে। গর্ভধারিণীর শুচিতা সন্দেহযুক্ত বটে, কিন্তু মাতৃগর্ভের শুচিতায় কোন সন্দেহ নেই। থাকতে পারে না। জন্ম-মৃত্যু ভগবানের নিজের আইন দ্বারা সংরক্ষিত। অতএব বসন্ত মনে মনে ঠিক করল, ঝুকুর সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখা মানেই ভগবানের হুকুম-নামা তামিল করা।

ঝুকুর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বসন্ত বলল, "ধুবুলিয়া ক্যাম্পে একবার মাবাবার সঙ্গে দেখা করব। তারপর চলে যাব অন্যদিকে। ভাবছি আপনাকেও সঙ্গে নেব। শিশুটাকে রক্ষা করতে হবে ব'লেই আপনার দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করছি।"

রেড গার্ডদের জুতোর আওয়াজ আরো জোরে শোনা গেল দরজার ঠিক বাইরেই। ঝুকু ছুটে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করতে যাচ্ছিল, নিজের প্রয়োজনে নয়, বাচ্চার প্রয়োজনে। কিন্তু পারল না। ছ'জন রেড গার্ড বড় বড় টর্চ হাতে নিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে। একজন টর্চ দিয়েই আঘাত করল বসন্তর মাথায়। বসন্ত পড়ে গেল মাটিতে। সে হাত দিয়ে অনুভব করল, চুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত পড়ছে।

একজন রেডগার্ড ধমকে উঠল, "শম্ভু মাইতি কোথায়?" বসন্ত জবাব দিল, "কি ক'রে বলব, পাঁচ দিন থেকে তো দেখা নেই।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি পা চালিয়ে দিল বসন্তর মুখের দিকে। বসন্ত আর্তনাদ ক'রে উঠল।

মুকু বলল, "এ-সব হচ্ছে কি? একজন অপরাধ করেছে ব'লে গোটা পাটোয়ারবাগানের উপর প্রতিশোধ নিচ্ছ কেন কমরেড?"

বিকট অট্টহাস্য ক'রে উঠল রেড গার্ডদের দলপতি। প্রকাণ্ড একটা টর্চ তুলে ধরল মুকুর মুখের উপর। আলোটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে দেখতে লাগল মুকুর প্রতি অঙ্গের স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য। শেষ পর্যন্ত সে আলোটাকে ধরে রইল মুকুর পেটের উপর। ধমকে জিজ্ঞাসা করল, "শম্ভু মাইতিকে ধরিয়ে দে, নইলে—" দলপতি পা তুলে ধরল মুকুর পেটের ঠিক ছ' ইঞ্চি উপরে। বসন্ত ছুটে এসে পা আর পেটের মাঝখানে দাঁড়াল সোজা হয়ে। বলল, "নরহত্যায় পাপ নেই কমরেড, কিন্তু শিশু-হত্যায় রাষ্ট্রের ক্ষতি।"

দলপতির পেছন থেকে একজন রেড গার্ড বন্দুকের বাঁট দিয়ে বসন্তর তলপেটে গুঁতো মারল। বসন্ত হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল দ্বিতীয়বার। এই সময় বাইরে থেকে বিনোদঠাকুর ঘরের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে ঘোষণা করল, "কমরেড, শম্ভু মাইতিকে পাওয়া গেছে।"

সবাই একসঙ্গে প্রশ্ন করল, "পাওয়া গেছে?"

"হ্যাঁ, শবদেহের মধ্যে পাওয়া গেছে, কিন্তু মংলু পালিয়েছে।"

শম্ভুকে পাওয়া গেছে শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সবাই।

বসন্ত ধীরে ধীরে মাটি থেকে উঠল। বিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবে সে যারপরনাই বিস্মিত হয়েছে। বুর্জোয়া বিনোদ ঠাকুর আজ সর্বহারাদের দিয়েই সর্বহারাদের ঘায়েল করতে বেরিয়েছে! সবাই চলে যাওয়ার পর বিনোদ ঠাকুর একটা টিনের কৌটা থেকে এক গাদা পান বার ক'রে মুখের মধ্যে পুরে দিল। জিজ্ঞাসা করল, "তুই এখানে মেয়েমানুষ নিয়ে কি করছিলি? ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস, আমি কি ক'রে জানব বল?" বিনোদ ঠাকুর পান চিবুতে চিবুতে ঢুকে পড়ল ঘরে। বসন্তর সঙ্গে কথা কইবার সময় সে মুকুকে ভাল ক'রে দেখবার চেষ্টা করল। দেখতে ভাল হ'লে বিনোদ ঠাকুর বসন্তর সঙ্গে নিশ্চয়ই কথা কইত না।

"মেয়েমানুষটার সর্বনাশ করেছিস দেখছি। আগে কেন খবর দিস নি, দু'চার টাকায় জাত পাঠিয়ে দিতুম।" বসন্ত এবার বিনোদ ঠাকুরের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করল "শম্ভু মাইতির নামটা বুঝি আপনিই ওদের জানিয়েছেন ?"

"জানাব না ? সতর টাকা আট আনার ভাত লুঠ ক'রে মনে করেছিল ব্যাটা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের মন্ত্রী হয়ে বসবে। ওদেরও বারোটা আমি বাজিয়ে দেব, তুই দেখে নিস্ বসন্ত। কমিউনিস্ট, না থুঃ—"

বিনোদ ঠাকুর সত্যি সত্যি থুথু ফেলল ঘরে। অল্প আলোয় বোঝা গেল না মুকুর গায়ে পড়ল কি না।

বসন্ত জিজ্ঞাসা করল, "শম্ভুকে আপনি বোমা ছুঁড়তে দেখেছেন ?" হো হো ক'রে হেসে উঠল বিনোদ ঠাকুর। তারপর ঘরের বাইরে গিয়ে বলল, "আমাদের রক্ষীদলের স্টক থেকে একটা বোমা আমিই নিয়ে এসেছিলাম বসন্ত। সংগ্রহ করতে অনেক সময় নিয়েছে. কিন্তু ছুঁড়তে লেগেছে এক সেকেণ্ড। থুঃ—মন্ত্রীরা শাসন করতে পারল না ব'লে, ও ব্যাটারা আমার হোটেল লুঠ করল কেন ? সতর টাকা আট আনা লাভ করতে আমার সতর বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। ফুলকপির স্পেশালটা তোরা তো সবাই খেয়েছিস, কিন্তু লাভ করবার লোভে এক রত্তি আমি আজ পর্যন্ত মুখে দিতে পারি নি। সর্দি কাশিতে ভুগছি জন্মাবধি। আমার হোটেলের সামনে দিয়ে কত ডাক্তারই না দিনরাত ছোটাছুটি করে, কিন্তু কই, এক ফোঁটা ওষুধ কেনবার পয়সা জোটে নি তো আমার ? আর এক-থাবা মেরে সর্বহারার দল আমার সর্বস্ব নিয়ে গেল ! আরও শুনবি বসন্ত ?"

বসন্তর হাবভাব থেকে কোন আগ্রহই প্রকাশ পেল না। তবুও যাওয়ার আগে বিনোদ ঠাকুর জানিয়ে গেল, "বাচ্চা ছেলেটার বয়স হয়েছে বারো। না খেতে পেয়ে ব্যাটা দু' হাতের বেশী লম্বা হয় নি। হামাগুড়ি দিয়ে চলাফেরা করে। এ অপরাধ কার বসন্ত ? বিনা পয়সায় ভাত মারবার জন্যে তো অনেক-দিনই ধরনা দিয়েছিস, কিন্তু মন্ত্রীদের গোলা থেকে বিনোদ শর্মা তো বিনা পয়সায় এক মুঠো চাল গলাতে পারে নি ! এখন দেখ্ গে যা, মন্ত্রীগুলোও সব

কমিউনিস্টদের জেলে হামাগুড়ি দিয়ে পথ হাঁটছে। পয়ের পয়লায় খেয়ে খেয়ে পেটের চর্বি হাঁটু পর্যন্ত নেমে এসেছিল। থুঃ! যতসব হাড়হাবাতের শাসন-তন্ত্র! একটা হোটেল চালাবার যোগ্যতা নেই, কি দরকার ছিল তোদের গভর্ণমেণ্ট চালাবার? তুই দেখে নিস্ বসন্ত আমি এবার সর্বহারাদের খাতায় গিয়ে নাম লেখাব। থুঃ!—"

বিনোদঠাকুর কখন যে চলে গেছে বসন্ত কিংবা স্থকু তা টের পায়নি। দু' জনেই হতভম্বের মত বসে রইল অনেকক্ষণ পর্যন্ত। রেড গার্ডদের আক্রমণের আকস্মিকতায় স্থকু যেন তার বিশ বছরের বৈপ্লবিক বক্তব্য সব হারিয়ে ফেলল। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক মানুষের মত নম্রকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল, "খুব লেগেছে, না বসন্ত?"

"হ্যাঁ। বিনোদ ঠাকুরের খাবার খেয়ে শরীরে যে এত রক্ত হয়েছে, একটু আগেও তা টের পাই নি। চলুন, আমরা রওনা হই।"

"এই রাত্তিরে কোথায় যাব?"

"পাটোয়ারবাগানের বাইরে।"

"ওরা যদি কাল এসে তোমার কাছে ক্ষমা চায়?"

"ভগবান ওদের ক্ষমা নিশ্চয়ই করেছেন। কিন্তু রেড গার্ডদের আসবার আগেই তো আমাদের যাওয়ার কথা ছিল?"

বসন্ত কুঁজো থেকে জল নিয়ে মাথাটা ধুয়ে ফেলল। স্থকু তার শাড়ীর আঁচল দিয়ে বসন্তর মাথাটা মুছে দিতে দিতে বলল, "স্বপ্নভঙ্গের আঘাত আমারও কম লাগে নি বসন্ত।" স্থকুর চোখ থেকে ঝরঝর ক'রে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

•

কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের প্রথম সূর্যোদয় পাটোয়ারবাগানে ব'সে স্থকুর আর দেখা হ'ল না। মধ্যরাত্রির পরেই সে বসন্তর সঙ্গে বেরিয়ে এল বিনয়প্রকাশের ঘর থেকে। বাইরে বেরিয়ে স্থকু স্তম্ভিত হয়ে গেল! দশহাত রাস্তা হাঁটতে গিয়ে বিশবার হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল স্থকু। পাটোয়ারবাগানের সরু সরু আঁকা-বাঁকা গলিগুলোতে অসংখ্য শবদেহ স্তূপাকার হয়ে আছে। একজনের অপরাধে

অসংখ্যের প্রাণনাশ করার মধ্যে মুকু কোন যুক্তি খুঁজে পেল না। এমন কি ডায়ালেকটিক্যাল যুক্তি প্রয়োগের দ্বারাও এই হত্যাকাণ্ডের সমর্থন পাওয়া অসম্ভব। শবদেহ পরিকীর্ণ রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মুকুর বিশ বছরের 'বিশ্বাসের' লৌহবেষ্টনীতে সংশয়ের হাতুড়ি মৃদু মৃদু আঘাত করতে লাগল। সে বুঝতে পারল, মার্কসবাদের কোথায় যেন একটা আক্রমণাত্মক অবৈজ্ঞানিক অন্ধতা রয়েছে। সেখানে বিরুদ্ধ-বক্তব্যের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবার স্বল্প স্থানটুকু পর্যন্ত নেই। নেই এমন কি মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলোকে বিচারসাপেক্ষ করার। মুকুর যেন মনে হ'ল, মার্কসবাদও বুঝি একটা রক্ষণশীল অন্ধবিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়। মার্কসের ব্যক্তিগত 'বিশ্বাস' যেন বিজ্ঞানের ছদ্মবেশ নিয়ে পৃথিবীর সর্বত্র আজ ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রচার ও প্রতিপত্তির সুযোগ নিয়ে। কিন্তু কোন ব্যক্তিগত 'বিশ্বাস' কি প্রচারের দ্বারা বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠতে পারে? সমালোচনা ও নিরীক্ষা-পরীক্ষার তুলাদণ্ডে প্রতিটি বস্তু ও 'বিশ্বাসের' যদি সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ না হয়, তবে তো বিজ্ঞানের কাছে তা সত্যগ্রাহ্য হবে না? মুকুর ইন্‌টেলেকচুয়াল অনুভবের মধ্যে 'লগস'-এর নিঃশব্দ পদচারণ সুরু হ'ল। হঠাৎ যেন ওর মনে হ'ল, বিশ্বাসের অন্ধতাই বিজ্ঞান-অস্বীকৃতি। বিজ্ঞানের নাম ক'রে মার্কস কি বিজ্ঞানকেই অস্বীকার ক'রে গেছেন? মার্কসিস্ট জগতের 'ইন্‌টেলেকচুয়াল ট্র্যাজেডি' মুকুর পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরিয়ে নিচ্ছে! নিচ্ছে নিশ্চয়ই —নইলে সে সর্বহারাদের বুকের ওপর পা ফেলে পার্টোয়ার্যাগানের রাস্তা অতিক্রম করতে কিছুতেই পারত না।

বসন্ত একটু আগে আগেই হাঁটছিল। ওর যেন সবুর সইছে না। বসন্ত পালিয়ে যাচ্ছে। যাচ্ছে কোথায় তা সে জানে না। রিফিউজীদের জানবার কথাও নয়। দুনিয়াময় আজ চলেছে বাস্তুহারাদের মিছিল। বসন্ত একলাই বাস্তু হারায় নি। সমদুঃখীর সংখ্যা আজ অনেক। মানুষের গৃহরচনার আদিম সত্য আবার কি সমাজের বুকে দ্বিতীয় বিশ্ববিপ্লবের আগুন জ্বালাবে? কে জানে, পরিবার-কেন্দ্রীক মানুষই হয়তো যন্ত্রসভ্যতাকে ধ্বংস করবার শ্রেষ্ঠ যন্ত্র হবে।

মুকু ডাকল বসন্তকে। বলল, "দাঁড়াও। আমি তো একা নই, তাই তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারছি না।"

বসন্ত দাঁড়াল। চারদিকে চাইতে ওর নিজেরই লজ্জা হচ্ছিল। বুর্জোয়া সমাজের ঐশ্বর্য চারদিকের রাস্তা ও নর্দমায় এলোমেলোভাবে পড়ে রয়েছে। শাড়ী কাপড়ের অভাব নেই, টেবিল চেয়ার আর বাসনপত্রের গাদায় ফাঁকা জায়গা সব পরিপূর্ণ। বসন্ত ভাবল, পাটোয়ারবাগান তবু ঐশ্বর্যশালী হ'ল না। সামনের দিক থেকে শম্ভুর মা আসছিল একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে। বেনারসীর মায়া সে তখনও কাটাতে পারে নি। ব্রোকেডের ব্লাউজ বুড়ির গায়ে আলগা হয়ে আছে। লণ্ঠন হাতে নিয়ে সে শম্ভুর শবদেহ খুঁজে বেড়াচ্ছে। বসন্তকে সামনে দেখে বুড়ি জিজ্ঞাসা করল, "তুই কাকে খুঁজছিস?" "সবাইকে।" বসন্তর জবাবে বুড়ি সন্তুষ্ট হ'ল না। জিজ্ঞাসা করল, "সবাইকে?" এই সময় সুকু এসে বসন্তর পাশে দাঁড়াল। লণ্ঠনটা সুকুর মুখ পর্যন্ত তুলে, শম্ভুর মা নিজের শুকনো দেহের দিকে চেয়ে বলল, "এই ম'লো যা! শম্ভু আর মংলুর ঘরে সাত সাতটা বালিগঞ্জের সোমত্ত মেয়ে, আর তুই—" সুকুর দিকে চেয়ে লাইনটা পূরণ ক'রে দিল সে নিজেই—"আর তুই এই ঝুনো নারকোল কোন্ বাগান থেকে নিয়ে এলি, বসন্ত?"

বসন্তর হয়ে সুকুই জবাব দিল, "গোয়াবাগান।"

শম্ভুর মা লণ্ঠনটা মাটিতে রেখে আবার একটা নোংরা মন্তব্য প্রকাশ করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ নীচের দিকে দৃষ্টি দিতেই সে দেখতে পেল শম্ভুর শবদেহ। লণ্ঠনের আলোয় শম্ভুকে চিনতে কোন অসুবিধে হ'ল না। পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্রায় দশ বারো জায়গায় গুলি লেগেছে। পাশেই পড়ে রয়েছে বালিগঞ্জের এক সোমত্ত মেয়ে! শম্ভুর ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতটা মেয়েটার মুখের ওপর। শম্ভুর মা বলল, "ব্যাটার হাতে হয়েছে মহারোগ।" হাতটা নীচের দিকে নামিয়ে দিয়ে সে পুনরায় ধমকে উঠল, "পাপের বোঝা আর ছুঁড়ীটার মুখের ওপর রেখে কি হবে রে ছোঁড়া? ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, বুঝলি?"

"শবদেহ কি ধর্মকথা কথা শুনতে পায়?" জিজ্ঞাসা করল বসন্ত।

শম্ভুর মা কোন জবাব দিল না। সুর ক'রে সে কাঁদতে আরম্ভ করল। মাতাপুত্রের সেই সনাতন সম্বন্ধের বিয়োগ-ব্যথা বুড়ির কণ্ঠে কি রকম অদ্ভুত

শোনাল। শোকাতুরা জননীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে বসন্ত চলে এল বস্তির বাইরে। হুকু নতমস্তকে বসন্তর পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগল।

সকাল থেকেই হুকুর শরীরটা বিশেষ ভাল ছিল না। কেমন একটা চিনচিনে ব্যথা নাভির চারদিকে মোচড় দিয়ে উঠছে। দু'একবার যেন ওর মনেও হয়েছে যে, পেটের মধ্যে মাংসপিণ্ডটা বোধহয় হাত পা ছুঁড়ছে।

অমাহার্স্ট স্ট্রিটের মোড় পর্যন্ত এসে হুকু বলল, "বসন্ত, রাত্রির মত কোথাও থেকে গেল্লে হ'ত না?"

"কেন?"

"বড্ড ভয় করছে। মরা মানুষ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে রাস্তা হাঁটলে খোকার অমঙ্গল হবে।"

বসন্ত অন্ধকারে হুকুর দিকে মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "খোকা এসে গেছে নাকি? কখন এল?"

হুকু জবাব দিল, "এত নিঃশব্দে তো খোকা আসবে না। কোন সৃষ্টিই বোধহয় নিঃশব্দে আসে না বসন্ত। আমার শরীরটা ভাল নেই আজ।"

কর্নওয়ালিস স্ট্রিট-এর দিক থেকে একটা জিপ গাড়ি হেড-লাইট ফেলে ঝপ্ ক'রে এসে দাঁড়িয়ে গেল ওদের সামনে।

"হল্ট!"

হুকু আর বসন্ত দাঁড়াল। রেড গার্ডদের গাড়ি। একজন রেড গার্ড স্টীয়ারিং ধরে ব'সে রইল, অন্য একজন নেমে এল ওদের সামনে। কটিবন্ধের পিস্তলটা হাতে নিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, "কে আপনারা? কোথায় যাচ্ছেন?" জবাব দিল হুকু, "আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক, পাড়াগাঁয়েই যাচ্ছি।"

"ওঃ! কিন্তু খুব হুঁসিয়ার, কলকাতার রাস্তাঘাট নিরাপদ নয়।" রেড গার্ডের সহানুভূতি হুকুর কানে অত্যন্ত শ্রুতিমধুর শোনাল।

রেড গার্ড প্রশ্ন করল, "আপনারা কোন পাড়ায় ছিলেন?"

বসন্ত জবাব দিল, "পাটোয়ারবাগান।"

যুবকটি এবার বসন্তর ঘাড়ে হাত রেখে বলল, "যে-সব রেড গার্ড আজ

পাটোয়ারবাগানে গুলি চালিয়েছে তারা সব হাজতে আছে। আপনারা কি আমাদের ক্ষমা করেন নি ?"

মুকু বসে পড়ল মাটিতে।

যুবকটি এগিয়ে এসে বলল, "চলুন, আমি আপনাদের খানিকটা দূর এগিয়ে দিয়ে আসি। কোথায় যাবেন বলুন তো ?"

বসন্ত জবাব দিল, "পিচের রাস্তার বাইরে।"

জিপ গাড়িতে উঠে, ওরা বসন্তর নির্দেশ মত চলল শ্যামবাজারের দিকে। মুকুর দিকে চেয়ে যুবকটি বলল, "রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় সবাই তো মাথা ঠিক রাখতে পারে না, তাই খানিকটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।"

মুকু সায় দিয়ে বলল, "তা তো ঠিক কথাই। একটা সামান্য ফুটবল খেলা নিয়ে ময়দানে কত মানুষেরই তো জীবন নষ্ট হতে দেখেছি। আর এ তো দু'টো সভ্যতার হারজিতের খেলা!"

রেড গার্ড ঘাড় বেঁকিয়ে মুকুর দিকে ভাল ক'রে চাইল।

বসন্ত গাড়িচালককে বলল, "যশোর রোড ধরে চলুন। ঐ তো সামনেই বেলগেছিয়ার পোল।"

প্রায় পনর মিনিট কেটে যাবার পরে যুবকটি মুকুকে বলল, "আপনার যা অবস্থা দেখছি, তাতে আমার মনে হয়, আপনি থেকে গেলেই পারতেন। হাসপাতাল এখন জনসাধারণের জন্যেই খোলা থাকবে। ওষুধের নাম ক'রে আমরা আর এক ফোঁটা জল বিতরণ করতে দেব না। কমরেড চৌধুরী বলেছেন, এক ফোঁটা অন্যায়ের জন্যে আসামীর সোজাসুজি ফাঁসি হবে।"

মুকু জিজ্ঞাসা করল, "কোন কমরেড চৌধুরী ?"

"কমরেড দীপক চৌধুরী—আমাদের লীডার। দেখেন নি, পাঁচিলের গায়ে সব বড়বড় তাঁর পোস্টার লাগান হয়েছে ?"

"কই না তো!" মুকু তার শাড়ীর আঁচলটা মাথার ওপর টেনে দিয়ে বলল, "পাটোয়ারবাগানের ভাঙ্গা দেয়ালে দু'একটা তাঁর ছবি টাঙানো উচিত ছিল কমরেড। গুলি ছোঁড়বার সময় রেড গার্ডরা তাহলে একটু হুঁসিয়ার হতে পারত।"

"আপনি তাহলে এখনও আমাদের ক্ষমা করেন নি দেখছি ? আমি বলছি,

অপরাধীরা কমরেড চৌধুরীর কাছে চরম শাস্তি পাবে। পার্টামেন্টারী নের গুলিচালনা তিনি কিছুতেই ক্ষমা করবেন না। আপনি তবে কেন কলকাতা ছাড়বেন ?”

মুকু বিস্মিতভাবে জানতে চাইল, “আমাকে রাখবার জন্যে আপনার এত আগ্রহ কেন ?”

“শিশুরাষ্ট্রে শিশুর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। আমাদের লীডার কমরেড চৌধুরী আজ বেতার-বক্তৃতায় বলেছেন যে, রেড গার্ডদের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে, সবরকম মৃত্যুর হাত থেকে শিশুরাষ্ট্রকে রক্ষা করা।”

মুকুর মনে নতুন ক'রে মার্কসবাদের দোলা লাগল। ইচ্ছে হ'ল ফিরে যায়। রাষ্ট্রের শিশুরক্ষাগারে কমিউনিস্ট শিশুদের পিতৃপরিচয়ের সাবেক প্রয়োজন অন্তর্হিত হয়ে যাবে। যে-লজ্জা সে গোপন ক'রে আজ বসন্তর সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছে, হয়তো তার কোন দরকারই ছিল না। স্বামী ছাড়া সন্তান হয় না, এমন নিয়মের মধ্যে আর যাই থাক, বিজ্ঞানের সত্য নেই। তা ছাড়া বুর্জোয়া মরালিটির ভগ্নাবশেষের মধ্যে যদি আরও কিছুদিন বসবাস করতে হয়, তবে বসন্তকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নিলে কেমন হয় ? কাজটা তো তেমন কিছু কঠিনও নয়। আশপাশের দু'চারজনকে জানিয়ে দিলেই হ'ল যে, বসন্তর সঙ্গে ওর মালাবদল হয়েছে। জানিয়ে দেওয়াটাই তো মরালিটি। মালাবদলটা কেবলমাত্র অনুষ্ঠান। মুকু একটু নড়েচড়ে বসল। মধ্য রাত্রে যশোর রোডে ঝিরঝির ক'রে হাওয়া বইছে, বিপ্লবের হাওয়া। বিপ্লবের উষ্ণতা সত্ত্বেও মুকুর শীত করতে লাগল। বসন্তর সঙ্গে সে একবস্ত্রে বেরিয়ে এসেছে, কান ঢাকতে গেলে হাত বেরিয়ে পড়ে। মুকু বসন্তর গায়ের সঙ্গে লেগে একটু ঘন হয়ে বসল। অনুভব করল, বসন্তর শরীরে মাংস নেই, সব হাড়। বেচারা বহু বছর খেতে পায় নি, সমাজ ও রাষ্ট্র ওর বরাদ্দ খাবার চুরি ক'রে খেয়ে ওর সামনে উড়িয়ে রেখেছিল ভগবান-বেলুন। বেলুন দেখে তো মানুষের গায়ে মাংস হওয়ার কথা নয়। কিন্তু হাড়মাংসের দরকারই বা কি, মরালিটি তো হাড়ের গায়ে আশ্রয় ক'রে নেই। লোকালয়ে যাওয়ার আগে, বসন্তর কাছে প্রস্তাব করলে কেমন হয় ? মুকু তার ডান হাতটা রাখল বসন্তর হাতের ওপর।

বসন্ত বলল, "এই তো বসিরহাটের বাজার, আমরা এইখানেই নামব।"

জিপ গাড়ী থামল।

রেড গার্ড জিজ্ঞাসা করল, "সঙ্গে টাকা পয়সা আছে তো? দেশে গিয়ে হয়তো দেখবেন টাকার দুর্ভিক্ষ—অবশ্য, তা সাময়িক।"

হুকু ব্লাউজের ভিতর থেকে দু'টো বড় বড় নোট বার ক'রে বলল, "দুশো টাকা!"

"কিন্তু আজ থেকে এ-টাকা আর চালু নেই।" রেড গার্ড তার নিজের পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট হুকুর হাতে দিয়ে বলল, "আমাদের নতুন টাকা। জনসাধারণের টাকা, তাই এর দাম দশটাকার চেয়েও বেশী।"

হুকু নোটখানা প্রাণপণে বুকের ওপর চেপে ধরে বসে পড়ল বসিরহাট বাজারের রাস্তার ওপর।

রাত তখন প্রায় তিনটে। বসিরহাটের বাজারে টাউনের যোয়ানমর্দরা সবাই আজ উপস্থিত আছে। রেশনের দোকানের সামনে একটা মাইক টাঙানো হয়েছে। কলকাতা থেকে কমরেড চৌধুরীর বক্তৃতার ছাপান কপি এনে একজন রেড গার্ড মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগল। মাইকের ওপরে কংগ্রেসের ছাপ মারা নেই, পিপল্‌স্ মাইক। "আমাদের নেতা কমরেড দীপক চৌধুরীর নিবেদন—" জনতা জয়ধ্বনি ক'রে উঠল, 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ!' কানে হাত দিয়ে হুকু রেশন দোকানের পাশেই দাঁড়িয়েছিল। উঁকি দিয়ে দেখল, দোকানে একদানা চাল নেই। কংগ্রেসী-সরকারের হিসেবের খাতাগুলো মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে। রেড গার্ডের পদাঘাতে হয়তো বা ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছে। তা উঠুক, মায়া করবার সময় এ নয়। হুকু জানে, দু'টো সভ্যতার হারজিতের খেলা চলেছে। বুর্জোয়া সভ্যতার হার নিশ্চয়ই হয়েছে, নইলে মাইকের মধ্যে দিয়ে কমরেডের কণ্ঠ জনতাকে বিচলিত করতে পারত না।

বাজারের পুব দিকের রাস্তা ধ'রে বসন্ত আর হুকু হাঁটতে লাগল। ঘণ্টাখানেক পরে ওরা মাঠের মধ্যে নামল। হাঁটতে হাঁটতে হুকু দীপক চৌধুরীর কথাই ভাবছিল। ওর কাছেই তো দীপুদার রাজনীতির হাতেখড়ি! কিন্তু হুকুর

হাতের কাছে আজ কেউ নেই। কোথায় বিনয়প্রকাশ আর কোথায়ই বা অনীতা! জগতের সবাই আজ দীপুদার ঠিকানা জানে, কিন্তু ওর ঠিকানা কেউ জানে না। ভাবতে ভাবতে হুকু খুবই আশ্চর্যবোধ করল কেমন ক'রে দীপুদা রাতারাতি জনসাধারণের নেতা হয়ে বসল! পলিট ব্যুরোর দু'চার জন লোক ছাড়া তো তাকে কেউ চিনত না! কংগ্রেসী নেতাদের মত জেলখাটার যোগ্যতা তার নেই, দু'চারটে আশ্রম কিংবা বিধবা-নিকেতনের জন্যেও সে চাঁদা তুলে দেয় নি। এমন কি খবরের কাগজের মালিকদের সে দু'দশ টাকার চা খাইয়ে নিজের ছবি পর্যন্ত ছাপায় নি। তবে কেন জনসাধারণ তাকে নেতা ব'লে স্বীকার ক'রে নিল? হাজার রকমের প্রশ্ন করতে করতে হুকু প্রায় চার মাইল রাস্তা অতিক্রম করল। পূবের আকাশ একটু একটু সাদা হয়ে আসছে। হুকু একটু থেমে বসন্তকে জিজ্ঞাসা করল "আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

বসন্তর গলার ভাঁজে ঘাম জমেছে। ঘাম মুছতে মুছতে বসন্ত জবাব দিল, "যেদিকে দু'চোখ যায়।"

"কেবল চোখের ওপর ভরসা ক'রে কি হাঁটা উচিত?"

"ভরসা তো ভগবান।"

"বিশ্বাসের মাত্রায় একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না?"

"বোধহয় না।"

"হাতের কাছে দু' চারটে প্রমাণ আছে কি বসন্ত?"

"আছে।" এই ব'লে বসন্ত নিকটের গাছতলায় গিয়ে বসল।

"আসুন একটু বিশ্রাম ক'রে নিন। মানুষের চ[illegible]র বোধহয় শেষ নেই। সংসারে দু' চার দিনের স্থিতি, তার জন্যে মাঠে ময়দানে মাইক লাগিয়ে ষাঁড়ের মত চিৎকার ক'রে লাভ কি?" বসন্ত ভাবল, হুকুর প্রশ্নের বোধহয় যোগ্য উত্তর দেওয়া হয়েছে। হুকু এসে বসল বসন্তর পাশেই, বলল "যে যুগে মাইক ছিল না, সে-যুগেও মানুষ ঘর বেঁধেছে।"

"বেঁধেছে বটে, কিন্তু টিকল কই?"

"টেকে নি?" প্রশ্ন করল হুকু।

"তাহলে বিপ্লবের কি প্রয়োজন ছিল? ভাঙা-গড়া জগতের নিয়ম। যেমন

জন্ম-মৃত্যু। আসলে আমরা তো ট্যুরিষ্ট—এসেছি, আবার গ্রহান্তরে চ'লে যাব।"

প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস-করা বসন্ত দাসের দিকে চেয়ে হুকু জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে সেদিন যে জজ সাহেবের মনের দারিদ্র্য সম্বন্ধে খুব লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিলে? ট্যুরিষ্টরা আবার অভিযোগ করবে কেন?"

"অভিযোগ নয়, ভর্ৎসনা। এই সব অতি চালাক লোকগুলোর জন্যেই তো মাইকের সৃষ্টি হয়েছে। মাইক না থাকলে বিপ্লব হ'ত না। কিংবা বিপ্লব মানেই মাইক।"

বসন্তর যুক্তি ক্রমে ক্রমে হুকুকে আকর্ষণ করতে লাগল। সে জিজ্ঞাসা করল, "ভগবান ভরসার দু' চারটে প্রমাণ দেবে বলেছিলে, তার কি হ'ল?"

"প্রমাণ তো পদে পদে। প্রমাণ না থাকলে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হ'ল কি ক'রে? ভগবানের অভিপ্রায়—রেড গার্ডের মার খেয়ে পাটোয়ারী বাগান ত্যাগ করা, আবার তাঁরই দয়ায় রেড গার্ডের গাড়ি চেপে বসিরহাটের বাজার পর্যন্ত নিরাপদে পৌছান। তিনি কাউকে বিপদে ফেলেন না। কেবল অতি চালাকরাই নিজেদের বিপদ নিজেরা ডেকে আনে। উঠুন, পাড়াগাঁয়ের দিকে মাইকের প্রচলন নেই।"

ওরা আবার হাঁটতে সুরু করল।

সমস্ত দিন ওরা হাঁটল। পরিশ্রান্ত হ'য়ে হুকু যতবার বসে পড়তে চেয়েছে, বসন্ত ততবারই ওকে ভগবানের ভরসা দিয়ে বসে পড়তে দেয় নি। বেলা চারটে নাগাদ হুকুর গর্ভযন্ত্রণা সুরু হ'ল। বসন্ত হুকুকে দু'হাতে আলগা ক'রে তুলে নিয়ে একটা গাছতলায় বসিয়ে দিল। বসন্ত চেয়ে দেখল, চারদিকে ধুধু করছে মাঠ। দু'এক মাইলের মধ্যে কোথাও লোকালয় আছে ব'লে ওর মনে হ'ল না। গাছের পাশ ঘেঁষে এক ফালি জমিতে কেবল লাঙল পড়েছে। আর সব জমিই পতিত। মাঝে মাঝে দু' দশটা জংলী গাছ, তাতে হলদে রংয়ের ফুল ফুটে রয়েছে। বসন্ত এবার সত্যি সত্যি একটু ভয় পেল। মাইল দুই আর হাঁটতে পারলে হয়তো লোকালয়ে গিয়ে পৌছান যেত।

মুকু বলল, "বসন্ত, তুমি আমায় ফেলে পালাবে না তো?" বসন্তর হাত চেপে ধ'রে মুকু পুনরায় বলল, "ব্যথা আমার ক্রমশই বাড়ছে, যদি অজ্ঞান হ'য়ে পড়ি?"

"অজ্ঞান হ'লে কি বাচ্চা হয় না?" মুকু সহসা জবাব দিতে পারল না। ওর তো কোনদিনও বাচ্চা হয়নি, আর তাছাড়া মার্কসবাদে যা নেই, মুকু তা কি ক'রে জানবে?

"এত তাড়াতাড়ি যে কাণ্ড ঘটবে আগে তা বলেননি কেন?" ক্ষুব্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করল বসন্ত।

"আমিই বা কি ক'রে জানব? বাচ্চা যখন হওয়ার তখন সে হবেই। কিন্তু আমার বড্ড ভয় করছে বসন্ত।"

"কিসের ভয়?"

"কেবল ভয় নয়, মনে হচ্ছে পাপ করেছি। বসন্ত, ইচ্ছে করলে তুমি আমায় পাপ থেকে উদ্ধার করতে পার, করবে?" মুকু বসন্তর দু'টো হাতই টেনে নিয়ে নিজের বুকের উপর রাখল।

"আমি কি ক'রে আপনাকে উদ্ধার করব?"

"সন্তানের পিতৃত্ব দিয়ে।" বসন্ত টান্ দিয়ে হাত দু'টো সরিয়ে নিয়ে এল।

তবুও মুকু বলল, "আমায় তুমি সমস্ত জীবনভর শাস্তি দিও। কিন্তু শিশুটাকে শাস্তি দিলে তোমাদের ভগবান তোমায় ক্ষমা করবেন না। আমায় তুমি বিয়ে কর বসন্ত।"

সংসারে বসন্ত ট্যুরিস্ট হ'য়ে এসেছে, কমিউনিস্ট হ'য়ে নয়। মুকুর আক্রমণাত্মক বৈপ্লবিক বিচার-বুদ্ধিতে সে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। মাইক ছাড়াও যে ফাঁকা মাঠে বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে মুকুর কথাবার্তায় বসন্ত তা উপলব্ধি করল। অসহায়ভাবে সে এদিক-ওদিক চাইতে লাগল। তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে ওর ভয় অনেকটা কাটত। কিন্তু প্রসারিত দৃষ্টির শেষ সীমানায়ও কোন মানুষের চিহ্ন দেখা গেল না।

মুকুর ব্যথা ক্রমশই বাড়তে লাগল। গাছতলায় শুয়ে সে চিৎকার করছে।

ব্যথার তীব্রতা এখনও সহ্যের সীমায় আছে। ঝুকু কাঁদতে কাঁদতে অনুরোধ করল, "ভগবান যদি সত্যি হয় তাহলে আমায় তুমি বিয়ে কর বসন্ত।"

চোখমুখ বন্ধ ক'রে বসন্ত বিব্রতভাবে বলল, "কি যে বলেন, আপনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়—"

"গোটা কয়েক জংলী ফুলই তুলে নিয়ে এস শিগগীর—মালা বদল হবে। সাক্ষী থাকবেন তোমার ভগবান। উঃ! মাগো—" ঝুকু ছটফট করছে দেখে বসন্ত ঠিক করতে পারল না সে এখন কি করবে, ফুল তুলতে যাবে, না ঝুকুকে ধ'রে ব'সে থাকবে। শেষ পর্যন্ত বোকার মত সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইল ঝুকুর দিকে।

সূর্য অস্তগামী, সন্ধ্যে হ'তে আর দেরি নেই। তৃণশূন্য অনুর্বর শক্ত মাটিতে আঁচড় কাটতে কাটতে ঝুকু দ্বিতীয়বার চিৎকার ক'রে উঠল, "শিশুটার কোন পরিচয় থাকবে না বসন্ত—কি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ফুল আনবে না? মালা গাঁথবে না? তোমার চেয়ে বয়স বেশী ব'লে বিয়ে হবে না, তেমন আদেশ কি ভগবান দিতে পারেন?"

"আপনার নিশ্চয়ই হিস্টিরিয়া হয়েছে।" বসন্তর মন্তব্য ঝুকুর শ্রুতিগোচর হ'ল না। ঝুকু মূর্চ্ছা-যাওয়ার উপক্রম। এক একবার খেঁচুনি আসছে, আবার স্থির হ'য়ে কতক্ষণ পড়ে থাকছে। একটু পরে ঝুকু থেমে থেমে বলতে লাগল—"আমি বোধহয় আর বাঁচব না। তুমি ছেলেমানুষ—পারো তো কাউকে খুঁজে নিয়ে এস।"

নিরুপায় হয়ে বসন্ত দৌড়তে যাচ্ছিল। ঝুকু ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "ও কি, পালাচ্ছ নাকি?"

"আপনিই তো বললেন লোক খুঁজে আনতে!" বিপদসঙ্কুল অবস্থার মধ্যে বসন্ত দিশেহারা হয়ে গেল। এবার ঝুকু অভিমানের সুরেই বলল "তোমার ভগবান যদি সত্য হয়, তবে তিনি আকাশ থেকে একজন ডাক্তার কেন পাঠিয়ে দিচ্ছেন না?"

"পাঠাবেন বৈ কি! আপনার হ'য়ে আমি প্রার্থনা করছি। আসলে এতক্ষণ তো আমি কিছুই করি নি, কেবল ভগবানকে ডাকছিলুম।"

হঠাৎ বসন্ত দেখল, মুকু সংজ্ঞা হারিয়েছে। গায়ে ধাক্কা দিতে গিয়ে ওর নজরে পড়ল, বন্ধ্যা মাটিতে রক্তের স্রোত বইছে। দেখতে দেখতে মাটিটাও বুঝি শুকিয়ে গেল! পোড়ামাটি রক্ত পান করছে! বসন্ত গিয়ে অন্য একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে ভগবানকে ডাকতে লাগল।

কতক্ষণ যে সে তন্ময় হয়েছিল সে-কথা বসন্ত নিজেও জানে না। হঠাৎ সে নবজাতকের কান্না শুনতে পেল। বসন্ত ছুটে এল মুকুর কাছে। এসে তার নিজেরই প্রায় সংবিৎ হারাবার অবস্থা! কে একজন মানুষ ন্যাকড়া দিয়ে বাচ্চাটাকে পরিষ্কার করছে। মুকুর কোমর পর্যন্ত একখানা শাড়ী দিয়ে ঢাকা রয়েছে। বসন্ত জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কে?"

"আমি অবনী মণ্ডল। যাচ্ছিলুম দেশের দিকে। ব্যাটা দেখছি সাহেবের বাচ্চা। কি সাদা! দেখবেন?"

বসন্ত বসে পড়ল অবনী মণ্ডলের পাশে।

রাত হয়ে গেছে। ফাঁকা মাঠে ঠাণ্ডা পড়ছে খুব। অবনী মণ্ডল শুকনো পাতা সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এল। তাতে আগুন জ্বালিয়ে যতটা পারল বাচ্চা ও মুকুকে গরম রাখবার সে চেষ্টা করতে লাগল। মুকুর জ্ঞান ফিরে এসেছে। বাচ্চার প্রথম স্পর্শে ওর জ্ঞানের গভীরতা বাড়ল। মুকুর ফুর্তি দেখে কে!

"বসন্ত, আমার মাথার নীচে কাপড়ের এই পুঁটলিটা কোত্থেকে এল? আর এই নতুন শাড়ীটাই বা কোথায় পেলে?"

মুকু ঘাড় বেঁকিয়ে দেখল অবনী মণ্ডলকে।

"আমি অবনী মণ্ডল। পাকিস্তান আর হিন্দুস্থান যে-বছর হ'ল, সেই বছরে আমি বৌকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলুম কলকাতায়। শিয়ালদা স্টেশনে বৌ আমার মারা যায়। তারই সব শাড়ীকাপড় ছিল। আমি চাষী, আমার তো এসব জিনিস থাকবার কথা নয় হুজুর।"

বসন্ত জিজ্ঞাসা করল, "কলকাতা ছাড়লেন কেন?"

"শহরের নিয়মকানুনই সব আলাদা। পছন্দ হ'ল না। আপনারা সব কমরেড নাকি হুজুর?"

বসন্ত লক্ষ্য করল, অবনী মণ্ডল ভয় পেয়েছে।

সুকু বলল, "আমরা সব রিফিউজী।"

"রিফিউজী? বগুড়া জেলা চেনেন?" অবনী মণ্ডলের প্রাদেশিক প্রীতি প্রবল হ'য়ে উঠল।

অন্ধকার আরও ঘন হয়ে এসেছে। অবনী মণ্ডল বসন্তকে বলল, "আপনি একটু চোখ রাখবেন, আশপাশে শেয়ালের গর্ত আছে অনেক। আমি যাচ্ছি শুকনো ডালপাতা নিয়ে আসতে।"

আগুন জ্বালিয়ে বসন্ত আর অবনী মণ্ডল সমস্ত রাত বসে রইল মাঠে। বসন্ত মাঝে মাঝে ঝিমিয়ে পড়েছে, অবনী মণ্ডল কিন্তু এক মুহূর্তও ঘুময় নি। শিশুরাষ্ট্রের প্রথম জন্মদিনে বাংলার মাঠে সুকুর শিশুও জন্মগ্রহণ করল। গোয়াবাগানের জগতে 'কালচার' ছিল, 'এগ্রিকালচার' ছিল না। চৌধুরী পরিবারের বাস্তু থেকে তাই বাংলার মাঠ দৃষ্টিগোচর হয় নি।

ঠাকুরদা ও বড়কাকার মৃত্যুদিনে সুকুর শিশু শতাব্দীর ব্যবধান ঘুচিয়ে জন্ম নিল বাংলার মাঠে। তার প্রথম চিৎকারে হয়তো বা শোনা গেল 'নতুন' বিপ্লবের মহাবেদ। বিপ্লবোত্তর বিপ্লব? হয়তো বা তাই।

•

সকালবেলা সুলতানপুর থেকে ওবাইদ মোল্লা এল লাঙল নিয়ে মাঠ চাষ করতে। দূর থেকেই সে ওদের দেখতে পেয়েছে। গরু দু'টোকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে সে ছুটে এল ওদের কাছে।

ওবাইদ মোল্লা রাত্রে স্বপ্ন দেখেছে, ভূষণ্ডীর পতিত জমিতে ফসল জন্মেছে, শত শত মাইলব্যাপী সোনার ফসল!

"সোনার ফসল তো মিথ্যে নয় গো!" এই ব'লে ওবাইদ মোল্লা নেকড়া সরিয়ে বাচ্চার মুখ দেখল। "খোদার এ কি মর্জি! ভূষণ্ডীর মাঠে গত দশ পুরুষের মধ্যে কোন বছরই দশ মনের বেশী ধান জন্মায় নি, আর এ যে এক তাল সোনা গো!"

ওবাইদ মোল্লা দু'হাত বাড়িয়ে বাচ্চাকে কোলে তুলে নিল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "তোমরা মশায়রা ভূষণ্ডীর মাঠে কেমন ক'রে এলে? আর এলেই যদি খবর দাও নি কেন?"

বসন্ত বলল, "বাড়িঘর তো এখান থেকে চোখে পড়ে না, তাই খবর দিতে পারি নি।"

"তোমরা খবর না দিলে কি হবে, ওবাইদ মিঞা খবর পেয়েছে মাঝ-রাত্রেই। স্বপ্ন দেখেছি, ভুঁয়ঞার মাঠে সোনার ধান। খোদা হাফেজ!—আমি ছুটে গিয়ে দুধ নিয়ে আসছি।"

হুকু ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "মিঞাসাহেব, খোকাকে নিয়ে যাচ্ছ না কি?"

"না গো না—দু' মাইল রাস্তা, এই ছুটে যাব আর আসব। খোকা তোমার এখানেই রইল।"

খোকাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে সে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "ফজরের নামাজ পড়া হয় নি যে!" ওবাইদ মোল্লা খোকার পাশেই বসে পড়ল নামাজ পড়বার জন্যে।

প্রথম ভাগ

কমরেড, পাটোয়ারবাগানে রেড গার্ডরা গুলি চালিয়েছে, তার খবর আমি পেয়েছিলাম। অপরাধীদের খুঁজে বার করতে খানিকটা সময় নিয়েছে। রাত বারোটার পর আমি গেলুম মুকুর খোঁজ করতে। যাওয়ার আগে লালবাজারের তিন তলায় দেখা হ'ল বিনয়প্রকাশের সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করলুম, "মুকুর খবর কি ?"

বিনয়প্রকাশ জবাব দিল, "মুকু ?—ও, হ্যাঁ মুকু। মুকুর খবর আমি জানি না। বোধহয় বস্তিতেই আছে।"

"বস্তিতে ? বস্তিতে থাকবে কেন ? সে কি সেখান থেকে চলে আসে নি ?"

"আমি লেটেস্ট খবর জানি না। মনে হয়, কমরেড মুকু বস্তি থেকে সরে আসতে পারে নি।"

"কেন ?"

"কমরেড মুকু গর্ভবতী।"

অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "তোমার কোন দায়িত্ব নেই বিনয়প্রকাশ ?"

"দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কমরেড চৌধুরী, বেলুড় আশ্রমে আমাদের শিশু-রক্ষাগার তৈরী হয়েছে। বাড়িটা খুবই ভাল, কেবল চুনকাম করতে হয়েছিল আমাদের। ট্রাম-বাসের গণ্ডগোল নেই, নবজাতকেরা গঙ্গার হাওয়া খেয়ে তাগড়া হয়ে উঠবে। যদি বলেন, তবে আমি কমরেড ব্যানর্জিকে ফোন ক'রে দিই।"

"কমরেড ব্যানার্জি কে ?"

"মনস্তাত্ত্বিক ব্যানার্জি।"

"আমি নিজেই যাচ্ছি এখন পাটোয়ারবাগানের বস্তিতে।" এই ব'লে

আমি সিঁড়ি দিয়ে দু'তলায় নেমে এলুম।" বিনয়প্রকাশও এল আমার সঙ্গে সঙ্গে। একতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন কমরেড কৃষ্ণান।

তিনি বললেন, "ছুটতে ছুটতে আসছি।"

"কি খবর ?"

"এখনি আপনাকে একবার বেতার-কেন্দ্রে যেতে হবে। বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের নিরাপত্তায় আশ্বাস দিয়ে এই বক্তৃতাটা আপনার জন্যে লেখা হয়েছে।" কমরেড কৃষ্ণান আমার হাতে এক টুকরো কাগজ গুঁজে দিলেন।

জিজ্ঞাসা করলুম, "ওঁরা কি ভয় পেয়েছেন না কি ? আমাদের রেড গার্ডরা কি ওঁদের দরজায় পাহারা দিচ্ছে না ?"

"দিচ্ছে, কিন্তু তাতেও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। হয়তো দু'চারটে ইটপাটকেল খেয়ে থাকবেন।"

পিছন থেকে বিনয়প্রকাশ বলল, "শুনেছিলাম যে, আণবিক বোমা না ছুঁড়লে এঁরা ভয় পান না ?"

নীচে নামতে নামতে বললুম, "ভয় যে পেয়েছেন, তাও তো বুঝতে পারছি না। আজই সকালে ঘোড়দৌড়ের মাঠের পশ্চিম দিক দিয়ে যখন যাচ্ছিলুম, দেখলুম যে বিদেশী সাহেব-মেমেরা গল্‌ফ খেলছেন! একটু দূরেই খিদিরপুরের দিকে তখনও আগুন জ্বলছিল।"

গম্ভীরভাবে কৃষ্ণান মন্তব্য করলেন, "ওঁরা বোধহয় আমাদের বিশ্ববিপ্লবকে উপহাস করছেন কমরেড চৌধুরী। ব্যাপারটা একটু অনুসন্ধান ক'রে দেখব কি ?"

"দু'চারজন রাষ্ট্রদূতের উপহাস আমাদের গায়ে লাগবে না কমরেড।"

বাকী ক'টা সিঁড়ি আমরা নিঃশব্দে নেমে এলাম।

লালবাজারের প্রাঙ্গণে ভিড় জমেছে। রেড গার্ডরা ভিড়ের মধ্যে দিয়ে রাস্তা ক'রে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের যারা উচ্ছিষ্ট তারাই আজ মাথা নীচু ক'রে লালবাজারের ফটক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করছে। জনসাধারণ এদের কোনদিনও এত সন্নিকটে দেখতে পায় নি। দেখতে পেলেও চিনতে পারে নি। বিপ্লবের আগুনে এদের মুখোশ আজ খুলে পড়েছে।

দস্যু রত্নাকরের দল ভুয়ো বাল্মীকির ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল কুমারিকা থেকে হিমালয় পর্যন্ত। আর যাই হোক, এরা গত দু'শ বছর থেকে আমাদের মিথ্যে রামায়ণ শুনিয়েছে। শুনিয়েছে নিশ্চয়ই, নইলে রামায়ণের ডায়ালেকটিকস এদের চোখে ধরা পড়ত। রাম-রাবণ যুদ্ধের ঐতিহাসিক পরিণতিই যে জনযুদ্ধ তা এরা কেউ স্বীকার করে নি। তা ছাড়া, জড়বাদের তীক্ষ্ণ তরোয়াল দিয়ে ভগবান প্রেরিত জটায়ুর ডানায় প্রথম কোপ বসিয়েছেন বাল্মীকি নিজেই। তারপর কয়েক শতাব্দীর চেষ্টায় আমরা বিজ্ঞানের আলোয় দেখতে পেলুম যে, জটায়ুর সারা অঙ্গে কোথাও ভগবানের লীলাখেলা নেই, থাকলে কাটা পাখা জোড়া লাগত। বাল্মীকির দয়ায় আমরা আরও দেখলুম, লালবাজারের ভিড়ের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর অসংখ্য জটায়ু আজ খদ্দর দিয়ে ডানার দগ্‌দগে ঘাগুলো লুকিয়ে রেখে নিরাপদ নির্ভাবনায় পুচ্ছ নাচাচ্ছে। রেড গার্ডদের গাড়ি থেকে এরা সব এক এক ক'রে নামছিল। একেবারে শেষে যিনি নামলেন, তাঁর সর্বাঙ্গ গাধার দুধের মত সাদা খদ্দরের কাপড় দিয়ে অলংকৃত। লক্ষ্য করলুম, কোথাও এতটুকু দাগ নেই। মনের উদ্বেগ পারিপাট্য পরিচ্ছদে বিন্দুমাত্র বিক্ষোভ আনে নি। বিনয়প্রকাশকে জিজ্ঞাসা করলুম, "ঐ মহাশয় ব্যক্তিটি কে?" কৃষ্ণান সরে এলেন বিনয়প্রকাশের দিকে। বিনয়প্রকাশ বলল, "প্রিয়নাথ বোস।"

"হ্যাঁ, মনে পড়েছে, খবরের কাগজে ছবি দেখেছি। দামী ব্লক ব'লেই আসল চেহারার সঙ্গে হয়তো খুব বেশী মিল নেই। কিন্তু উনি এত সেজেগুজে এসেছেন কেন?"

"ভাবছেন হয়তো, বন্দীশালায় শুয়েশুয়ে আত্মজীবনী লিখবেন।"

"যাত্রা ওঁর জয়যুক্ত হোক!"

গাড়িতে উঠে বসবার পর বিনয়প্রকাশ বলল "ওঁকে আমরা আড়াই মিনিটের জন্যে লড়াই করবার সুযোগ দিয়েছিলাম।"

"কি রকম?" কৃষ্ণানের কৌতূহল বাড়ল।

"উনি রেড গার্ডদের প্রতিরোধ করছিলেন। ম্যাজিস্‌টেট্স দিয়েছেন ছাদের ওপর থেকে গোটা পাঁচেক থান ইট ছুঁড়ে।" কৃষ্ণান হেসে উঠলেন।

কৃষ্ণানের এই প্রথম হাসি! জয়যুক্ত বিপ্লবের শেষ মুহূর্তে কৃষ্ণানের প্রথম হাসি! লালবাজারের প্রাঙ্গণ ছাপিয়ে হয়তো বা ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করল। য়্যানা বেঁচে নেই, নইলে সেও বলকানসের গণ্ডগ্রাম থেকে শুনতে পেত হাসির আণবিক বিস্ফোরণ।

রেড গার্ডরাও অসহায়ভাবে শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণানের সঙ্গে সঙ্গে হাসতে লাগল। ডেনিউবের লাল জলে নৌকো ভাসিয়ে কৃষ্ণান যেন হাঙ্গেরীয়ান গ্রাম্য সংগীত শুনতে লাগলেন। পাশে তাঁর য়্যানা নেই, পৃথিবীর কোথাও নেই। ধারের টাকায় তিনি প্রচুর ঘি কিনে এনেছেন, কিন্তু ঘর তাঁর শূন্য। হঠাৎ বোধহয় তাঁর মনে হ'ল হাসির পর কান্না আসছে—কিংবা হাসিটাই আসলে তাঁর কান্না। প্রথম থেকেই কান্না, সব পাওয়ার পরেও একটা কি যেন পাওয়া যাচ্ছে না। জিপ গাড়িতে বসে তিনি নিজের অন্তরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করলেন। গভীর অন্বেষণ সুরু হ'ল। হাজার হাজার মাইলের পরিক্রমা! ছোটাছুটির শেষ নেই, আকাঙ্ক্ষারও শেষ নেই। ডায়ালেকটিকাল জড়বাদের 'সমগ্র সাম্রাজ্য' হাতের মুঠোর মধ্যে ছটফট করছে, মুঠো একটু আলগা করতে গিয়েই তিনি দেখলেন, 'সমগ্র সাম্রাজ্য' পালিয়েছে। প'ড়ে আছে সেই আদিম পৃথিবী। নতুন মানুষ জন্ম নিয়েছে, আবার বুঝি নতুন ক'রে ঘর বাঁধবে। হাজার হাজার মাইল ফাঁকা মাঠ, অসংখ্য তাঁবু—আগুনের তাপ দিয়ে খণ্ড খণ্ড কাদার ঢেলাকে পুড়িয়ে ফেললে যে ইট হয়, তা এরা এখনও জানে না। ইটের বিজ্ঞান অপরিজ্ঞাত। কৃষ্ণান দেখলেন, ওরা সব মেষপালক। অসংখ্য মেষ ঘাস খাচ্ছে—আর মেষপালকেরা গাছতলায় শুয়ে কেউবা বাঁশী বাজাচ্ছে, কেউবা বাঁশী শুনছে। কৃষ্ণানের স্পষ্ট মনে পড়ল, এই বাঁশী তিনি মন্দির গাত্রে দেখেছেন, খারখোভ কিংবা নিউইয়র্কের কারখানার তৈরী বাঁশী এ নয়। তবে কি ডেনিউবের জল লাল নয়? তিনি বল্‌কানসেই ফিরে এলেন। সেখানেও অসংখ্য তাঁবু—শিল্পকারখানা নেই, ধোঁয়া নেই, লোহা আর ইস্পাতের দাম্ভিক গর্জন কিছু শোনা যাচ্ছে না। ডেনিউবের জলে আদিম প্রশান্তি। এতটুকুও রং বদলায় নি। পৃথিবীর বিবর্তনে মানুষ সেই নির্ভীক পথচারী। আসছে, চলে যাচ্ছে—আবার আসবে, আবার চলে যাবে। হোমো ভিয়াটোর।

৭

আমরা গার্স্টিন প্লেসে এলুম, বেতার-কেন্দ্রে।

বিদেশীদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে আমি যখন বেতার স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলুম, রাত তখন দু'টো। কৃষ্ণান তখন সঙ্গে ছিলেন না। আমি এবার চললুম পাটোয়ারবাগানের দিকে। বিপ্লবের আগুন থেকে মনটাকে যতই মুক্ত করতে লাগলুম, হুকু যেন ততই সেই ফাঁকা স্থানটা জুড়ে বসতে লাগল। ক্রমশই ভাবতে লাগলুম, হুকু পাশে না থাকলে বিপ্লবোত্তর ভারতবর্ষকে বুঝি দেখেও চিনতে পারব না। হুকুর চোখ ছাড়া আমার হয়তো দৃষ্টিবিভ্রম ঘটতে পারে। মার্কসবাদের বৈপ্লবিক 'উত্তমশীলতার' উৎস থেকে হুকুর মনে যে 'মিস্তিকের' জন্ম হয়েছে, আমি তো তারই অংশ!

বড় বড় টর্চলাইট ফেলে আমরা পাটোয়ারবাগানের সরু গলিতে ঢুকে পড়লুম। বিক্ষিপ্ত শবদেহগুলোর উপর আলো ফেলতে ফেলতে আমরা হুকুকে খুঁজতে লাগলুম। শেষ পর্যন্ত বস্তির সামনের ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দেখি একটা মৃতদেহের বুকের ওপরে একটা লণ্ঠন রয়েছে। লণ্ঠনের আলোয় চারদিকের শবদেহগুলোকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু হুকু নেই। গোটা পাটোয়ারবাগান মৃত! বস্তির একটি ঘরেও জনমানবের চিহ্ন দেখতে পেলুম না। বিনয়প্রকাশের ঘর তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলুম, তবু হুকুর কোন সন্ধান নেই। বস্তির শেষ প্রান্তে ছোট্ট একটা খুপরির মত ঘর ছিল। দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে দিতেই, কে একজন বুড়ী চেঁচিয়ে উঠল, "না, না, শম্ভু এখানে নেই, শম্ভু মরে গেছে।"

"তুমি এখানে কি করছ?"

"ঘর আগলাচ্ছি।"

একজন রেড গার্ড ধমকে উঠল, "সারা কলকাতার ধনরত্ন সব লুকিয়ে রেখেছিস এইখানে, না? কমরেড চৌধুরী, দেখুন, বুড়ীটা বেনারসী শাড়ী পরেছে। ও নিশ্চয়ই লুঠ করতে গিয়েছিল। ওকে গ্রেপ্তার করি।"

"আমি লুঠ করতে যাব কেন রে ছোঁড়া, গিয়েছিল তো শম্ভু। বুড়ো হাড়ে একটু বেনারসীর হাওয়া লাগাচ্ছি, তাও তোদের সইল না?"

হঠাৎ খাটিয়ার নীচে টর্চ ফেলতেই একটি মেয়ের মুখ দেখে একজন রেড গার্ড বলে উঠল, "কমরেড, বোধহয় আপনার বোনকে পাওয়া গেছে!"

"পাওয়া গেছে?"

দশ বারোটা টর্চ একসঙ্গে জ্বলে উঠতেই, মেয়েটি বেরিয়ে এল খাটিয়ার তলা থেকে।

স্বকু নয়।

বুড়ীটা দ্বিতীয়বার চেঁচিয়ে উঠল, "ওকে নিয়ে যাচ্ছিস কোথায়? ও যে আমার শত্তুর বৌ।"

রাইফেল নিয়ে তেড়ে গেল রেড গার্ডদের একজন, "তোকেও হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে যাব লালবাজারে। লুটের জিনিস লুকিয়ে রাখাও অপরাধ।"

"আমায় নিয়ে যা, তবু মেয়েটাকে রক্ষে করিস বাবা। পাটোয়ারবাগানের শ্মশান আগলে বসে রইলাম আমি। কেবল শত্তুর জন্যে নয়, সবার জন্যেই আমি কাঁদব। আমি ছাড়া ওদের আর কেউ নেই।"

বাইরে বেরিয়ে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার নাম কি?"

"রুক্মিণী।"

"এখানে কেমন ক'রে এলে?"

"কে যেন কতগুলো লোক আমায় ধরে নিয়ে এসেছিল। সজ্ঞানে আসি নি।"

"কোথায় থাকতে?"

"কুইনস পার্কে।"

টর্চটা তুলে ধরলুম মুখের ওপর। আলোটা কেঁপে উঠল বটে, কিন্তু রুক্মিণীর চোখের পাতা একটুও নড়ল না।

কুইনস পার্কের বাড়ী অন্ধকার।

এক তলায় রুক্মিণীরা থাকত। দু'তলার মাদ্রাজী ভাড়াটেরা সব পালিয়েছে। রুক্মিণী ঘরের আলো জ্বালল। আমি তিন তলার ছাদে উঠলুম। মা নেই।

গত রাত্রের পূজোর আয়োজন ঠিক তেমনি ভাবেই পড়ে রয়েছে।

পেতলের রেকাবীতে চারখানা বাতাসা; বাতাসার গা বেয়ে ঘা বেরিয়েছে, লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ে প্রসাদ-প্রত্যাশী হয়ে লাইন বেঁধে দরজা পর্যন্ত এসে পৌঁচেছে। লম্বা লাইন। শেষটা দেখতে পাচ্ছি বটে, কিন্তু সুরুটা দেখতে পেলুম না। শেষ পিঁপড়েটা পৌঁছবার আগে বাতাসার আর কোন অস্তিত্বই থাকবে না। খাদ্যের অন্বেষণ জগতে প্রথম ও শেষ অন্বেষণ। রাষ্ট্রপতি থেকে পিঁপড়েপতি পর্যন্ত সবাই খাদ্য খুঁজে বেড়াচ্ছে। খাদ্যের সংস্থান না থাকলে রাষ্ট্রপতির সিংহাসনে কেউ বসত না। মিহি কিংবা মোটা খদ্দর খাবার জন্যে জগতের কোন পণ্ডিত আসত রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রসাদলোভী হয়ে?

বুভুক্ষু ভারতবাসী দৈনিক কাগজে দেখেছে প্রতিদিন, রাষ্ট্রপতি আর প্রদেশপালদের ভোজের আয়োজন। হাজার হাজার খদ্দরের পিঁপড়ে টেবিলের চারদিকে ভিড় জমিয়েছে খাওয়ার লোভেই। তাদেরই একজন আজ ছাদের ওপর থেকে প্রতিরোধ আন্দোলন চালাচ্ছিল। কিন্তু পাঁচখানা খান ইটের একটাও আমাদের গায়ে লাগে নি।

ঠাকুরঘরের সব আয়োজন তেমনিই পড়ে আছে বটে, কিন্তু মা নেই। মস্ত অভাব চোখে পড়ল। কেবল মায়ের অভাবই নয়, হয়তো যাওয়ার সময় তিনি ভক্তিবাদের শেষ বিন্দুটুকুও সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছেন। মাটির মূর্তি মৃত; অতীত ভারতের শবদেহের মত জগদ্ধাত্রীর শবদেহটাও আমরা ফেলে দিয়ে আসব 'প্রলয় পয়োধি জলে।'

পাশের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলুম, মার নিত্য ব্যবহারের সব জিনিসই পড়ে রয়েছে। কিছুই সঙ্গে নেন নি।

হয়তো বিসর্জনের পর সব বস্তুরই সহজাত মূল্য লোপ পায়। টাকার টাকাত্ব যে অস্বীকার করে, তার কাছে কোটি টাকার মূল্য সিকি পয়সাও নয়।

এক তলায় দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রুক্মিণী দাঁড়িয়েছিল। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে বলল, "উদ্ধার করলেন কেন?"

"শম্ভু মাইতি তো মরে গেছে, দেখাশোনা করবে কে?"

"পাটোয়ারবাগানে লোকের অভাব হ'ত না।"

"হ্যাঁ জানি, যত অভাব সব আজ অযোধ্যায়। রামচন্দ্ররা সব পালিয়েছে।

বাল্মিকীর অজ্ঞতা আমাদের ডায়ালেকটিকস-এর কাছে ধরা পড়েছে। রুক্মিণী, তুমি সীতার চেয়েও বড়—তুমি বৃহত্তর সীতা।"

দেয়াল থেকে একটু সরে এসে সে জিজ্ঞাসা করল, "কেন?"

"শম্ভু মাইতির ঘরে বারো ঘণ্টা বসবাসের পরেও তুমি আত্মহত্যা করো নি, রাবণের বাগানবাড়ি থেকে ফিরে এসে সীতা করেছেন। তুমি দেয়াল ধরে উঠলে, তিনি ফাটা মাটিতে ডুবলেন। তুমি জন্মেছ মানুষকে ওঠাতে, সীতা জন্মেছিলেন মানুষকে ডোবাতে। রামায়ণের গল্পে বাল্মিকীর দুষ্কৃতির সংখ্যা গোটা দুনিয়ার লোকসংখ্যার চেয়েও বেশী। বলপূর্বক নারীধর্ষণে সতীত্ব যায় না। সতীত্ব যায় তাদেরই যারা সিঁদুরের সাক্ষী নিয়ে অবাঞ্ছিত পুরুষের সঙ্গে ঘর করে জন্মাবধি। কেবল দক্ষিণার লোভে পুরোহিতরা অনুষ্ঠানকে মানুষের চেয়ে বড় ক'রে রেখেছে। রুক্মিণী, তুমি সোজা হয়ে দাঁড়াও। সীতার আত্মহত্যার মহারোগ যেন তোমায় স্পর্শ না করে। তুমি যুক্তপ্রদেশের মাটিতে জন্মেছ, আর ঐ যুক্তপ্রদেশের মাটিতেই এক গাদা মূর্খ প্রজার সামনে সীতা পাতালে প্রবেশ করেছিলেন! সতীত্বের জোর থাকলে হয় তিনি পুনরায় পুটু ক'রে উঠে আসতেন, নয় তো আশপাশের পুরুষগুলো তাঁকে মরতে দিত না। কিন্তু অতি দুঃখের সঙ্গেই জানাচ্ছি যে, গোবিন্দবল্লভ পন্থের পূর্বপুরুষরাও পুরোহিত ছিলেন।"

রুক্মিণী এবার সত্যিসত্যিই মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াল। আমি দেখলুম, ওর দৃষ্টি সহজ ও স্বাভাবিক হয়েছে। বুর্জোয়া-মস্তকের নৈবেদ্য নিবেদনের দাম্ভিক উক্তি করার রুক্মিণী এ নয়। তার পিতার খণ্ডিত মস্তকটি আমার চরণকমলে পৌঁছে দেওয়ার চেয়ে আমার চোখের দিকে সোজাভাবে তাকানই স্বাভাবিক কাজ ব'লে ও মনে করল। নিশ্চয়ই মনে করল, নইলে সে আমায় জিজ্ঞাসা করত না, "এখন আমি কি করব?"

"কমরেডরা টালার পাম্পিং স্টেশন চালু ক'রে দিয়েছেন। তুমি ভেতর থেকে ভাল ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে স্নান ক'রে নাও। এ যাবৎকাল কলকাতার দু'তলায় জল উঠত না, আজ থেকে তিন তলা পর্যন্ত উঠছে। জামাকাপড় কি সবই লুঠ ক'রে নিয়ে গেছে?"

"আমাকে লুঠ করার পর ওরা হয়তো আর কিছু নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে নি।"

"তাহলে তো শম্ভু মাইতিকে এপিকের 'হিরো' ব'লে অভিহিত করা যায়। আমার মনে হচ্ছে, সেই জন্যেই রেড গার্ডরা শম্ভু মাইতিকে মেরে ফেলেছে। 'হিরোইজম' আমরা সহ্য করি না।"

আমি বেরিয়ে আসছিলাম। হঠাৎ মনে হ'ল রুক্মিণীর হয়তো ক'দিন থেকে খাওয়া হয় নি। জিজ্ঞাসা করলুম, "ঘরে কিছু খাবার আছে কি?"

"বোধহয় নেই।"

"তাহলে তুমি স্নান ক'রে নাও। রেড গার্ডরা তোমার জন্যে ইতিমধ্যে কিছু খাবার সংগ্রহ ক'রে আনবে। উপযুক্ত পরিমাণ প্রোটিন পেটে গেলেই প্রিয়জনদের বিচ্ছেদ-ব্যথা দুর্বিসহ মনে হবে না।"

"আপনি আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না।"

"না, ব্যস্ত হওয়ার সময় আমার নেই। আমি বলছিলাম যে, প্রোটিনের অভাবটাই বড় দুঃখ, বাপমায়ের অভাবটা সময়ের মলমে কালক্রমে পূরণ হয়ে যায়। দু'জন রেড গার্ড রইল, তোমার হুকুম তামিল করবার জন্যে।"

দু'পা এগিয়ে এসে রুক্মিণী জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি রাত্রে আর ফিরে আসবেন না?"

"দু'ঘণ্টা পরেই তো ভোর হয়ে আসবে। গোয়াবাগান হ'য়ে একবার বেলুড় যাব। ঠাকুরদা মারা গেছেন, বাবা হয়তো খবর পান নি। আসব, কাল সকালেই কুইন্‌স্‌ পার্কে ফিরে আসব রুক্মিণী।"

গোয়াবাগানে ফিরে এলুম। ফটকের সামনে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দু'দিকের স্তম্ভের ওপরে সিমেণ্টের তৈরী দুটো বাঘের মুখ হাঁ ক'রে থাকত। মুখের মধ্যে দু'টো বাল্‌ব লাগানো ছিল। বাচ্চা সিং সন্ধ্যের সময় বাতি জ্বালিয়ে বসে থাকত ফটকের সামনে। গতকাল ঠাকুরদার মৃত্যুর পরে বাচ্চা সিং গোয়াবাগান ত্যাগ করেছে। ত্যাগ করেছে নিশ্চয়ই, নইলে বাঘের মুখে আলো জ্বালান থাকত।

ভিতরে কোন মানুষের সাড়া শব্দ পেলুম না। হয়তো কাজের ভিড়ে ছোট কাকা এখনও এসে বাড়িটায় দখল নিতে পারেন নি। ওনার একলার পক্ষে এ-বাড়ি সত্যিই বড়।

ঠাকুরদার ঘরে গিয়ে দেখলুম শবদেহ নেই। আর্ট-গেলারির ছবিগুলো ছোটকাকাই ছিঁড়ে ফেলেছেন। ছবির টুকরোগুলো চারদিকে ছড়ান রয়েছে। পূর্বপুরুষদের বুকের ওপর পা না দিয়ে 'আর্ট-গেলারি'তে ঢোকা যায় না। কিন্তু সেখানেও তাঁর শবদেহ দেখলুম না। তবে কি ছোটকাকা নিজেই ঠাকুরদার মুখাগ্নি করেছেন? কিন্তু শ্মশান পর্যন্ত মড়া ব'য়ে নিয়ে যাওয়ার মত সময় তো ছোটকাকার ছিল না। ভাবলুম, এবারেল ঠাকুরদাকে তিনি হয়তো রাস্তায় ফেলে দিয়ে গেছেন। রেড গার্ডরা করপোরেশনের লরী ভর্তি ক'রে অসংখ্য শবদেহের সঙ্গে ঠাকুরদাকেও হয়তো ধাপার মাঠে নিয়ে পুঁতে ফেলেছে।

সংকারের শুচিতা রক্ষা করার সময় এ নয়। কি মনে ক'রে ঢুকে পড়লুম হুকুর ঘরে। প্রায় পঁয়ত্রিশটা বছর হুকু এই ঘরে কাটিয়েছে! খাটের ওপর বিছানা পাতাই ছিল। বালিশটা হাত দিয়ে সরিয়ে দিতেই দেখলুম, একটা পিস্তল রয়েছে সেখানে। এই পিস্তলটাই সে বিনয়প্রকাশের কাছ থেকে উপহার পেয়েছিল। গোয়াবাগানের বিপরীত আবহাওয়ার মধ্যে হুকুর আত্মরক্ষার অস্ত্র। কিন্তু এখানকার এই বিরাট বিস্তৃতির মধ্যে একটা চারাগাছও তো হুকুর সঙ্গে শত্রুতা করেনি, তবে সে কার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করছিল? শয্যাশ্রিত ঠাকুরদার পঙ্গুতা হুকুকে আঘাত দিতে পারত না, বড়কাকার নিষ্কামতার কুরুক্ষেত্রে হুকুকে তিনি কোনদিনই প্রতিপক্ষ মনে করেন নি। তবে কেন হুকুর এই আত্মরক্ষার আয়োজন? বুর্জোয়ারা মার্কসবাদকে আঘাত দিতে পারে ব'লেই, মার্কসিস্টরা নিত্য সতর্কতা অবলম্বন করে। করতেই হয়, নইলে মার্কসিস্টরা বাঁচলেও মার্কসবাদ বাঁচে না। কিন্তু বড়কাকা? তিনি বাঁচলেন না কেন? ছোটকাকার গুলিবর্ষণ তো পূর্বপরিকল্পিত নয়, এ্যাকসিডেন্টাল। আসলে বড়কাকা নিজেই বাঁচতে চান নি। হঠাৎ যেন মনে হ'ল, গোয়াবাগানের ভবশংকর চৌধুরী মানব ইতিহাসের এক চেনা চরিত্র। কৃষ্টিচ্যুত সমাজ ও রাষ্ট্রের অঙ্গে যখন সংখ্যাগুরুর

দল ভগ্নসভ্যতার ছিন্ন কন্থা পরিয়ে দিয়ে ভোটের জোরে প্রমাণ করতে চায় যে, এইটেই দেহসজ্জার নতুন বস্ত্র, তখন ভবশংকর চৌধুরীর সংখ্যালঘু শূন্য হলেও সমাজ-জীবনের চেতনাবোধ থেকে লুপ্ত হয়ে যায়। অক্ষর আস্তীর্ণ হতভাগ্য ইতিহাস নিরক্ষরের হাতে কতিপয় থান ইট ছাড়া আর কিছুই নয়। বড়কাকাকে আমরা তাড়াই নি, তিনি নিজেই সরে যেতে চেয়েছিলেন। তাই তো আজ মুষ্টিমেয়র বিপ্লববিক্ষুব্ধ সাংস্কৃতিক চেতনা সংখ্যাগুরুর নিরক্ষরতা ঘোচাবার ঐতিহাসিক দায়িত্ব নিয়ে ভারতের দরজায় সমুপস্থিত। ভবশংকর চৌধুরীর সংখ্যালঘুত্বের শূন্যতা পূরণ করবার আমরাই যোগ্য ওয়ারিশ। প্রকৃতি নিজেই তো শূন্যতার সাময়িকতা ঘুচিয়ে দেয়।

ঝুকুর ঘরের সামনের বারান্দা থেকে পূবের আকাশ অনেকটা দেখা যায়। ভোর হয়ে আসছে। হয়তো আর আধ ঘন্টার মধ্যে ভারতবর্ষের অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। আলোর সত্যই জগতের প্রথম ও শেষ সত্য। ঝুকুর কাছেই আমি সত্যের দীক্ষা নিয়েছিলাম এই গোয়াবাগানের বাড়িতে। কিন্তু আজ আর ঝুকু নেই। নেই কেন? পূব আকাশের আলোর প্রথম ইঙ্গিত দু' জনেরই তো একসঙ্গে দেখবার কথা ছিল, তবে সে কেন বড়কাকার পথানুসরণ করল? পালিয়ে গেল কেন? আলোর প্রতি কি ঝুকুর অবিশ্বাস জন্মেছে? ডাইভারসানিস্ট? পিপলস্ কোর্টে আমরা তা একদিন বিচার ক'রে দেখবই। ঝুকুকে পালিয়ে থাকতে আমি দেব না। ঝুকু পালিয়ে থাকলে হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই সে আমাকেও একদিন পালিয়ে যেতে প্রলুব্ধ করবে।

বেলুড় আশ্রমে বাবা নেই। এমন কি বাবাজীদেরও দেখতে পেলুম না। রেড গার্ডরা আমায় জানালো "একজনকেও গঙ্গায় ডুবতে দিই নি।" জিজ্ঞাসা করলুম, "ওঁরা সব কোথায়?"

"কালীমন্দিরে আটকে রেখেছি। বাইরে থেকে তালা বন্ধ।"

বললুম, "ভালই করেছ। কমরেড, কালীর পায়ে লুটিয়ে পড়বার এই তাঁদের প্রথম সুযোগ। আর সুযোগ দিলুম আমরাই, যারা কাদা-মাটির কেলেঙ্কারিতে বিশ্বাস করি না।"

জিপ গাড়িতে হেলান দিয়ে এবার চললুম নিমতলার দিকে। বাবা যদি কোনক্রমে ঠাকুরদার খবর পেয়ে থাকেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই তাঁর সৎকারের ব্যবস্থা করেছেন। বুর্জোয়ারা আমাদের যতই গালাগালি দিক, শকুনের মুখে মৃতদেহ আমরা তুলে দেব না।

নিমতলার আগুন বাগবাজারের দু' নম্বর ফটক থেকেই দেখা গেল। রেড গার্ডরা রাইফেলের নলগুলো বাইরের দিকে উঁচু ক'রে ধরল। কেবল লালবাজারের আদমিরাই রাইফেল ছুঁড়তে জানে তেমন বিশ্বাস আর জনসাধারণের নেই। তাই বললুম, "ওটা শ্মশানের আগুন, ভয়ের কোন কারণ নেই কমরেড।"

শ্মশানের সবগুলো চিতা একসঙ্গে জ্বলছে। রাস্তা এবং আশপাশের সব ফাঁকা জায়গায় অসংখ্য শবদেহ স্তূপীকৃত হয়ে আছে। গাড়ি থেকে নেমে আমি ভিতরে গেলুম। বাবাকে দেখতে পেলুম না। ভোর হয়ে আসছে, সকাল হ'লে আর বোধহয় আমার পারিবারিক সম্পর্ক খুঁজে বার করবার সময় থাকবে না। নতুন সভ্যতার বীজ আমরা সারা ভারতবর্ষে বপন করেছি, এবার সেই বীজ থেকে গাছ তৈরির গুরুদায়িত্ব আমাদের বহন করতে হবে। ক্ষিপ্রতম সময়ে বৃহত্তম গাছ তৈরির বৈজ্ঞানিক কৌশল আমরাই জানি। ভারতবর্ষের পুরনো মাটিতে আমরা সংস্কার আনব না, পুরনো মাটি সব ফেলে দিয়ে নতুন মাটি আমদানি করব।

শ্মশানের উত্তরদিকে একটু দূরে দেখলুম বাবা বসে আছেন। গলায় নতুন পৈতে, পরনে শুক্লবাস। পা ঝুলিয়ে দিয়েছেন গঙ্গার দিকে, ডান হাতটা মাটিতে রেখে সমস্ত দেহটাকে একটু হেলিয়ে দিয়েছেন। তিনি চিন্তামগ্ন। পাঁচ হাত দূরে বসে আছে বাচ্চা সিং। আমাকে দেখে বাচ্চা সিং গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল। আমি ধরে ফেললুম। বললুম, "কাঠমুণ্ডুর ঠিকানা ওদিকে নয়। সাঁতার জানলা, কোথায় যাচ্ছিলে?"

আমি বাবার পাশে গিয়েই বসে পড়লাম। ডানদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে বা বাঁ দিকে চেয়ে রইলেন। নিমতলার দেয়ালে মস্তবড় পোস্টার লাগান আছে। চিতার আগুনে পোস্টারের ছবি ও লেখাগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

বললুম, "ওদিকে তো আমিই আছি। রক্তমাংসের দীপককে যদি দেখতে না চাও, পোস্টারের কমরেড চৌধুরীকে তোমায় দেখতেই হবে বাবা। ছত্রিশ কোটি পোস্টার ছাপান হয়েছে ছত্রিশ কোটি লোকের জন্যে।"

এবার বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে কি মনে ক'রে? মরা মানুষেরা তো পোস্টার দেখবে না। পোস্টারের সত্য সকাল সন্ধ্যায় বদলায়।"

"কেবল পোস্টারের নয় বাবা, জীবনের কোন সত্যই চিরস্থায়ী নয়। আসলে চিরস্থায়িত্বের স্থায়িত্বই তর্কসাপেক্ষ। চিতার মধ্যে যে সত্য আবিষ্কারের ভাবপ্রবণতা নিয়ে তুমি বসে আছ, তাও পুড়তে মাত্র তিন ঘণ্টা সময় আর সাত মণ কাঠ লেগেছে! বিজ্ঞানের ওপর আস্থা থাকলে, গ্যাস্‌-চেম্বারে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় নিত না।"

"বিজ্ঞানের ওপর আস্থা আমার আছে। আস্থা আছে ব'লেই তো আমার বিশ্বাস, মার্কসবাদের স্থায়িত্বও তর্কসাপেক্ষ। গ্যাস্‌-চেম্বারের বিজ্ঞান অতি ভয়ংকর জিনিস—জ্যান্ত এবং মরা মানুষকে যেমন পোড়ায়, মার্কসবাদকেও তেমনি পোড়াতে পারে। ভাখ্‌ দীপু, মার্কসের ডায়লেকটিক্যাল জড়বাদ সুরু হবার আগে হাজার হাজার বছরের ইতিহাস রয়েছে। মানবজাতির ইতিহাস। সেই ইতিহাসকে বাদ দিলে, জীবনের শুদ্ধ সত্যকে বোঝা যায় না। তা ছাড়া মার্কসবাদের আংশিক সত্য জীবনের সমগ্র সত্য নয়, কিংবা মৌলিক সত্যও নয়।"

"তুমি এ সব কথা কোন্‌ বইতে পড়েছ বাবা? বইগুলো সব কোথায়? ধাপার মাঠে আমরা একটা প্রকাণ্ড বড় চিতা তৈরি করছি। জৈমিনি থেকে শুরু ক'রে যাযাবর পর্যন্ত কেউ বাদ যাবে না।"

বাবা কম্বলের আসনটা হাতে নিয়ে চট ক'রে দাঁড়িয়ে উঠলেন। জিজ্ঞাসা করলুম, "কোথায় যাচ্ছ?"

বাবা বললেন, "বেলুড়।"

"কিন্তু সেখানে তো বাবাজীরা কেউ নেই।"

"নেই? তবে—"বাবা ভাবতে লাগলেন।

বললুম, "ডলার দিয়ে তৈরী প্রকাণ্ড বাড়িটা কেবল প'ড়ে আছে। আমরা

সেখানে জনসাধারণের জন্তে শিশু-রক্ষাগার করেছি। তোমার বোধহয় মনঃপূত হ'ল না বাবা ?"

"আমি জনসাধারণ কিংবা কমিশার নই। আমার মতামতের ওপর কিছুই তো নির্ভর করছে না।"

"না, তা অবশ্যই করছে না। তবু, তোমার অনুযোগ করবারও কিছু নেই। বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার পর, আমার মনে হয় বেলুড়ে পরমপুরুষ ফিরে এসেছেন। বাচ্চাদের নিয়ে তিনি খেলা করছেন। তুমি এত তাড়াতাড়ি হাঁটছ কেন বাবা ? কুইনস পার্কেই চল। বন্ধকী টাকা আর শোধ দিতে হবে না, মারওয়াড়িটা পালিয়েছে।"

বাবা বাগবাজারের দিকে দ্রুত পা চালিয়ে হাঁটতে লাগলেন। আমি নিরুপায় হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কোথায় যাচ্ছ ? আমাদের নতুন টাকা চালু হয়েছে, কিছু টাকা নিয়ে যাও। নইলে দাদুর শ্রাদ্ধশান্তি কি ক'রে হবে ?"

বাবা একটু দাঁড়ালেন। আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "দরকার হ'লে চেয়ে নিয়ে আসব। তুই কোথায় আছিস ?"

সহসা জবাব দিতে পারলুম না। গত এক বছর থেকে আমি কোথাও নেই। অনেক ভেবেচিন্তে বললুম, "গত সাতদিন থেকে জিপ গাড়ীতেই আছি। আমি আছি, এইটেই আমার কাছে সবচেয়ে বড় বিস্ময় বাবা !"

"তাহলে আমি তোকে খুঁজে নেব দীপু।" চ'লে যাবার জন্তে বাবা ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন।

পেছনে চিতার আগুন, সামনে বাবার চোখে ঘৃণার আগুন, আর মাঝখানে আমি। একা আমি। সহসা যেন মনে হ'ল বাবা মিথ্যে কথা বললেন। আমায় তিনি কোনদিনও খুঁজবেন না। আমি অস্পৃশ্য, আমি পরিত্যক্ত। ছত্রিশ কোটি পোস্টারের নেতা আমি। সবাই আমায় চিনবে, কিন্তু কেউ খুঁজবে না। মা, বাবা এবং বোনেরা যদি আমায় না খুঁজল, তবে ছত্রিশ কোটির চেনাটাও তো না-চেনার সামিল ! তবে কি পোস্টারের সত্যের মধ্যেও আংশিক সত্য আছে ?

বাবা হাঁটতে লাগলেন অতি দ্রুত গতিতে। আমি অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে তাই দেখতে লাগলাম। ইচ্ছে হচ্ছিল, তাঁর পথ রুখে দাঁড়াই। আমরা মানব ইতিহাসের গতি রুখে দিয়েছি। অথচ বাবার গতি রুখতে পারলুম না! সাধ ছিল, কিন্তু সাধ্য ছিল না। সাধ্য কি কেবল বলপ্রয়োগের মধ্যে সীমাবদ্ধ? ভালবাসার সাধ্য দিয়ে বাবাকে ধরে রাখতে পারলুম না কেন? মার্কসবাদের মধ্যে কি কেবল বলপ্রয়োগের সাধ্যই আছে? তবে মানবজাতির ইতিহাস-স্রোতস্বিনীর গতি আমরা রুখে দিলুম কি ক'রে? দিলুম ডায়লেকটিকের সত্য দিয়ে। ডায়লেকটিক মানেই গতি। গতি আসছে কেমন ক'রে? আসছে সব কিছুর উল্টো রূপান্তর থেকে। বস্তু এবং মনের মধ্যেও এই গতির সত্য অব্যাহত আছে। বৈজ্ঞানিক বলপ্রয়োগের মধ্যে প্রকৃতির সাবলীলতা যদি লুপ্ত না হ'ল, তবে ডায়লেকটিক্যাল জড়বাদ আমারই মত একদিন পরিত্যক্ত হবে অস্পৃশ্যতার অবহেলায়। কিন্তু সংখ্যালঘুর অস্পৃশ্যতা আমরা মানব কেন? আমরা আজ দলে ভারী। আমরাই আজ সংখ্যাগুরু। সংখ্যাগুরুর সাধ্য দিয়ে স্রোতস্বিনীর গতি আমরা রুখবই। কিন্তু মানবমনের স্বাধীন স্রোতও যদি আমরা বেঁধে দিই, তবে কি আমরাও একদিন জড়বাদের চৌবাচ্চায় মাথা ঠুকে মরব না?

মনে হ'ল কালো পোষাক প'রে অনীতা এসে সামনে দাঁড়িয়েছে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো পোষাক দিয়ে ও আবৃত। মুখে ওর মৃদু হাসি।

চিতার আগুনে মুখের সাদা রং লাল হয়ে উঠেছে। মানুষের পূর্ণতায় ও ধর্মের পূর্ণতায় অনীতা যেন সমগ্র ও শুদ্ধ সত্যের প্রতীকের মত আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আংশিক সত্যের অনিশ্চয়তা অনীতার মধ্যে খুঁজে পেলুম না। তবে কি আমি ভুল দেখেছি? কি জানি, হয়তো দেখার নিশ্চয়তার মধ্যেই সত্যের নিশ্চয়তা লুকিয়ে আছে।

রেড গার্ডরা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। চোখ রগড়ে দেখলুম, অনীতা নেই। এমন কি বাবাও নেই। আছে প্রভাতের আকাশ—শুভ্র, শান্ত এবং সীমাহীন। পরিচ্ছন্ন শ্লেটে আমাদের এবার নির্মাণের কাজ সুরু হোক। বন্ধুগণ, কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের প্রথম প্রতিশ্রুতি—গুড মর্ণিং। এ-প্রভাত কোনদিনই যেন অন্ধকারে মিলিয়ে না যায়।

সাময়িকভাবে দিল্লী থেকে কলকাতায় রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছে। গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেল আমাদের কেন্দ্রীয় অফিস। কেবল অফিস নয়, ভারত-তুরঙ্গের রাজনৈতিক বল্গা আমরা এখান থেকেই টানছি। আমি সেই যে নিমতলা থেকে গ্রেট ইস্টার্ণে এসেছি, তারপর সাতদিন হয়ে গেছে, এক ঘণ্টার জন্যেও বাইরে বেরুতে পারি নি। ক্রমাগত মিটিং চলেছে। কমরেড রাওকে দেখে আর চেনা যাচ্ছে না। মুখে দাড়ি গজিয়েছে এক ইঞ্চি লম্বা। চোখ দু'টো ব'সে গেছে আধ ইঞ্চি ভেতরে। বিপ্লবের চাপে তাঁর যা ভাঙবার তা ভেঙেছে, যা গজাবার তা গজিয়েছে—কেবল টাকের বিস্তৃতি কিংবা সংকোচন হয় নি। মিটিং করতে ব'সে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের নতুন ক'রে যেন পরিচয় হ'ল। ঘরে ঢুকেই আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনি তো কমরেড রাও?" তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "আশা করি, আপনি কমরেড চৌধুরী?"

কমরেড গোস্বামী এগিয়ে এলেন হাসতে হাসতে, বললেন," কমরেড চিয়েন আর কমরেড চুয়েন এসেছেন দাড়ি কামাবার বাক্স নিয়ে। ক্ষুর না চালালে, কেউ কাউকে চিনতে পারবেন না। উনিশ-শ' সাতচল্লিশ সালে পনরই আগষ্ট যাঁরা মাউন্টব্যাটেনের হাত থেকে 'স্বাধীন ভারতবর্ষ' উপহার আনতে গিয়েছিলেন, তাঁদের মুখে এবং কাপড়ে কোন দাগ ছিল না বটে, কিন্তু তাঁদের হাতের ময়লা আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। আমাদের অবস্থা বিপরীত।"

আলোচনা গড়িয়ে চলল সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত। সন্ধ্যে থেকে আবার সুরু হয়ে শেষ হ'ল ভোর রাত্রে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত গ্রেট ইস্টার্ণের কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে যাওয়া আসা ছাড়া আর কিছুই করতে হ'ল না। কমরেড জগৎ শেঠ দিল্লীর পুরনো রাষ্ট্রপতি ভবনে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করছেন।

দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ আর ক্যাথলিক বুর্জোয়াদের চক্রান্তে প'ড়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটা অংশ কোন কোন জায়গায় এখনও পিপলস্ আর্মির সঙ্গে যুদ্ধ করছে। ব্রিগেডিয়ার সিং সে-অঞ্চলে নিজেই সৈন্য পরিচালনা করছেন। মাদ্রাজ শহর আমাদের দখলে আসতে অবশ্য দু'দিনের বেশী সময় লাগে নি।

রাজা উজীরেরা সব পালিয়েছেন বিপ্লবের সুরুতেই। উড়োজাহাজ ভর্তি

ক'রে তাঁরা বহু কোটি টাকার সোনাদানা নিয়েই পালিয়েছেন। বোম্বাই অঞ্চলের মারোয়াড়ী ও ভাটিয়ারা যত পেরেছে তারাও মণিমুক্তা, হীরে-জহরত নিয়ে সরে পড়েছে মার্কিণ মুলুকে। ভারতবর্ষের মন্দির লুঠ করতে এবার আর গজনীর মাহ্মুদ আসে নি। ভারতের মন্দির সব শূন্য। আমরাও জানতুম ধর্মের শোষণ না থাকলে, সোনারূপোও থাকবে না। সোমনাথ আর মীনাক্ষী মন্দিরে একটা লোকও মাথা কুটে মরে নি।

বাবা বিশ্বনাথের দেয়ালে আমরা ডবল-ক্রাউন সাইজের একটা মাত্র বিজ্ঞপ্তি লাগিয়েছিলুম। তাতে লেখা ছিল, "মন্দিরে প্রবেশ করিলে ফৌজদারী আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে।" বিজ্ঞপ্তি দর্শনের পর একজন স্ত্রীলোক পর্যন্ত বিশ্বনাথ দর্শনের জন্যে মন্দিরের এক মাইল পরিধির মধ্যে পদার্পণ করে নি। দরিদ্র বাঙালীর ঘর থেকে ইংরেজ আর ভারতীয় বণিকেরা প্রায় দু'শ বছর ধরে দু'হাত দিয়ে সব সোনাই বার ক'রে নিয়েছে। অতএব কালীঘাটের মা-কালীর কালো অঙ্গে বাঙালী বাবুরা সোনার অলংকার যা পরিয়েছে তার ওজন করার মজুরি পোষাবে না ব'লে এই বণিক সম্প্রদায় ঘেন্নায় সেদিকে চোখ দেয় নি। তিনখানা পোস্টার লাগাবার পর, সেদিকটাও ফাঁকা। কেউ আসে নি ধর্মকে ধরে রাখবার জন্যে—প্রাণ দেয় নি কোন একজনও পেন্সনভোগী বাঙালী বুড়ো।

আজ রাত দু'টোর পরে মিটিং ভাঙল। আমার দেহরক্ষী কমরেড ঘোষ আর কমরেড লতিফ দরজায় দাঁড়িয়েছিল। এস্প্লানেডের মোড় থেকে সুরু ক'রে ক্লাইভ স্ট্রীট আর ক্যানিং স্ট্রীটের সীমানা পর্যন্ত প্রতি দু' হাত দূরে দূরে রেড গার্ডরা রাইফেল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পুরোটাই নিষিদ্ধ এলাকা। বিনয়প্রকাশের সই করা পাস না নিয়ে কেউ এদিকে এক পাও রাস্তা হাঁটতে পারে না।

দেহরক্ষীদের মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, তারাও পরিশ্রান্ত। গত সাতদিনে তারা সাত ঘণ্টাও ঘুমতে পারে নি। নিজের রাষ্ট্রের প্রতি এদের দায়িত্ববোধ প্রশংসার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এরা কেবল আমার দেহই রক্ষা করছে না—রাষ্ট্রগঠনে সহযোগিতা করছে। রাস্তার প্রতিটি মানুষ চঞ্চল হয়ে উঠেছে, কেমন ক'রে এবং কত তাড়াতাড়ি ওরা গঠনের কাজে সহায়তা করতে পারে। ওরা

হাত বাড়িয়ে রয়েছে গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের দিকে। মাউন্টব্যাটেনের 'মহাদান'-এর পরেও এরাই হাত বাড়িয়েছিল—সহযোগিতার হাত। কিন্তু রাজনীতির বড় জমিদারেরা ছোটলোকদের নোংরা হাত গ্রহণ করে নি।

গ্রেট ইস্টার্ণের করিডোর দিয়ে হাঁটতে লাগলুম। দু'ধারে সারি সারি ঘর। প্রতি ঘরের দরজায় একজন ক'রে প্রহরী। আমি আজও জানি না কোথায় আমার ঘর, কোথায় আমার ঠিকানা। দেহরক্ষীরা হঠাৎ থেমে গেল। কমরেড লতিফ বলল, "এই ঘরেই আপনি বিশ্রাম করুন।" দরজা খুলে দিল ওরাই, আমি কেবল পা চালিয়ে ঢুকে পড়লুম। সামনেই বিছানা পাতা ছিল। আমি গড়িয়ে পড়লুম বিছানায়। কার বিছানা জানি না, কে পেতে রেখেছে তাও আমার জানবার বিষয় নয়। কেবল শুয়ে পড়াটাই আমার নিজের। চিমটি কেটে দেখলুম গায়ে আমার ব্যথা লাগে কিনা, দেখলুম লাগে। তাহলে দেহটা নিশ্চয়ই আমার। কমরেড ঘোষ স্নানের ঘর এবং খাটের নীচেটা পর্যবেক্ষণ করল। বুর্জোয়া শত্রুদের বিশ্বাস নেই। ওরা মারীচকে সোনার হরিণ সাজাবার ভেলকি জানে। ওদের ভগবান ভেলকিবাজ। কমরেড লতিফ বলল, "আমরা যাচ্ছি। ঘরের আলোটা জ্বালানই থাক। কাল সকাল আটটায় রেড স্কোয়ারে আপনার প্রথম কাজ। সাড়ে পাঁচ মিনিট বক্তৃতা দিতে হবে।" ওরা বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে গেল।

স্বাধীনতা গড়েরমাঠের মত অনিয়ন্ত্রিত উন্মুক্ত ময়দান নয়। স্বাধীনতা হচ্ছে গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের বাড়িটার মত। অসংখ্য খুপরি, প্রত্যেক খুপরির বাইরে নম্বরের টিকিট লাগান আছে। এক খুপরি থেকে অপর খুপরির মাঝখানে দেয়াল। কেবল তাই নয়, স্বাধীনতা-খুপরির বাইরে তালা দেওয়া থাকে। প্রয়োজনের মুহূর্তে তালা খোলা হবে, প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তালা আবার বন্ধ হয়ে যাবে।

উত্তর দিকের জানালাটা খোলা ছিল। জানালার ঠিক পাশেই ড্রেসিং টেবিল। ওদিকটায় চাইতে গিয়েই নিজের চেহারাটা আয়নায় ভেসে উঠল। হঠাৎ আতঙ্কে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। সহসা যেন মনে হ'ল আমি ছাড়াও ঘরে দ্বিতীয় ব্যক্তি একজন আছে—সন্দেহজনক ব্যক্তি! গুপ্তঘাতকের

জিঘাংসাপ্রবণ চোখের মত তার চোখ দু'টো জ্বলছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ির গোড়ায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। শীতের রাত্রে গুপ্তঘাতকের দাড়ির গোড়ায় ছাড়া অন্য কোথাও ঘাম জমে না। শিকার ধরবার পূর্বমুহূর্তের নিষ্ঠুর একাগ্রতা যেন আয়নার গায়ে প্রতিফলিত হ'ল। উঠে পড়লুম বিছানা থেকে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হ'ল দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ নয়, আমি—সেই আমি।

আমি এসে পুনরায় বিছানায় শুয়ে পড়লুম। ঘুম কিছুতেই আসছে না। দেয়ালের ঘড়িতে চারটে বাজল। গত বিশ বছরে কত বারই তো চারটে বেজেছে, কিন্তু মনে মনে হিসেব ক'রে দেখলুম, আমি বোধ হয় বিশ বছর ধরে জেগেই আছি। মানুষকে যে ঘুমতেই হবে, তেমন সত্য বিজ্ঞান আজ আর স্বীকার করে না। খাটের তলা থেকে হঠাৎ একটা শব্দ কানে এল। বিছানায় শুয়ে নীচের দিকে মুখ বাড়াতেই দেখি একটা পায়রা। ডানা দিয়ে শব্দ করছে। আমি ধমকানি দিতেই, পায়রাটা জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল। কে জানে হয়তো 'পিকাসোর পায়রাটা' রেড গার্ডদের মাথার ওপর দিয়ে ওয়াটারলু স্ট্রীট অতিক্রম করল। পেছনে পড়ে রইল কেবল গ্রেট ইস্টার্নের অসংখ্য খুপরি।

বাইরে থেকে ঘরে প্রবেশ করল সিমেনস।

জিজ্ঞাসা করলুম, "ঘরটা খুঁজে পেলে কি ক'রে?"

"চার্ট দেখে।" চেয়ারটা বিছানার কাছে টেনে নিয়ে এসে সিমেনস্ পুনরায় বলল, "মানুষের বুর্জোয়া মনোবৃত্তি যখন একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন দেখবে, মানুষ কেবল চার্টের মধ্যেই বেঁচে আছে। মানুষ যখন অমর নয়, তখন ওরা ঠিকানার স্থায়িত্ব নিয়ে অতো গর্ব করে কেন চৌধুরী?"

"বোধহয় মানুষ মুহূর্তে মুহূর্তে ঠিকানা বদলাতে চায় না সিমেনস। কিংবা গৃহরচনার পূর্ণতম প্রয়াসের মধ্যে মানুষ তার জাগতিক পূর্ণতার স্বপ্ন দেখছে। খাস সম্পত্তি যদি মানুষের করায়ত্তে না থাকত, তবে বুর্জোয়াদের স্থাপত্য-শিল্পের জন্ম হ'ত না। দখলী স্বত্বের ভোগোন্মাদনা থেকে ওদের ভূগোল এল অবৈজ্ঞানিক অর্থ নিয়ে। সীমানা টানা হ'ল যার যার লালসার স্কেল দিয়ে। জোর যার

মুল্লুক তার। যে যত বড় গুণ্ডা সে ততো বড় শাসক। নির্দিষ্ট সীমানার আবাদী জমির ফসলে পেট ভরল না, লালসার অস্ত্র নিয়ে তারাই এল রাজ্য জয় করতে। মানচিত্রের অদলবদল হতে লাগল। তারপর একদিন হঠাৎ গুণ্ডাগুলো হয়ে বসল রাজা। রাজতন্ত্রের পেছনে এল ধর্মের সমর্থন। মানুষের জীবনে উৎপাতের শেষ নেই! পৃথিবীটাকে ভেঙে ভেঙে ওরাই করল মহাদেশ। সিমেনস, আমার মনে হয়, আমরাই পারব মহাদেশের ব্যবধান ঘোচাতে। এক রাষ্ট্র, এক স্বার্থ, এক কৃষ্টি, এক সভ্যতা। কমিউনিষ্ট বিশ্বরাষ্ট্রে মানুষকে আমরা স্থায়ী ঠিকানার অধিকার দেব না, খাস সম্পত্তির গোড়া মারব, ধর্মের মাটিতে ডায়লেকটিক্যাল জড়বাদের ট্রাক্টার চালাব। পরিবার-কেন্দ্রীক জীবন থেকে ঠিকানার স্থায়িত্ব কেড়ে নিতে পারলে, ভগবানের আর্তনাদ কেউ শুনতে পাবে না। আমরা কেবল চার্টের মধ্যেই বেঁচে থাকব না, আমাদের জীবন একটা বিশ ইঞ্চি মাপের সুটকেসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। ক'খানা কাপড়-চোপড়, একটা পরিচয়পত্র ও কয়েকটা ড্রাগ থাকলেই হ'ল। মনিব্যাগটা অবশ্য কোটের পকেটেই থাকবে। সিমেনস, কাল রেড স্কোয়ারে আমি বক্তৃতা দেব সাড়ে পাঁচ মিনিট। তোমার কাছে বক্তৃতাটা ঝালিয়ে নিতে মাত্র দু' মিনিট লাগল।"

একটা সিগারেট ধরিয়ে সিমেনস জিজ্ঞাসা করল, "ড্রাগগুলো কি কাজে লাগবে চৌধুরী?" প্রশ্ন করার পরেই সিমেনস নিজের পকেট থেকে দু'টো ট্যাবলেট বার ক'রে চিবিয়ে চিবিয়ে গুঁড়ো করতে লাগল।

আমি বললুম, "মানুষের হাতে সময় এত কম যে, তার শরীর ও মন খারাপ ক'রে ব'সে থাকলে চলবে না। সুটকেসে ড্রাগস রয়েছে, ইনজেকসেন নিয়ে নিলেই শরীর ও মনের ব্যাধি দূর হয়ে যাবে। মানুষের পুরো অস্তিত্বটাই ড্রাগস-এর দ্বারা বশীভূত ও নিয়ন্ত্রিত হবে।"

চোখদুটো বিস্ফারিত ক'রে সিমেনস জিজ্ঞাসা করল, "স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা, ধৈর্য এবং আরও যে-সব মনের উপাদান রয়েছে, তাদের কি ব্যবস্থা করবে চৌধুরী?"

"এই সব উপাদানগুলোও তো ব্যাধি। প্রয়োজনের মুহূর্তে ইন্জেকসন

নিলেই দেখবে প্রেম, প্রণয়, ভালবাসা ইত্যাদির জন্ম হ[illegible]বার মৃত্যুও হচ্ছে।"

"তাহলে প্রতিটি মানুষের স্যুটকেসে একটা ক'রে সিরিঞ্জও রাখতে হবে।" সিমেনস মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

আমি বললুম, "তোমার হাসবার কারণ অবশ্য আমি জানি না সিমেনস। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান সংশয়বাদীদের ঠোঁট থেকে সবটুকু হাসিই কেড়ে নিয়েছে। কেবল একটা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে এ যুগের বৈজ্ঞানিকেরা যা দেখলেন, বিগত পাঁচ হাজার বছরে দর্শন ও ভগবৎ শাস্ত্রের পাণ্ডারা তা দেখতে পান নি।"

"কে কতটা দেখল এবং দেখার কতটুকু অংশ সত্যি দেখা, তার বিচার বিশ্লেষণের সময় এখনও বোধ হয় আসে নি। কিংবা আধুনিক সত্যানুসন্ধানীরা প্রত্যেকেই হয়তো আংশিক সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। গোল বেধেছে কেবল অংশকে পুরো সত্যের রূপ দিতে গিয়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কসের ঐতিহাসিক জড়বাদকেও দেখান যেতে পারে।"

"সিমেনস!" আমার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। আয়নার দিকে চেয়ে দেখি, গুপ্তঘাতকের চোখ দু'টো ব্যর্থ আক্রোশে যেন ফেটে পড়তে চাইছে! মুহূর্ত পরেই আমি চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলুম, "এ সব কি বলছ সিমেনস? সবাই যদি সত্যের অংশ নিয়ে খেলা ক'রে গেল, তবে পুরো সত্যটা কি? সবগুলো অংশকে জোড়া লাগালে কি পুরোটাকে পাওয়া যাবে না?"

"বোধ হয় পাওয়া যাবে না।"

"কেন?"

"গোটা মানবজাতির ইতিহাসকে বাদ দিয়ে আমরা যেদিন বিজ্ঞানের টেস্ট টিউবের মধ্যে সত্যের নিরীক্ষা-পরীক্ষা সুরু করলাম, সেদিন থেকেই প[illegible] আমাদের ভুল হ'ল। কনফিউশন, টোটাল কনফিউশন! বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা অস্বীকার করলে কনফিউশন অনিবার্য।" ওয়াটারলু স্ট্রীটে রেড গার্ডদের জুতো[illegible] আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আমি যেন কিছুই ভাবতে পারছিলুম না, কেবল কা[illegible] পেতে রইলাম আওয়াজ শোনবার জন্যে। আওয়াজের মধ্যে পাহারার সতর্ক[illegible]

রয়েছে। ঘরের মধ্যে আমিও পায়চারি করতে লাগলাম। হঠাৎ আমার মনে হ'ল, সৃষ্টির প্রথম থেকেই আমরা বোধ হয় ক্রমাগত পায়চারি করছি। মানুষ বুঝি মুহূর্তের জন্যেও বিশ্রাম পেল না।

নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে সিমেনস জিজ্ঞাসা করল, "মুকু কোথায় বলতে পার?"

"মুকু? মুকু কেন? বোধ হয় মরে গেছে। বিশ বছর সে ঘুময় নি। মুকুর তো মরে যাওয়াই উচিত।"

"আমি ঘুমইনি ত্রিশ বছর! এ্যাসপিরিন খেলে হজম হ'য়ে যায়।"

"তাহলে সাপের বিষ খেয়ে দেখ, কাজ হ'তে পারে। কিন্তু সিমেনস, তুমি অনীতার কথা জিজ্ঞাসা না ক'রে মুকুর কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?"

খুব ক'ষে সিগারেটে টান দিয়ে সিমেনস বলল, "অনীতার ঠিকানার ঠিক আছে, মুকুর নেই।"

"আশ্চর্য! গুপ্তপুলিসরা আজ ক'দিন থেকে অনীতাকে ধরবার জন্যে কলকাতা চযে ফেলল, আর তুমি তার ঠিকানা জান! তাহলে তো বিনয়-প্রকাশকে এক্ষণি ডেকে পাঠাতে হয়।"

ঘড়ির দিকে চেয়ে সিমেনস বলল, "ডাকতে হবে না, সে নিজেই আসবে।"

"তাহলে এতদিন তুমি অনীতার ঠিকানা বল নি কেন?"

"আমার ধারণা ছিল অনীতার ঠিকানা তুমি জানো। কারণ, অনীতা কোনদিনও ঠিকানা বদলায় নি। যারা ক্রুশের সত্য বুঝতে পেরেছে তাদের ঠিকানা 'গল্‌গোথায়।' চৌধুরী, পারো তো বেদবেদান্তের ভারতবর্ষে মুকুর জন্যেও একটা ঠিকানা খুঁজে দিও।"

এই সময় বুটজুতোর আওয়াজ করতে করতে দু'জন রেড গার্ড নিয়ে বিনয়-প্রকাশ ঘরে প্রবেশ করল। বিনয়প্রকাশ ঘোষণা করল, "সিমেনসকে আমরা গ্রেপ্তার করলুম।"

নাটকীয় আকস্মিকতায় আমি অভিভূত হ'য়ে পড়লাম।

জিজ্ঞাসা করলুম, "সিমেনসের কি অপরাধ?"

সিমেস নিজেই জবাব দিল, "মস্কোতে ফিরে যাওয়ার আদেশ এসেছিল, গ্রাহ্য

করি নি। আমি লণ্ডনে ফিরে যাওয়ার বন্দোবস্ত করেছিলুম।—ওল্‌গা শেষ বাজিতেও জিতল।"

বিনয়প্রকাশ বলল, "সিমেনস ভুলে গেছে যে, ভয়েড এণ্ড ভয়েড কোম্পানির হেড অফিস লণ্ডনে নয়, মস্কোতে।"

"কেবল মস্কোতে নয়, লুবিয়াংকার কয়েদখানায় কমরেড।" সিমেনসের মন্তব্যে কোন অনিশ্চয়তা ছিল না।

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

সিমেনস একটু থেমে আমাকে উদ্দেশ ক'রেই বলল, "লুবিয়াংকায় ঘর বাঁধলুম। ছোট্ট ঘর, দু'দিকে হাত ছড়িয়ে দাঁড়াতেও পারব না, কিন্তু মন ছড়িয়ে বসতে পারব। মনের বিস্তৃতি আমার বাংলার মাটি ছুঁয়ে থাকবে। চৌধুরী, চিঠিপত্র দিও। ছোট ছোট সুখ-দুঃখের কথা যেন তাতে থাকে: তোমার সর্দি-কাশির কথা, তোমার নিদ্রাহীনতার সংবাদ, কি খাচ্ছ, কতটুকু খাচ্ছ—"

বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "রাজনীতির কথা জানতে চাও না বুঝি?"

"না। আমার চেয়ে বেশী রাজনীতি তুমি করতে পারবে না। আমার সমস্ত জীবনটাই মার্কসবাদের আদর্শ দিয়ে অধ্যুষিত হয়েছে এবং মার্কসবাদের রাজনীতি একেবারে টোটাল। চৌধুরী, আমার মত লোকের জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান লুবিয়াংকা। কারণ, সেখানেই কেবল রাজনীতি নেই। তুমি আমায় চিঠি দিও। আমার ঘাড়ে গুলি মেরে ওরা আমার ওপর প্রতিশোধ নেবে। তা নিক। পূর্বগামীদের রক্তচিহ্নিত বধ্যভূমির সিমেন্টের ওপর আমি লুটিয়ে পড়ব। তবু তুমি চিঠি লেখা বন্ধ ক'রো না। মৃত্যুর পর চৌধুরী-পরিবারের খবর ছাড়া আমার তো জানবার কিছু রইল না! আণবিক কিংবা হাইড্রোজেন বোমার বৈজ্ঞানিক উৎপাতের খবর নিয়ে আমার কি দরকার? খুকুর যেদিন বাচ্চা হবে···চৌধুরী, ওপারে যদি টেলিভিশনের ব্যবস্থা থাকে, তবে যেন বাচ্চাকে একবার দেখতে পাই।"

বুঝলুম, সিমেনসের 'মস্তিষ্ক' আজ সিমেনসের সঙ্গে প্রতারণা করছে।

ওরা চ'লে গেল।

করিডোর থেকে বিনয়প্রকাশের ধমকানি শুনতে পেলুম, "বিশ্বাসঘাতক, সাম্রাজ্যবাদীর গুপ্তচর……"

আর শোনা গেল না।

প্রভাতের প্রথম মুহূর্তে সাড়ে পাঁচ মিনিটের বক্তৃতাটা মনে মনে আবার একবার ঝালিয়ে নিচ্ছিলাম, আর সেই সঙ্গে বিছানায় শুয়ে ওয়াটারলু স্ট্রীটের রেড গার্ডদের জুতোর আওয়াজের নতুন সিম্ফনিও শুনতে লাগলাম। তন্দ্রা এল। তন্দ্রার মধ্যেই যেন বুঝতে পারলুম, বাদ্যযন্ত্রের একটা তার বুঝি ছিঁড়ে গেল—তারপর একটা বিরাট বিস্ফোরণ! যেন বিকিনি দ্বীপটা চোখের সামনে ধোঁয়া হয়ে যাচ্ছে!

সেই ভাঙা সিম্ফনির বুক চিরে বেরিয়ে এল পূর্ণগর্ভা মৃত্যুর আর্তনাদ।

এ্যাসপিরিনের তন্দ্রা গেল কেটে।

সামনে দাঁড়িয়ে দেহরক্ষী কমরেড লতিফ।

ঘড়ির দিকে চেয়ে সে আমায় স্মরণ করিয়ে দিল, "রেড স্কোয়ারে যেতে হবে পনর মিনিট পরেই। তামাম দুনিয়া ব'সে আছে আপনার বক্তৃতা শোনবার জন্যে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন? কমরেড জগৎ শেঠের তো সকালেই পৌঁছবার কথা ছিল?"

"তিনি আর আসবেন না, তিনি বন্দী।"

এই সময় কমরেড কৃষ্ণান এলেন ঘরে। দু'খানা ফুলস্ক্যাপ কাগজ আমার হাতে দিয়ে বললেন, "আজকের বক্তৃতা। সময় দেওয়া হয়েছে সাড়ে পাঁচ মিনিট। দু'চারবার পড়ে নিন। কমা এবং ফুলস্টপগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখবেন। উল্টেপাল্টে দিলে অর্থবোধে গোলমাল হতে পারে। আমাদের রাষ্ট্রে পান থেকে চুন খসলেই সাবোটাজ হবে। কমরেড চৌধুরী, কাল রাত্রে আমরা জগৎ শেঠের সাবোটাজ ধ'রে ফেলেছি।"

"কেমন ক'রে ধরলেন?"

"ইতিহাস থেকে। পলাশীর যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে ফাইনান্স করেছিল কে?"

বললুম, "জগৎ শেঠ।"

"কংগ্রেসী তহবিলে টাকা দিয়েছিল কে ?"

"জগৎ শেঠ।"

"গত দু'শ বছর ধ'রে পেছন থেকে যারা ছুরি চালাচ্ছিল তারা কারা ?"

"জগৎ শেঠরা।"

"ভারতবর্ষকে ভাগ ক'রে যে-সব বুড়োগুলো মজা লুঠছিল তারা কারা ?"

"বুড়ো জগৎ শেঠরা।"

"মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে চক্রান্ত ক'রে যে-সব বুড়োগুলো মহাত্মাজীর বিপ্লবকে ভেস্তে দিল, সে লোকগুলো কারা ?"

"অনেকগুলো জগৎ শেঠ।"

"ইনক্লাব জিন্দাবাদ।"

"ইনক্লাব জিন্দাবাদ।"

রেড স্কোয়ারে প্রায় দশলক্ষ লোকের সমাবেশ!

জনতার এক অংশ থেকে প্রশ্ন উঠল, "ভারতবর্ষ কাদের ?"

অপর অংশ জবাব দিল, "কৃষাণ, মজদুর, সর্বহারার।"

মঞ্চের ওপরে দাঁড়িয়ে গলা আমার শুকিয়ে এল। কৃষ্ণানের দেওয়া কাগজের দিকে চোখ রেখে আমি বক্তৃতা স্বরু করলাম :

কমরেডগণ,

আমাদের বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছে। বিশ্বাসঘাতক শাসক গোষ্ঠীর অনেকেই আজ বন্দীশিবিরে। পচা শামুকগুলোকে আমরা বস্তাবন্দী ক'রে রেখেছি আপনাদের অনুমতিক্রমেই। ছদ্মবেশী জগৎশেঠরা ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও প্রতিরোধ আন্দোলন চালাচ্ছে। তাদের একেবারে উচ্ছেদ করতে হ'লে আপনাদের সাহায্য চাই। আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া মুষ্টিমেয় পুলিস তো তাদের ধরতে পারবে না।

এবার আমাদের রাষ্ট্র গড়ার কাজে নেমে পড়তে হবে। আপনাদের রাষ্ট্র, গড়তে হবে আপনাদেরই। ইঙ্গ-মার্কিনের টাকায় এযাবৎকাল ভারতবর্ষের শিল্পকারখানা চলছিল। ওদের টাকায় শোষণের শৃঙ্খল রচিত হয়েছিল— আমরা তা ভেঙ্গে দিয়েছি। আরও ভাঙতে হবে।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ইতিহাস থেকে সুরু ক'রে তাদের শিল্প, কলা, সঙ্গীত, সাহিত্য, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব যাবতীয় সব কিছু ভাঙতে হবে। ভাঙবেন আপনারাই। না ভাঙলে তো গড়া যাবে না! নূতন সভ্যতার রামধনুতে নানান রংয়ের বর্ণচ্ছটার প্রয়োজন নেই—ওটা বুর্জোয়া কবিত্ব। আমাদের সভ্যতার রামধনুতে থাকবে কেবল একটা রং—মার্কসবাদের রং।

ওরা বলে, ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। আপনাদেরও অনেকের মনে ধারণা জন্মেছে, কমিউনিস্ট শাসনতন্ত্রে ধর্ম থাকবে না। ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রীর শাসনতন্ত্রেও ধর্ম ছিল না। কিন্তু আমরা আপনাদের ধর্মের স্বাধীনতা দেব।

জনতা হর্ষধ্বনি ক'রে উঠল।

কমরেডগণ,

আপনাদের যদি ধর্ম পালনের স্বাধীনতা থাকে, তবে আপনাদেরই আবার ধর্মলোপ করবার স্বাধীনতাও থাকবে; দু'টো বিরুদ্ধ অবস্থার সংঘর্ষ জীবন ও জগতের সব জায়গাতেই ঘটছে। মার্কস সে কথা প্রমাণ করেছেন। দু'টো বিপরীত অবস্থার সংঘর্ষ থেকে একটা সমন্বয় আসে। আমাদেরও এসেছে। আমরা তাই ভারতবর্ষের মন্দিরগুলো নিষিদ্ধ এলাকা ব'লে আইন পাস করেছি। মার্কসবাদের আইন থেকেই এ আইন জন্মেছে। মার্কসবাদ আপনাদের—অতএব এ আইনও আপনাদের।

জনতা পুনরায় হর্ষধ্বনি করল।

কমরেডগণ,

আমরা উপস্থিত মন্দির, মসজিদ ও গির্জেগুলো কেড়ে নিলুম কেন? আপনাদের জন্যেই। সেখানে কারিগরি কাজের ব্যবস্থা হবে। আপনারা জানেন, ইট, সুরকি ছাড়া বাড়িঘর তৈরী হয় না। কিন্তু এখুনি ইট, সুরকি কোথায় পাব? ইট, সুরকির জন্যে অপেক্ষা করতে হ'লে, আপনাদের কারিগরি শিক্ষার জন্যেও অপেক্ষা করতে হয়। আপনারা অপেক্ষা করতে চাইলেও, রাষ্ট্র অপেক্ষা করতে পারে না।

বিদেশী রাষ্ট্রপতিদের উদ্দেশ ক'রে আমি বলছি, তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোন ঝগড়া নেই; কিন্তু মতের মিলও নেই। তা না থাক—তাঁদের নির্বাচিত

রাষ্ট্রদূতেরা ভারতবর্ষে যথাযোগ্য সম্মান পাবেন। আমি আশা করব, তাঁরা যেন ভারতবর্ষে গুপ্তচর-বৃত্তির জন্যে দূতাবাস না খোলেন। তাঁদের কাছ থে আমরা যেমন মূলধন চাই না, তেমনি তাঁদের লগ্নিকৃত পুরনো মূলধনও ফিরি দিতে চাই না।

নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য আমরা করব। করব মার্কিণ মুল্লুকের সঙ্গেও। কি কতটা করব? কংগ্রেসী গভর্ণমেন্ট রাশিয়ার সঙ্গে যতটুকু করেছিল, তার বে নয়। সাবান আর টুথপেস্টের বদলে আমরা কয়েকটা বছর গঙ্গামাটি ও নিমগাছের ডাল দিয়েই কাজ চালিয়ে নেব।

কমরেডগণ

কংগ্রেসী গভর্ণমেন্টের পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার কাগজের নৌকো আম তৈরি করব না। সময় আমাদের অতি সংক্ষিপ্ত—তাই আমরা মনস্থ করে দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার বুলডোজার দিয়ে ভারতবর্ষের পুরনো সভ্যতার উঁচুনী মাটি সব সমান ক'রে দেব। প্রতিরোধ আন্দোলন যারা চালাচ্ছে কিং ভবিষ্যতেও যারা চালাবার সংকল্প করছে, তারা যেন বুলডোজারের কথাটা ভু না যায়। ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

কৃষ্ণান আমার হাত থেকে কাগজ দু'টো ছোঁ মেরে টেনে নিলেন।

সেই দিনই বেলা এগারটার সময় রওনা হলুম মাদ্রাজের দিকে। সং রইলেন কমরেড কৃষ্ণান।

সামরিক উড়োজাহাজ গর্জন করতে করতে আকাশে উঠল। আসবার প বিপ্লবোত্তর কলকাতাকে নতুন শহর ব'লে মনে হয়েছে, কিন্তু আকাশের কো পরিবর্তন হয় নি। সেই আকাশ যে-আকাশের বুক চিরে আমি মং গিয়েছিলাম। সেদিন আমার মনে 'ভারতবর্ষ আবিষ্কারের' কৌতুক ছিল, আ আছে ভারতবর্ষ-সৃষ্টির মহা তৃপ্তি।

কৃষ্ণান জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ভাবছেন?"

"ভাবছি ভারতবর্ষের কথা।"

"কোন্ ভারতবর্ষ কমরেড চৌধুরী?"

"জনসাধারণের ভারতবর্ষ, পিপলস্ ইণ্ডিয়া।"

জানলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে কৃষ্ণান চাইলেন নীচের দিকে। তারপর বললেন, "দশ হাজার ফুট ওপর থেকে ভারতবর্ষকে কত ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে! একই বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন স্তর থেকে ভিন্ন রকমের দেখায়।"

বললাম, "ওটা স্তরের উঁচু-নীচু, বস্তু ঠিকই আছে। মাটি থেকে যত বেশী ওপরে উঠবেন, দৃষ্টির পরিধি ও প্রসারতা ততো বেশী কমবে। দৃষ্টির কমবেশির জন্যে মাটির কমবেশি কখনই হয় না। অন্ধ লোকেরা পদার্থের অস্তিত্ব দেখতে পায় না ব'লেই পদার্থের পরের অস্তিত্ব নিয়ে মাথা ঘামায়। বুর্জোয়ারা পদার্থ-শূন্য অস্তিত্বের নাম দিয়েছে মেটাফিজিক্স। ডায়লেকটিকসের কাঁচি দিয়ে মার্কস 'মেটা' শব্দটা কেটে দিয়ে পদার্থের নির্দিষ্ট রূপ আমাদের চোখের সামনে ধরে দিয়ে গেছেন। মনুষ্য সমাজের বিপদ-লগ্ন নিশ্চয়ই কাটবে যদি আমরা পদার্থকে কেবল পদার্থ ব'লেই বুঝতে পারি।" শেষের কথাগুলো কৃষ্ণান শুনতে পান নি। তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা চুপ ক'রে বসে রইলুম।

ভাবলুম, ওঁকে ডাকি। এ্যাসপিরিনের শ্রাদ্ধ ক'রেও আমার ঘুম আসে না, অথচ কৃষ্ণান কি ক'রে ঘুমচ্ছেন? আমি একটু ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলুম। কনুই দিয়ে একটু ধাক্কা দিতেই কৃষ্ণান সোজা হয়ে বসলেন।

জিজ্ঞাসা করলুম, "ঘুমচ্ছিলেন নাকি?"

"না, না—ও-সব বুর্জোয়া রোগ আমার নেই। আমি কেবল বিশ হাজার ফুট ওপরে উঠেছিলাম মজা দেখবার জন্যে।"

হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি মজা দেখলেন কমরেড কৃষ্ণান?"

"মজা আর দেখলাম কই? দেখলাম তো একটা দাড়িওয়ালা লোককে। লোকটার একদিকে লছমী, অন্যদিকে য়্যানা। ব্যাপার কিছু বুঝলেন কমরেড চৌধুরী?"

"ওপরে উঠলেন আপনি, আমি কি ক'রে বুঝব?"

কৃষ্ণান তাঁর অভ্যাসবশত আক্রমণাত্মক ভঙ্গী ক'রে বললেন, "বিশ হাজার ফুট ওপরে দেখলাম একখণ্ড জমি। জমিতে অনেক ফসল। জমির শেষ প্রান্তে একটা গাছ। গাছে অনেক পাতা, অনেক ফুল।"

বাধা দিয়ে বললাম, "গাছটা বোধ হয় কল্পবৃক্ষ ?"

"হ্যাঁ। তাহলে তো বংশীবাদক পলিটিশিয়ান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হ'ত। তিনি বোধ হয় বিশ হাজারে নেই, একেবারে চল্লিশ হাজারের সীমান্ত পেরিয়ে বিচরণ করেন। আমি গিয়ে পৌঁছতেই য়্যানা আর লছমী এসে দু'জনে আমার দু'টো হাত চেপে ধরল। তারপর হাতের আস্তিন দু'টো টেনে টেনে নামাতে লাগল। য়্যানা আমায় বলল, 'এখানে কেউ আস্তিন গুটোয় না।'

জিজ্ঞাসা করলুম, 'কেন ডারলিং ?'

য়্যানার হয়ে লছমী জবাব দিল, 'এখানে রাজনীতি এবং হত্যা দু'টোই নিষিদ্ধ।'

আমি বললুম, 'ওহো, কী নিদারুণ বালুকা বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে তোরা বসবাস করছিস! আধুনিক মানুষের জীবনে রাজনীতিই যদি না রইল, তবে আর রইল কি ? তা ছাড়া, কোন্ দেশের এবং কোন্ যুগের রাজনীতির হাতে রক্তের দাগ নেই বল্ ?'

'অত কথা জানি না—তবে তোমার হাতে রক্তের দাগ কোনদিনই শুকয় নি, আর শুকবেও না।"

'বলিস কি লছমী ? আমি হলুম ভারতরাষ্ট্রের একজন প্রতাপশালী কমিশার! ধর্ম ও নৈতিক বিভাগ আমার হাতে। এক হাতে ধর্মের ঘাড় মটকাচ্ছি, আর অন্য হাতে মানুষকে শেখাচ্ছি নীতিবোধ। তোরাও নিশ্চয়ই জানিস, নইলে কি আর ছুটে এসে টেনে টেনে আস্তিন নামিয়ে দিতিস ? তোরাও আজ আমার কাছে খাতির প্রার্থী।'

য়্যানা বলল, 'তোমার হাত থেকে রক্তের দাগ আমরা ধুয়ে দিতে চাই।'

'তোমাদের দেশে এসেছি, যা ইচ্ছে তাই করতে পারো। কিন্তু ধোবে কি দিয়ে ? জল তো দেখছি না ডারলিং ?'

'জল না থাক, ভালবাসা আছে।'

'আছে ?' আমি প্রায় লাফিয়ে উঠেছিলাম। য়্যানার কোমরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললুম, 'আই লাভ ইউ ডারলিং—' সঙ্গে সঙ্গে পায়ের তলা থেকে একখণ্ড মেঘ সরে গেল। বিশ হাজার ফুট উঁচু থেকে দেখলুম,

নীল ডেনিউব হেলে দুলে গদাইলস্করী চালে বল্কানদের দু'কূল ছাপিয়ে বয়ে চলেছে। নীল ডেনিউবের দুধারে সীমাহীন শস্যক্ষেত্র। মাঝে মাঝে গ্রাম দেখা যাচ্ছে। ছবির মত দেখতে সব গ্রাম্যকুটির। কুটিরের সামনে বাগান। কত রকমের ফুল ফুটে রয়েছে। বাগানের এক পাশে গোয়াল। গরুগুলোর স্বাস্থ্য ভারতবর্ষের গামা কিংবা গোবরবাবুর চেয়ে অনেক ভাল। বাচ্চাগুলো গুঁতো মেরে মেরে বাঁট থেকে দুধ টেনে খাচ্ছে। ওহো, কী সুন্দর ঐ গীর্জেগুলো! ক্যাথলিক পুরোহিতদের কাছে দল বেঁধে লোক আসছে পরামর্শ আর উপদেশ নিতে। সংসারের সহস্র দুঃখের বোঝা ওরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে গীর্জের দরজায়। সংসারের সব দুঃখই বুঝি দূর হয়ে গেল! তারপর আবার এক খণ্ড মেঘ—কিছুই দেখা যায় না, হাওয়ায় ভর দিয়ে ভেসে আসতে লাগল গ্রাম্য সঙ্গীতের সুর। ক্রমে ক্রমে সুরটাও যেন দূরে সরে যেতে লাগল, আর শোনা গেল না। তারপর যখন দ্বিতীয় খণ্ড মেঘের আবরণ খসে পড়ল, তখন আবার সেই বলকানস্। নীল ডেনিউবের রং গেছে ফিকে হয়ে। অসংখ্য কারখানা দু'ধারে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়েছে। ধোঁয়া আর ধোঁয়া, চারদিকের মানুষের চেহারা গেল বদলে। সবটা মিলিয়ে মনে হ'ল, সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-সৌন্দর্যও বুঝি লোপ পেয়ে গেছে। কমরেড চৌধুরী, তারপর যা দেখলুম, তা আর আপনাকে বলতে চাই না।"

আমি অনুরোধ ক'রে বললুম, "বেশ লাগছে শুনতে। আপনি ব'লে যান যতক্ষণ না মাদ্রাজ পৌঁছাই অথবা উড়োজাহাজে আগুন লাগে। হ্যাঁ, কি দেখলেন?"

"এবার আর মেঘ নয় কমরেড চৌধুরী। একটা প্রকাণ্ড বড় পোস্টার সারা ইয়োরোপের মাথায় সামিয়ানার মত উড়ছে। সামিয়ানার রংটি লাল! দু'মিনিট চেয়ে থাকবার পর দেখলুম একটা পায়রা উড়ে এসে বসল সেই সামিয়ানার উপরে। ঠোঁট থেকে ল্যাজ পর্যন্ত সব ক'টি রোঁয়া লাল। ব্যাপার কি?

লছমী বলল, 'শান্তি-পায়রা। পোস্টারটা সরে গেলেই দেখবে সাদা হয়ে গেছে।'

'তাই না কি? আড়ালে এলেই লাল আর লোকের সামনে সাদা? কি ক'রে ম্যানেজ করে রে লছমী?'

'বুকের নীচে একটা সাদা আলখিল্লা রাখে। ওটা পরে নেয়। দেখবে?'

লছমীর হাতটা সহসা লম্বা হয়ে গেল। আঙুল দিয়ে খোঁচা দিতেই পোস্টারটা গেল সরে আর পায়রাটাও ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে গেল আকাশে। সত্যিই সাদা পায়রা! ডেনিউবের জলে ছায়া পড়ল। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। দেখলুম, আমি নৌকো বেয়ে চলেছি, পাশে য়্যানা। জিজ্ঞাসা করলুম, 'য়্যানা, তুমি সাঁতার জান?'

'না তো।' য়্যানার চোখে মুখে ভয়।

কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে ওকে ফেলে দিলুম ডেনিউবের জলে। দেখতে দেখতে ডেনিউবের নীল জল লাল হয়ে গেল!

বিশ হাজার ফুট ওপরে দাঁড়িয়ে আজ আমায় য়্যানা বলল, 'তোমায় আমি ক্ষমা করেছি কৃষ্ণান। বুকভরা ভালবাসা নিয়ে মানুষ যেদিন মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে সেদিন আর গুপ্তহত্যার প্রয়োজন হবে না।'

'তা ঠিক, তা ঠিক। ভালবাসার অভাব আমার মস্ত অভাব। তুমি যাবে না কি ভারতবর্ষে? আমি আজকাল কলকাতায় গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে আছি।'

'না কৃষ্ণান, আমি ডেনিউবের আকর্ষণ কোনদিনই কাটিয়ে উঠতে পারব না। লাল ডেনিউব যখন আবার নীল হয়ে উঠবে, তখন যাব ঘর বাঁধতে বুডাপেষ্ট থেকে বিশ মাইল দূরের সেই পল্লীগ্রামে।'

কমরেড চৌধুরী, এই সময় আমি চলে আসছিলাম। হঠাৎ দেখি, লছমী যেন কোথা থেকে জেট্ প্লেনের মত উড়ে এসে আমার পাশে দাঁড়াল। ভড়কে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কি রে লছমী? কোন্ কারখানায় তৈরী হয়ে এলি?' আমাদের লাল বৈজ্ঞানিকেরা ইউরাল পর্বতের মধ্যে গোপন-গবেষণাগারে বসে যে-সব নতুন কলকব্জা তৈরি করছিল, লছমীর সারা অঙ্গে দেখলুম সে-সব লেটেস্ট ডিভাইসেস রয়েছে। কমরেড চৌধুরী, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, লছমী আমেরিকার গুপ্তচর। কোটের পকেটে পিস্তলটা চেপে ধরলাম। লছমী বার বার ক'রে আমার হাতে মরতে চায় কেন?

লছমী হাসতে হাসতে বলল, 'বিশ হাজার ফুট উঁচুতে পিস্তল তোমার কাজে লাগবে না দাদা। বারুদ সব জমে গেছে দেখো।'

লছমীর মুখ থেকে খাঁটি বৈজ্ঞানিক সত্য উচ্চারিত হ'ল।

এবার অনুরোধ করলুম, 'লছমী, আমাদের হয়ে যা না একবার মার্কিণ মুল্লুকে—লক্ষ লক্ষ রুবল দেব, ওদের লেটেষ্ট সিক্রেটগুলো নিয়ে আয়। যাবি বোন ?'

লছমী বলল, 'ঐ যে গাছতলায় বুড়োটা বসে আছে, তাঁর কাছে জীবন ও জগতের সব রকম সিক্রেটের সন্ধান পাবে।'

'এত বক্ বক্ করছিস, বুড়োটা কে রে ?'

'সত্য—আদিম সত্য। খণ্ড নয়—পুরো সত্য।'

'ধোৎ, সব বাকতাল্লা মারছিস ! সত্য ? সত্যই যদি হবে, তবে তিনি বিশ হাজার ফুট ওপরে কেন ?'

লছমী হেসে বলল, 'তোমরা কেউ তো তাঁকে চাও না, তাই।'

'আমরা কমিউনিস্ট, ও-সব বুজরুকীতে বিশ্বাস করি না। কিন্তু যারা কমিউনিস্ট নয়, তারা কেন ওঁকে ধরে রাখল না ?'

গাছতলার দিকে চেয়ে দেখলুম, বুড়োটা নেই। পালিয়েছে। দেখলেন তো কমরেড চৌধুরী, আমার দৃষ্টির সামনে লছমীর বুড়ো-সত্য দু'মিনিটও টিকতে পারল না ?"

"আমি আর দেখলুম কই কমরেড কৃষ্ণান, দেখলেন তো আপনি। ঐ, ঐ বুঝি মাদ্রাজ শহর দেখা যাচ্ছে—"

কমরেড কৃষ্ণান বললেন, "হাঁ, এসে পড়েছি। কিন্তু বিশ হাজার ফুট উঁচু থেকে নেমে আসবার সময়, লছমী কি বলল জানেন ?"

"কি ক'রে জানব, আমি তো ঘুমই নি। আর এ্যাসপিরিনের ঘুমে বোধ হয় অত উপরে ওঠা যায় না।"

"তা যা বলেছেন।" কৃষ্ণান আস্তিন গুটোতে গুটোতে পুনরায় বললেন, "লছমী বলল, দীপক বাবুকে আমার কথা স্মরণ করিয়ে দিও।"

বাধা দিয়ে বললুম, "আমি কেন আপনার বোনকে স্মরণ করতে যাব ?"

"লছমী বলল, আপনি না কি কেওড়াতলায় গিয়েছিলেন ওরই সন্ধানে ? তা ছাড়া ওর ধারণা, রাষ্ট্রের চূড়ায় বসে আপনিও না কি সেই বুড়ো-সত্যের খোঁজ ক'রে বেড়াচ্ছেন ? লছমী কি সর্বনেশে কথাই না বলে ! লছমীর গভীর বিশ্বাস, আপনি ওকে ভালবাসেন।"

"পাগল না কি ! সিমেনসের মত লুবিয়াংকায় গিয়ে ঘর বাঁধবার অভিলাষ আমার নেই। ঘর বাঁধবার মনোবৃত্তি থেকেই তো খাস সম্পত্তির লোভ জন্মায়। কমরেড কৃষ্ণান, কমিউনিস্ট ভারতে কারুর ঘর থাকবে না। থাকবে কেবল একটা সুটকেস।"

আমরা বিমানঘাঁটির ওপরে এসে পড়েছি। কৃষ্ণান আমার হাতে এক টুকরো কাগজ দিয়ে বললেন, "আজকের বক্তৃতা। কমা, সেমিকোলনগুলো একটু ভাল ক'রে দেখে পড়বেন।" আমি কাগজের ওপর চোখ বুলোতে লাগলাম, কিন্তু মনোযোগ দিয়ে পড়তে পারছিলাম না। কৃষ্ণানের মুখ থেকে কেওড়াতলার খবর শুনে মন আমার চঞ্চল হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রের চূড়ায় বসেও স্বাধীন চিন্তার অবকাশ নেই। দেহরক্ষী কমরেড ঘোষ সামনে এগিয়ে এসে বলল, "বক্তৃতার সময় সাড়ে আট মিনিট। বক্তৃতার পর হাতে বেশী সময় উদ্বৃত্ত থাকবে না। কারণ, রাত সাড়ে আটটার ট্রেনেই আপনাকে বাঙ্গালোর রওনা হতে হবে। কাল বেলা এগারটায় সাউথ প্যারেডে বিরাট জনসভা আহ্বান করা হয়েছে।"

কোমরে বেল্ট বাঁধতে লাগলুম।

মাদ্রাজের মাঠে বিরাট জনতা। সমস্ত মাদ্রাজ শহরে লাল ঝাণ্ডার তুফান উঠেছে। প্রত্যেকের হাতে ছোটবড় সাইজের একটা ক'রে ঝাণ্ডা আছে। পুঁজিবাদীর টাকায় এ-সব তৈরি হয় নি। যে যেমন ক'রে পেরেছে প্রত্যেকেই এক টুকরো লাল কাপড় যোগাড় ক'রে নিয়ে এসেছে। পুরনো আমলে এমন নিয়ম ছিল না। কেবল ঠিকেদার আর দালাল গোষ্ঠীর ছাদের ডগায় তিন রংয়ের সস্তার খদ্দর লাগিয়ে রাখা হ'ত। নিজেরা কোনদিন

হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখে নি তা। যে-পতাকা চাকর-দরোয়ানরাই বহন করতে পারে সে-পতাকার জন্যে মানুষ জীবন দেবে কেন ?

ঘড়ি মিলিয়ে মাদ্রাজের বক্তৃতা শেষ করলুম। কমরেড আয়েংগার এগিয়ে এলেন মঞ্চের দিকে। আমরা করমর্দন করলুম। তিনি বললেন, "পান্নির কোম্পানীর গুপ্ত ব্যবসায় উঠে গেছে। এবার আমরা ব্যবসায় করব প্রকাশ্য দিবালোকে। দিবালোকে এবং সোজাসুজি জনসাধারণের সঙ্গে। আইন করতে হ'ল না, দালালরা নিজেরাই সরে গেল।"

দেহরক্ষী কমরেড ঘোষ মাথা নীচু ক'রে আমার কানের কাছে মুখ এনে অনুচ্চ স্বরে বলল, "আপনার খাবার সময় হয়েছে। যেতে হবে।"

আজ আর আমার মুখে মুখোস নেই। মাদ্রাজের রাস্তা দিয়ে চলেছি প্রকাশ্যভাবে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে। সামনে পেছনে অনেক সমারোহ! রেড গার্ডদের সাঁজোয়া গাড়ি সম্মুখে চলেছে সতর্ক দৃষ্টি মেলে। আমি সুরক্ষিত। কমরেড আয়েংগার পাশেই ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলুম, "রাস্তায় লোক নেই কেন? ময়দানে দশ লক্ষ লোকের সমাবেশ, অথচ রাস্তায় একজন লোকও তো দেখতে পাচ্ছি না?"

"আপনার আসা-যাওয়ার রাস্তা থেকে লোক সরিয়ে দিয়েছি। আপাতত তাই এসব নিষিদ্ধ এলাকা।"

রাস্তায় একটা কুকুর পর্যন্ত নেই!

মনে হ'ল আমার আসবার খবর পেয়ে রাস্তাঘাটগুলো বোধহয় মুখোস পরেছে। প্রাচীরের গায়ে অসংখ্য পোস্টার, আমারই ছবি রয়েছে তাতে। ইচ্ছে হ'ল দু'পাশের বাড়িগুলোতে ঢুকে পড়ি। জিজ্ঞাসা ক'রে আসি ভেতরের মানুষদের, পোস্টারের সত্য ওঁরা মেনে নিয়েছেন কি না। কমরেড আয়েংগার বললেন, "বাড়িগুলোতে কোন মানুষ নেই।"

"কেন?"

"রাত আটটা পর্যন্ত নিষিদ্ধ এলাকা থাকবে। আপনার মাদ্রাজ শহর ত্যাগ করার পর, ওরা ফিরে আসবে।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "এঁরা সব কোথায় আছেন এখন?"

"বোধহয় মাঠে গিয়েছে আপনার বক্তৃতা শুনতে।"

"কেউ একজনও প্রতিবাদ করেন নি কমরেড আয়েংগার?"

"দশ লক্ষ লোকের প্রতিবাদ শুনতে গেলে বিশ লক্ষ কানের দরকার। শুধু কান হলেই চলবে না, সময়ের দরকার। সেই জন্যে আমরা শ' দুয়েক রেড গার্ড পাঠিয়ে দিয়েছিলুম এ-পাড়ায়, সে-পাড়ায়। বেয়নেট খুলে পেছন থেকে তাড়া করতেই ময়দানে ভিড় জমে গেল। ফেরবার পথে তাড়া করতে হবে না, বন্দুকের বাঁট দিয়ে দু'চারটে গুঁতো মারলেই যে-যার ঘরে ফিরে আসবে।"

ডান দিকে চেয়ে দেখি রাস্তাটা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলুম, "মায়লাপুর, না?"

"হ্যাঁ।" জবাব দিলেন আয়েংগার।

এই সময় সাঁজোয়া গাড়িটা থামল এসে একটা ফটকের সামনে। দেহরক্ষী কমরেড ঘোষ বলল, "এইবার আপনাকে নামতে হবে।" বাড়িটা চিনতে আমার অসুবিধে হ'ল না। চেট্টিয়ারের বাড়ি। লক্ষ্মীর সঙ্গে এই বাড়িতেই আমার প্রথম দেখা হয়। বাগানের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে-সব দিনগুলোর কথা আমার মনে পড়তে লাগল। কংগ্রেসের চার আনার সদস্য চেট্টিয়ারের মুখেই কেবল মুখোস ছিল না, বাড়িটাও এযাবৎকাল মুখোস প'রে ছিল। যে-বাড়িতে শ্রীনাদার পুলিশ পাহারা নিয়ে খানা খেয়ে গেছেন, সেই বাড়িতেই পলাতক রেডিড নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা দিয়েছে। প্রদীপের নীচে চিরদিনই অন্ধকার থাকে, এ-কথা আমাদের চেয়ে ভাল ক'রে কেউ আর জানত না। এই অন্ধকারটুকু না থাকলে আমাদের রাষ্ট্রবিপ্লবের সফলতা কিছুতেই সম্ভব হ'ত না। মন্ত্রীর বাড়ি যদি দুদু না আগলাতো, তবে জগৎ শেঠের মত কোটিপতি দলে ভিড়তো কি ক'রে? বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্ক দুদুর চরিত্রে নেই। বুর্জোয়ারাই তো চিরদিন ব'লে এসেছি, যুদ্ধ ও প্রেমের ক্ষেত্রে চিরাচরিত নীতি-বোধের দরকার হয় না। কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে দুদু যুদ্ধ করেছে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। প্রদীপের অন্ধকারে তাই ওকে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়েছে। আমার মনে হ'ল রাজনীতির ক্ষেত্রে যে-নীতিবোধ দুদু বিসর্জন দিল, প্রেমের ক্ষেত্রে সেই নীতিবোধই সে ধরে রইল কেন? ইচ্ছে করলেই দুদু অনীতাকে

সরিয়ে দিতে পারত ছলে, বলে কিংবা কৌশলে; অনীতা নিজেই সরে যেত যদি ও গোলাগুলি ভাবে দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়াত। মুকু তা করল না কেন? আমার বিশ্বাস, মুকু ওর সবটুকুই পার্টিকে দেয় নি। গোপন ক'রে রেখেছিল ওর প্রেমের রাজ্য, যে-রাজ্যে বিনয়প্রকাশ ছাড়া আর কেউ ছিল না। বিনয়প্রকাশ মার্কনিষ্ঠ, চণ্ডীদাস নয়। কমিউনিস্ট সভ্যতার ধোবাখানায় রামী কাপড় কাচবে লণ্ড্রীম্যান চণ্ডীদাসের পাশে দাঁড়িয়ে। ওদের গান করবারও অধিকার থাকবে, লণ্ড্রীম্যানের গান। বুর্জোয়া পিরিতির উচ্ছিষ্ট ফেলে আসতে হবে পুরনো সভ্যতার মরা নদীতে। মুকু ভুল করেছে, মারাত্মক ভুল! প্রদীপের নিকটতম অন্ধকারটাই মুকুর চোখে গাঢ়তম অন্ধকার হয়ে রইল। আলোর ইঙ্গিং মুকুর চোখে ধরা পড়ল না।

কমরেড ঘোষ বললে, "আর বেশী সময় নেই, খেয়ে নিন।"

কোন্ সময় যে আমি খাবার টেবিলে এসে বসে পড়েছি তা খেয়াল করি নি। চেট্টিয়ারের সেই প্রকাণ্ড ডাইনিং-রুম। শ্রীরাজাগোপালাচারিয়া আসেন নি বটে এই ঘরে, কিন্তু শ্রীনাদার এসেছেন বহু দিন। চামচে থেকে চেটে চেটে পুডিং খেয়ে গেছেন। হিন্দু, পাঠান এবং মুঘল রাজত্বের শাসকরা পাকস্থলী ফাটিয়ে খেয়েছেন অনেক, কিন্তু শ্রীনাদারদের মতো এমন নগ্নভাবে খাওয়ার টেকনিক সে-যুগের নৃশংসতম তুর্কী সম্রাটেরও জানা ছিল না। ওঁদের খাওয়ার নিষ্ঠা থেকে আমরাই ভারতমাতার গণতান্ত্রিক দেহটাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে এলুম। মেদ মজ্জার চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া গেল না, চেটে চেটে সব খেয়ে ফেলেছে! জানি, শকুনের লোভে গরু মরে না। কিন্তু মানুষের লোভে রাষ্ট্র মরে।

কমরেড আয়েংগার জিজ্ঞাসা করলেন, "খাচ্ছেন না যে? ভয় করছে নাকি? পরীক্ষা না ক'রে কোন খাবারই আমরা আপনার টেবিলে আনতে দিই নি।"

"পরীক্ষা? কার ওপরে পরীক্ষা করলেন? চেট্টিয়ার বুঝি বাড়িতে গিনীপিগও রাখে?"

"গিনীপিগের পরীক্ষাও শেষ পরীক্ষা নয় কমরেড চৌধুরী। গিনীপিগের মধ্যেও তো দু'-একটা বুর্জোয়া পিগ থাকতে পারে? সেই জন্যে আমরা ছ'টি কমরেডকে বাছাই ক'রে রেখেছি যাঁরা আপনার খাদ্য চেখে চেখে দেখবেন।

তাঁদের মধ্যে দু'জন যাচ্ছেন আপনার সঙ্গে বাঙ্গালোর। কোন্ সময় আপনি কি খাবেন সবই আমরা লিষ্ট ক'রে নিয়েছি। আপনার কোন অসুবিধে হবে না। সময় নষ্ট করতে হবে না খাওয়া-পরার দুর্ভাবনা নিয়ে।"

"হ্যাঁ, খাওয়া-পরার ভাবনা রাষ্ট্রের হাতেই ছেড়ে দেওয়া ভাল। কমরেড আয়েংগার, চেট্টিয়ারকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?"

"আপনার কাছে আসবার তিনি প্রবেশপত্র পান নি।"

"কিন্তু বাড়িটা তো তাঁর? এখানে প্রবেশ করবার অধিকার তাঁর কেড়ে নিল কে?"

"আমরা।"

"কেন?"

"চেট্টিয়ার বিশ্বাসঘাতক। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লোকসান পূরণ করবার জন্যে তিনি পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। তা ছাড়া যিনি একবার কংগ্রেসকে ঠকিয়েছেন, তিনি তো পার্টিকেও ঠকাতে পারেন?"

"ঠিক, ঠিক কথা। আপনার যুক্তিতে কোন ছিদ্র নেই। চেট্টিয়ার এখন কোথায়?"

"তিনি এখন শিবিরে আছেন। শিবির মানে বন্দী-শিবির।"

দ্বিতীয় আইটেম খাওয়া শেষ ক'রে জিজ্ঞাসা করলুম, "শিবিরের জানলা দরজাগুলো বেশ শক্ত আছে তো কমরেড আয়েংগার?"

"চেট্টিয়ারের ঘরে আমরা কোন জানলা রাখি নি। ডালমিয়া-সিমেণ্ট দিয়ে সব ভরাট ক'রে দিয়েছি। আপনি বোধহয় জানেন না, শেঠজী চেট্টিয়ারের সঙ্গে এক ঘরেই আছেন?"

"ভালই হয়েছে। শেঠজী পাশে থাকলে, চেট্টিয়ারের সময় কাটবে ভাল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ডালমিয়া-সিমেণ্ট বিক্রি করবার ফাঁক ফন্দি সব তিনি জেনে নিতে পারবেন তাঁর কাছেই। শিবিরের ঘরটার মোট আয়তন কত?"

"প্রায় একশ' বর্গ ফুট।"

"সর্বনাশ! পঞ্চাশ বর্গ ফুটের মাঝখানে একটা সিমেণ্টের দেয়াল তুলে

দিন, নইলে অন্য লোকের স্থানের অভাব হবে। তা ছাড়া, শেঠজী যদি একবার হাত-পা ছড়িয়ে বসতে পারেন, তবে তিনি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে বসবেন। তাঁর নাকের ডগায় দেয়াল ঠেকিয়ে দিতে পারলে, প্রবন্ধ লেখা ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন।"

দেহরক্ষী কমরেড ঘোষ ঘরে ঢুকল। তার কব্জির ঘড়িটা আমার চোখের সামনে তুলে ধরে বলল, "পুডিংটা থাক। আড়াই মিনিটের মধ্যে আপনাকে স্টেশনে পৌঁছতে হবে।"

আড়াই মিনিটের মধ্যেই আমরা মাদ্রাজ স্টেশনে পৌঁছে গেলুম। পরের দিন বাঙ্গালোরে জনসভা।

বাঙ্গালোর এক্সপ্রেস স্টেশনেই দাঁড়িয়েছিল। চারদিকে রেড গার্ডদের কর্ম-তৎপরতা লক্ষ্য করলুম। কেবল মাইনে পাবে ব'লেই যে এরা সব কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠেছে তা নয়। নিজের রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ববোধ প্রত্যেকটি মানুষকে সজাগ ও সতর্ক ক'রে রেখেছে। রাষ্ট্রের গায়ে আঘাত লাগলে, নিজের গায়েও আঘাত লাগবার সচেতনতাই বিপ্লবের সফল পরিণতি। যে-মানুষ নিজের মুখে ভাত তুলতে গিয়ে কোটি কোটি শূন্য পেটের কথা স্মরণ ক'রে ভাতের গ্রাসে তিক্ততার স্বাদ পায়, বিপ্লবোত্তর ভারতবর্ষ তারই কাছে আজ মাথা নত করছে। প্রতিবেশীকে ভালবাসবার মধ্যে ঐশী প্রত্যাদেশ ছিল, ভাত ছিল না। পুঁজিবাদীর একচেটিয়া ভাতের কারবার খতম করলুম আমরাই। ওদের সিন্দুক পাহারা দেবার জন্যে দরওয়ানদের আর রাত জাগতে হবে না। ভারত-সিন্দুকের চাবি আজ সবার হাতেই আছে।

প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কমরেড আয়েংগারকে জিজ্ঞাসা করলুম, "গাড়িতে যাত্রীর ভিড় নেই কেন ?"

"এক শহর থেকে অন্য শহরে যাওয়া-আসা করতে গেলে ছাড়পত্র লাগবে। আজ থেকে আমরা এই নূতন আইন পাস করলুম।"

"ভালই করেছেন। অবাধে যাওয়া-আসার অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে বুর্জোয়াদের গভীর ষড়যন্ত্র ছিল। অবাধ স্বাধীনতার অর্থই হচ্ছে স্বাধীনতার

অভাব। ছাড়পত্রের নিয়ন্ত্রণের দ্বারা আমরা অভাবও রাখলাম না, আবার অবাধ কথাটার উচ্ছৃঙ্খলতাও দিলাম তুলে।"

কামরায় উঠলুম আমি।

কমরেড আয়েংগার বললেন, "আমরা সব পাশের কামরাতেই রইলুম। আশা করি, আপনার সুনিদ্রা হবে।"

কমরেড ঘোষ আমার হাতে একটা কাগজ দিয়ে বলল, "কালকের বক্তৃতা। সময় পনর মিনিট। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করবেন না। প্রত্যেক স্টেশনেই আমি খবর নেব।"

সবাই চলে যাচ্ছিলেন, আমি বললুম, "তেষ্টা পেয়েছে। এক গেলাস জল পাওয়া যাবে কি ?"

জল চাইতে গিয়ে গাড়ি ছাড়তে পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে গেল। বড় একটা ফ্লাস্ক নিয়ে এল কমরেড ঘোষ। দেখলুম, ফ্লাসকের গলায় একটা টিকিট ঝুলছে। টিকিটের ওপর পরীক্ষার তারিখ ও সময় লেখা রয়েছে। তারপর দু'টো গেলাস নিয়ে এসে উপস্থিত হ'ল দু'টি মানুষ-গিনীপিগ। এক গেলাস থেকে অন্য গেলাসে অল্প একটু জল ঢেলে খেয়ে ফেলল প্রথম গিনীপিগটি। খেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল মিনিট তিনেক। সবাই চেয়ে রইলেন ওর মুখের দিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে। কোন রকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। ডাক্তার চারী বললেন, "এবার আপনি জলটা খেতে পারেন।" বুর্জোয়া শত্রুদের বিশ্বাস নেই, জলের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিলে গিনীপিগের পেটে গিয়ে তা ধরা পড়বেই।

গাড়ী মাদ্রাজ স্টেশন ছাড়ল।

কামরায় আমি একা। গত বিশ বছরে আমার একাকীত্ব সত্যিই যেন একটা বৈজ্ঞানিক সুসম্পূর্ণতা লাভ করেছে। আমার চারদিকে দৃশ্যমান জগৎ—সে-জগতে মা, বাবা, অনীতা, ঝুকু সবাই ছিলেন। আজ আর আমি কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না। আমার অস্তিত্বটাই সংসারমুখী, অথচ সবটাই যেন আবার সংসার থেকে আলগা হয়ে আছে। সবারই সঙ্গ আমি কামনা

করি, কিন্তু কেউ কাছে এলে আমি তাকে দেখতে পাই না। কামরার নির্জনতা আমায় গলা টিপে মারতে আসছে ; গলাটা যখন বাড়িয়ে দিচ্ছি, নির্জনতা সরে যাচ্ছে দূরে। বেদান্তের দার্শনিক বিচ্ছিন্নতা যেন মার্কসবাদের সর্বশেষ পরিচ্ছেদে এসে অদ্ভুত এক সমন্বয় ঘটিয়েছে। নিরিন্দ্রিয় নিষ্পত্তির ব্রহ্মলোকের সঙ্গে যেন কামরার কায়িক সাদৃশ্য আছে! দিবারাত্র আমার চোখে ঘুম নেই, জেগে জেগে নিজের মধ্যেই 'মিস্তিকের' লীলাখেলা অনুভব করছি। এ্যাসপিরিনের শিশিটা পকেট থেকে বার করলুম। নিষ্কামতার চূড়ায় বসেও এ্যাসপিরিনের নেশা আমার কাটে নি!

রাত বোধ হয় তখন দু'টোই হবে। স্নানঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন চেট্টিয়ার। কয়েদীর পোষাক নেই, আছে ছদ্মবেশ। জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনি এখানে কেমন ক'রে এলেন?"

"অতিকষ্টে এবং রেড গার্ডদের সাহায্যেই।"

"বুড়ো শেঠজী কোথায়?"

"যথাস্থানেই আছেন।"

"পালিয়ে এলেন কেন?"

"সে মশাই, দিনরাত ভুল সংস্কৃত শুনে শুনে কান আমার ঝালাপালা হয়ে গেছে!" বললেন চেট্টিয়ার।

"ধমকে দিলেই পারতেন?"

"বলেন কি? মুখের কথা তিনি শুনবেন কেন? কম্বল দিয়ে একদিন প্রায় দু'ঘণ্টা নাকমুখ চেপে ধরে রেখেছিলাম। তাতেও কাজ হয় নি। বিড়বিড় ক'রে কম্বলের তলা থেকেই সংস্কৃত বলতে লাগলেন। কাগজ কলমের অভাবে মুখ দিয়েই তিনি প্রবন্ধ লিখছেন! কি সব কতোগুলো দৈনিক আর সাপ্তাহিক কাগজ আছে, তাতে নাকি প্রবন্ধগুলো ছাপা হবে। ব্যাপার দেখুন।"

"দেখছি তো গত দু'শ বছর থেকে এই রকমই সব চলে আসছে। যাক, সে সব পশ্চাতের ইতিবৃত্ত আলোচনার সময় এ নয়। আপনি স্নানঘরে কতক্ষণ থেকে লুকিয়ে আছেন?"

"প্রায় সাত ঘণ্টা হ'ল।"

"জেল থেকে পালালেন কি ক'রে?"

"অনেক কষ্টে।" এই ব'লে চেট্টিয়ার পকেট থেকে একটা পিস্তল বার করলেন।

আমি বললুম, "যা করবার তাড়াতাড়ি করুন। পরের স্টেশনে গাড়ি থামলেই, আমার দেহরক্ষীরা সব এসে কামরায় উঁকি দেবে।"

"সেই জন্যেই তো এতক্ষণ বেরুতে পারি নি। কমরেড চৌধুরী, কিছু খাবার আছে কামরায়? গত তিন দিন থেকে নিরম্বু উপবাস করছি।"

"বলেন কি? রেড গার্ডরা খাবার ব্যবস্থা করে নি?" একটু হেসে পুনরায় বললুম, "বুর্জোয়ারা কোনদিনও কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে খাবার দেখতে পায় না।"

পিস্তলটা নাড়াচাড়া করতে করতে চেট্টিয়ার বললেন, "দয়া ক'রে আপনিই একটু খাবার দেখান না এখানে? পিস্তলের ঘোড়া টিপবার শক্তি পর্যন্ত আঙুল থেকে নিঃশেষ হ'য়ে গেছে।"

"তাহলে পিস্তলটা আমার কাছেই রেখে দিন কমরেড চেট্টিয়ার।"

"কেন, আত্মহত্যা করবেন না কি কমরেড চৌধুরী? কোটি হত্যার চেয়ে নিজেকে হত্যা করা অবশ্য অনেক ভাল।"

"ছত্রিশ কোটিকে বাঁচাবার জন্যে কোটি হত্যা তার চেয়েও ভাল কমরেড চেট্টিয়ার। বলতে পারেন, কোন্ যুগে রাজনীতির মধ্যে হত্যা ছিল না? দু'টো মহাযুদ্ধের ইতিহাস কি? গণতন্ত্রের নামে অগণিত মানুষকে মারতে হয় নি? তা ছাড়া প্রাক্-বিপ্লবী যুগের ভারতবর্ষের অবস্থা কি ছিল? গোটা ক্লাইভ স্ট্রীটে বেলা দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত কি ব্যবসা চল্‌ছিল মশাই? গুলি ক'রে মানুষ মারা সব দেশেই আইনবিরুদ্ধ বটে, কিন্তু শোষণের বিষ খাইয়ে একটা গোটা জাতিকে নিস্তেজ ক'রে দেওয়ার মধ্যে কি হত্যা নেই? প্রাচীন যুগে রাজপ্রাসাদের মধ্যেই ছিল রাজনীতির চতুঃসীমা, গণতন্ত্রের যুগে প্রত্যেকটি সামাজিক মানুষের চিন্তাধারার সবটুকুই রাজনীতি। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত এবং সন্ধ্যে থেকে সকাল পর্যন্ত প্রত্যেকটি মানুষের নিঃশব্দ পদচারণের মধ্যে রাজনীতির অস্থিরতা ছাড়া আর কি আছে? অতএব যুক্তির খাতিরেই বলতে

হচ্ছে যে, সামাজিক মানুষের সহজ প্রবৃত্তির মধ্যেও হত্যার বীজ বপন করা হয়েছিল। কমরেড চেট্টিয়ার, আমরা এবার মানুষের জীবন থেকে রাজনীতি কেড়ে নিচ্ছি। রাজনীতি থাকবে ভারতবর্ষের ক্রেমলিনে—গুটিকয়েক লোক তাই নিয়ে ডুবে থাকবে চব্বিশ ঘণ্টা। মানুষের সামনে খাবার থালা সাজিয়ে দেবে রাষ্ট্র; তাতে ভাত থাকবে, রাজনীতি থাকবে না।"

চেট্টিয়ার জানলা দিয়ে মুখটা বার ক'রে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, "এখনও দেরি আছে।—দেরি আছে নতুন সভ্যতার স্টেশনে পৌঁছতে। কমরেড চৌধুরী, ভাতের থালা সবার সামনেই সাজিয়ে দেবেন, বিনিময়ে ওদের কাছ থেকে কিছু চাইবেন না?"

"চাইব। চাইব ওদের পুরো আত্মসমর্পণ। কেবল শ্রম দিলেই চলবে না, মনটাকেও দিয়ে যেতে হবে। পেট ভ'রে ভাত খেতে পেলে ওরা আর কিছুই চাইবে না। নতুন সভ্যতায় কেউ তো আর মন এবং আত্মার বোঝা বইতে চাইবে না কমরেড চেট্টিয়ার।"

"দাসত্বের শেকল যারা পরে তারা কেবল লোহার বোঝাই বয়। মন ও আত্মার বোঝা তারা বইবে কি ক'রে কমরেড চৌধুরী?"

"দাসত্ব? কার কাছে দাসত্ব করবে ওরা? রাষ্ট্রের কাছে। রাষ্ট্র হবে শ্রেণীহীন সর্বহারার নিজস্ব সম্পত্তি। পার্টি কেবল ওদের হয়ে যোগাবে বুদ্ধি, খেলবে রাজনীতির খেলা, সমাধান করবে লক্ষ সমস্যা। কিন্তু আপনি পালিয়ে এলেন কেন মিঃ চেট্টিয়ার?"

"কি করব, বন্দীশালায় ঘুম আসছিল না।"

"বুর্জোয়ারা আমাদের বন্দীশালায় কোন দিনই ঘুমতে পারে না। আত্মজীবনী লেখবার সুবিধে দিলেও আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে বই লিখবেন। আপনার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটল কেন?"

"ছ' ফুট উঁচুতে ঢালু মত সিমেন্ট দিয়ে তৈরি দু'হাত চওড়া একটা তাক আছে। শুতে গেলে গড়িয়ে পড়তে হয়। চিৎ হয়ে শোয়া যায় না। উপুর হয়ে শুতে হবে, আর সেই সময় এক হাত দিয়ে ঢালু বিছানার ওপরের দিকটা ধরে থাকতে হবে। হাত যদি কোন রকমে আলগা হয়ে যায়, তবে গড়িয়ে

পড়বেন মেঝেতে। মেঝেটাও আবার শুকনো নয়, রাত্রিবেলা এক হাঁটু উঁচু ক'রে জল ধরে রাখে। দেয়ালের গায়ে কল বসানো আছে। শুনেছি ভারতবর্ষের কোন ইঞ্জিনিয়ারের মাথা থেকে এই স্থাপত্য-শিল্পের উদ্ভব হয় নি, বল্‌কানস্ থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ডাকতে হয়েছে।"

"বুর্জোয়াদের প্রপোগাণ্ডা শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল! তা' ছাড়া শ্বশুরবাড়ির সুখসুবিধে কোন্ দেশের বন্দীশালায় পাওয়া যায় বলুন?"

এই সময় গাড়ির গতি অনেকটা কমে এল। চেট্টিয়ার বাইরের দিকে মুখ বার ক'রে চারপাশটা দেখে নিলেন একবার। তারপর বললেন, "আমাকে ধরবার জন্যে মাদ্রাজ শহরের প্রতি ঘরে রেড গার্ডরা একবার ক'রে উঁকি দেবে। এক ইঞ্চি জায়গা ওরা না দেখে ছেড়ে আসবে না। হয়তো সমুদ্রের উপকূলে ডুবুরী নামিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখবে, আমি সেখানে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে আছি কি না। কমরেড চৌধুরী, আমি ধরা পড়তে চাই না—পালিয়ে যেতে চাই। আশা করি ভারতবর্ষের পয়লা নম্বর কমিউনিস্ট আমায় সাহায্য করবেন পালিয়ে যেতে। আত্মসমর্পণের পরেও যারা আঘাত করে তারা 'এপিক' চরিত্রের হিরোইজ্‌মের অর্থ জানে না। আমি রইলুম আপনার ঐ স্নানঘরে। আমাকে রক্ষা করবার দায়িত্ব রইল আপনার।"

চেট্টিয়ার স্নানঘরে গিয়ে ঢুকলেন। গাড়ির গতি এই সময় একেবারে কমে এল। আমি দেখলুম, গাড়িটা থামতেই স্টেশনের রেড গার্ডরা চারদিকে ছোটাছুটি করছে। পেছন দিকের কামরাগুলোতে দু'চার জন ক'রে রেড গার্ড ঢুকে পড়ছে। একটু পরেই কমরেড আয়েংগার এলেন, বললেন, "এই মাত্র খবর এল, বিশ্বাসঘাতক চেট্টিয়ার পালিয়েছে!" তিনি ছুটলেন গার্ডের কামরার দিকে। গাড়িটা ছাড়তে কিছু বিলম্ব হবে।

দেহরক্ষী ঘোষ পিস্তল উঁচিয়ে আমার কামরার সামনে পায়চারি করতে লাগল। সে বলল, "প্রত্যেক যাত্রীর ছাড়পত্র দেখতে একটু সময় নেবে। আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি কামরার আলো নিবিয়ে দিচ্ছি।" এই ব'লে কমরেড ঘোষ লাফিয়ে গাড়িতে উঠলেন। এবার যেন প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছে অতি দীর্ঘ ব'লে মনে হ'তে লাগল। কামরার আবহাওয়ায় নাটকীয়

উৎকণ্ঠা অনুভব করলুম। ব'সে থাকা আমার পক্ষে আর সম্ভব হ'ল না। কমরেড ঘোষ যখন একটা বাতি নিবিয়ে দিয়ে দু' নম্বর সুইচে হাত দিতে যাচ্ছিল, আমি তখন নিজেই স্নানঘরে গিয়ে ঢুকলুম। দু' মিনিট পরে স্নানঘর থেকে বেরিয়ে দরজাটা বন্ধ করতে করতে বললুম, "এবার বাতিটা নিবিয়ে দাও।" সুইচটা বাইরেই ছিল। কমরেড ঘোষ বাতি নিবিয়ে দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেল। অন্ধকার কামরায় শুয়ে শুয়ে আমি যেন প্রশ্ন করলুম, "মিঃ চেট্টিয়ার, আপনি আমার কাছে কি রকম ব্যবহার প্রত্যাশা করেন ?"

চেট্টিয়ারের জবাবও যেন শুনলুম, "যিনি মহৎ তাঁর কাছে মহৎ ব্যবহার ছাড়া আর কিছুই প্রত্যাশা করি না।"

চেট্টিয়ারের জবাবটা আমি নিজের মনেই সাজিয়ে নিয়েছিলুম। নইলে, কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের একজন প্রধান শত্রুকে আমি রক্ষা করতে যাবই বা কেন ? তা ছাড়া, মহত্ত্ব কেবল আমার ব্যবহারেই প্রকাশ পায় নি, বুর্জোয়া চেট্টিয়ারের ব্যবহারেও মহত্ত্ব ছিল। ইচ্ছে করলেই তিনি আমায় গুলি ক'রে মেরে ফেলতে পারতেন। আমার মৃতদেহটা ফেলে দিতে পারতেন জানলা দিয়ে ছুঁড়ে। পরের দিন মাদ্রাজের মাঠে উড়ে আসত অসংখ্য শকুন। দীপক চৌধুরীকে খুঁজে পেত না কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের গুপ্ত পুলিশের দল। ভারতবর্ষের প্রাচীরের গায়ে নতুন পোস্টার পড়ত। গত বিশ বছরের ইতিহাস হারিয়ে যেত মাংস-লোভী শকুনের ক্ষুধিত চঞ্চুর চরম চর্বণে। নৃতত্ত্ববিজ্ঞের নখর দংশনে আবিষ্কৃত হ'ত না দীপক চৌধুরীর কঙ্কাল-ঐতিহ্য।

গাড়ি ছাড়বার পর চেট্টিয়ার বেরিয়ে এলেন স্নানঘর থেকে। বললেন, "বাতি জ্বালবার দরকার নেই। ভোর হওয়ার আগেই আমি নেমে যাব। হয়তো লাফিয়ে পড়তে হবে চলন্ত গাড়ি থেকে। তারপরও যদি বেঁচে থাকি, আমার অস্তিত্বের আগুন আপনাদের গায়ে লাগবে।"

"বুর্জোয়া আগুনের তাপ আমাদের চামড়ায় আর কোন রেখাপাতই করতে পারবে না মিঃ চেট্টিয়ার। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ক্ষতিপূরণ আর কোনদিনই হবে না। আপনার উচিত ছিল, আমাদের বন্দীশালায় তিলে তিলে মরে যাওয়া। ইংরেজকে ঠকাবার জন্যে কংগ্রেসের খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন। কংগ্রেসকে

ঠকাবার জন্যে এসেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। মুখোশ যখন একবার খুলে পড়েছে, বুর্জোয়া সমাজও আপনাকে স্থান দেবে না। কুকুর লেলিয়ে দেবে, কামড়ে কামড়ে আপনার মাংস ছিঁড়ে নেবে। তার চেয়ে আমাদের সিমেন্টের তক্তাপোশে উপুর হয়ে শুয়ে থাকাই আপনার ভাল হ'ত। এ ছাড়া আপনি আর কি-ই বা করতে পারতেন?"

"প্রশ্নটা ঠিক তা নয়। কি করব, সেইটেই আসল প্রশ্ন।"

"কি করবেন ব'লে ভাবছেন মিঃ চেট্টিয়ার? প্রতিরোধ আন্দোলন?"

"হ্যা। ওকি, উঠছেন কেন কমরেড চৌধুরী?"

"উঠছি? আমি উঠছি না কি?"

"অন্ধকার হ'লেও আমি দেখতে পাচ্ছি। হাতটা নামিয়ে আনুন।"

"গাড়ির শেকলটা একটু টানব না?"

"আমি পিস্তলের ঘোড়া টানছি কমরেড চৌধুরী। হাত নামিয়ে নিন।" ধমকে উঠলেন চেট্টিয়ার।

তারপর চেট্টিয়ার ওপাশের দরজা খুললেন টের পেলুম। পিস্তলটা আমার দিকে তাক করেছেন, তাও বুঝতে পারলুম। তবু হাতটা যেন নামিয়ে আনতে পারলুম না। মহত্বের বিনিময়ে যে মহত্বই দেখাতে হবে তেমন যুক্তি শেষ পর্যন্ত টিকতে চাইছে না। আমি বললুম, "গাড়ির শেকল আমি টানব।"

"পিস্তলের গুলি আমি ছুঁড়ব।"

"তবু গাড়ি আমায় থামাতেই হবে চেট্টিয়ার—"

"তবে মরতেই হবে আপনাকে কমরেড চৌধুরী।"

এই সময় গাড়ির গতি অনেক কমে এল। সামনে বোধহয় কোন স্টেশন আসছে। ঝুপ্ ক'রে চেট্টিয়ার ঝুলে পড়লেন। আমি ছুটে গেলুম ওপাশের দরজায়। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবু আমি বোধহয় মিনিট তিনেক দাঁড়িয়ে রইলাম খোলা দরজার সামনে। ইচ্ছে হ'ল, আমি লাফিয়ে পড়ি, ছুটে যাই চেট্টিয়ারের পেছনে পেছনে। বাইরের ঘন অন্ধকার আমায় আকর্ষণ করছিল; মনে হ'ল কে যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। বাতাসের

গর্জনের মধ্যে শুনতে পাচ্ছি চেট্টিয়ারের চীৎকার। প্রতি মুহূর্তে আমারও লাফিয়ে পড়বার লোভ অদম্য হয়ে উঠতে লাগল। চেয়ে রইলুম অন্ধকার দিগন্তের দিকে। ভুলে গেলাম নিজের চেতন-অস্তিত্ব। নাকের ওপর দিয়ে একটা প্রাচীর নেমে এল। তারপর আমার দেহ সংলগ্ন হয়ে অপর তিনদিকেও তিনটে প্রাচীর খাড়া হয়ে উঠল। একটা আবদ্ধ খাঁচায় আমি সুরক্ষিত হয়ে রইলুম। স্বাধীন সত্তা লুপ্ত হ'ল দিগন্তব্যাপী ভারতরাষ্ট্রের পিঞ্জর-গুহায়। চেট্টিয়ারের নাকের নিশ্বাস আমার গায়ে লাগছে, অথচ হাত দিয়ে তাঁকে ছুঁতে পারছি না! কত কাছে, তবু কত দূরে!

বাঙ্গালোর এক্সপ্রেসের শেকল টানতে গিয়ে চেট্টিয়ার আমার নিজের হাতের শেকলটা বোধ হয় দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। গাড়িটা কখন যে থেমে গেছে, টের পাই নি। কমরেড ঘোষ আমার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। কামরায় বাতি জ্বালানো। ওপর দিকে চেয়ে দেখলুম, শেকলটা ঠিকই আছে। আমি বোধ হয় স্বপ্ন দেখছিলুম। স্বপ্ন? হয়তো তাই।

কমরেড ঘোষ জিজ্ঞাসা করল, "আপনি ভয় পেয়েছিলেন নাকি?"

"কেন? আমি ভয় পাব কেন?"

"আপনি ভীষণ জোরে একবার চেঁচিয়ে উঠেছিলেন।"

"কই, মনে পড়ছে না ত! ঠিক শুনেছ?"

"হ্যাঁ। কামরায় কেউ উঠেছিল নাকি? * মনে হ'ল, দরজা দিয়ে কে যেন লাফিয়ে পড়ল।"

"ঠিক দেখেছ লাফিয়ে পড়তে?"

"ঠিক দেখি নি, সন্দেহ হ'ল, যেন কি একটা গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ল দূরে।"

"তোমার কথা শুনে আমার এবার সত্যিই ভয় করছে। তুমি আমার কামরাতেই থাকো কমরেড ঘোষ।"

রাত প্রায় শেষ হয়ে আসছে। আমি শুয়ে আছি বটে, কিন্তু চোখে আমার ঘুম নেই। দেহরক্ষী কমরেড ঘোষ শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে পিস্তল হাতে নিয়ে। মাঝে মাঝে এ-দরজা থেকে ও-দরজা পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে বাইরের দিকে উঁকি

দিচ্ছে সে। মাদ্রাজের কালো আকাশে নক্ষত্রের আলো ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। একটু পরে কি মনে ক'রে সে স্নানঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সন্দেহ তার এখনও কাটে নি।

স্নানঘর থেকে বেরিয়ে এল কমরেড ঘোষ। দেখলুম, উত্তেজনায় তার হাত কাঁপছে! এক তাড়া ছাপানো কাগজ রয়েছে তার হাতে। জিজ্ঞাসা করলুম, "এ-সব কি ?"

"সাবোটাজ!" কমরেড ঘোষ গর্জন ক'রে উঠল, "বুর্জোয়া পঞ্চম বাহিনীরা কাজে নেমে পড়েছে কমরেড চৌধুরী! এই দেখুন, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার আহ্বান জানাচ্ছে চেট্টিয়ার।"

আমরা বাঙ্গালোর ষ্টেশনে পৌঁছে গেলুম।

ঘড়ি মিলিয়ে বক্তৃতা শেষ করতে কোন অসুবিধা হ'ল না। প্রতিদিন একটা ক'রে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছি, অথচ কি বলছি আমি, এক ঘণ্টা পরে তা আর মনে থাকছে না। মনে থাকবার প্রয়োজনই বা কি ? বক্তৃতা আমার নিজের নয়, বক্তৃতা পার্টির। কোন বিশেষ ব্যক্তির বক্তব্যের চেয়ে পার্টির বক্তব্য বড়। ব্যক্তির ভুল হ'তে পারে, পার্টির ভুল হবে না। অতএব সমবেত জনতার সামনে ঘড়ি মিলিয়ে ঠোঁট নাড়তে নাড়তে সমগ্র দক্ষিণ-ভারত পরিক্রমায় আমার মাত্র পনর দিন লাগল। ফেরবার মুখে মাদ্রাজে একদিন থাকতে হ'ল আমায়। ছিলুম চেট্টিয়ারের বাড়িতেই।

সন্ধ্যের সময় আয়েংগার এলেন। সঙ্গে তাঁর দুটি মেয়ে ছিল। একটির বয়স বছর পনর ও অন্যটির বছর তেরো ব'লে মনে হ'ল। আয়েংগার পরিচয় করিয়ে দিলেন, "আপনার বোন। জ্ঞানশংকর চৌধুরীর মেয়ে রমলা আর শীলা। 'উটি' থেকে কলকাতায় ফিরছে। আপনার সঙ্গেই যাবে ওরা।"

আজ আমার বিশ্রামের দিন। তাই আয়েংগার বোন দু'টিকে আমার কাছে রেখে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। চলে যাবার পর, আমি কি করব তাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম এই জন্যে যে, আমি মুহূর্তের মধ্যে ফিরে গিয়েছিলাম অতীত দিনের গোয়াবাগানে। খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম ঠাকুরদাকে।

সেদিন হাওড়া থেকে গোয়াবাগানে ফিরে যেতে আমার চোখ ফেটে জল আসছিল, আজ আবার সেখানে ছুটে যেতে এক মুহূর্তও লাগল না! সেদিন এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে ব'লে ঠাকুরদা চেয়ে বসেছিলেন দরজার দিকে, কর্তব্যপরায়ণা অনীতা প্রতীক্ষা করছিল তার নিপুণ হাতের সমারোহ সম্ভার নিয়ে, কিন্তু আজ এদের গ্রহণ করবার জন্যে একটা আঙুল পর্যন্ত নড়ে উঠল না! স্নেহ ও ভালবাসার বটবৃক্ষ গোয়াবাগানের মাটি থেকে উৎপাটিত হয়েছে। অতএব এরা সেই বটবৃক্ষের ছায়া থেকে বঞ্চিত হ'ল।

কি যে ভাবছিলাম আজ আর আমার মনে নেই। বোধ হয় ওদের দিকে আমি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়েছিলাম অনেকক্ষণ পর্যন্ত। ওরাও অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়েছিল। অভ্যর্থনার কোন রকম ইঙ্গিৎ পেল না ব'লেই সম্ভবত রমলা আমাকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিল, "আমরা তোমার বোন।"

"বোন? ও, হ্যাঁ বোন। তোমরা ব'স।"

জড়সড় হ'য়ে ওরা আমার বিছানার পাশেই বসল। আমরা তিনজনে মিলে চেষ্টা করতে লাগলাম স্বাভাবিক হবার জন্যে। আয়েংগারের ঘোষণায় প্রমাণিত হয়েছে, ওরা আমার বোন। বোন নিশ্চয়ই, ছোট কাকার মেয়ে ওরা। কিন্তু সম্পর্কের স্বাভাবিকতা কেউ যেন আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। নিঃশব্দে ব'সে রইলাম আমরা। কোটি কোটি ভারতবাসীর সামনে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছি, দূরের মানুষদের নিকটে টানবার রাজনীতির দড়ি ধ'রে দিনরাত টানাটানি করছি, অথচ ছোট কাকার মেয়েদের কাছে টানবার মত ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না! কমিউনিস্টদের কি বোন থাকতে নেই? না হয় দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি পনর বছর, তাই ব'লে কি রক্তের সম্পর্ক জলের চেয়েও পাতলা হবে? ব'সে ব'সে নিজের কাছেই নিজে অনেক রকমের প্রশ্ন উত্থাপন করতে লাগলাম। গোয়াবাগানের বটবৃক্ষের অভাব বোধ করতে লাগলাম প্রতি মুহূর্তে। গোয়াবাগানের স্বাভাবিকতা নষ্ট করবার জন্যে গত বিশ বছর ধ'রে আমি কী-ই না করেছি! আজকে আবার সেই স্বাভাবিকতার অভাবটাই আমার কাছে বড় হয়ে উঠতে লাগল। স্নেহের উত্তাপ দিয়ে যদি ছোট কাকার মেয়েদের দ্রব ক'রে ফেলতে হয়, তাহলে বোধ হয় আমাদের ফিরে যেতে হবে

গোয়াবাগানেই। উপস্থিত চেট্টিয়ারের বাড়িতে বসেই উত্তাপ-উপকরণের অনুসন্ধান করতে লাগলাম।

জিজ্ঞাসা করলুম, "অনেকগুলো বছর তো কনভেন্টে রইলে, কি শিখে এলে ?"

নৈঃশব্দের পীড়ন থেকে মুক্তি পেয়ে শীলা জুতো নিয়েই উঠে বসল বিছানায়। আমার হাত ধ'রে সে ব'লে ফেলল, "নিজের মত ক'রে প্রতিবেশীকে ভালবাসতে শিখে এসেছি।"

সহসা বড় কাকার কথা মনে পড়ল। তিনি প্রায়ই বলতেন, "প্রতিবেশী কে ? জগতের প্রতিটি জীবিত অস্তিত্বই আমাদের প্রতিবেশী।"

রমলা বলল, "আমরা যা শিখে এসেছি তা বোধ হয় আমাদের ভুলে যেতে হবে।"

"কেন ?"

"সিষ্টার আইলীন আসবার সময় ব'লে দিয়েছেন যে, তোমরা নাকি আমাদের ভুলে যেতে বাধ্য করবে।"

"সিষ্টার আইলীন ? নামটা যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে। তিনি কি কার্শিয়ং-এ ছিলেন ?"

"হ্যাঁ।"

"তিনি উটিতে এসেছেন কবে ?"

"প্রায় ছ'মাস আগে।" শীলা আমার কোল ঘেঁষে বসল, তারপর জিজ্ঞাসা করল, "দাদুর কাছে কবে আমরা যাব ?"

"দাদু তো নেই, মারা গেছেন।"

রমলা ও শীলা দু'জনেই হাত দিয়ে ক্রুশের চিহ্ন আঁকল। তারপর দু'জনেই মেজেতে ব'সে প্রার্থনা করল, "হে প্রভু, দাদুর আত্মার যেন শান্তি হয়।"

আমি অবাক হয়ে দেখতে লাগলুম ছোট কাকার সন্তান দু'টিকে। ঐতিহাসিক জড়বাদের একটা অক্ষরও এদের স্পর্শ করে নি, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-ঐতিহ্যের মাধ্যাকর্ষণে ছোটকাকা পাকা আপেলের মত স্খলিত হয়েছেন বহু বছর পূর্বেই—অথচ রমলা ও শীলা আজও নতজানু হয়ে হাত বাড়িয়ে রইল

প্রাচীন সভ্যতার প্রথম সত্যের দিকে। অবাক হ'য়ে বেশীক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকতে পারলুম না। শঙ্কিত হ'য়ে উঠলুম ওদের আচার অনুষ্ঠানের ঘটা দেখে। আয়েংগার কিংবা কৃষ্ণানের চোখে এ-দৃশ্য ভাল লাগবে না। দু'জনকেই আমি হাতে ধ'রে তুলে নিয়ে এলুম খাটের ওপরে। বললুম "যেখানে-সেখানে অমন ক'রে বসে পড়তে নেই, জামা কাপড়ে ধুলো লাগবে যে!"

"আমরাও তো একদিন ধুলো হয়ে যাব!" শীলার বাক্যাড়ম্বর ক্রমশই বাড়তে লাগল।

রমলাকে বললুম, "একটু সামলে সুমলে থাকতে হবে ভাই। গত দশ বছর ধ'রে তোমরা যা শিখেছ, তা ক্রমে ক্রমে সবই ভুলে যেতে হবে। তোমাদের ভুলিয়ে দেবার ভার নিয়েছে কমিউনিস্ট রাষ্ট্র।"

রমলা জিজ্ঞাসা করল, "আমাদের ভগবানও কি ভুল?"

"কমিউনিস্ট-সভ্যতায় ভগবানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে। অতএব ভগবান-সত্য থেকে যে-সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছিল তাও আর আমরা রাখব না। গ্যালিলিও কোপার্নিকাস ইত্যাদির নাবালকত্বকে বিজ্ঞান ব'লে চালিয়ে দিলে কমিউনিস্টরা তা শুনবে কেন?"

"অন্ধকারযুগে তো কেউ শুনতে পায় নি—ইতিহাসে এর নজির আছে। কিন্তু ডার্ক এজের সঙ্গে কি কমিউনিস্ট যুগের কোন তফাতই নেই?" রমলার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগেই শীলা বিতর্কের উপর উপসংহার টেনে দিল, "অত শক্ত কথা সব বুঝতে পারি না—সভ্যতা অসভ্যতাও জানি না। তোমাদের দেশে যদি ভগবান না থাকে তো তোমরাই মরবে। আমাদের বিশ্বাস আমরা ছাড়ব না—বাবা আর মা যদি আমাদের ল্যাম্প-পোস্টের সঙ্গে ঝুলিয়েও দেন, আমরা ঝুলব, তবু বিশ্বাস হারাব না। সিস্টার বলেছেন, ব্ল্যাস্‌ফেমির মত পাপ আর নেই। তুমিও আমাদের সঙ্গে হাত মেলাও।" এই ব'লে শীলা তার হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে।

আমি আর হাসি চেপে রাখতে পারলুম না। শীলাকে টেনে নিলুম দু' হাতের মধ্যে। বললুম, "তোদের দেখবার জন্যে ঠাকুরদা কত আশা ক'রেই না বসেছিলেন। লণ্ডনের ওপর যখন খুব বোমা পড়ছিল, ঠাকুরদা তখন রেডিও

খুলে ব'সে থাকতেন বি-বি-সি'র ঘোষণা শোনবার জন্তে। জানিস শীলা, ঠাকুরদার মত এত ভালমানুষ ভারতবর্ষে আর জন্মাবে না।"

এই সময় রমলা উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এল। ছিটকিনি লাগিয়ে দিল ভেতর থেকে। আমরা তিনজনে মিলে পুরনো দিনের গোয়াবাগানকে গ'ড়ে তুলতে লাগলুম মাদ্রাজের মায়লাপুর পাড়ায়। বিশ বছর পরে, আজ আমার বিশ্রামের দিন এসেছে। দেহরক্ষীরা ঘরে এসে আর বিরক্ত করবে না, সময়ের মুখে ঘড়ির কাঁটার লাগাম থাকবে না, দর্শনপ্রার্থীর তালিকাও আজ শূন্য।

শীলা তার জামার পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার ক'রে আমার চোখের সামনে তুলে ধ'রে বলল, "চৌধুরী পরিবারের জিনিয়োলজি—বংশতালিকা। ছবিগুলো সব আমার আঁকা।"

আমি দেখলুম, শীলা সত্যি সত্যি চৌধুরী পরিবারের প্রত্যেকেরই ছবি এঁকেছে। জিজ্ঞাসা করলুম, "তুই তো কাউকেই চোখে দেখিস নি, অথচ প্রত্যেকটা মানুষের সঙ্গে দেখছি পোর্ট্রেটগুলোর অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে! কেমন ক'রে হ'ল রে?"

"সে সব গুপ্ত খবর তোমায় পরে বলব।"

রমলা ধমকে উঠল, "শীলা—"

শীলার চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল। বংশ-তালিকাটা হাতে নিয়ে সে চুপ ক'রে বসে রইল। স্লাভ-রক্তের চাপা-প্রতিবাদ অনুচ্চারিত রইল রমলার শাসন-সংযত সতর্ক-ধ্বনিতে। একটু পরে শীলা আবার বলতে লাগল, "ঠাকুরদাকে বসিয়েছি একটা বড় পাহাড়ের ওপরে। তার নীচে রয়েছে তিনটে ছোট পাহাড়, দুই জ্যেঠামশাই আর বাবা। বড় জ্যেঠামশাই-পাহাড়ের তলায় দেখ দু'টো ঢিপি, একটা তুমি আর অপরটা অনীতাদি। চিনতে পারছ?"

বললুম, "সবাই পারবে চিনতে। গুপ্ত পুলিসরা যারা ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তারাও পারবে। অনীতাকে না দেখলে এমন ছবি আঁকা তো সম্ভব নয়।"

আমার মন্তব্য উপেক্ষা ক'রে শীলা পুনরায় বলতে লাগল, "তোমার ছবি এঁকেছি পোস্টার দেখে। আমাদের কনভেন্টের দরজায় তোমার পোস্টার লাগিয়েছে 'উটির' রেড গার্ডরা।"

"মিস্টার-রা আপত্তি করেন নি ?"

"বল কি দীপুদা ? তোমার জন্যে ওঁরা প্রতিদিন গীর্জেতে প্রার্থনা করেন ! প্রার্থনা করেন, তোমার যেন মঙ্গল হয় ।" এই ব'লে শীলা তার বংশ-তালিকা ভাঁজ ক'রে পকেটে রেখে দিল। জিজ্ঞাসা করলুম, "মুকুর ছবিটা কি হ'ল ?"

"মুকুদির ছবিটা হয় নি ।"

"কেন ?"

"মুকুদির বড্ড বেশী ছদ্মবেশ—আমি যতবারই রং আর তুলি নিয়ে বসি, ততবারই আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে মস্তবড় একটা ক্যামুফ্লাজ। আসল চেহারাটা ধরতে পারি না ।"

বললুম "থাক না ছদ্মবেশ, থাক না ক্যামুফ্ল্যাজ, শিল্পীর দৃষ্টিতে তার আসল চেহারা ধরা পড়বেই। অনীতার মত সাদা চেহারা সবাই আঁকতে পারে। কিন্তু মুকুদিকে আঁকতে গেলে কেবল রং আর তুলি নিয়ে বসলে হবে না, দৃষ্টি নিয়ে বসতে হবে। শীলা, ভারতবর্ষের ক্রেম্‌লিনে তোমায় আমরা শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আসন দেব, যদি তুমি মুকুদির একটা সত্যিকারের ছবি আঁকতে পার।"

"ক্রেমলিনে আমি যেতে চাই না। আমায় তোমরা চৌধুরী পরিবারের আর্ট-গেলারিতে একটু স্থান দিও।"

"আর্ট-গেলারিতে আর কিছু নেই। ছোটকাকা সব ফেলে দিয়েছেন।"

"আমি সবাইকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসব দীপুদা। বাবা আর মা আপত্তি করবেন জানি। কিন্তু ওঁদের মত বড় মানুষদের কি তুমি ভারতবর্ষের বাইরে পাঠিয়ে দিতে পার না দীপুদা, এই ধর পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ক্রেম্‌লিনে ?"

"শীলা ! তোরা কি প্রতিরোধ আন্দোলনের গুপ্ত সদস্য না কি ?"

এবার রমলা জিজ্ঞাসা করল, "ভয় পাচ্ছ না কি দীপুদা ?"

"ভয়ের কারণ আছে বৈ কি।"

"কেন, তোমার গুপ্ত পুলিসরা বুঝি দেয়ালের গায়ে যান্ত্রিক-কান লাগিয়ে রেখে গেছে ? দেখ দীপুদা, কর্মক্লান্ত মানুষ যদি কারখানা আর খামার থেকে ফিরে এসে তার নিজের বাড়িতে স্ত্রী-কিংবা ভাই বোনের সঙ্গে প্রাণখুলে দু-একটা কথা কইতে না পারে, তবে তোমাদের গম আর মাখন খেয়ে তো তেমন

মানুষরা কেউ বাঁচবে না দীপুদা। মানুষ বাড়ি ফিরে স্ত্রী-পুত্রকেই চাইবে, গুপ্তচর চাইবে না, চাইবে না যান্ত্রিক-কান।"

"উপস্থিত তাই নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই রমলা। কারণ, কনভেন্টগুলো সমূলে উৎপাটিত হবার পর, এ-সব কথা আর কেউ শিখতে পারবে না। শিখতে না পারলে, প্রচারের সুযোগ যাবে নষ্ট হ'য়ে। কিন্তু তোদের যদি আমি চোখে চোখে না রাখতে পারি, তবে আমার চোখেও ঘুম আসবে না।"

"আমাদের জন্যে তোমার এত ভয় কেন?" প্রশ্ন করল রমলা।

"অনাবশ্যক লাঞ্ছনায় লাভ কি বল্?"

"লাঞ্ছনা সহ্য করবার শিক্ষা আমরা পেয়ে এসেছি দীপুদা।"

"জানি, ক্রুশের লাঞ্ছনা-প্রতীক তোদের কাছে গৌরবের জয়পতাকা। গত দু'হাজার বছরে কতবার প্লাবন এল, কতবার ঝঞ্ঝা এল, তবু তোদের জয়পতাকা উড়ছে। কিন্তু এবার? এবার তোরা কি করবি? পতাকা বহনের গর্ব তোদের ক্ষুণ্ণ হবেই।"

"গর্ব নয় দীপুদা, বিনয়—বহনের হিউমিলিটি," গম্ভীরভাবে ব'লে ফেলল শীলা। তেরো বছরের মেয়ের গাম্ভীর্য যেন আমায় ক্রমশই ধাক্কা মারতে লাগল। আমি আমার বিদ্যাবুদ্ধির পাহাড়ের চূড়া থেকে গড়িয়ে পড়তে লাগলাম অনিবার্যভাবে। অনীতা তার যুক্তির চাতুর্য দিয়ে যা পারে নি, এরা এদের বিশ্বাসের গাম্ভীর্য দিয়ে তা পারল। আমি দুর্বল বোধ করতে লাগলাম।

ওদের গাম্ভীর্যকে খেলো করবার জন্যেই বোধ হয় আমি সহসা গভীরতর কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, "পতাকা বহনের বিনয়বোধ তোদের অসীম সে কথা বুঝলাম। কিন্তু বহন করবি কোথায়? মামার বাড়ি তো নেই—" বাধা দিয়ে রমলা বলল, "জানি লিথুয়েনিয়ার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু সব মানুষের সবটুকু মানসিক বৈশিষ্ট্য সব সময়ের জন্যে বিলুপ্ত হতে পারে না। দীপুদা, মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্রে এত বালি আর পাথর, মনে হয় এত উত্তপ্ত অঙ্গারের মধ্যে বুঝি একগাছা তৃণ পর্যন্ত জন্মাতে পারে না। কিন্তু হঠাৎ সেখানেই একদিন মায়ের কোল চেপে এল জগতের সবচেয়ে বড় সৃষ্টি,

বিজ্ঞজনের চোখে পরিস্ফুট হ'ল পুব-আকাশের তারা। লিথুয়েনিয়ায় মানচিত্রের সীমারেখা মানুষ মুছে দিয়েছে সত্যি, কিন্তু যারা পুব-আকাশে তারার আলো দেখতে পেয়েছে, তাদের দৃষ্টিতে লিথুয়েনিয়া দুর্মর। যাক সে সব কথা। আমরা তো মামার বাড়ি যাচ্ছি না, যাচ্ছি গোয়াবাগানে। চৌধুরী পরিবারের পুনর্গঠনের দায়িত্ব আমরা নিলুম দীপুদা।"

অস্থির হয়ে উঠলুম। বিছানা থেকে নেমে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলুম। পুরনো দিনের গোয়াবাগানকে গড়ে তুলবার ছেলেমানুষী খেলা করতে গিয়ে ওরা যে আমায় উল্টো-বিপ্লবের সংবর্তে ফেলে দেবে তা আমি ভাবতে পারি নি।

বললুম, "রমলা, চৌধুরী পরিবারের পুনর্গঠনের অর্থ হচ্ছে কাউন্টার রিভলিউশন। বিপ্লবোত্তর বিপ্লব। রাষ্ট্রের আইন অনুসারে এর একমাত্র শাস্তি হচ্ছে প্রাণদণ্ড। তোদের এই প্রতিরোধ আন্দোলনের সর্দার কে রে?"

রমলার হয়ে শীলাই ফস্ ক'রে ব'লে বসল, "ভগবান।"

আমি কিছু বলবার আগেই রমলা জিজ্ঞাসা করল, "তার জন্যে তোমরা কি দণ্ডবিধি ঠিক করবে দীপুদা?"

"অবাস্তব ভুয়ো অস্তিত্বের জন্যে রাষ্ট্র হয়তো আর আইন-কানুন নিয়ে মাথা ঘামাবে না। দু'-চারটে বিজ্ঞপ্তি কনভেন্টের দেয়ালে লাগিয়ে দিলেই কাজ হবে।"

"অবাস্তব অস্তিত্ব? ভুল বললে দীপুদা। ভগবানের অতিবাস্তব অস্তিত্বই জগতের প্রথম সত্য। মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞানের সমগ্র উৎস একদা সেই প্রথম সত্য থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। তারপর গত দু'-তিনশ' বছর ধ'রে মানুষ ক্রমাগত চেষ্টা করছে সেই সত্যের কাছ থেকে স'রে আসবার। বিজ্ঞানের আংশিক সত্য মানুষের চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়েছে। তুমি দেখবে দীপুদা, কমিউনিস্ট-প্লাবনে যখন সমস্ত পৃথিবী ভেসে যাবে, আমাদের জন্যে তখন প্রস্তুত থাকবে 'নোয়ার' নৌকো। তুমি কেন আমাদের সঙ্গে হাত মেলাও না ভাই?"

এদেরই মা খারখোভ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশানে লেখাপড়া শিখেছেন, আর বাবা শিখেছেন বৈজ্ঞানিক বস্তুতত্ত্ববাদ!

রাত্রির খাওয়া শেষ ক'রে ওরা শুতে গেল পাশের ঘরে। যাবার সময় দু'জনেই আমার গালে চুমু খেয়ে বলে গেল, "গুড নাইট দীপুদা।"

রাত একটা পর্যন্ত আমার ঘুম এল না। ঘরের মধ্যে পায়চারি করছি আর ভাবছি অনেক কথা। সত্যিই অনেক কথা। বাইরে রেড গার্ডদের জুতোর শব্দ পাচ্ছি। চেট্টিয়ারের বাড়ির আধ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে একটি জনপ্রাণীও নেই। আমি এখানে বাস করছি ব'লেই এটাকে নিষিদ্ধ এলাকা ব'লে ঘোষণা করা হয়েছে। মায়লাপুর মৃত। চেট্টিয়ার স্বপ্নেও কোনদিন ভাবতে পারেন নি যে, তাঁকে এ-বাড়ি ত্যাগ করতে হবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি এসেছিলেন ভারতবর্ষে। ইংরেজ ও চীনা ধনপতিদের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে তিনি নাম লিখিয়েছিলেন পার্টির খাতায়। আবার তিনি বিতাড়িত হয়েছেন পার্টি থেকে, বিতাড়িত হয়েছেন মায়লাপুর থেকে। পলাতক চেট্টিয়ার এবার আশ্রয় নিলেন দক্ষিণ-ভারতের বনজঙ্গলে। কেবল চেট্টিয়ার কেন, অনীতাই বা কি করছে ? সে ও তো পালিয়ে বেড়াচ্ছে। মুকু কোথায় ? ওর তো পালাবার প্রয়োজন ছিল না। তবে কেন সে মরা বাংলার খানা-ডোবায় ডুবে রইল ? বাবা, মা তাঁদের ঠিকানাও আমার জানা নেই। অন্ধকার ঘরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ আমি থেমে গেলুম। জানলা দিয়ে চেয়ে রইলুম।

আমার মনে হ'ল, বাবা, মা, অনীতা, মুকু সবাই যেন আমার কাছ থেকে সরে পড়বার জন্যে পালিয়ে যাচ্ছেন। আমি দেখলুম চেয়ে, ওঁরা ছুটছেন। প্রতি মুহূর্তে গতি ওঁদের কেবল বেড়েই যাচ্ছে। আমি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিলুম। পেছন ফিরে ওঁরা যেন দেখলেন আমায়। দেখবামাত্র চলার গতি ওঁদের আরও বেড়ে গেল। আমি জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলুম। ইচ্ছে হ'ল, ওঁদের পেছনে পেছনে ছুটে যাই, ফিরিয়ে আনবার জন্যে নয়, ওঁদের সঙ্গে বুঝিবা আমিও পালিয়েই যেতে চেয়েছিলুম। 'ঘাসের রুটির' গর্ব নিয়ে আমার হয়তো পালিয়ে থাকাই উচিত হ'ত। শীতের রাত্রেও ভীষণভাবে ঘামতে লাগলুম। ভারতবর্ষের ক্রেমলিনে ব'সে আমি যে-রাজত্ব শাসন করতে যাচ্ছি সেখানে আমার বাবা, মা, বোন এবং বন্ধু-বান্ধব কেউ থাকবে না।

রাজপুতানার ইতিহাসে চৈতক ছিল, কমিউনিস্ট ভারতবর্ষে আমার থাকবে কেবল চারটে দেয়াল।

আমি দেখলুম, ক্রমে ক্রমে সবাই চলে গেল। চলে গেল? আমি যেতে দেব কেন? আমার গুপ্ত পুলিসের দল সব নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে না কি? ফিরে এলুম জানলার কাছ থেকে। কাউকে আমি যেতে দেব না। প্রত্যেকের ঠিকানা আমি জানব। সবাইকে বসিয়ে রাখব আমার চোখের সামনে। আমিও আঘাত দিতে জানি।

বালিশের তলা থেকে পিস্তলটা টেনে নিয়ে ছুটে গেলুম পাশের ঘরে। রমলা ও শীলাকে টেনে তুললুম ঘুম থেকে। পিস্তলটা ওদের দিকে তুলে ধ'রে জিজ্ঞাসা করলুম, "দু'মিনিটের সময় দিলুম, অনীতার ঠিকানা আমি জানতে চাই।"

শীলা চোখ রগড়ে বলল "তুমি আমাদের খুন করবে না কি?"

"হ্যাঁ। অনীতা কোথায়? চৌধুরী পরিবারের এত খবর তোদের অনীতা ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না।"

শীলা এবার শঙ্কিতভাবে রমলার দিকে চাইল। রমলা মাথা নীচু ক'রে বসে আছে। হয়তো বা পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝবার চেষ্টা করছে। একটু পরে রমলা বলল, "তোমার হাত কাঁপছে দীপুদা। যাঁরা বড় রাজনীতিজ্ঞ তাঁরা নিজের হাতে হত্যা করেন না।"

এরই মধ্যে শীলা ও-ঘর থেকে ঘুরে এসে আমার সামনে নতজানু হয়ে বসল। দু'হাত দিয়ে বুকের ওপরে চার ইঞ্চি মাপের একটা ছোট্ট বই চেপে ধরে বলল, "আমি প্রস্তুত দীপুদা, তুমি গুলি চালাও।"

"গুলি খেয়ে মরবি, তবু অনীতার ঠিকানা বলবি না?"

"না।" শীলা চোখ বুজে প্রার্থনা করতে লাগল।

পিস্তল ছোঁড়বার শক্তি হারিয়েছি অনেকক্ষণ আগেই। এবার সেটাকে ফেলে দিয়ে শীলাকে কোলে তুলে নিলুম। বুকের ওপর প্রাণপণে চেপে ধ'রে বললুম, "শীলু, তোদের কি আমি মারতে পারি ভাই?" এই ব'লে ওকে বিছানার ওপর বসিয়ে দিলুম। রমলা জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কাঁদছ না কি দীপুদা?"

"বোধ হয় শীলার চোখের জল আমার চোখে মুখে গড়িয়ে পড়েছে বোন।"

"তোমায় আজ আমরা ছাড়ব না দীপুদা। আমাদের মাঝখানে তুমি শুয়ে থাকো। রাত জেগে জেগে তোমার চোখের নীচে কালি পড়েছে।"

"আমার কালি বোধ হয় আর কোনদিনই মুছবে না রমলা।"

শীলা এবার ঘোষণা করল, "আমরা তোমার সব কালি মুছে দেব দীপুদা।"

আমি বিছানায় উঠে বসলুম।

রমলা উঠে গিয়ে ওর একটা ব্লাউজ নিয়ে এল। ব্লাউজের তলার দিকের হেম সেলাইগুলো কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলে বার করল একটা কাগজের টুকরো।

অনীতার চিঠি!

শীলা আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, "বিনয়প্রকাশ দিদিকে পৌঁছে দিয়ে গেছেন মাদ্রাজ পর্যন্ত। দীপুদা, তুমি এবার শুয়ে পড়। আমরা তোমায় ঘুম পাড়াব।"

দ্বিতীয় ভাগ

[কমরেড, এই অংশটা ঝুকুর ডাইরি থেকে নেওয়া। তা ছাড়া আমার সঙ্গে অবনী মণ্ডল ও ওবাইদ মোল্লার দেখা হয়েছিল। আমরা একসঙ্গেই ছিলুম। কেবল ছিলুম বললে মিছে কথা বলা হবে। আমি ওদের মধ্যে মিশে গিয়েছিলুম। যে-রাষ্ট্র আমরা গড়েছিলুম কুমারিকা থেকে হিমালয় পর্যন্ত, তার 'নাগরিক সৌভাগ্যে' এরা কেউ মহিমান্বিত হয় নি। সর্বহারার একনায়কত্ব স্পর্শ করে নি এদের কাউকেই। আমাদের 'সমগ্র সাম্রাজ্যের' মধ্যে বসবাস ক'রেও এরা শেষ পর্যন্ত আলাদা হয়েই রইল। কমরেড, ভারতবর্ষ থেকে চলে আসবার আগে আমি ছিলুম এদেরই অংশ, যে-অংশটা বিংশ শতাব্দীর রাজনীতি-নখরে বিক্ষত হ'ল না। তীব্রতম আঘাত পেয়েও মানব সমাজের যে-অংশটা চিরদিন আঘাতকে অস্বীকার ক'রে এসেছে, আমি ছিলুম তারই আজ্ঞাবহ দাস।

ঝুকু, অনীতা, অবনী মণ্ডল এবং ওবাইদ মোল্লাকে আমরা শিবিরের সীমাবদ্ধতায় আটকে রেখেছিলাম বটে, কিন্তু ওদের সজ্ঞান-অস্তিত্বের ওপর দখল আমরা পাই নি। ওদের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক বিস্তৃতি ছিল আমাদের নাগালের বাইরে। আমিও তাই ক্রমে ক্রমে মিশে গিয়েছিলুম ওদের সেই দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের মহা বিস্তৃতির সীমাহীনতায়।]

ভুষণ্ডীর মাঠ থেকে ছুটতে ছুটতে ঘরে ফিরে এল ওবাইদ মোল্লা। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে গর্জন ক'রে ডাকল, "বৌ—মেহের বিবি কইরে?" বিবি মেহেরউন্নিসার সাড়া পেল না ওবাইদ মোল্লা। লম্বা লম্বা পা ফেলে সে এসে ঢুকল গোয়ালে। এক মাস আগে গাইটা তার বাচ্চা দিয়েছে। মাঠে বেরুবার আগে প্রত্যেক দিনই সে বাচ্চাটাকে বাঁশের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখে যায়। একটু বেলা বাড়লে মেহের বিবি ঘুম থেকে উঠে বালতি নিয়ে

আসে এই গোয়ালে। পাইকার তার লোক পাঠাবে দুধ নিয়ে যাবার জন্যে। পাইকারের কাছ থেকে আগাম পয়সা নিয়ে রেখেছে ওবাইদ মোল্লা। দুধ-বেচা পয়সা দিয়ে ওকে চাল কিনতে হয়।

মেহের বিবি নিজের হাতে দুধ দোয়। দোয়াতে ভাল লাগে। তন্দ্রালু চোখে চেয়ে থাকে গাইটার বাঁটের দিকে। মেহের বিবি ধীরে ধীরে দড়িটাকে আলগা ক'রে দেয়। বাছুরটা ছুটে এসে বাঁটের মুখে গুঁতো মারতে থাকে। দুধ আসছে। বালতি নিয়ে মেহের বিবি বসে দুধ দোয়াতে। বাছুরটা পাশে দাঁড়িয়ে ছটফট করে।

দুধ দোয়াতে দোয়াতে সে ভুলে যায় গরুর কথা। বাছুরটার ছটফটানি তার চোখেও পড়ে না। দু'হাঁটুর মাঝখানে ভরা বালতি ধ'রে রেখে মেহের বিবি তার বুকের কাপড় নাড়াচাড়া করতে থাকে। তার মনে পড়ে ওবাইদ মোল্লার কথা। বেলা বুঝি অনেক হ'ল, ভূষণ্ডীর মাঠ থেকে স্বামী আসবে নাশ্‌তা খেতে! পতিত জমিতে লাঙ্গল ঠেলতে ঠেলতে স্বামীর তার বয়স বেড়ে গেছে। পেরেশানের ফসল দিয়ে দু'টি প্রাণীরও পেট চলে না।

আজও সে গোয়ালে বসে দুধ দোয়াচ্ছিল। বালতি প্রায় ভরে এসেছে। বাঁট থেকে হাত নামিয়ে নিয়ে মেহের বিবি দুধের ফেনা মারতে লাগল। ফেনা থাকলে পাইকার বড্ড আপত্তি করে। ছেঁড়া শাড়ির ফাঁক দিয়ে একটা মাছি এসে ব'সে পড়েছে বুকে। ফেনা মাখানো ন'খ দিয়ে মেহের বিবি নিজের বুকে আঁচড় কাটতে লাগল। ওবাইদ মোল্লা দাঁড়াল এসে মেহের বিবির কাছে। জিজ্ঞাসা করল, "কি করছিস বৌ?"

"দুধ দোয়াচ্ছি।" বালতিটা সরিয়ে নিয়ে জবাব দিল বিবি মেহেরউন্নিসা।

"আর কি করছিস্ মেহের?"

"ভাবছি।"

"কি ভাবছিস্?"

"ভাবছি, খোদার রহমত না থাকলে বুকে বোধহয় দুধ আসে না।"

"এতদিন পরে তোর মুখে একটা সাচ্চা কথা শুনলুম মেহের। কেবল হিম্মৎ থাকলেই বাপ হওয়া যায় না।"

একটু চুপ ক'রে থেকে সে পুনরায় বলল, "আঁচড় কেটে কোন লাভ নেই বৌ, ন'খের আগায় কেবল খুন উঠে আসবে।"

একটু ভেবে নিয়ে মেহের বিবি জিজ্ঞাসা করল, "আজ যেন একটু সকাল সকাল নাশতা খেতে এলে? ব্যাপার কি মিঞাসাহেব?"

"কেমন একটু উদাস উদাস লাগছিল, তাই তোকে দেখতে এলুম।"

"পাঁচ বছর তো দেখলে, সাধ মেটেনি?"

"তোর মিটেছে মেহের?" জানতে চাইল ওবাইদ মোল্লা।

চট ক'রে জবাব দিল না বিবি মেহেরউন্নিসা। দুধের বালতিতে হাত ডুবিয়ে নিজেও যেন সাঁতার দিল দুধের দরিয়ায়। যোগ্য জবাবটা বোধহয় খুঁজতে লাগল মেহের বিবি। একটু পরে সে বলল, "মেয়েছেলের নিজের বুকে দুধ না এলে সাধ কখনো মেটে? কিন্তু তুমি এতো জলদি জলদি মাঠ থেকে ফিরলে কেন?"

ওবাইদ মোল্লা জবাব দিল, "কাল রাত্রে একটা স্বপ্ন দেখেছি। ভূষণ্ডীর মাঠ জুড়ে রাশি রাশি ফসল জন্মেছে, সোনার ফসল।" এই ব'লে সে মেহের বিবির গা ঘেঁষে বসল।

মেহের বিবি বলল, "স্বপ্ন দেখার ব্যামো তোমাদের মোল্লা বাড়ির রোগ। তোমার বাপজান তো সারাজীবন নিজের পেটের খিদে মেটাতে পারলেন না। অথচ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তিনি গাড়ি-ভর্তি ক'রে ভূষণ্ডীর পতিত জমি থেকে ধান নিয়ে আসতেন! মোল্লা বাড়ির বরাতে ধান নেই।"

"জানি রে মেহের জানি। মোল্লা বাড়ির বরাতে আধখানা ব্যাটাও নেই।" একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ওবাইদ মোল্লা আঙুল দিয়ে মাটিতে রেখা টানতে টানতে পুনরায় বলল, "একটা আধ সের ওজনের পুঁটলিও যদি হাত পা ছুঁড়তো, তাতেও তোর বুক জুড়তো বৌ।"

"তা জুড়তো। কিন্তু আমি তো স্বপ্ন দেখি না।"

"সমস্তটা দিন তবে কি করিস্ মেহের?"

"ঘুমই। হাত-পা ছোঁড়া পুঁটলি কি স্বপ্নে আসে? তাই ভাবি, মোল্লা বাড়ির বাইরে রয়েছে ভূষণ্ডীর পোড়া মাটি আর ভেতরে রয়েছে আমার পাথুরে গতর।"

"আফশোস করিস নে বৌ, খোদার মর্জি বোঝা মুশকিল। হাঁ, শোন্—" হঠাৎ চুপ ক'রে গেল ওবাইদ মোল্লা।

"কি হ'ল, থেমে গেলে কেন? রাগ করলে না কি? বল না কি বলবে?"

"তোর কাছে ব'লে কোন লাভ নেই মেহের। তুই তো আমার কোন কথাই বিশ্বাস করবি না। কিন্তু বিশ্বাস ছাড়া ত্নিয়ায় কেউ কিছু পায় না বৌ।"

এই ব'লে ওবাইদ মোল্লা গম্ভীরভাবে বসে রইল কতক্ষণ। মেহের বিবি তার স্বামীর জন্যে নাশতা যোগাড় করতে লাগল। মাটির হাঁড়িতে গত রাত্রের ভাত রয়েছে। হাঁড়ি থেকে ভাত নিয়ে সে কলাইকরা থালাতে তুলতে লাগল। তরকারির কিংবা সব্জীর কোন দরকার হয় না ওবাইদ মোল্লার। গাছ থেকে ত্'টো লঙ্কা তুলে নিয়ে এসে সকালের নাশতা সে এমনি সাদাসিধে ভাবেই শেষ ক'রে ফেলে। মোল্লা বাড়িতে ত্'পুরুষ থেকে এই নিয়মই চ'লে আসছে। থালাখানাও বড়মিঞার সম্পত্তি ছিল। বাপ-ব্যাটাতে ত্'জনে মিলেই এক থালায় নাশতা খেত। নাশতা খেয়ে ওরা চলে যেত ভূষণ্ডীর মাঠে লাঙল ঠেলতে। তারপর সেই থালাতেই সাজিয়ে নিত মেহেরবিবি তার নিজের ভাত। লাউ, কুমড়ো, বেগুন ইত্যাদির অভাব ছিল না মোল্লাবাড়ির। অভাব ছিল না বটে, কিন্তু বড়মিঞা মাঠে যাবার আগে প্রতিদিনই গুণে রেখে যেত লাউ-কুমড়োর মোট সংখ্যা।

মেহেরবিবিকে ডেকে বলত, "মেহেরউন্নিসা, লাউ আর কুমড়োগুলো সব আমাদের নগদ টাকা।"

বড়মিঞা মারা যাওয়ার পরেও সেই নিয়মই চলে আসছে। ওবাইদ মোল্লাও মাঠে যাবার আগে বেগুন গাছের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ত্'একটা বেগুনের গায়ে হাত বুলতে বুলতে ভাবতে থাকে, "পাইকারের কাছ থেকে এবার কিছু বেশী টাকা চেয়ে নিতে হবে। মেহেরবিবির একখানা শাড়ি দরকার। পুরনো যেটা ছিল সেটা আর সেলাই করা চলে না।"

মেহেরউন্নিসাকে ডেকে বলে, "ভাবছি একবার হাওড়া-হাটে যাব।"

অবাক হয়ে প্রশ্ন করে মেহেরবিবি, "কেন?"

"তোর একখানা শাড়ি চাই।"

"কি দরকার নগদ টাকা নষ্ট করবার ?"

"বল্লিস কি বৌ, দেহটাকে ঢাকতে হবে তো ?"

লজ্জা পেয়ে মেহেরবিবি আঁচলটাকে ঘাড়ের ওপর দিয়ে টেনে এনে বুকের ওপর চাপা দিয়ে বলে, "মোল্লাবাড়ির হারেমে তোমার আসবে কে ?"

"কাকপক্ষীর চোখে পর্দা নেই ? তোকে দেখলে ওদেরও বোধহয় সরম আসবে।"

তুড়ি দিয়ে ওবাইদ মোল্লা সামনের গাছ থেকে মাছরাঙা পাখিটাকে উড়িয়ে দিল। ওপাশের ডোবা থেকে মাছ ধরবে ব'লে মাছরাঙাটা সেই সকাল থেকে অপেক্ষা করছিল।

"মতলব ছাড়া কাকপক্ষীরাও শুধুশুধু ফাঁকা আসমানে উড়ে বেড়ায় না বৌ।—কাল তোর জন্য একটা শাড়ি কিনে আনব।"

মেহেরবিবি চলে যাচ্ছিল অন্দরমহলের দিকে। লাঙলটাকে ঘাড়ের ওপর তুলে নিয়ে ওবাইদ মোল্লা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "মেহের বিবি, একটু দাঁড়া।"

মেহের বিবি দাঁড়াল।

"মুড়ির কলসীতে দু'পাঁচ টাকা যে জমিয়ে রেখেছিলি, সে টাকায় কি হাত দিয়েছিস ?"

"না। অতো টাকা দিয়ে কি করবে ?"

আকাশের দিকে চেয়ে ওবাইদ মিঞা বলল, "এবারও বোধহয় সময় মত পানি এল না! কি জানি, হয়তো ওসমান গনির কাছ থেকে চড়া দামে চাল কিনতে হবে। বৌ, ভুঁবঙীর জমি থেকে খুন বেরুচ্ছে!"

লাঙলের ফালের মুখে আলগোছে হাত বুলতে বুলতে মেহের বিবি বলল, "কেবল হিম্মত দিয়ে ফসল ফলানো যায় না মিঞা সাহেব।"

"তুই ঠিকই বলেছিস বৌ, খোদার রহমৎ চাই। খোদা মালিক!"

আজ যখন মেহের বিবি থালায় ভাত তুলছিল, ওবাইদ মোল্লার তখন নাশতা খাওয়ার খিদে ছিল না কিছুই। ভাত তোলা শেষ হওয়ার পর ওবাইদ মোল্লা ধীরে ধীরে বললে, "আজ আর কিছু খাব না বৌ, খিদে নেই।"

"খিদে নেই? রাতের স্বপ্ন কি শেষ হয় নি তোমার? এখনও কি স্বপ্ন দেখছ না কি?"

"তোর তো মোল্লা-মসজিদের ওপর বিশ্বাস নেই, সব কথা তোকে তাই বলতে ভাল লাগে না।"

"বল, বল, তোমার স্বপ্নের কাহিনী আমি শুনব।"

"প্রথমে সব জিনিসই স্বপ্ন থাকে, তারপর—" থামল ওবাইদ মোল্লা।

"তারপর কি হয়?" জিজ্ঞাসা করল মেহের বিবি।

"তারপর স্বপ্নই হয় সাচ্চা।"

"সত্যি?" মেহের বিবি চট ক'রে নিজের দেহের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

"হ্যাঁ, সত্যি। বিশ্বাস নিয়ে স্বপ্নের পেছনে লেগে থাকতে হবে। লেগে ছিলুম ব'লেই তো ভূষণ্ডীর মাঠে আজ সোনার ফসল জন্মেছে। সারা জিন্দীগীর স্বপ্ন আমার সার্থক হয়েছে মেহেরউন্নিসা।"

ভাতের থালাটা উনানের দিকে সরিয়ে দিয়ে মেহেরউন্নিসা স্বামীর মুখোমুখি হয়ে বসল। প্রশ্নে তার অনেক প্রত্যাশা। জিজ্ঞাসা করল, "স্বপ্নে পাওয়া দাওয়াই বুঝি? ক'বার খেতে হবে? কোন্ দরগায় পাওয়া গেল?"

"দরগা নয় রে মেহের, খোদাতালা নিজেই আসমান থেকে এক বাচ্চা ছেলে ফেলে দিয়েছেন ভূষণ্ডীর মাঠে। ডাগরডোগর, দুধে-আলতা হাত-পা ছুঁড়ছে ফাঁকা মাঠে! বৌ, তোকে ব'লে রাখছি, নসিব আমা ফিরল। আর আমাদের দুঃখ্ নেই। খোদা মেহেরবান! দে দুধের বাল্‌তিটা এদিক পানে ঠেলে দে মেহের।"

মেহেরউন্নিসা সহসা যেন হাতের জোর সব হারিয়ে ফেলল। যে-বালতিটা তার দু'হাঁটুর মাঝখানে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, সেই বালতিটা হাতের ঠেলায় নড়তে চাইল না সিকি ইঞ্চিও।

ওবাইদ মোল্লা লক্ষ্য করল না কিছুই। সে আজ সকালের ঘটনাটা সাজিয়ে-গুজিয়ে বেশ দরদ দিয়ে বলতে লাগল মেহেরউন্নিসাকে। ক্রমে ক্রমে মেহেরউন্নিসার গল্প শোনার তন্ময়তা বাড়তে লাগল। সে ভুলতে লাগল নিজের

পেটের শূন্য হাহাকার। মনটা তার ঘুরতে লাগল ভূষণ্ডীর মাঠে। চোখ বুজল মেহের বিবি। বাচ্চাটাকে তুলে নিল নিজের কোলে। তার নাকের নোলক দুলতে লাগল বাচ্চার মুখের ওপর। পরের ছেলেকে নিজের কোলে টেনে নেবার তন্ময়তা পেল বিবি মেহেরউন্নিসা।

ওবাইদ মোল্লা জিজ্ঞাসা করল, "চোখ বুজে রইলি কেন ?"

চমকে উঠে মেহের বিবি জবাব দিল, "দেখছিলাম, ভাল ক'রে দেখছিলাম।"

"কি দেখছিলি মেহের ?"

"লাল টুকটুকে এক তাল মাংস ভূষণ্ডীর মাঠটাকে রাঙা ক'রে দিয়েছে !"

"দেখেছিস ? ভাল ক'রে দেখেছিস মেহের ?" ওবাইদ মোল্লা সরে বসল মেহের বিবির কাছে।

"দেখেছি, খুব ভাল ক'রে দেখেছি। ভূষণ্ডীর পতিত জমিতে খুনের দাগ আর নেই, সব মুছে গেল ! ওর মাথার ওপর ঘর তুলে দাও। রোদ বৃষ্টির দুশমনি তো রুখতে হবে ?"

"তুই ঠিক বলেছিস বৌ। ভাতের হাঁড়িটাও সঙ্গে দিয়ে দে। ওরা মেহ্‌মান, অতিথি। ওরা উপোস থাকলে, ইসলামের কলজেতে দাগ লাগবে না ?"

"লাগবে", জবাব দিল মেহের বিবি, "কিন্তু আমাদের ভাত খেয়ে ওদের ধর্ম যদি না বাঁচে ?"

"ভাতের মধ্যে আবার অধর্ম এল কি ক'রে ? ভাতের সবটুকুই তো ভাত ? কি জানি, তুই আবার বড্ড গোলমেলে কথা বললি বৌ।"

"এক কাজ কর না। ঘরে তো সের দুয়েক চাল আছে, তাই নিয়ে যাও। গাছ থেকে দু'টো বেগুন তুলে দিচ্ছি। মাচার ওপর থেকে একটা কুমড়ো পেড়ে আন।"

"পাইকেরের হিসেব মেটাব কি ক'রে মেহের ?"

"হিসেবের খাতা আজ না হয় তোলা থাক মিঞা সাহেব।—ঘর তুলবে কি দিয়ে ?"

মেহের বিবি আর ওবাইদ মোল্লা হাঁটতে হাঁটতে চলে এল গোয়াল ঘরের

পেছনে, বাঁশ ঝাড়ের কাছে। মেহের বিবি বলল, "বাঁশগুলো সব কাঁচা। ওসমান গণির কাছ থেকে দু'টো বাঁশ ধার চেয়ে নাও। আমাদের বাঁশ পাকলে, আমরা তাকে ফিরিয়ে দেব তিনটে বাঁশ। একটা বাঁশের সুদ না দিলে ওসমান গণি তার বাঁশের গাদায় হাত দেবে না।"

"তুই ঠিকই বলেছিস মেহের। সুদ সে নেবে। টাকাই হোক আর বাঁশই হোক সুদ তো বটে! ওসমান গণির ধর্ম নেই।"

"কেবল ধর্ম থাকলেই চলবে না, বাঁশও থাকা চাই মিঞা সাহেব। দেখো, গণি সাহেবের কাছ থেকে একটা গরুর গাড়িও চেয়ে নিয়ে এস। জিনিসপত্তর সব একবারেই নিয়ে যেতে পারবে।"

"তোকে নিয়ে ঘর ক'রে সুখ আছে মেহের। তারিফ করবার মত তোর বুদ্ধি-বিবেচনা।—বুদ্ধি বেশী ব'লেই বোধহয় তোর মোল্লা-মসজিদের ওপর বিশ্বাস নেই বৌ।"

প্রায় একঘণ্টা পর ওসমান গণির বাড়ি থেকে ফিরে এল ওবাইদ মোল্লা। গাড়িটাকে সে নিজেই টেনে নিয়ে এসেছে। মেহের বিবি জিজ্ঞাসা করল, "গরু দু'টো কোথায়" ?

"গরু দুটোর জন্য ওসমান গণি আলাদা ভাড়া চাইছিল। বলছিল, দু'সের বেগুন দিতে হবে। আমি রাজি হলুম না মেহের।"

জোয়ালের উপর হাত রেখে মেহের বিবি জানতে চাইল, "এই গাড়িটার ভাড়া কত ?"

"তিন সের ধান। ওসমান গণি খাতায় লিখে রেখেছে। বৌ, ভয় করিস নে তুই। ভূবতীতে এবার ধানের ঢেউ বইবে। তিন সের ধান তো একটা ঢেউও নয় মেহের ?"

"কিন্তু ওসমান গণিই বা এত ধান-চাল দিয়ে কি করে মিঞা সাহেব ? ঘরে তো আর কেউ নেই। দু'খানা বাঁশ কি সে দান-খয়রাৎ করতে পারত না ? কত টাকা তার !"

"ওর অনেক টাকা, কিন্তু ওসমান গণির মত ভিখারি আমি নই। দান-

খয়রাৎ নিতে যাব কেন? তুই দুঃখু করিস নে বৌ, নতুন নিয়ম চালু হয়ে গেছে। ওসমান গণিদের সব বিচার হবে এবার। বিচার করব আমরাই।"

মেহের বিবি একটু হেসে বলল, "বেলা বেড়ে যাচ্ছে।"

ওবাইদ মোল্লা গাড়িতে সব জিনিষ তুলতে লাগল। দু'টো বাঁশ তো আগে থেকেই গাড়িতে ছিল। গোয়াল ঘর থেকে সে খড় নিয়ে এল। বড় মিঞার আমলের দুটো ঢেউ-খেলানো টিন পড়েছিল কাঁঠাল গাছের তলায়। ওবাইদ মোল্লা বললে, "টিন দু'খানাও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। ভাঙাচোরা টিন। তা হোক, অনেক কাজ হবে এতে। তুই চট ক'রে কোদালখানা নিয়ে আয়। মাটি তুলতে হবে তো। আর ত্বাখ্ বৌ, গোয়ালঘরের বেড়াগুলোও আমি খুলে নিচ্ছি। গরু দু'টোর একটু কষ্ট হবে। তা হোক, মানুষের চেয়ে তো গরুর কষ্ট বেশী নয়।"

মেহের বিবি ছুটল কোদাল আনতে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে গাড়ি বোঝাই ক'রে সব জিনিসপত্র নিয়ে ওবাইদ মোল্লা জিজ্ঞাসা করল "বৌ, তুই কবে যাবি দেখতে? ভূষণ্ডীর দুঃখই কেবল দেখলি, সুখ তো দেখলি না।"

ওবাইদ মোল্লা গাড়িতে টান মারল। মেহের বিবির চোখ ফেটে জল আসছিল। জিজ্ঞাসা করল, "এক ক্রোশ রাস্তা, তার ওপর মাটি থেকে আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে, কেমন ক'রে তুমি গাড়িটা টানবে?"

"যেমন ক'রে গরুগুলো টানে।" এই ব'লে সে গাড়ির জোয়ালটা বুকের সঙ্গে ঠেকিয়ে সামনের দিকে টানতে লাগল।

"একটু দাঁড়াও মিঞা সাহেব।" মেহের বিবি ছুটল অন্দরমহলের দিকে। বুকের সঙ্গে জোয়াল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওবাইদ মোল্লা। একটু পরেই ফিরে এল মেহেরউন্নিসা। বলল, "মিঞা সাহেব, এই কাঁথাখানা নিয়ে যাও। বাচ্চার দরকার হবে। নিজের হাতে সেলাই করেছিলাম, আমাদের তো কোনো কাজে লাগল না।"

ঘাড় ফিরিয়ে ওবাইদ মোল্লা বলল, "জানি, চোখে তোর অনেক পানি

অমে আছে মেহের। কিন্তু কি করব বল? খোদার দোয়া চাইরে মেহের, কেবল খোদার দোয়া।"

সুলতানপুরের রাস্তা দিয়ে গাড়ির চাকা গড়িয়ে চলল। মেহের বিবি বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল গাড়ির দিকে। চাকাগুলোতে ক্যাঁচর ক্যাঁচর আওয়াজ হচ্ছে। অনেক দূরের পথ। সুলতানপুরের রাস্তা শেষ হয়ে গেলে ওবাইদ মোল্লাকে নামতে হবে মাঠের মধ্যে। উঁচুনীচু মাঠে গাড়ি টানতে তার স্বামীর কষ্ট গরুর চেয়ে নিশ্চয়ই অনেক বেশী হবে। ভূষণ্ডীর মাঠে ওবাইদ মোল্লার স্বপ্ন আছে; মোল্লা বাড়ির দশ পুরুষের স্বপ্ন। মেহের বিবি জানে, স্বপ্নের নেশা যত বেশীই হোক, ভূষণ্ডীর মাটিতে এখন স্বপ্ন নেই, আছে প্রখর উত্তাপ। স্বামীর পায়ে ফোস্কা পড়বে। বড় স্বপ্নের জন্যে আজ তাকে বড় ফোস্কা নিয়ে ফিরতে হবে ঘরে। মেহের বিবির চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। গাড়িটাকে আর যেন দেখা যাচ্ছে না। সুলতানপুরের সীমা অতিক্রম করেছে ওবাইদ মোল্লার গাড়ি। বিবি মেহের-উন্নিসা কেবল ভাবতে লাগল, ওবাইদ মোল্লা গরুর চেয়ে অনেক বড়, অনেক বড় ওসমান গণিদের চেয়ে। গত দশ পুরুষের মধ্যে মোল্লা বাড়ির কেউ এমন ক'রে স্বপ্ন দেখতে পারে নি। স্বপ্ন দেখলেও স্বপ্নকে কেউ তারা এমন ক'রে বিশ্বাস করতে পারে নি। তার স্বামী ওবাইদ মোল্লা পেরেছে। গরুর জোয়াল সে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে কেবল বন্ধ্যা মাটিতে ফসল ফলাবে বলে। সোনার ধান নয়, সোনার মানুষ। মানুষ-ফসল।

ওবাইদ মোল্লার পুরুষত্ব স্বপ্নের চেয়েও বড়।

সন্ধ্যের একটু পরেই ফিরে এল ওবাইদ মোল্লা। সমস্তদিনের অনাহার আজ তাকে কাবু করা তো দূরের কথা মাঝে মাঝে ওর মনে হয়েছে, অনাহার আজ ওকে অনেক বেশী আহার দিয়েছে। উপবাসী অতিথিদের পেট ভরেছে ব'লে ওর নিজের পেট আজ ভরা। হাতের কব্জিতে তাই শক্তির বান ডেকেছে। সফল-স্বপ্নের তাকত দিয়ে ঘর তুলেছে নবজাতকের মাথার ওপর। ঘর তুলতে তুলতে ওবাইদ মোল্লা পরিশ্রান্ত হয় নি। চেয়ে রয়েছে বাচ্চাটার দিকে। ভূষণ্ডীর পোড়ামাটি ধন্য হ'ল আজ।

গাড়িটাকে সঙ্গে ক'রেই ফিরে এসেছে ওবাইদ মোল্লা। বাড়ির নীচে ঢালুর মধ্যে গাড়িটাকে রেখে সে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে এল। তারপরেই হাত দশেক ফাঁকা জায়গা। ফাঁকা জায়গার পরেই ভাঙ্গা-বেড়ার উঁচু প্রাচীর। মোল্লা বাড়ির মেয়েদের পর্দা রাখা ধর্ম। আজ কিন্তু মেহের বিবি ভাঙ্গা-বেড়ার বাইরেই দাঁড়িয়েছিল। ভূষণ্ডীর সোনা বুঝি মেহের বিবিকেও টানছে!

"মেহের? রাত্তির বেলা বাইরে কেন?" জিজ্ঞাসা করল ওবাইদ মোল্লা।

"হারেমে আজ অনেক জ্বালা, তাই চেয়ে আছি ভূষণ্ডীর দিকে।"

"চেয়ে চেয়ে কি দেখছিস?"

"দেখছি, ছেলে তোমার কাঁথার ওপর শুয়ে হাত-পা নাড়ছে। মিঞাসাহেব, গরম মাটির তাপ লাগছে না?"

"কাঁথার তলায় বিচেলী দিয়েছি বৌ।"

এই সময় দূর থেকে জনতার হল্লা-চিৎকার শোনা গেল।

ওবাইদ মোল্লা জিজ্ঞাসা করল, "ব্যাপার কি মেহের?"

মেহের বিবি বলল, "লালফৌজদের কুচকাওয়াজ। ধনীমহাজনদের বাড়িতে বোধহয় লুটপাট হচ্ছে।" তারপর সে ওবাইদ মোল্লার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "আমাদের বাঁশ ঝাড়ের পেছনে বড় মহাজন ওসমান গণি লুকিয়ে আছে। মিঞাসাহেব, বাঁশগুলো তো কাঁচা!"

ওবাইদ মোল্লা যেন আকাশ থেকে পড়ল! অবাক হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, "লুকিয়ে আছে কেন?"

"লালফৌজরা ওকে ধরতে এসেছিল। কাজীপাড়ার শাজাহান লালফৌজদের সর্দার হয়েছে।"

ওবাইদ মোল্লা আর মেহের বিবি দাঁড়াল এসে রান্নাঘরের সামনে। বাঁশ-ঝাড়ের পেছন থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে উপস্থিত হ'ল ওসমান গণি। বাতব্যাধিতে তার ডান পা'টা জখম হয়েছিল অনেকদিন আগেই। হাতে তাই একটা লাঠি নিয়ে তাকে চলাফেরা করতে হয়।

ওসমান গণি সামনে আসতেই মেহের বিবি সরে গেল রান্নাঘরের পেছন দিকে।

ওবাইদ মোল্লা জিজ্ঞাসা করল, "গণিসাহেব, চৌকিদারকে খবর দাও নি?"

"চৌকিদার? ওরে আহাম্মক, সুলতানপুরে আর চৌকিদার নেই। সবাই যে আজ ভিড়ে পড়েছে লালফৌজের দলে। মহাজনদের সিন্দুকে আর একরত্তি সোনা নেই। সব চেঁচেপুছে নিয়ে গেছে রে ওবাইদ!"

গণিমিঞার কণ্ঠে আর্তনাদের সুর ভেসে উঠল। সে ওবাইদ মোল্লার আরও কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, "গাড়ি-ভর্তি ক'রে তুই কি নিয়ে এলি ওবাইদ? লুটের মালগুলো সব দেখা না?"

"লুট?" ওবাইদ মোল্লার প্রশ্নে বিস্ময়ের সুর।

"লুট নয় তো কি? তোর মত লোক রূপ্ ক'রে গাড়ি ভাড়া করতে পারে? এক সের নয়, একেবারে তিন সের ধান ভাড়া দিবি ব'লে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে ওয়াদা ক'রে এলি! এ হিম্মত তোর কোত্থেকে এল রে? সবুর কর্, দিল্লীতে কাল বড় মন্ত্রীর কাছে একটা তার ভেজে দিচ্ছি।"

"এ তুমি ভুল বলছ গণিসাহেব। আমি লুট করতে যাই নি। কোন দিন যাবও না। আমাদের কি আর মানুষ রেখেছ যে লুট করতে যাব?"

"লুট করতে যাবি নে, তবে তোর গাড়ির দরকার হয় কেন? গাড়ি নিয়ে তো কেউ মসজিদে নামাজ পড়তে যায় না? ইসলামের বারোটা বাজিয়ে দিলি তোরাই। নে, চল্ এবার আমায় একটু পৌঁছে দিয়ে আয় রহমতপুরে। ক'মাইল আর হবে, তিন মাইলের বেশী নয়। সোলেমান চাচার ভয়ে রহমতপুরে বাঘে গরুতে এক ঘাটে পানি খায়। নে, চল্ ওবাইদ।" হাতের লাঠিটা ওসমান গণি তুলে ধরল ওবাইদ মোল্লার দিকে।

অসহায় ভাবে ওবাইদ মোল্লা চেয়ে রইল বেড়ার ওপাশে। ইসলামের পর্দা ভেদ ক'রে মেহের বিবি কোন জবাব দিতে পারল না।

একটু পরে ওবাইদ মোল্লা বলল, "রহমতপুরে তোমায় পৌঁছে দিচ্ছি মিঞা সাহেব, কিন্তু লুটের কথাটা তুমি ঠিক বললে না। আমি লুট করতে যাই নি।"

"আজ যাস্ নি, কাল যাবি। এবার থেকে শিয়া-সুন্নির ভেদাভেদ আর থাকবে না। যত ব্যাটা ফেরেববাজ সব কাল থেকে পুলিশ-পেয়াদার কাজ

চালাবে। চল্ চল্ দেরি হয়ে যাচ্ছে। আফশোস করিস নে ওবাইদ, ফেরবার সময় গাড়িভর্তি ক'রে লুটের মাল নিয়ে আসতে পারবি—খালি গাড়ি তোকে টানতে হবে না।"

একটু ইতস্তত করে ওবাইদ মোল্লা জিজ্ঞাসা করল, "তোমার বলদ দু'টো কই? নিয়ে আসব?"

"ইয়া আল্লা! বলদ? বলদ দু'টো আর আছে না কি? লালফৌজদের সঙ্গে তারাও ভিড়ে পড়েছে। এবার থেকে বলদের বাদশাহী সুরু হ'ল রে ওবাইদ। নে, নে—চল্—" হাতের লাঠিটা দিয়ে ওবাইদ মোল্লাকে একটা খোঁচা দিয়ে ওসমান গণি ঘোষণা করল, "গাড়ি টানবার মজুরি তোকে আমি দেব।"

"মজুরির লোভে আমি গাড়ি টানতে পারব না মিঞা সাহেব।"

"তবে?" প্রশ্ন করল ওসমান গণি।

"কেউ যদি বিপদে পড়ে, তাকে সাহায্য করা মানুষেরই ধর্ম।"

"ধর্ম? তুই ধর্ম মানিস না কি? কই, আমার বড় মসজিদে তোকে তো কোন দিনই নামাজ পড়তে দেখি নি?"

"আমি তো খোলা ময়দানেই নামাজ পড়ি। যাক, সে-সব তর্ক ক'রে লাভ নেই। পালাবে তো চল, ওরা আবার তোমার জন্যে এখানেও ঢুঁ মারতে পারে।"

"তা পারে। হয়তো আসবে। তবে মসজিদের ইটগুলো সব খুলতে একটু সময় নেবে। খোদা মেহেরবান!"

লাঠিতে ভর দিয়ে ওসমানগণি খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলল ওবাইদ মোল্লার পেছনে পেছনে। বেড়ার পেছন থেকে শুকনো পাতার খসখস শব্দ পাওয়া গেল, কিন্তু বিবি মেহেরউন্নিসা বেরিয়ে এসে ওবাইদ মোল্লার পথ রুখে দাঁড়াতে পারল না। ওবাইদ মোল্লার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে মেহের বিবি শেষ পর্যন্ত বেড়ার গায়ে কিল্ মারতে লাগল। ওসমানগণি বলল "একটু দাঁড়া ওবাইদ। বিবি তোকে ডাকছে।"

"ডাকছে?" রান্না ঘরের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ওবাইদ মোল্লা বেশ একটু

জোরে জোরেই বলল, "তিন মাইল রাস্তা ছুটে যাব আর আসব, ভয় করিস নে মেহের।"

ওসমান গণি সহসা তার নিজের বিপদের কথা ভুলে গেল। পালিয়ে যাওয়ার তাড়া নেই আর। দু'পা রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে যেন মেহের বিবিকেই সোজাসুজি অনুরোধ করল, "বিবিকেও সঙ্গে নিয়ে চল ওবাইদ। লাল-ছোঁড়াদের বিশ্বাস নেই—" ওসমান গণি রান্নাঘরের পেছনের দিকে যাওয়ার জন্যে থোড়া পা-টা এগিয়ে দিল। ওবাইদ মোল্লা যেন মেহের বিবির ধর্ম রক্ষা করবার জন্যেই লাফিয়ে পড়ল ওসমান গণির সামনে। দু'জনের মাঝখানে নিজেকে খাড়া ক'রে রেখে অদৃশ্য মেহের বিবিকে উদ্দেশ ক'রে জিজ্ঞাসা করল, "যাবি মেহের? গাড়ির ওপর দু'টো খুঁটি লাগিয়ে হাওড়া হাটের নতুন শাড়ী খানা টাঙিয়ে দেব। পর্দার ফারাক রয়েই যাবে।"

"কোন ভয় নেই বিবি সাহেবা, আমি উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকব।" ওসমান গণি তার হাতের লাঠি দিয়ে ওবাইদ মোল্লাকে মৃদুভাবে খোঁচা মারল। খোঁচা খেয়ে ওবাইদ মোল্লা বলল, "আজ সমস্তটা দিন পেটে আমার এক দানা ভাত পড়ে নি গণি সাহেব!"

"তোর আহাম্মকী-কথা শুনলে হাজী সাহেবরাও হেসে ফেলত।" মন্তব্য করল ওসমান গণি।

"কেন গণি সাহেব?"

"কেন?—" জবাবটা দিতে পারল না ওসমান গণি। ওবাইদ মোল্লাকে যেন একটু ধাক্কা দিয়েই সে ছুটতে চাইল রান্নাঘরের পিছনের দিকে; এগিয়ে গেল দু'-পা। দেখল চেয়ে, সেখানে কোন মেয়েছেলে নেই।

"ওবাইদ, তোর খুব খিদে পেয়েছে, না?"

"হ্যাঁ, গণি সাহেব। তুমি যদি একটু অপেক্ষা কর, তাহলে দু'টো ভাত খেয়ে নি।"

"বিবি যদি সঙ্গে থাকে ভাতের নেশা আর থাকবে না ওবাইদ।"

গোয়ালঘরের ও-পাশ থেকে মেহের বিবির কণ্ঠ শোনা গেল, "লাল ফৌজরা এদিক পানে আসছে।"

ফস্ ক'রে লাফিয়ে পড়ল ওসমান গণি পেছন দিকের ঢালুর মধ্যে। ব্যগ্র স্বরে ডাকল, "চলে আয় ওবাইদ, দেরি করিস নি!"

"বৌকে সঙ্গে নেব না?" জিজ্ঞাসা করল ওবাইদ মোল্লা।

"খালি পেটে ডবল বোঝা টানতে পারবি নে, শিগগীর পালিয়ে আয়!"

"তবে যে বললে লাল ছোঁড়াদের বিশ্বাস নেই?"

"খোদার কসম, ভুল বলেছি। আমার কসুর মাফ কর ওবাইদ। আয় বাবা, তাড়াতাড়ি আয়। বুড়ো বয়সে আর পায়ে হাত দিতে বলিস নে।"

"নাঃ মিঞা সাহেব, তোমার জবানের কোন ঠিক নেই। তুমি নিজেই পালাও।"

"খোদা হাফেজ! খোঁড়া মানুষকে তুই ছুটতে বলছিস্? ধরতে পারলে ওরা আমায় খুন ক'রবে ওবাইদ!"

"তা তো করবেই। কিন্তু—আমি আজ আর যেতে পারব না।" ওবাইদ মোল্লা তার শেষ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়ে ঢালুর ওপর থেকে সরে আসছিল রান্না ঘরের দিকে। হঠাৎ সে দেখল, মেহের বিবি এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছে।

"মেহের, তুই তো আমার চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধি রাখিস। তুই বল্, সুদ খেলে কি মুসলমানের ধর্ম বাঁচে?" মেহের বিবি জবাব দেয়ার আগেই ঢালুর অন্ধকার থেকে ওসমান গণি কাতর স্বরে বলল, "টাকার সুদ খেলে ধর্ম বাঁচে না। কিন্তু আমি তো তোর কাছ থেকে টাকা নিই নি ওবাইদ?"

"টাকা নাও নি বটে, কিন্তু দু'টো বাঁশ ধার দিয়ে তিনটে বাঁশ চাইলে, কেন? বাঁশের সুদটা কি সুদ নয়? টাকায় যদি পাপ হয়, তবে বাঁশে কেন হবে না মিঞা সাহেব? জবাব দাও।" তেড়ে উঠল ওবাইদ মোল্লা।

"ছাখ্ ওবাইদ, ধর্মের জন্যে ওসমান গণি জান্ দেবে, তবু ঝুট্ বলবে না। কোরাণ-শরীফে টাকার হিসেব আছে, বাঁশের হিসেব নেই। তোর পায়ে ধরছি, শিগগীর নেবে আয়।" এই ব'লে হাতের লাঠিটা ওসমান গণি তুলে ধরল ওপর দিকে। ওবাইদ মোল্লার গায়ে সত্যি সত্যি লাঠিটার স্পর্শ লাগল। লাঠির আগাটা সোনা দিয়ে মোড়ানো। ওবাইদ মোল্লা নীচের দিকে চাইতে

মিঞা সাহেব।" এই ব'লে ওবাইদ মোল্লা জোয়ালটা মাটিতে রাখতে যাচ্ছিল। কিন্তু রাখতে পারল না। ওসমান গনি কস ক'রে লাঠির সোনা মোড়ান মাথা ধরে টান মেরে বার করল একটা গুপ্ত তরোয়াল। তরোয়ালের সুতীক্ষ্ণ মুখটা ওবাইদ মোল্লার ঘাড়ের ওপর ঠেকিয়ে রেখে ওসমান গনি সুদক্ষ গাড়োয়ানের মত আওয়াজ করল, "হেট্, হেট্—চল্। রহমতপুরে আমার চাচার ভয়ে বাঘে গরুতে এক ঘাটে পানি খায়।"

ওবাইদ মোল্লা নিঃশব্দে গাড়ি টানতে লাগল। টানল প্রায় আরও দু'ঘণ্টা। হাঁটু ভেঙ্গে মাঝে মাঝে সে বসে পড়তে চেয়েছে, একটু বিশ্রাম করতে পারলে বাকী পথটুকু গাড়ি টানতে তার হয়তো খানিকটা আরাম হত। কিন্তু পারে নি। ওসমান গনি তরোয়ালের সোনার বাঁট ধরে সেই যে বসে আছে, এক মুহূর্তের জন্যেও ওবাইদ মোল্লার ঘাড়ের ওপর থেকে তরোয়ালটা সে আলগা করে নি। মাঝে মাঝে সে মরে যাওয়ার কল্পনাও করেছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে সে ওসমান গনির সঙ্গে লড়াই করবে বলে ভেবেছে। কিন্তু লড়াই সে করবে কি ক'রে? ওসমান গনি তার আগেই ওর ঘাড় দেবে কেটে। মেহের বিবিকে একলা ফেলে ওবাইদ মোল্লা মরতে চায় নি। ভুখণ্ডীর মাঠে নতুন জন্মের আভাস পেয়েছে সে। অতএব সব দিক বিবেচনা ক'রে ওবাইদ মোল্লা দু'-ঘণ্টা নিঃশব্দে গাড়ি টানল। কিন্তু আর বোধ হয় পারবে না। গাড়ি থামিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল "মিঞা সাহেব, আর কতদূর?"

"ঐ তো রহমতপুর। কাকপক্ষীর এক দৌড়ের রাস্তা! নে চল্—হেট্, হেট্। লাল ছোঁড়াদের দফা আমি রফা করব, একবার চাচার সঙ্গে মোলাকাত হলেই হয়। জানিস ওবাইদ, দিল্লীর বড় মন্ত্রীর সঙ্গে চাচা আমার খানা খেয়েছে?"

"তুমি আমায় একটা বিড়ি খাওয়াও না গনি সাহেব। আপ-খোরাকী ছ'-ঘণ্টা তো গাড়ি টানলুম।"

"গাড়ি টানতে টানতে কোন্ বলদে বিড়ি খায় রে আহাম্মক? চল্—হেট্, হেট্। পূবের আশমান সাদা হয়ে এসেছে—ঐ তো চাচার বাড়ির বড় মসজিদটা দেখা যাচ্ছে। একটা আজান দে না ওবাইদ।"

"বলদরা তো আক্কান দেয় না গণি সাহেব! তরোয়ালটা একটু সরাও, গর্দান থেকে খুন পড়ছে।"

"খুন? সারা জনম তো উপোস ক'রে আছিস, খুন এল কোত্থেকে?"

"ছোটলোকদের খুন তো খুন নয় গণি সাহেব, পানি। বাপজান বলতেন, আমাদের সুলতানপুরের দরিয়ায় এত পানি কিন্তু 'কারবালার' ময়দানে সেদিন এক ফোঁটাও পানি ছিল না! দুনিয়ার সব গণি সাহেবদের গোলায় চালের গাদায় পোকা পড়ে, ওবাইদ মোল্লার বাপজান দু'মুঠো চালের অভাবে মারা যায়! খোদা মেহেরবান।"

একটু পরে পূব দিকের আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল।

মাতালের মত ঢুলতে ঢুলতে ওবাইদ মোল্লা গাড়িটাকে এনে দাঁড় করিয়ে দিল বড় মসজিদের দরজার সামনে। ওসমান গণির চাচা, সোলেমান সাহেব তখন ফজরের নামাজ শেষ ক'রে মসজিদের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। পেছনে তাঁর গুটিকয়েক বাঘ আর গরু—এক ঘাটে তারা জল না খেলেও, এক মসজিদে নামাজ পড়েছে। সোলেমান সাহেবকে দেখতে পেয়েই ওসমান গণি তড়াক ক'রে লাফিয়ে পড়ল গাড়ি থেকে। খোঁড়া পা'টা শূন্যে তুলে লাঠির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াল সে। বলল, "চাচামিঞা, আমার সর্বস্ব লুঠ করেছে লালগুণ্ডার দল। দিল্লীতে একটা তার ভেজে দাও, পল্টন পাঠাবার জন্যে। চাচামিঞা, হাম লড়েঙ্গে—" সোলেমান সাহেব ধরে ফেললেন ওসমান গণিকে। উত্তেজনার ভার সামলাতে না পেরে সে পড়ে যাচ্ছিল সোলেমান সাহেবের গায়ের ওপর। সোলেমান সাহেব তাকে ধরে নিয়ে এগিয়ে চললেন বাড়ির দিকে।

ওবাইদ মোল্লা দু' হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসেছিল। বিশ্রাম করছে সে। গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সে এক ঘণ্টাও অবসর পায় নি চোখ বুজবার। গতকাল ভোরবেলা ভূষণীর মাঠে সে গিয়েছিল প্রতিদিনকার মত কাজ করতে। চাষের কাজ ফেলে সে ছুটে এসেছিল খাদ্য আর ঘর তোলবার মালমশলা সংগ্রহ করবার জন্যে। উপস্থিত সে সব কথা ভাবতে ভাবতে ওর ঘুম আসছিল। এমন সময় ওসমান গণির গলার আওয়াজ শুনে সে চাইল সামনের দিকে।

গণি সাহেব চিৎকার ক'রে তার চাচামিঞাকে বলছে, "লোক পাঠিয়ে গাড়িটাকে তোমার বাড়ির ভেতর নিয়ে এস। ও ব্যাটা ওবাইদ মোল্লাকে বিশ্বাস নেই—'কারবালাতে' পানি ছিল না ব'লে ঐ ব্যাটা আমাদের সব দায়ী করছে, জানো? হাত্ লড়েছে চাচামিঞা—"

ভয় পেল ওবাইদ মোল্লা। পা ফেটে রক্ত পড়ছিল, রক্ত পড়ছিল ওর ঘাড় থেকেও। স্বপ্ন দেখবার সময় এ নয়। আর দু'-এক মিনিট দেরী করলে ওসমান গণি হয়তো তরোয়াল দিয়ে সত্যি সত্যি ওর ঘাড়ে একটা কোপ বসিয়ে দেবে। ওবাইদ মোল্লা ছুটতে লাগল মাঠের দিকে।

ওসমান গণিদের আর সে বিশ্বাস করবে না। ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে সে প্রায় ওর নিজের মাথাটাই আজ হারাতে বসেছিল। উল্টো দিকের তিন ক্রোশ রাস্তা যেন আর শেষ হ'তে চায় না। এক একবার সে থামে আর পেছন ফিরে দেখে, ওসমান গণি আসছে কি না। কয়েক মাইল ছুটবার পরও ওর যেন মনে হতে লাগল, সোনার বাঁট-ওয়ালা তরোয়ালটা ওর ঘাড়ের ওপর ঝুলছে। ওসমান গণি তার খোঁড়া পা নিয়েই বুঝি ওকে ধরে ফেলবে। পাগলের মত দৌড়তে লাগল ওবাইদ মোল্লা। মেহের বিবির পেতলের নোলক ওকে টানছে। পেতলের নোলক কেবল টানে না, কাটেও। ঘাড়ের ওপর থেকে ওর রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। বুকের ছাতিটা রাঙা হয়ে উঠেছে। মেহের বিবির জন্যেই আজ সে লড়াই করতে পারে নি, পারে নি মরে যেতে। অতিথির ইজ্জৎ বাঁচাতে গিয়ে ওবাইদ মোল্লা পারে নি তার নিজের ইজ্জৎ বাঁচাতে। মেহের বিবির ভালবাসার কাছে নিজের ইজ্জৎও আজ বড় ব'লে মনে হ'ল না ওর। তাই বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে ছুটতে লাগল সুলতানপুরের দিকে। লোকালয় পার হয়ে এসে ওবাইদ মোল্লা নেমে পড়ল মাঠের মধ্যে। মাটির ঢেলাগুলো পায়ের চাপে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। ধুলোর মত উড়ে যাচ্ছে শক্ত মাটির ঢেলা! চাষীরা সব লাঙল ফেলে অবাক হয়ে চেয়ে দেখছে ওবাইদ মোল্লার দ্রুত পায়ের গতি। ওরা বোধ হয় ভাবতে লাগল, চাষীর পায়ে এত শক্তি কেমন ক'রে এল? তেপান্তরের রাজপুত্র কি পারত যেতে ওবাইদ মোল্লার আগে? পেছন ফিরে চেয়ে দেখবার সময় নেই

ওবাইদ মোল্লার। মেহের বিবি তাকে টানছে। টানছে পেতলের নোলক। নোলকের টানে সে অতিক্রম করল ছ'-মাইল রাস্তা। মনে মনে সে প্রশ্ন করল: মেহের বিবির মহব্বত-সোনা দুনিয়ার কোন্ খনিতে পাওয়া যায় খোদা?

প্যাণ্ডোরার বাক্সটিকে ভারতবর্ষের ময়দানে খুলে দিয়ে হুকু পালিয়ে এল ভূষণ্ডীর মাঠে। ভাঙ্গা-সভ্যতার অকল্যাণগুলো সহস্র নাগিনীর মত বাক্স থেকে মুখ বার ক'রে যখন শীকারের সন্ধান করতে লাগল, হুকু তখন ভূষণ্ডীর পতিত জমিতে 'নূতন আশার' বীজ বপনের তোড়জোড় করছে। প্যাণ্ডোরার বাক্সে কেবল অকল্যাণই ছিল না, নবসৃষ্টির অঙ্কুর-আশাও ছিল। কে জানে, হয়তো বা তিন লক্ষ বছর পর হুকুর শুকনো হাড়ে আবিষ্কৃত হবে পুরোপলীয় যুগের দ্বিতীয় প্রারম্ভ।

অবনী মণ্ডল ভোর বেলায়ই মাঠে চাষ করতে বেরিয়ে গেছে আজ। ভূষণ্ডীর পতিত জমিতে আজ সে প্রথম লাঙল দেবে। গতকাল ওবাইদ মোল্লার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সে পুরো মাঠটাই পরীক্ষা করে দেখে এসেছে। মাটিতে কোন রস নেই। পাথরের মত শক্ত হয়ে রয়েছে মাটির দেহটা। কোদাল মেরে খানিকটা খুঁড়ে দেখেছে অবনী মণ্ডল। তাতেও সে এক বিন্দু রসের সন্ধান পায় নি। কোদাল দিয়ে কোপ মারবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের মত খানিকটা বাষ্প বেরিয়ে এসেছে! বাষ্পটা ভোলো নয়, একেবারে শুকনো খরখরে ব'লে মনে হয়েছে অবনী মণ্ডলের। পাশে দাঁড়িয়ে ওবাইদ মোল্লাও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল, "ভূষণ্ডীর গতরে আগুন জ্বলছে।"

"চাষী যদি সাচ্চা হয়, তবে তার হাতের স্পর্শ পেলে আগুনের তেজও ক্রমে ক্রমে কমে আসবে। ওবাইদ ভাই, সাপুড়ের কাছে কোন বিষই যেমন ভয়ংকর নয়, চাষীর কাছেও তেমনি কোন মাটি-ই পতিত নয়।" বলেছিল অবনী মণ্ডল।

অতএব শেষ পর্যন্ত ওবাইদ মোল্লার চাষ-করা জমির পাশেই একখণ্ড জমি অবনী মণ্ডল নিজেই ঠিক ক'রে নিল চাষ করবার জন্যে। তিনটে প্রাণীর জন্যে

ফসল তুলতে হবে এই জমি থেকে। অবনী মণ্ডল সেই 'ঐতিহাসিক দায়িত্ব' নিয়ে আজ সকালে বেরিয়ে গেছে মাঠের দিকে। বসন্ত কিংবা ঝুকুর সঙ্গে সে দেখা ক'রে যাওয়ার দরকার বোধ করে নি।

অবনী মণ্ডল চ'লে যাওয়ার পর বসন্তরও ঘুম ভাঙল। সে ঘরের সামনেই অল্প ক'দিন থেকে মাটি তৈরি করছে, লাউ কুমড়োর গাছ লাগাবে ব'লে। ওবাইদ মোল্লা দু'চার রকমের শাক-সবজির বিচিও যোগাড় ক'রে দিয়েছে বসন্তকে।

বেলা বোধহয় তখন আট-টাই হবে। বিচালির মধ্যে থেকে ঝুকু বাচ্চাটাকে টেনে তুলে নিল কোলে। মেহের বিবির দেওয়া কাঁথাখানা বিচালির ওপর পাতা থাকে বটে, কিন্তু বাচ্চাটা রাত্রিতে কখন্ যে হাতপা ছুঁড়তে ছুঁড়তে কাঁথার বাইরে এসে পড়ে ঝুকু তা টের পায় না। টের পায় না বসন্তও।

বাচ্চাকে কোলে নিয়ে ঝুকু দেখল ওর পিঠের দিকটায় লম্বা লম্বা দাগ পড়েছে। দাগের মুখে একটু একটু রক্তের ছিটেফোঁটাও দেখা যাচ্ছে। বিচালিগুলো তুলোর মত মসৃণ হ'লে ছেলেটার এত কষ্ট হ'তো না। গোয়াবাগানের ব্যবস্থা ভূষণ্ডীর মাঠে স্বপ্নাতীত ভেবেই ঝুকু বাইরে এসে দাঁড়াল। বেলা বেশ বেড়েই গেছে। ওবাইদ মোল্লা হয়তো এখুনি দুধ নিয়ে এসে উপস্থিত হবে। ভূষণ্ডীর মাঠে ঘড়ি নেই। আকাশের দিকে চেয়ে সময়ের আন্দাজ করতে হয়। তা ছাড়া এখানে ঘড়ির প্রয়োজনই বা কি? অফিস, আদালত কিংবা বিনয়প্রকাশ ইত্যাদিরা কেউ আর ভূষণ্ডীর মাঠে ঘড়ির কাঁটার সভ্যতা নিয়ে উপস্থিত নেই। ভালই হয়েছে। ঘড়ির কাঁটার সভ্যতা সে ফেলে এসেছে কলকাতার অসংখ্য গলি আর গর্তের মধ্যে। গুপ্ত যোগাযোগ বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে এক মিনিটের তারতম্য হতে পারত না। কুমারিকা থেকে কালিম্পং পর্যন্ত লম্বা একটা সেকেণ্ডের কাঁটার ওপর ভর দিয়ে ঝুকু যেন গত বিশটা বছর কাটিয়ে এল! বাচ্চাটাকে বুকের ওপর চেপে ধ'রে ঝুকু ভাবল, ভূষণ্ডীর মাঠে আধুনিক সভ্যতার গলি ও গর্তগুলো কোন রেখাপাতই করতে পারে নি। কলকাতার বুকে কান পেতে এযাবৎকাল সে কেবল সেকেণ্ডের টিকটিক্ শব্দ শুনতে পেয়েছে। আজ কিন্তু ঝুকু শিশুটার বুকে শুনতে পেল জীবনের স্পন্দন। যন্ত্রের একঘেয়ে ত্রুটিহীন শাব্দিক নিষ্ঠায় অঙ্কের নির্ভুলতা

আছে সত্য, স্পন্দন নেই। সৃষ্টির স্পন্দন অনস্তিত্বের অদৃশ্য আবরণ উন্মোচিত হয়েই তো এসেছিল জগতের প্রথম অস্তিত্ব। দু'হাতে বাচ্চাটাকে জড়িয়ে ধ'রে স্বকু ওর বুকে কান পেতে রইল। স্পন্দনের মধ্যে সুস্পষ্ট একটি ছন্দ রয়েছে। ছন্দ মানে শুধুমাত্র পুনরাবৃত্তি নয়। একই ধ্বনি যদি পুনঃ পুনঃ বাজতে থাকে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে, তাতেও ছন্দ আসে না। অন্তরের শক্তি কিংবা উত্তম যখন একত্রীভূত হয়ে তার প্রগাঢ়ত্বের চূড়ায় গিয়ে ওঠে, তখনই হয় ছন্দ। সে চলে চক্রাকারে। সে নিজে ক্ষয়ে যায় না, ক্ষয়ে যায় চক্রটি। ক্ষয়ে যায় বটে, কিন্তু যায় সে নতুন চক্রের নব-সূচনার মধ্যে। জন্ম ও মৃত্যুর দুই সীমানা ছাড়িয়ে ছন্দ চলে সীমানা-উত্তীর্ণ সর্বকালীন সত্যের দিকে। ছন্দ রয়েছে গতির সঙ্গে বাঁধা। গতির স্বরু কোথা থেকে? গতি হচ্ছে মুভমেণ্ট। তা হ'লে? স্বকুর মনে এবার অনেক রকমের প্রশ্ন উঠতে লাগল। এযাবৎকাল সে সর্বহারা-শাসিত বিশ্বরাষ্ট্রে কোন স্তরই দেখতে পায় নি। উঁচু-নীচুর সংবাদ রাখে নি গোয়াবাগানের স্বকু চৌধুরী। সে চেয়েছিল পুরনো পৃথিবীর উঁচু-নীচুর স্তরগুলোকে ভেঙে দিয়ে নতুন পৃথিবী গড়তে—সমতল পৃথিবী। আজ মনে হচ্ছে দশ দিনের শিশুটা ওর বিশ বছরের সাধনলব্ধ জ্ঞানের স্তরটাকে দিয়েছে ভেঙে। মনের রাজ্যে গ'ড়ে উঠছে ছোটবড় অনেক রকমের উঁচু-নীচু স্তর। কোন জায়গা থেকেই কোনকিছু 'সমগ্র' ভাবে দেখা যাচ্ছে না। ভূষণ্ডীর মাটিতে দাঁড়িয়ে ও যা আজ দেখছে, তার বিস্তৃতি বিশ্বরাষ্ট্রের ঢিবি ছাড়িয়ে অনেক উপরে উঠে গেল।

বাচ্চাটাকে কোলে নিয়েই মনে মনে স্বকু যেন গড়তে লাগল তার নতুন সংসার। বিশ্বরাষ্ট্রের বাইরেই সে আজ সংসার গড়তে চায়। জীবনের নতুন মর্যাদায় ও চায় পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হতে। এই মর্যাদা ঘিরে একটা আলাদা সভ্যতাও যেন গ'ড়ে উঠতে পারে ব'লে স্বকুর মনে হ'ল। কিন্তু উঠবে কোথা থেকে? চতুর্দিকের মহাপ্লাবনে সবই তো ডুবে গেছে। মাটি ছাড়া তো সভ্যতা শূন্য আকাশে দানা বাঁধবে না?

বাঁধবে না সত্য, তবু যেন স্বকু নিরুপায় হয়েই ভূষণ্ডীর আকাশের দিকে চেয়ে রইল। বলা যায় না, নতুন মাটির সংবাদ নিয়ে পায়রাটা হয়তো এখুনি ফিরে আসবে। প্লাবনের জল নেমে গেলে মাটির সন্ধান পাওয়া যাবেই।

বসন্ত সামনেই দাঁড়িয়েছিল। ওকে দেখে সুকুর মনে হ'ল যে, পায়রাটা বুঝি ফিরে এসেছে। ভূষণ্ডীর পতিত জমিটাই হয়তো দুনিয়ার প্রথম মাটি।

বাচ্চাটাকে সে তুলে দিতে চাইল বসন্তর কোলে। কেবল বাচ্চাই নয়, বসন্তকে আজ সে অনেক কিছুই দিতে চাইছে। দেওয়া দরকারও। বিশ্বরাষ্ট্রের হাতে সবটুকু তুলে দিতে হবে ব'লেই তো সুকু পালিয়ে এসেছে পাটোয়ারবাগান থেকে। গোয়াবাগানের অভাব পাটোয়ার বাগান পূরণ করতে পারে নি। সে ভাবছে, ভূষণ্ডীর মাঠ এবার দুই বাগানের অভাবই পূরণ করবে। বসন্তকে কেন্দ্র ক'রে ছোট্ট একটা সংসার সে গ'ড়ে তুলবার সুযোগ পেয়েছে। এ-সংসারের সর্বনায়কত্ব সে কারুর হাতেই তুলে দিতে চায় না। তার নতুন সাম্রাজ্যের সীমানা থেকে যেন রাজনীতির টিকিটা দেখা না যায়, সেই জন্যেই সুকু মনে মনে বোধহয় চারদিকে একটা প্রাচীরও তুলতে লাগল।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে সুকু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। তাই সে লক্ষ্য করে নি যে, বাচ্চাটা দুধ খাওয়ার জন্যে অনেকক্ষণ থেকেই চেষ্টা করছে। লজ্জা পেয়ে সুকু বাচ্চাটাকে একটা হেঁচকা টান দিয়ে সরিয়ে নিল। বসন্তর হাতে তুলে দিয়ে সে বলল, "তোমার দৃষ্টি থেকে আমার কোন কিছুই বোধহয় আর গোপন রইল না।"

"আপনি ভাববেন না, আমার তাতে কোন অসুবিধে হবে না।" বলল বসন্ত।

"তোমার কোন অসুবিধে না হওয়াটাই আমার ভয় বসন্ত।"

"কেন ?"

"তোমার চোখে যদি কোন কৌতূহলই না থাকে, তবে ভূষণ্ডীর মাঠে আমি কি নিয়ে বাঁচব ?"

"বাঁচবার কি আর দ্বিতীয় কোন অবলম্বন নেই ?" জিজ্ঞাসা করল বসন্ত।

"আছে। কিন্তু সে তো তিন লক্ষ বছর পরের কথা। নৃতত্ত্ববিদরা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমার কংকাল থেকে খুঁজে বার করবে সমাজতত্ত্বের অন্ধকার যুগ। আমি বাঁচব কালি আর কলমের অক্ষর-অবয়বের মধ্যে। আমি ইতিহাসের পরিকীর্তনের মধ্যে বেঁচে থাকতে চাই নে বসন্ত।"

বসন্ত খুবই অবাক হ'ল। সে জিজ্ঞাসা করল, "আপনাকে নিয়ে ইতিহাস লেখা হবে না কি?"

"হবে। নূরজাহান কিংবা মেহেরউন্নিসার চেয়েও আমার কঙ্কালের দাম অনেক বেশী। ঐসব 'ডক্টর'-মার্কা দেওয়া ঐতিহাসিকদের লেখা 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের' চেয়েও আমি বড়। আমার ইতিহাস মুখস্থ ক'রে কেউ প্রবেশিকা পরীক্ষার খাতা লিখতে বসবে না বসন্ত।"

"চলুন না, দাওয়ার ওপর বসে আপনার ইতিহাসের ব্যাখ্যা শুনি?" বসন্ত বোধ হয় এ-সব কথা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর শুনতে পারছিল না। হুকুর কঙ্কাল হয়তো ক্রমে ক্রমে ভারী হয়ে উঠছে। দু'জনে এসে বসল দাওয়ার ওপর।

বসন্তই আবার কথা বলতে আরম্ভ করল। সে বলল, "আপনি যে এত বড়, আমি তা বুঝতে পারি নি।"

"আগে কেউ বুঝতে পারেও না বসন্ত। কারণ, ইতিহাস লেখা হয় পরে। পশ্চাৎ-অনুসন্ধানের বিজ্ঞানই হচ্ছে ইতিহাস। বসন্ত, আমার কঙ্কালের মধ্যে কেবল ইতিহাস থাকবে না, থাকবে ঐতিহাসিকতাও। সময় ও শাশ্বতের মধ্যে যখন মিলন ঘটে তখনই আসে ঐতিহাসিকতা। কিন্তু উপস্থিত আমি সময়ের নির্দিষ্টতার মধ্যেই বাঁচতে চাই। বাঁচতে চাই তোমার কৌতূহলের সীমাবদ্ধতার মধ্যে। সেই জন্যেই তো আমরা আজ ভূষণ্ডীর মাটিতে গ'ড়ে তুলছি বাস্তু—জীবিকার জন্যে নয়, জীবনের জন্যে।"

বসন্ত চুপ ক'রে রইল। বাচ্চাটার চুলে কতগুলো খড়ের টুকরো লেগে-ছিল। বসন্ত তার নিজের আঙুলগুলো চুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে চিরুনির মত আঁচড়াতে আঁচড়াতে জিজ্ঞাসা করল, "ওর নাম রাখবেন কি?"

"হামু।" জবাব দিল হুকু।

বিস্মিতভাবে বসন্ত প্রশ্ন করল, "হামু? হামু কোত্থেকে এল?"

"ব্যাবিলন থেকে। হাম্মুরাবিকে ছেঁটে দিয়ে আমি হামু করলুম। ভূষণ্ডীর মাঠে হামু আবার তার দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন করবে। হাত থেকে ওকে ফেলে দিও না বসন্ত। প'ড়ে গিয়ে ও যদি মরে যায়, তবে ভূষণ্ডীর

ভবিষ্যৎও যাবে মরে। কেবল কুমড়ো আর লাউ গাছ দিয়ে তুমি কোন্ সভ্যতা সৃষ্টি করবে বসন্ত?" উত্তরের জন্যে মুকু চেয়ে রইল বসন্তর দিকে।

"পদে পদে কেবল সভ্যতাই সৃষ্টি করতে হবে তেমন চুক্তি ক'রে আমরা পথে বেরয় নি। সে যাক। হামুকে আমি ফেলে দেব, এ-সন্দেহ আপনার কেমন ক'রে এল?"

"আমি দেখলুম, তুমি যেন ইচ্ছে ক'রেই তোমার হাত দু'টো আলগা ক'রে দিচ্ছ!"

"আপনি ভুল দেখেছেন। হাম্মুরবির পতন নেই।"

"নেই, কি ক'রে বিশ্বাস করব? হামু তো তোমার সন্তান নয়!"

বসন্তর মাথায় ও মনে প্রচণ্ড জোরে একটা ধাক্কা লাগল। ও বুঝতে পারল, মুকু যেন ইচ্ছে ক'রেই ওকে আঘাত দেবার চেষ্টা করছে। তা ছাড়া, হামুর জন্ম-বৃত্তান্ত বসন্ত বোধহয় ভুলেই গিয়েছিল। ভুলবার প্রয়োজন আছে ব'লেই বসন্ত তার ভালবাসার মধ্যে কোন ছিদ্র রাখে নি। হামুকে তাই এক মুহূর্তের জন্যেও সে চোখের আড়াল করতে চায় না। মুকু সবই দেখছে, সবই বুঝতে পারছে। অথচ, বসন্ত যা অনিবার্যভাবে ভুলে যেতে চায়, মুকু নিজেই তা বসন্তর মন থেকে মুছে দিতে চায় না কেন? অনেক ভেবেচিন্তে বসন্ত বলল, "রক্তের সম্পর্ক না থাকলে কি হবে, হামুকে আমি খুবই ভালবাসি।"

"তুমি কখনই ওকে ভালবাসতে পার না যতক্ষণ না তুমি ওর বাবার কথা ভুলে যেতে পারছ।" জোর দিয়ে বলল মুকু।

"হামুর বাবা?" বসন্ত আকাশ থেকে পড়ল, "আপনি বিশ্বাস করুন, হামুর বাবার কথা আমার মনেই ছিল না।"

"ছিল। নিশ্চয়ই তোমার অবচেতন মনে হামুর বাবা ভেসে বেড়াচ্ছিল।"

মুকু কায়দা ক'রে হামুর বাবাকে জলছবির মত ভাসিয়ে তুলছে বসন্তর সামনে। মুকু বুঝতে পেরেছে, তাকে পুনরুজ্জীবিত না করতে পারলে, বসন্ত কিছুতেই যেন সাবালক হ'য়ে উঠছে না। একজন প্রতিপক্ষ চাই। প্রতিপক্ষ একজন দাঁড় করাতে পারলেই, বসন্তর মনে ঈর্ষা আসবে। ঈর্ষা থেকেই জন্ম নেবে একজন সাবালক যোয়ানমর্দ বসন্ত দাস। অতএব হামু ও তার নিজের

মাঝখানে স্বকু নিয়ে এল গাড়োয়াল পাহাড় থেকে এক রহস্যময় পিতৃ-পরিচয়। সে বলল, "আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে হামুকে তুমি সর্বক্ষণ আদর করছ; কারণ তুমি কাপুরুষ। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ভয় পাও।"

"বিশ্বাস করুন, কোন কিছুতেই আমার ভয় নেই। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব কার সঙ্গে?"

"হামুর বাবার সঙ্গে।" মনস্তত্ত্বের খেলা দেখাতে লাগল মার্কসিষ্ট স্বকু চৌধুরী। আলোচনা থেকে সে হামুকে সরিয়ে নিতে লাগল। দু'দিকে দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী রেখে স্বকু এবার তার নিজের জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। আলোচনার মধ্যে জট পাকিয়ে গেছে, বসন্ত তাই ভেবে পাচ্ছিল না কি বলবে। অথচ কিছু একটা না বললেও ওর কাপুরুষতা নিয়ে স্বকু হয়তো সমস্ত দিনটাই রসিকতা ক'রে বেড়াবে। তাই সে বলল, "হামুকে নিয়ে আমি কোনদিনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাব না।"

"কিন্তু আমাকে নিয়ে?" স্বকু এগিয়ে বসল বসন্তর খুব কাছে, "আমাকে নিয়ে তুমি কি কোনদিনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না, বসন্ত? আমার কোন মূল্য আছে কি না তাও কি আমায় জানতে দেবে না?"

বসন্ত জবাব দিল না। মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। হামুর মুখের কাছ থেকে নিজের মুখটা সে সরিয়ে নিয়েছিল অনেকক্ষণ আগেই। হামুর মুখের দিকে চাইতে গেলেই যেন বসন্তর মাথা নীচু হয়ে আসছিল লজ্জায়। বসন্তর মনে বোধ হয় রং ধরছে। বসন্ত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে দেখে স্বকুই আবার বলল, "দু'পক্ষের লড়াই আমি কোনদিনও দেখতে পেলাম না বসন্ত!"

"ভারতবর্ষের বুকে এতবড় লড়াই লাগিয়ে দিয়ে এলেন, তবুও আপনার সাধ মিটল না? পাটোয়ারবাগানে থেকে গেলেই পারতেন।" কথাটা শেষ ক'রে বসন্ত হামুকে তুলে দিল স্বকুর কোলে।

স্বকু ধীরে ধীরে বলতে লাগল, "ওদের নতুন সাম্রাজ্যে আমার জন্যে দু' ইঞ্চি জায়গাও আর নেই।"

"এখানকার জায়গাও তো তেমন কিছু বড় নয়?" বলল বসন্ত।

"ছত্রিশ ইঞ্চি তো বটে," স্বকু ভাল ক'রে চাইল বসন্তর বুকের দিকে,

তারপর বলল, "আজ মনে হচ্ছে তোমার ছত্রিশ ইঞ্চির বিস্তৃতি সারা বিশ্বের চেয়েও বড়।—তুমি আমায় আশ্রয় দিয়েছ বসন্ত, ধরে রেখেছ ছত্রিশ ইঞ্চির গভীরতা দিয়ে। আমার আত্মসমর্পণ সর্তহীন।"

"আপনি বোধ হয় ভুল বলছেন।" বলল বসন্ত।

"কেন?"

"মানুষ মানুষকে আশ্রয় দিতে পারে না। যিনি পারেন তাঁর কাছেই আমাদের কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত।"

"আমার চেতনার সবটুকুই তো তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধের চরম স্বীকৃতি।"

"আপনার বিশ বছরের বিশ্বে মরলেও যাবে না!"

"কেন? কেন বসন্ত?"

একটু হেসে বসন্ত জবাব দিল, "আপনি বোধ হয় দু'মিনিটও চুপ ক'রে বসে থাকতে পারেন না। চব্বিশ ঘণ্টাই যেন ভাবছেন, কেমন ক'রে দুনিয়ার সবাইকে 'পার্টিতে' এনে ভর্তি ক'রে দেওয়া যায়। নিজেও ভাবছেন, অপরকেও ভাবাচ্ছেন।"

বসন্ত চলে যাচ্ছিল। গুরু তার পথ রুখে দাঁড়িয়ে বলল, "বসন্ত, রাজনীতি আমি ছেড়ে দিয়েছি।"

"রাজনীতি আপনাকে ছাড়ে নি। বিশ বছরের অভ্যাস সহজে কেউ ছাড়তে পারে না।"

"কিন্তু—"ভাবতে ভাবতে গুরু বলল, "বসন্ত, তুমি কি আমার কাছে কিছুই চাও না? পুরুষমানুষরা তো মেয়েদের কাছে চায় ষড়্‌রিপুর ঋতু উৎসব। চায় প্রেম। সবগুলো একসঙ্গে কাউকে আমি দিতে পারি নি।"

"তাহলে হামুর পিতার ঠিকানাটা দিন, আমি গিয়ে তাঁকে ডেকে নিয়ে আসছি।"

"আমার তাতে কি লাভ বসন্ত?" জানতে চাইল গুরু।

"কি করলে আপনার লাভ হয় বলতে পারেন?"

"বসন্ত, জীবনের ক্লেদের সত্য যদি না দেখলে, তবে প্রেমের সত্য বুঝবে কি

ক'রে ?—সর্বক্ষণ তোমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকাই আমার লাভ।" একটু ভেবে নিয়ে তুকুই আবার বলল, "পাশাপাশি আমরা দু'জনে যদি না চলতে পারি, ভূষণ্ডীর সমাজে তবে কথা উঠবে।"

"ভূষণ্ডীর সমাজ ? এখানে সমাজ আছে না কি ?" প্রশ্ন করল বসন্ত।

"অবনী মণ্ডল ও ওবাইদ মোল্লাকে নিয়েই তো আমাদের সমাজ। ওরা জানে তুমি আমার—" কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে তুকু এক মুহূর্তের জন্যে চেয়ে রইল হামুর দিকে। তারপর বলল, "হামুকে বাদ দিলেও চলবে না। সে বড় হয়ে যদি পিতৃ-পরিচয় দিতে না পারে, তবে আমরা কেমন ক'রে ওর কাছে মুখ দেখাব ?"

এবার যেন বসন্ত তুকুর মনের কথাটা বুঝতে পারল। পথ পেল এগিয়ে যাওয়ার। সে জিজ্ঞাসা করল, "অবনী মণ্ডল আর ওবাইদ মোল্লার কাছে মুখোস যেদিন খুলে পড়বে, সেদিন কি করবেন ?"

"তোমাকে পাবার জন্যে আমি আবার নতুন ক'রে মুখোস পরব। হামুকে রক্ষা করার মধ্যে সামাজিক প্রশ্নের চেয়ে মানবতার প্রশ্ন অনেক বড়। আমাকে শাস্তি দেবার জন্যে হামুর ভবিষ্যৎ কেন নষ্ট করবে তুমি ?"

"আপনাদের রাষ্ট্রে পিতৃ-পরিচয়ের ঠিকুজি নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। হামুর ভবিষ্যৎ হামুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। হামু জন্মেছে, সেইটেই তো রাষ্ট্রের প্রথম ও শেষ জ্ঞাতব্য বিষয়। যেদিন মরে যাবে, সেদিন ওরা জমা-খরচের খাতা থেকে ওর নামটা লালকালি দিয়ে কেটে দেবে। আপনার কাছে যতটুকু শিক্ষা পেয়েছি, তাতে মনে হয় জমা-খরচের বাইরে মানুষের কোন অস্তিত্বই নেই। হামু এল, জনসংখ্যা বাড়ল। হামু মরে গেল, জনসংখ্যা কমল। জন্ম ও মৃত্যুর মাঝখানের সময়টাতে হামু কি করল ? তিন হাজার ইউনিট ক্যালরি পেল চোদ্দ ঘণ্টা শ্রম দিয়ে। এর মধ্যে মানবতার তর্ক-বিতর্ক এনে ভবিষ্যৎ-হামুকে চঞ্চল ক'রে তোলার অর্থ কি ?"

"থিয়োরেটিকেলি অর্থ নেই সত্য। কিন্তু আমি তার মা—" সহসা তুকু ঘরের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। বসন্ত ওর মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। বাচ্চাটা আবার দুধ খাবার জন্যে ওর কাপড়টাকে নাড়াচাড়া করতে লাগল। বসন্ত মাঠের দিকে

এগিয়ে গেল দু'পা। তারপর একটু দূরে দাঁড়িয়ে হুকুকে উদ্দেশ ক'রে বলল, "মিথ্যে বাপ হওয়ার অযোগ্যতা আমার শ্রেষ্ঠ গুণ নয়।"

হুকুর মতামত শুনবার জন্যে বসন্ত আর অপেক্ষা করল না।

মঠের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল অবনী মণ্ডল। আজ সে প্রথম ভূষণ্ডীর মাটিতে লাঙল দিতে যাচ্ছে। হালিশহরের মাটির সঙ্গে এ-মাটির পার্থক্য আছে। হালিশহরে সে পরের মাটিতে লাঙল ঠেলেছে, ধান তুলেছে প্রচুর। কিন্তু পরের জমি ব'লেই সে-জমির প্রতি ওর কোন মমতা ছিল না। কেমন যেন মনটা ওর সর্বক্ষণ উদাস হয়ে থাকত। পরের ছেলেকে আদর করবার মতই সে হালিশহরের মাটিকে আদর করেছে, কিন্তু মাটির মধ্যে সে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারে নি। বোধহয় কোন চাষীই পারে না।

অবনী মণ্ডল ধীরে ধীরে গরু দু'টোকে জোয়ালের সঙ্গে বাঁধল। প্রথম দিন ব'লেই হয়তো কাজের তেমন তাড়া নেই। তা ছাড়া ভূষণ্ডীর জমি পতিত হলেও, এ-জমিটা তার নিজের ব'লেই সে মনে করছে। ওবাইদ মোল্লা কথা দিয়েছে, এ-জমির ওপর তার আর কোন দখল রইল না। বোধহয় সেই জন্যেই অবনী মণ্ডল আজ নিজেকে সত্যিকার চাষী ব'লে মনে করছে। মাটিতে পাথরের কুচি অনেক, সে জানে না কতটা ফসল সে তুলতে পারবে। তা না জানুক, নিজের মর্যাদা যে সে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে পেরেছে সেই কারণেই অবনী মণ্ডলের আজ সুখের কোন সীমা নেই। কারো আদেশ শুনে তাকে কাজে নামতে হবে না; ঘড়ি মিলিয়ে আটঘণ্টার শ্রমের হিসেব দিতে হবে না কাউকে।

কোমর থেকে গামছাটা খুলে নিয়ে সে মাথার চারদিকে ভাল ক'রে জড়িয়ে নিল। তারপর দাঁড়িয়ে রইল চুপ ক'রে মিনিট পাঁচেক। ওবাইদ মোল্লা এখনও এসে পৌঁছয় নি। কথা ছিল ওবাইদ মোল্লার সামনেই সে প্রথম দিন চাষের কাজটা শুরু করবে। বেলা বাড়তে লাগল। ওবাইদ মোল্লার জন্যে সে আর অপেক্ষা করল না। হয়তো সে কোন দরকারী কাজে আটকে পড়েছে। এই ভেবে অবনী মণ্ডল মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল একবার। তারপর

মাথা ঠেকালো লাঙলের গায়ে। কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করল আকাশের চারদিকে। দায়িত্ব তার কম নয়। একটা সংসার তার বাঁচিয়ে রাখতে হবে। পুরো বছরের ধান তুলতে হবে ভূষণ্ডীর পতিত জমি থেকে। এতবড় একটা দায়িত্ব নিতে হচ্ছে ব'লেই, অবনী মণ্ডল ভাবল, জীবনটা তার সার্থক হয়েছে। বগুড়া জেলার বাস্তুতে ফিরে গেলেও সম্ভবত এত বেশী সুখ তার হ'তো না। হালিশহরে দায়িত্ব ছিল না ব'লেই সুখের মুখ সে কোনদিনই দেখতে পায় নি।

লাঙল দিয়ে ঠেলা মারতেই ফালের সঙ্গে পাথরের যোগাযোগ হ'ল। ঠং ক'রে একটা শব্দ হতেই অবনী মণ্ডল ফালটাকে আলগা ক'রে তুলে ধরল উপর দিকে। তারপর মাটি থেকে টেনে বার করল একটা পাথর। পাথর ? অবনী মণ্ডল হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়ল মাটিতে। পরীক্ষা করতে লাগল, পাথরটা সত্যিই পাথর কি না। কালো কুচকুচে মসৃণ পাথরখানা দেখতে অনেকটা মশলা-বাটা নোড়ার মত। মুহূর্তের মধ্যে অবনী মণ্ডলের মনে ধর্মের প্রেরণা এল। গত পাঁচ বছর ধ'রে সে হালিশহরের জমিতে লাঙল চালিয়েছে, ফসল ফলিয়েছে সবার চেয়ে বেশী। কিন্তু হালিশহরের জমিতে সে পাথর পায় নি। সাধারণ পাথর এ নয়। লম্বায় প্রায় দু'হাত, চওড়ায় এক হাতের কম নয়, ওপর দিকটা গোল হয়ে প্রায় আধ হাত পর্যন্ত উঁচু হয়ে উঠেছে। অবনী মণ্ডল তার কৃষি-বিদ্যার জ্ঞান দিয়ে পাথরের মর্ম উদ্ঘাটন করতে পারল না। ক্রমে ক্রমে সে তার সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনাও হারিয়ে ফেলল। কিন্তু মানুষের মন তো একেবারে ফাঁকা থাকতে পারে না। দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে মনেও ততক্ষণ কিছু না কিছু একটা থাকবে। সমস্ত বুদ্ধি-বিবেচনা লুপ্ত হওয়ার পর অবনী মণ্ডলের শূন্য মনটা দখল ক'রে বসল ভয়। কালো কুচকুচে মসৃণ পাথরের ভয়। তারপর সে নিজের মাথা থেকে গামছাটা খুলে নিয়ে পাথর থেকে ধুলো পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখলে পাথরের ডাইনে-বাঁয়ে দু'টো ক'রে চারটে রেখা টানা রয়েছে। খুব সূক্ষ্ম রেখা। অবনী মণ্ডলের মনে আর কোন সন্দেহ রইল না যে, রেখাগুলো আসলে দু'টো চোখ। চোখের মণি দু'টো সে খুঁজে পেল না। তা না পাক, দেব-দেবীরা চোখের মণি ছাড়াই সব কিছু

দেখতে পান। নিশ্চয়ই দেখতে পান, নইলে তিনি ভূষণ্ডীর মাঠে আসবেন কেন? ভূষণ্ডীর পতিত জমিতে ফসল ফলাবার জন্তেই তিনি এখানে এসে আবির্ভূত হয়েছেন। যেখানে কষ্ট সেখানে তিনি কেষ্ট, যেখানে দারিদ্র্য সেখানে তিনি লক্ষ্মী, যেখানে অজন্মা সেখানে তিনি হলধর। হলধর হ'লেই অবনী মণ্ডলের সুবিধে হয়। সারাজীবন তো ওকে লাঙল নিয়েই থাকতে হবে। ভয়ের বদলে অবনী মণ্ডলের মনে এবার ভক্তি এল। পাথরটা আসলে পাথর নয়, হলধর। সে মাঠের বাইরে এসে পাথরটাকে গামছা দিয়ে মুড়তে লাগল। রোদ উঠেছে, ছাউনি একটা চাই।

এদিকে ওবাইদ মোল্লার ঘুম থেকে উঠতে আজ একটু দেরিই হয়ে গেল। সে নতুন রকমের একটা স্বপ্ন দেখছিল। মাঝরাত্রি পর্যন্ত যা [illegible]ছিল তাতে ভূষণ্ডীর গর্ভ থেকে কেবল সোনা আর সোনা বেরিয়েছে। কিন্তু ভো[illegible]রাত্রিতে যে-স্বপ্নটা সে দেখেছে সেটা খুবই খারাপ। কাল সে অবনী মণ্ডলকে তার নিজের লাঙলখানা দিয়ে এসেছে। কথা ছিল সকালের দিকটায় অবনী তার নিজের জমিতে কাজ করবে, আর বাকী দিনটা লাঙল চালাবে ওবাইদ তার পুরনো জমিতে। একটা লাঙল ভাগাভাগি ক'রে দু'জনে পাশাপাশি সমান সুখদুঃখের মধ্যে বসবাস করবে ব'লে ওবাইদ মোল্লা মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছিল। ভোরের দিকে স্বপ্ন দেখল, লাঙলের ফালটা ভেঙে দু'টুকরো হয়ে পড়ে রয়েছে মাঠে! অবনী মণ্ডল মাথা কুটছে! কি হবে? স্বপ্নের মধ্যেই ওবাইদ মোল্লা ভেবেছে, পুরো বছরটাই বুঝি ওদের সবাইকে এবার উপোস ক'রে থাকতে হবে। ঘুম তবু তার ভাঙে নি। সে ভাবতে লাগল, লাঙলের ফাল দিয়ে ঠেলা মারলে কেবল পাথর বেরয়। ফাল যায় ভোঁতা হয়ে। নবীন কামার আজ বিশ বছর থেকে ওবাইদ মোল্লার লাঙলের ফালে ধার দিচ্ছে, কিন্তু পুরো মজুরি সে কোনদিনই তার কাছ থেকে পায় নি। দু'এক টাকা সে মাঝে মাঝে নবীন কামারকে দিয়েছে বটে, কিন্তু বিশ বছরের ঋণ তাতে শোধ হয় না। ওবাইদ মোল্লা ঋণকে বড্ড ভয় করে। ভয় করে ব'লেই ভাঙা-ফাল দেখে সে চেঁচিয়ে উঠল ঘুমের মধ্যেই। কিংবা চেঁচাতে গিয়েই বোধহয় ওবাইদ মোল্লার ঘুম ভেঙে গেল। ধাক্কা দিয়ে মেহের বিবিকেও ঘুম থেকে তুলল সে। জিজ্ঞাসা করল,

"আমায় তুলে দিস নি কেন? ভোররাতের স্বপ্ন যে সত্যি হয় তা কি তুই জানিস না মেহের?"

"তা জানি। কিন্তু আজ যে তুমি খারাপ স্বপ্ন দেখবে তা কি ক'রে জানব?" বলল মেহের বিবি।

"ঠিক, ঠিক কথাই বলেছিস মেহের।—বড় মসজিদের আজান শুনে রোজই আমার ঘুম ভাঙত। আজ আমি আজান শুনতে পেলুম না কেন রে?" জিজ্ঞাসা করল ওবাইদ মোল্লা।

"নয়া কানুন চালু হয়েছে। তাই ভয়ে কেউ আর মসজিদে যায় না আজান দিতে।" মেহের বিবি উঠে বসল।

ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে। ভোর রাত্রে স্বপ্ন না দেখলে ওবাইদ মোল্লা এতক্ষণে ভুষণ্ডীর মাঠে গিয়ে পৌঁছে যেত। সে বুঝতে পারল যে, আজান বন্ধ হওয়ার জন্যেই আজ সময়মত তার ঘুম ভাঙেনি। ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সে জিজ্ঞাসা করল, "খোদাতালার আইনের বিরুদ্ধে যারা আজ নতুন আইন চালু করছে, তারা সব কোন্ দেশের লোক রে মেহের? সাহেব-সুবোরা আবার সব শহরে ফিরে এল নাকি?"

মেহের বিবি সাহেব-সুবোর খবর রাখে না। পাইকারের কাছ থেকে গফুর ব'লে একটি বারো-তেরো বছরের ছেলে আসে দুধ নিতে। মেহের বিবি তারই মারফত দু'চারটে খবর পায়। সে বলল, "শুনতে পাচ্ছি, এখন থেকে সবাই পেট ভরে খেতে পাবে। ওসমান গণিদের জুলুমবাজী আর চলবে না।"

"আমিও তাই শুনেছিলুম মেহের। কিন্তু যারা আজ খোদার ওপর খোদকারি করছে, তাদের জুলুমবাজী রুখবে কে, বল্?"

"রুখবে বোধহয় খোদাতালা নিজেই।" বিবি মেহেরউন্নিসার কণ্ঠে প্রত্যয়ের সুর শোনা গেল।

ওবাইদ মোল্লা অনেক ভেবে-চিন্তে বলল, "তুই ঠিকই বলেছিস বৌ। কিন্তু একটা কথা আমি মাঝে মাঝে ভাবি। মণ্ডল ভাইয়ের সঙ্গে নিরিবিলিতে বসে আলাপ-আলোচনাও করেছি। মেহের, আমাদের দু'জনের যা বুদ্ধি তোর একার বুদ্ধি তার চেয়েও বেশী। কথাটা শুনবি?"

"হ্যাঁ।"

"ভাখ, আমরা তো কোনদিনই কারো কাছে কোন আর্জি নিয়ে উপস্থিত হইনি। পেট ভরে খেতে পাই না, কিন্তু অপরের গোলা থেকে চাল চুরি করবার প্রবৃত্তি আমাদের নেই। সুলতানপুরের একটা মানুষ কিংবা একটা পশুপক্ষীও বলতে পারবে না, আমরা কারো কোন ক্ষতি করেছি। আমরা জেলায় গিয়ে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার স্বপ্নও দেখি না। কিন্তু শহরের লোক-গুলো বারবার ক'রে আমাদের আঘাত দেয় কেন, বলতে পারিস? আমরা চাষী, ফসলের বাইরে আমাদের কোন ইজ্জৎ নেই। তবে কেন ওরা আজান দেওয়া বন্ধ করল মেহের?"

"তাহলে বোধহয় শহরে আবার সাহেব-সুবোরা ফিরে এসেছে।" জবাব দিল মেহেরউন্নিসা।

"সম্ভব, খুবই সম্ভব।"

ওবাইদ মোল্লা ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল গোয়াল ঘরের দিকে। হঠাৎ তার মনে পড়ল অবনী মণ্ডল আজ পতিত জমিতে প্রথম লাঙল চালাবে। কথা দিয়ে এসেছিল, সে খুব ভোরবেলায়ই ভূষণ্ডীতে এসে উপস্থিত হবে। তাই সাহেব-সুবোর কথা ভুলে গিয়ে ওবাইদ মোল্লা ছুটল ভূষণ্ডীর দিকে।

ওবাইদ মোল্লা দূর থেকেই অবনী মণ্ডলকে দেখতে পেয়েছে।

লাঙল ছেড়ে দিয়ে অবনী মাঠের ধারে বসে আছে কেন? তবে কি ভোরের স্বপ্ন সত্যি হ'ল? ওবাইদ মোল্লা ছুটতে লাগল মাঠের ওপর দিয়ে। পথ যেন আর শেষ হতে চায় না। ওর চোখের সামনে যেন ভূমিকম্প হচ্ছে! একটা গোটা সাম্রাজ্য তলিয়ে যাচ্ছে ফাটা মাটির গহ্বরে। রাজা উজিরের সাম্রাজ্য এ নয়, এ মোল্লাবাড়ির চাষী সম্রাটদের জগৎ-জোড়া বিস্তার। ফালের মুখের পরিধি ঘিরে সাম্রাজ্যের সীমান্ত খাড়া হয়েছে। মোল্লাবাড়ির শেষ সম্রাট ওবাইদ মোল্লা দৌড়তে দৌড়তে হাঁপিয়ে পড়ল। মনে হ'ল পায়ের মাংসপেশীর ওজন সে আর বইতে পারছে না। ভূষণ্ডীর পাথরগুলো বুঝি ওর মাংসপেশীতে জমাট বেঁধে গেছে। কোন রকমে সে পা টেনে টেনে এসে উপস্থিত হ'ল মাঠের ধারে।

সে দেখল, মণ্ডল ভাই তার বড় একটা পাথর সামনে নিয়ে বসে আছে। ওবাইদ মোল্লা নিজেও খুব অবাক হ'ল। ভুবণ্ডীর গর্ত থেকে এত বড় পাথর সে কোনদিনই উঠতে দেখেনি। মুহূর্তের মধ্যে সেও কালের কথা ভুলে গেল।

"কি ভাই অবনী, ব্যাপার কি?" প্রশ্ন করল ওবাইদ মোল্লা।

"সাক্ষাৎ হলধর!" অবনী মণ্ডল গামছাটা ঈষৎ আলগা ক'রে খুলে ধরে পুনরায় বলল, "চোখ দেখেছ? এ ভাই লাঙলের দেবতা—"

"দেবতা? বল কি মণ্ডল ভাই? মোল্লাবাড়ির মাটিতে দেবতা আসবে কেন?"

"দেবতার কাছে জাত-জন্মের কোন ফারাক নেই। বুঝলে ওবাইদ ভাই, ভুবণ্ডীর মাটি থেকে কুচোকাচা পাথর সব এবার বিদায় নিল। ক'মণ ধান তুলতে হবে ভুবণ্ডীর মাটি থেকে?" জিজ্ঞাসা করল অবনী মণ্ডল।

"বল কি? কুচো পাথরগুলো সব পালিয়ে গেল? ইয়া খোদা! বিঘে প্রতি দশ মণ ক'রে তুলতে পারলে, আমরা আর মহাজনের কাছে গিয়ে হাত পাতব না। সুদ দেব না এক ছটাক চালও। মণ্ডল ভাই, দেবতার গায়ে একটু হাত দেব? একটু ছুঁয়ে দেখব?"

ওবাইদ মোল্লা আবেগ ও উত্তেজনায় ভেঙে পড়তে লাগল। তারপর দুজনে মিলে হলধরকে চ্যাংদোলা ক'রে তুলে নিয়ে চলল গাছতলার দিকে। দু'জনের জমির মাঝামাঝি জায়গায় একটা বাবলা গাছ ছিল। অবনী মণ্ডল তার গামছাটা ফেলল গাছতলায়। তারপর হলধরকে গামছার উপর বসিয়ে দিয়ে সে বলল, "এখান থেকে আমাদের দু'জনের জমিটাই হলধর দেখতে পাবে।"

ওবাইদ মোল্লা তার নিজের মাথা থেকে গামছাটা খুলে নিয়ে বলল, "দু'দিকে দু'টো গাছের ডাল পুঁতে দিয়ে আমার গামছাটা মাথার ওপর টাঙিয়ে দিলে পাথরের গায়ে রোদ লাগবে না।"

"পাথর নয় ওবাইদ ভাই, এ সাক্ষাৎ হলধর! গোছা গোছা ধান যখন উঠবে, তখন বুঝতে পারবে হলধর কত বড় করিতকর্মা দেবতা! ওবাইদ ভাই, পরানপুরের মাজার শরীফ চেন?"

"পরানপুর? সেটা কোন্ মুলুকে?"

"বগুড়া জেলায়। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে মক্কা থেকে এক ফকির সাহেব আসেন পরানপুরে। ফকির সাহেব দেখলেন এসে পরানপুরের চাষীরা মাঠ থেকে ধান তুলতে পারে না, বন্যার জলে সব ডুবে যায়। চাষীরা সব প্রতিবছরই জেলা-শহরে গিয়ে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের দরজায় আর্জি পেশ ক'রে আসে। কিন্তু ইংরেজ সাহেবরা কেউ পরানপুরের দিকে দৃষ্টি দেয় না। ফকির সাহেব এসেই বললেন যে, বন্যা থামানো সাহেব-সুবোর কম্ম নয়। খোদার দোয়া না থাকলে বন্যা থামবে না। বুঝলে ভাই ওবাইদ, পরের বছর থেকে বন্যা থেমে গেল। আমরা তো ঠাকুরদার আমল থেকে দেখে আসছি, ফকির সাহেবের মাজার শরীফে একসের কাঁচি-দুধ আর সতের আনা পয়সা মানত না ক'রে কেউ ধানের জমিতে লাঙল ছোঁয়ায় না। আমার বিশ্বাস ভূষণ্ডীর মাঠে এবার ধানের বাহার দেখতে সাত তল্লাট থেকে লোক আসবে।"

ওবাইদ মোল্লার মনে বিশ্বাসের ঢেউ বইতে লাগল। পাথরের দিকে চেয়ে ও যেন দেখতে পেল সুলতানপুর আর রহমতপুর থেকে কাতারে কাতারে লোক আসছে ভূষণ্ডীর দিকে।

একটু পরে দু'জনেরই সংবিৎ ফিরে এল। হলধরের সামনে অবনী মণ্ডল সোজা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। হাত-দু'টো ছড়িয়ে দিল পাথরের দিকে। ওবাইদ মোল্লা অবাক হয়ে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ পর্যন্ত। সে ব্যাপার দেখে খানিকটা ভড়কে গেছে। জিজ্ঞাসা করল, "শুয়ে পড়লে কেন মণ্ডল ভাই?"

অবনী মণ্ডল জবাব দিল না। ওবাইদ মোল্লা পুনরায় বলল, "একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে আমার বড্ড ভয় করছে।"

অবনী মণ্ডলের কাছ থেকে তবু কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। সে উপুর হয়ে মুখ গুঁজে রইল। ওবাইদ মোল্লা লক্ষ্য ক'রে দেখল, হাত-পা গুলোও তার যেন অসাড় হয়ে গেছে। মণ্ডল ভাই কি তবে মরে গেল নাকি? ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল ওবাইদ মোল্লার। সাহস ক'রে সে আর পাথরটার দিকে চোখ ফেলতে পারছে না। সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। এদিক-ওদিকে চেয়ে দেখল ওবাইদ মোল্লা, বসন্তকে কাছে কোথাও দেখা যাচ্ছে কি না। সে দেখতে পেল না বসন্তকে। নিরুপায় হয়ে ওবাইদ মোল্লাও উপুর হয়ে শুয়ে

পড়ল পাথরের সামনে। দু'হাতের মাঝখানে মুখটাকে ঢেকে রাখল। ভয়ে চোখ বুজে রইল অনেকক্ষণ পর্যন্ত।

একটু পরেই অবনীমণ্ডল মাটি থেকে উঠে পড়ল। ওবাইদ মোল্লাও দেরি করল না উঠতে। সে জিজ্ঞাসা করল, "হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছিলে কেন?"

"হলধরের পায়ে মনের সব কথা নিবেদন ক'রে দিলুম। পাপ অনেক জমা হয়েছিল, বুঝলে? সেই যে হালিশহরে পরের জমিতে লাঙল ঠেলে এলুম, বাবুরা আমায় এক মিনিটের জন্যে ঠাকুর-দেবতার পুজো করতে দেয় নি। বুঝলে ভাই ওবাইদ মোল্লা, আমরা চাষী। আমাদের কাছে লাঙল যেমন সত্যি, ধর্মও তেমনি সত্যি।"

"ঠিক, ঠিক—যথার্থ কথা।" মাথা নেড়ে সায় দিল ওবাইদ মোল্লা। তারপর দু'জনে মিলে একসঙ্গে এল মাঠের মধ্যে। ওবাইদ মোল্লা বসে পড়ল মাটিতে। হাত দিয়ে লাঙলের ফালটা পরখ করতে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে, "সর্বনাশ হয়েছে, ফালের মুখ যে ভেঙে গেছে মণ্ডল ভাই!"

ভূষণ্ডীর ফাঁকা মাঠে ওবাইদ মোল্লার আর্তনাদ অবনী মণ্ডল ছাড়া আর কেউ শুনতে পেল না। ফালের সাম্রাজ্য দ্বিখণ্ডিত! এখন অবনী মণ্ডলের বিশ্বাস যদি খণ্ডাকার না হয় তবেই হয়তো পাথরের ইজ্জত কোন রকমে রক্ষা পাবে। ওবাইদ মোল্লার আর্তনাদ থেমে যাওয়ার পর, অবনী মণ্ডল বলল, "কোন ভয় নেই ভাই ওবাইদ মোল্লা, ভাঙা ফাল জোড়া লাগবে। হলধরের উদ্দেশ্য আমরা কি ক'রে বুঝব বল?"

"কিন্তু জোড়া লাগবে কি ক'রে? নবীন কামার পাঁচ সের চাল চেয়ে বসবে। তার পুরনো ঋণও শোধ দিতে পারি নি। মাটিতে লাঙল পড়ল না, এদিকে বর্ষার পানি পড়বার সময় হয়ে গেল! মণ্ডল ভাই, আমাদের এখন উপায় হবে কি?"

"উপায় করবেন হলধর নিজেই। কিন্তু নবীন কামার থাকে কোথায়?"

"থাকে সুলতানপুরে। আজ তো সে ঘরে নেই। বসিরহাটে গেছে, ঘোড়ার পায়ে নাল বাঁধবার জন্যে। আজ হয়তো নাও ফিরতে পারে।"

"ফিরবে। হলধর হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে আসবে।" অবনী মণ্ডল গরু দু'টোকে খুলে দিয়ে বলল, "ওরা ঘুরে ঘুরে ঘাস খাক। আমরা চল হলধরের কাছে বসে গল্পগুজব করি।"

"কিন্তু কালকে মাটিতে লাঙল দেব কি ক'রে?" জিজ্ঞাসা করল ওবাইদ মোল্লা।

"ব্যবস্থা করবেন হলধর।" জবাব দিল অবনীমণ্ডল। হতাশভাবে ওবাইদ মোল্লা মাথা নেড়ে অবনী মণ্ডলের সব কথাতেই সায় দিতে লাগল।

ভূষণ্ডীর পতিত জমিতে সেদিন আর লাঙল পড়ল না।

সন্ধ্যের সময় ঘরে ফিরে ওবাইদ মোল্লা মেহের বিবির কাছে কোন কথাই গোপন করল না। মেহেরউন্নিসার মনে সত্যি সত্যি ভয় এল, ভবিষ্যতের ভয়। সে জিজ্ঞাসা করল, "পুরো বছর পেট চলবে কি ক'রে? লাঙল কোথায় পাবে? কেবল মুখের কথায় নবীন কামার নেয়াই পাতবে না এবার।"

"রাগ করিস নে মেহের। মণ্ডল ভাই বলেছে, যে-পাথরে ফাল ভেঙেছে সেই পাথরই আবার ভাঙা-ফাল জোড়া লাগিয়ে দেবে। নসিবে যা আছে তাই তো ঘটবে। একচুল এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই।" তারপর সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, "ওসমান গণি সুদ নিত বটে, কিন্তু তার কাছে হাত পাতলে সে শুধু হাতে ফিরিয়ে দিত না। ওর ঘরে বিশ তিরিশটা লাঙল ছিল।"

এই সময় গোয়ালঘরের দিকে গফুরের গলা শোনা গেল। ওবাইদ মোল্লা জিজ্ঞাসা করল, "রাত্রিবেলা গফুর এসেছে কেন? সকালবেলা পাইকেরের দুধ পাঠাস নি?"

মেহের বিবি বলল, "বাইরে গিয়ে দেখ দিকি একবার, গফুর বোধহয় একলা আসে নি।"

"একলা আসে নি?"

"না। অপর লোকের গলা শোনা যাচ্ছে।"

"কেন? কেন মেহের?"

"আজ সকালে গফুর যখন দুধ নিতে এসেছিল—" ওবাইদ মোল্লা মাথা দিয়ে

বিবির মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, "অতো জোরে জোরে বলিস নে, ওরা শুনতে পাবে যে! হ্যাঁ, এবার বল্।"

"গফুর জিজ্ঞাসা করল, আপা, তোমার কাছে আলতা আছে?"

"তুই কি জবাব দিলি মেহের?"

"বললুম আছে। বসিরহাটের বাজার থেকে তুমি নিজেই তো কিনে এনেছিলে আলতা।"

"গফুর আলতা চায় কেন?" জিজ্ঞাসা করল ওবাইদ মোল্লা।

"হিন্দুস্থানে লালবাদশার রাজত্ব সুরু হয়েছে। গফুর তাই নিজের কুর্তা-লুঙ্গি সব আলতা দিয়ে রাঙিয়ে নিতে চায়।"

"তুই দিয়ে দিলি বুঝি?"

"সবটুকু দিই নি। আমাদের কাপড়চোপড় যদি ছোপাতে হয়?"

"মেহের, তোর একটা মাথায় যা বুদ্ধি আছে, আমাদের গোটা সুলতানপুরের মাথায় তা নেই।"

দাওয়ায় দাঁড়িয়ে গফুর ডাকল "আপা, ঘরে আছ নাকি?"

ওবাইদ মোল্লা তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এল। জিজ্ঞাসা করল গফুরকে, "কি রে গফুর, লালকুর্তা দেখাতে এসেছিস বুঝি?"

"না ভাইজান, ওসমান গণির কুঠিতে মিটিং বসেছে। তোমাকে তাই তলব করেছে শাজাহান মিঞা। বেইমান ওসমান গণি পালিয়েছে, খবর রাখ তো?"

"তা রাখি। কিন্তু শাজাহান মিঞা তলব করলে আমাকে যেতে হবে কেন? তুই গিয়ে তাকে বলিস, ওবাইদ মোল্লা কারো হুকুম তামিল করে না।"

গফুর পেছন দিকে একবার চেয়ে নিয়ে ফিস ফিস ক'রে বলল, "ভাইজান, বাইরে সব লাল চৌকিদারেরা দাঁড়িয়ে আছে। তোমাকে ওরা নিয়ে যেতে এসেছে। শাজাহান মিঞা আর সেই আগের মত নেই। হিন্দুস্থানের লালবাদশার দফতরের সে এখন বড় দারোগা।"

"তাহলে লালবাদশার পরোয়ানা কই? আমি দেখব।" গর্জন ক'রে উঠল ওবাইদ। ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল কাজীপাড়ার লালু শেখ। হাতের বন্দুকটা ওবাইদ মোল্লার নাক পর্যন্ত তুলে ধ'রে সে বলল, "পরোয়ানা

দেখেছ ?" ওবাইদ মোল্লা কেবল পরোয়ানাটাই দেখল না, সে কাজী পাড়ার ছিঁচকে চোর লালু শেখকেও দেখল। লুঙ্গির ওপর দিয়ে গায়ের পিরানটা হাঁটুর তলা পর্যন্ত ঝুলছে। লালু শেখের নিজের জামা নয়। হয়তো বা ওসমান গণির বাক্স-ভর্তি জামা থেকে একটা জামা লালু বার ক'রে নিয়েছে। লাল রঙয়ে ছোপানো পিরান। ওবাইদ মোল্লা দেখল পিরানটার হাতা দু'টোয় রং লাগে নি, কেবল ছাতির দিকটায় লাল রংটা ঢেউয়ের মত উঁচুনীচু ভাবে জমাট বেঁধে আছে।

লালু শেখের বন্দুকের দিকে চেয়ে ওবাইদ মোল্লা বলল, "ভাল অস্তর পেয়েছিস লালু। এবার থেকে সিঁধ কাটবার জন্যে শাবল হাতে সমস্ত রাত জেগে বসে থাকতে হবে না।"

লালু শেখ বন্দুকের বাঁট দিয়ে ওবাইদ মোল্লার কটিদেশে মৃদু একটা আঘাত করল। ভয় পেয়ে গফুর বলল, "ভাইজান, জলদি চল। তুমি না গেলে মিটিং শুরু হতে পারবে না।"

এই সময় প্রবেশ করল দ্বিতীয় চৌকিদার, দর্জিপাড়ার সয়ফুল্লা। তারও হাতে একটা বন্দুক। সূঁচ আর সুতোর কারবার ছেড়ে দিয়ে সয়ফুল্লা বন্দুক ধরেছে। না ধ'রে তার উপায়ও ছিল না। সারা জীবন ওসমান গণিদের জন্যে সে শার্ট-পাঞ্জাবি সেলাই করেছে, কিন্তু নিজের জন্যে এক ফালি কাপড় সে যোগাড় করতে পারে নি। ঈদের সময় ওসমান গণিদের শেরোয়ানীর ঝুলটা কিছু কমিয়ে দিলে সয়ফুল্লার কাপড়ের অভাব ঘুচত, কিন্তু সয়ফুল্লা তা করে নি। সয়ফুল্লা কোরাণ-হাদিস পড়ে। আজ ওবাইদ মোল্লা দেখল, সয়ফুল্লাও বিশ্বাস হারিয়েছে। গায়ে পরেছে লম্বা একটা পিরান। হাতা দু'টো সেলাই করবার সময় পায় নি। সময় পায় নি বোতামের ঘর কাটবার। শার্টের তলার দিকটায় কাঁচি চালিয়েছে বটে, কিন্তু গোল ক'রে কাটা নয়। মুড়ি ভেঙ্গে সেলাই পর্যন্ত করে নি। কেমন যেন হাতাকাটা আলখিল্লার মত গজ তিনেক শাদা থান-কাপড় গলার থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলছে। সয়ফুল্লা সামনে এগিয়ে এসে বলল, "করিস কি লালু, ওবাইদ ভাই যে সত্যিকারের সর্বহারা! কমরেড চৌধুরী বলেছেন, ভারতরাষ্ট্র শাসন করবে চাষী আর মজুররা।" তারপর ওবাইদ

মোল্লার দিকে চেয়ে সে বলল, "কমরেড, তোমায় আমরা গ্রেপ্তার করতে আসি নি, এসেছি তোমার সাহায্য চাইতে।"

ওবাইদ মোল্লার চোখ দিয়ে জল আসছিল। সারা দুনিয়ায় কারো কোন ক্ষতি সে করে নি, অথচ লালু শেখ ওর কোমরে বন্দুক দিয়ে একটা গুঁতো মারল! নাকের ডগায় বন্দুকের নলটা ঠেকিয়ে রেখে একজন সাচ্চা চাষীর ইজ্জত মারল কাজীপাড়ার ছিঁচকে চোর লালু শেখ! দুনিয়া থেকে ইনসাফ কি তবে উঠে গেল? প্রমাদ গণল ওবাইদ মোল্লা। ওসমান গণির কুঠির দিকে হাঁটতে হাঁটতে ওর মনে হ'ল, কোরাণ-হাদিসের শাস্তি বোধহয় মানুষের আর পছন্দ হচ্ছে না। ওদের সহ্য হচ্ছে না মোল্লাবাড়ির স্বামী-স্ত্রীর সুখের জীবন। সুখ? ওবাইদ মোল্লা একটু থেমে গেল। সুখ কোথায় ওরা দেখল? সুলতানপুরের সীমান্তে একটা ভাঙ্গাবাড়ি আর সীমান্ত ছাড়িয়ে ভূষণ্ডীর বিঘে কুড়ি পতিত জমি। এই তো ওবাইদ মোল্লার সুখের সম্পত্তি! তার উপর আজ পাথরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে লাঙলের ফালটাও গেছে ভেঙে। কথাটা মনে পড়তেই ওবাইদ মোল্লা ওসমান গণির দরজা থেকে প্রায় ফিরে আসছিল। মাথার ভিতর কেমন যেন ঝিম্ ঝিম্ ক'রে উঠল। সে বলল, "আমায় তোমরা ছেড়ে দাও মিঞা সাহেবরা। ওসব মিটিং-ফিটিং দিয়ে আমার কি দরকার?" ওর পথ রুখে দাঁড়িয়ে সয়ফুল্লা বলল, "তোমার নিজের দরকার না থাক, অন্যান্য পাঁচজনের দরকার আছে।"

রেগে উঠল ওবাইদ মোল্লা। জিজ্ঞাসা করল, "আমি কি তোমাদের পাঁচজনের পাকা ধানে মই দিতে গেছি যে তোমরা আমায় জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছ?"

"আমরা তোমায় একলা থাকতে দেব না, কারণ পাঁচজনকে ভাল ক'রে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে তোমাকে আমরা চাই। আমরা ছ'জন মিলে যে-কাজ করতে পারব, তুমি একলা সে-কাজ করতে পারবে না। ওবাইদ সাহেব, চাষী-মজুরদের রাজত্ব সুরু হয়েছে, দলের বাইরে থাকলে মারা পড়বে যে।" সয়ফুল্লা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওর সামনে।

ওবাইদ মোল্লা সহসা হো হো ক'রে হেসে উঠল। ওর হঠাৎ উল্লাসের কারণটা বুঝতে না পেরে সবাই চেয়ে রইল ওবাইদ মোল্লার মুখের দিকে।

হাসিটা পুরোপুরি না থামিয়ে সে বলল, "সেই থেকে তো তোমরা মিঞা সাহেবরা বার বার ক'রে আমায় রাজা-উজির তৈরি করছ, কিন্তু ওবাইদ-রাজার একটা ভাঙা-লাঙল জোড়া দেওয়ায় ক্ষেমতা নেই। এ কেমন রাজা গো?"

"নতুন লাঙল তোমার ক'টা চাই?" প্রশ্ন করল সয়ফুল্লা।

"ও-সব ভোটের ধাপ্পা ক'বারই তো শুনলুম। আমার এই সারা জিন্দিগিতে খাকী টুপি দেখেছি, সবুজ টুপি দেখেছি আর এই সেদিন সাদা টুপি দেখলুম সয়ফুল্লা মিঞা! এবার আবার লাল টুপির খেল্ দেখাচ্ছ, না? রাজা-উজির নিয়ে তোমরাই থাকো, আমি এবার চলি। লাঙলের ফাল জোড়া দিতে হবে, রাস্তা ছাড়।"

সয়ফুল্লা একেবারে সোজাভাবে মেরুদণ্ড খাড়া ক'রে কণ্ঠে তার গভীর বিশ্বাসের স্বর তুলে বলল, "লাল টুপিতে ধাপ্পা নেই। তোমার ক'টা লাঙল চাই?"

"টুপির জবান আর আমি বিশ্বাস করব না।" উল্টো দিকে পা বাড়াল ওবাইদ মোল্লা।

এই সময় ওসমান গণির বাড়ি থেকে ন'দশ জন লাল চৌকিদার বেরিয়ে এল। ভয় পেল ওবাইদ মোল্লা। মনে পড়ল মেহের বিবির কথা। লোকগুলোকে সে হয়তো খুব বেশী ভয় করত না, কিন্তু বন্দুকগুলো তো মিথ্যে নয়? সে যদি মরে যায়, তবে মেহের বিবিকে দেখবে কে?

"চল চল, লাল বাদশার বড় দারোগার জবান শুনে আসি।" ওবাইদ মোল্লা নিজেই চলল ওসমান গণির বাড়ির দিকে আগে আগে।

ওসমান গণির কাছারি বাড়িটায় মিটিং বসেছে। তিন খানা তক্তাপোশ একসঙ্গে জোড়া দিয়ে তার ওপরে ফরাশ পাতা রয়েছে। ঘরে ঢুকে ওবাইদ মোল্লা এখানকার সব কিছুই চিনতে পারল। বহুবার তাকে এই ঘরে ঢুকতে হয়েছে। সেদিন যখন সে ওসমান গণির কাছে দু'খানা বাঁশ ধার নিতে এসেছিল তখন সে এই ঘরে ঢুকেই লাল খাতায় টিপসই দিয়ে গেছে। তক্তাপোশের পেছন দিকের কুলঙ্গিতে সেই সব লাল খাতাগুলো আজও সে দেখতে পেল।

মনে হ'ল, একটা খাতাও যেন খোয়া যায় নি। ওসমান গণি পালিয়ে গেছে বটে, কিন্তু হিসেবটা তার পড়ে রয়েছে সুলতানপুরেই। ভালই হয়েছে। ঋণ তার ওবাইদ মোল্লা শোধ দিয়ে দেবে। গোটা তিনেক বাঁশের গায়ে একটু রং ধরলেই সে সমান মাপের তিনটে বাঁশই ওসমান গণির কাছারি বাড়ির সামনে ফেলে রেখে যাবে। তারপর কোনদিন যদি ওসমান গণি ফিরে আসে, তবে লালখাতার টিপসই খারিজ করিয়ে নেবে ওবাইদ মোল্লা।

ঘরে ঢুকতেই শাজাহান মিঞা বলল, "তক্তাপোশের ওপর উঠে ব'স কমরেড মোল্লা।"

ওবাইদ মোল্লা চেয়ে দেখল, সুলতানপুরের অনেকেই আজ তক্তাপোশের ওপর উঠে বসেছে। ওসমান গণির সামনে এরা কেউ কোনদিনও সাহস ক'রে তক্তাপোশের কাছেও যেতে পারে নি। এদের সবাইকে বসতে হয়েছে দূরের ঐ টুলের ওপর দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে। সে নিজেও কখনও অতো উঁচুতে উঠবার চেষ্টা করে নি। আজকে তাই সে নতুন ব্যবস্থাটা সহসা যেন মেনে নিতে পারল না। সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চাইতে লাগল।

শাজাহান মিঞা একটু জোর দিয়েই বলল, "যারা এতদিন ধরে আমাদের শোষণ ক'রে আসছিল, তাদের আমরা পা দিয়ে এবার মাড়িয়ে দেব।" শাজাহান মিঞা ফরাশের ওপর নিজের পা'টা ঘসতে লাগল বারবার। ওবাইদ মোল্লা বলল, "রাজার পেছনে গালি দিলে রাজার তাতে অপমান নেই। গণি সাহেবের অবর্তমানে, ফরাশের ওপর পা ঘসলে কি হবে, তাঁর গায়ে লাগবে না। আমি ঐ টুলের ওপরই বসছি।"

লাল চৌকিদারদের মধ্যে প্রতিবাদ উঠল। কিন্তু কেউ কোন প্রস্তাব তুলতে সাহস করল না। সাচ্চা চাষীকে অপমান করবার ক্ষমতা বড় দারোগারও নেই।

শাজাহান মিঞা ঘোষণা করল, "এবার আমাদের মিটিং সুরু হোক। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।"

জনতা একসঙ্গে চিৎকার ক'রে উঠল, "ইনক্লাব জিন্দাবাদ।"

"কমরেড চৌধুরী জিন্দাবাদ।"

"কমরেড চৌধুরী জিন্দাবাদ।"

"লাল ভারত জিন্দাবাদ।"

"লাল ভারত জিন্দাবাদ।"

"খোদার শাসন মানব না।"

"খোদার শাসন মানব না।"

"মোল্লা-মসজিদ তোড় দেও।"

"মোল্লা-মসজিদ তোড় দেও।"

"ই-ন্-ক্লা-ব জি-ন্দা-বা-দ।"

ওবাইদ মোল্লা কাছারি বাড়ির দেয়ালগুলোর দিকে চেয়েছিল। এতোগুলো লোকের চিৎকারে দু'একটা দেয়াল ধসে পড়তে পারত। কিন্তু গণি সাহেবের ব্যবস্থায় কোন ফাঁক ছিল না। এক নম্বর ইট দিয়ে বেশ পুরু ক'রে সে দেয়াল তৈরি করিয়েছে। লালু শেখ তাই কোনদিনও শাবল মেরে ওসমান গণির কুঠিতে সিঁধ কাটতে পারে নি। লালু শেখ স্বপ্ন দেখত ডাকাত হওয়ার। ডাকাত না হতে পারলে ওসমান গণির কোন্ ভিটেতে সিঁধ কাটবে সে?

শাজাহান মিঞা মিটিং সুরু করল, "আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে, ওসমান গণির দশখানা লাঙল আজ বিলি করা হবে।" সয়ফুল্লা বলল, "আমি প্রস্তাব করছি, একখানা লাঙল কমরেড মোল্লাকে দেওয়া হোক।"

"আমি কমরেড সয়ফুল্লার প্রস্তাব সমর্থন করছি।" ওপাশের ওপর থেকে ঘোষণা করল খালেক মিঞা।

ওবাইদ মোল্লা কেবল অবাক হ'ল না, লাল টুপির মধ্যে যেন সে স্বয়ং খোদাতালাকেই দেখতে পেল। পাথরের চেয়ে লাল টুপির কেরামতি অনেক বেশী ব'লে ওর মনে হ'ল। নবীন কামারের কাছে আর তার ঋণের বোঝা বাড়বে না। ভূষণ্ডীর পাথরের সঙ্গে টক্কর লড়তে ওবাইদ মোল্লার আর কোন ভয় নেই। নতুন লাঙলের ফাল্ দিয়ে সে নির্ভয়ে মাটি চাষ করবে। দেহের সবটুকু তাকত দিয়ে সে ফালটাকে ঢুকিয়ে দেবে মাটির অনেকটা নীচে পর্যন্ত—পাথরগুলো নতুন ফালের সামনে আর টিকতে পারবে না।

শাহজাহান মিঞা জিজ্ঞাসা করল, "কারো কোন আপত্তি আছে?" ওবাইদ মোল্লার বিরুদ্ধে কারো কোন আপত্তি নেই।

"আমার আপত্তি আছে।" এই ব'লে শাজাহান মিঞা প্রশ্নবোধক দৃষ্টি ফেলল ওবাইদ মোল্লার ওপর।

"আমার কসুর?" জানতে চাইল ওবাইদ মোল্লা।

ঘরের জনতা যেন জমে গেল বরফের মত। প্রত্যেকের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। শাজাহান মিঞা হাত দিয়ে ইসারা করল গফুরকে। দু'জন লাল চৌকিদারের মাঝখান দিয়ে মাথা গলিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল গফুর। মেহের বিবির আল্‌তা দিয়ে সে তার কুর্তাটা রাঙিয়ে নিয়েছে। বহুদিনের পুরনো কুর্তা। বুকের ওপর থেকে খানিকটা কাপড় খসে গেছে গেলবার ঈদের সময়। লালকুর্তার ফাঁক দিয়ে কালো কুচকুচে ষোল ইঞ্চি বুকটাকে যথাসাধ্য উঁচু ক'রে গফুর এগিয়ে গেল শাজাহান মিঞার দিকে। তারপর জনতার দিকে চেয়ে সে বলল, "বেইমান ওসমান গণি ওবাইদ মিঞার বাড়িতে লুকিয়েছিল।"

"ওবাইদ মোল্লা কি অস্বীকার করতে পারে?" প্রশ্ন করল শাজাহান মিঞা।

মাথা নেড়ে ওবাইদ মোল্লা জবাব দিল, "না, অস্বীকার করছি না। ওসমান গণি আমার আশ্রয় চেয়েছিল।"

সয়ফুল্লা বলল, "চাষীদের খুন চুষে খেয়েছে ওসমান গণি। তার কাছে ওবাইদ মোল্লারও বাকী-বকেয়া কম ছিল না। তবে কেন তুমি তা[illegible] পালিয়ে যেতে দিলে?"

"সে এসেছিল আমার কাছে মেহ্‌মান হয়ে। মেহ্‌মা[illegible]ক রক্ষে করা মুসলমানের ধর্ম। তোমরা মিঞাসাহেবরা তো রাজা-উজির [illegible]াক, তোমরাও কি দুর্বলকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষে কর না? ধর্মের [illegible] না হয় ছেড়েই দিলাম।"

শাজাহান মিঞা বুঝতে পারল, তর্ক-বিতর্কের মধ্যে দিয়ে আসল কথাটা বড্ড জটিল হয়ে উঠেছে। অতএব সে ওবাইদ মোল্লাকেই উদ্দেশ ক'রে বলল, "কমরেড, যা হবার হয়ে গেছে। এখন যদি ওসমান গণির ঠিকানাটা আমাদের

জানিয়ে দাও, তাহলে নতুন লাঙলখানা তোমাকেই দেওয়া হবে।—এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কারুরী কোন আপত্তি আছে ?"

সমবেত কমরেডদের হয়ে সমস্বরে জবাব দিল, "কোন আপত্তি নেই।"

"আমার আপত্তি আছে।" ঘোষণা করল ওবাইদ মোল্লা নিজেই।

"কেন ?" জানতে চাইল কমরেডরা সবাই।

"আমি গরিব, আমি চাষী—কিন্তু বেইমান নই। মিঞাসাহেবরা, তোমরা আমার খুন নিতে পার, শির নিতে পার, কিন্তু আমার কাছ থেকে ওসমান গণির ঠিকানা নিতে পারবে না। আমি জানি, খোদার কাছে আমার কোন কসুর হয় নি। লাঙল আমি চাই না।"

ওবাইদ মোল্লা যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল, লালু শেখ লাফিয়ে উঠে বন্দুকের বাঁট দিয়ে ওবাইদ মোল্লার বুকে একটা গুঁতো মারল। শাজাহান মিঞা হুমকি দিল, "মিঞাসাহেব, খোদার শাসন উঠে গেছে। এবার থেকে বন্দুকের শাসন চালু হ'ল।"

লালু শেখ বন্দুকটাকে লাঠির মত লম্বা ক'রে ধ'রে ওবাইদ মোল্লার বুকে মারল একটা ধাক্কা। ওবাইদ মোল্লা ধাক্কাটা সামলাতে না পেরে বসে পড়ল তক্তাপোশের ওপর। ওসমান গণির ফরাশ পাতা তক্তাপোশ! লালু শেখ হুংকার দিল, "ওসমান গণি কোথায় ?"

"বলব না—মেহ্‌মানকে ধরিয়ে দিয়ে আমি বেইমানী করতে পরব না লালু।" জবাব দিল ওবাইদ মোল্লা।

লালু শেখ বন্দুক উঁচিয়ে পুনরায় তেড়ে উঠল। ওবাইদ মোল্লা অবাক হয়ে ভাবতে লাগিল, লালু কেন ওকে এমন ক'রে অপমান করছে ? সে তো লালুর কোন ক্ষতিই করে নি। সে বলল, "লালু, তোর বোধহয় মনে নেই যে, ছ'মাস আগে তুই আমার ঘরেই সিঁধ কেটেছিলি। তোর হাতে তখন এই নতুন অস্তর ছিল না।"

লালু শেখ ভেংচে উঠল, "সিঁধ কেটেছিলুম তো সারারাত্রি বসে, কিন্তু পেলুম কি ? একটা ছেঁড়া নেকড়া পর্যন্ত হাতে লাগে নি! সমস্ত রাত্রের পেরেশান আমার মাঠে মারা গেল!"

"তা গেল, কিন্তু আমি তো তোকে ধরে এনেছিলুম? ইচ্ছে করলে চৌকিদার ডাকতে পারতুম। বল্, পারতুম কি না?"

"তা পারতে। কিন্তু আমি কেন সিঁধ কাটতে গিয়েছিলুম, তার কারণটা কি ছিল?"

"কারণ যাই হোক না কেন, সিঁধ কাটা তো ভাল কাজ নয় লালু।"

"তোমাদের খোদার আমলে মানুষ উপোস ক'রে মরত, সেইটে বুঝি ভাল কাজ ছিল? মাসের মধ্যে ক'দিন আমি ভাত খেয়েছি? কই তোমাদের খোদার কাছ থেকে তো এক থালা ভাত পাই নি কোনদিন? তার উপর নিজে গেলুম রোজগার করতে, সমস্ত রাত বসে রইলুম তোমার ঐ ভাঙা-ঘরটার পেছনে। হাজার পাঁচেক মশা আমার কলিজার খুন চুষে খেল। তারপর যখন তোমার ঘরে ঢুকলুম, কি পেলুম সেখানে? এক মুঠো চাল পর্যন্ত নয়! আর কিছুদিন তোমাদের খোদার শাসন চালু থাকলে, বৌটার সঙ্গে সঙ্গে আমিও টেঁশে যেতুম।"

"সেই জন্যেই বুঝি শাবল ছেড়ে বন্দুক ধরেছিস? খোদার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছিস লালু? তা চেষ্টা ক'রে ছাখ—কিন্তু ওসমান গণির ঠিকানা তুই আমার কাছ থেকে পাবি নে।"

এবার এগিয়ে এল সয়ফুল্লা। বলল, "তত্ত্ব-কথা ছেড়ে দাও মিঞাসাহেব। এখন ওসমান গণি কোন্ পথ দিয়ে পালিয়েছে সেই খবরটা আমরা জানতে চাই।"

ফস্ ক'রে গফুর ব'লে উঠল, "পালিয়েছে কি বলছ? আমি স্বচক্ষে দেখেছি, মোল্লা সাহেব গণিকে নিজে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে এসেছে।"

সমবেত কমরেডদের মধ্যে নতুন ক'রে গুঞ্জন উঠল। কে একজন ভিড়ের মধ্যে থেকে বলল, "ওবাইদ মোল্লা যতবড় চাষীই হোক না কেন, সে যদি কসুর করে, তাকেও শাস্তি পেতে হবে।"

অসহায়ভাবে ওবাইদ মোল্লা চেয়ে রইল সয়ফুল্লার দিকে। ভাবতে লাগল, বিচারে যদি ওর ফাঁসি হয়, মেহের বিবির কি উপায় হবে তবে? তা ছাড়া ওর ফাঁসির সঙ্গে সঙ্গে মোল্লা বংশের আর কোন চিহ্নই থাকবে না। সে বেহস্তে

গিয়ে কেমন ক'রে বাপ-দাদার কাছে মুখ দেখাবে? মেহের দি[illegible]বংকাল সন্তান হয় নি বটে, কিন্তু খোদার দোয়া থাকলে হতে কতক্ষণ? [illegible] মোল্লা যদি মরে যায়, তাহলে ওর সঙ্গে সঙ্গে সব আশা-ভরসাই তো ম[illegible] ওসমান গণির কাছারি বাড়িতে বসে গুটি পাঁচেক বন্দুকের সামনে ওবাইদ [illegible] ভিতরে ভিতরে ঘেমে উঠল। সয়ফুল্লা ছাড়া আর বোধহয় এখানে তার কোন বন্ধুই নেই। বন্ধু? বন্ধু হ'ল কবে সয়ফুল্লা? গেলবছর সয়ফুল্লা এক কুড়ি আলু আর তিন সের চাল ওর কাছ থেকে ধার নিয়েছিল, আজও সে-ধার সয়ফুল্লা শোধ দেয় নি। একদিন যখন সে ওকে উপকার করেছে, নিজে উপোস ক'রে সয়ফুল্লাকে চাল ধার দিয়েছে, তখন আজ কি সয়ফুল্লা ওবাইদ মিঞাকে এই বিপদ থেকে রক্ষে করবে না? লাঙল পাওয়ার আশা তার উবে গেছে, এখন জীবনটা নিয়ে কোন রকমে ঘরে ফিরতে পারলেই হয়।

এবার শাজাহান মিঞা একটা উপসংহারে আসবার চেষ্টা করল। সে বলল, "উপস্থিত লাঙলের আশা কমরেড মোল্লাকে ছেড়ে দিতে হয়। আমরা দু'দিনের সময় দিলুম তোমাকে ভেবে দেখবার জন্যে। আমাদের নতুন রাষ্ট্রে ওসমান গণির মত লোক যদি লুকিয়েও থাকে, তাহলে চাষী মজুরদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। লুকনো ব্যাধি যেমন শরীরের পক্ষে খারাপ, লুকনো পুঁজিবাদীও তেমনি রাষ্ট্রের পক্ষে মারাত্মক। কমরেড মোল্লা, চাষীর গায়ে হাত দেয়া কানুন-বিরুদ্ধ কাজ, নইলে সাঁড়াশী দিয়ে তোমার জিভে একটা মোচড় দিতে পারলেই ওসমান গণির ঠিকানা তোমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসত। তোমাকে ভেবে দেখবার সময় দিলুম। দু'দিন পর জিলা-কমিটির মেম্বাররা আসবেন সুলতানপুরে। ঠিকানা যদি না পাই, আমরা তাহলে রিপোর্ট করব।"

সয়ফুল্লা যেন তার এক কুড়ি আলু আর তিন সের চালের ঋণ শোধ করবার সুযোগ পেল। সে নিবেদন করল কমরেডদের কাছে, "ওসমান গণি [illegible] এমনিতেই ধরা পড়বে। কিন্তু চাষীর কাছ থেকে যদি লাঙল কেড়ে [illegible] হয় তবে রাষ্ট্রের ক্ষতি হবে সবচেয়ে বেশী। এ তো পুরনো গভর্ণমেন্টের রাষ্ট্র নয়, এ জনসাধারণের রাষ্ট্র।"

"ঠিক, ঠিক কথা।" মন্তব্য করল সমবেত কমরেডরা। শাহাজান মিঞা

ঘোষণা করল, "লাঙলটা এখন ঘরেই থাক। জিলা-কমিটির মেম্বররা না আসা পর্যন্ত কমরেড সফুল্লার প্রস্তাব মুলতুবী রইল। এবার আমাদের দ্বিতীয় প্রস্তাব—"

বাধা দিয়ে সয়ফুল্লা বলল, "কমরেড মোল্লার কি দরকার আমাদের দ্বিতীয় প্রস্তাব শুনবার? সে এখন চলে যেতে পারে। দু'দিন পরে আমরা আবার তাকে ডেকে পাঠাব।"

"ঠিক, ঠিক, যথার্থ কথা।" অন্যান্য কমরেডরা সয়ফুল্লার শেষ প্রস্তাব অনুমোদন করল।

নত মস্তকে এবং নিঃশব্দে ওবাইদ মোল্লা বেরিয়ে এল কাছারি-বাড়ি থেকে। অতিথিকে রক্ষা করবার ধর্ম বাঁচিয়ে সে আজ ফিরে এসেছে। সুলতানপুরের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দু' একবার তার নতুন লাঙলের কথাও মনে পড়ল। ইচ্ছে করলে সে আজ লাঙলটা সঙ্গে নিয়েই ফিরতে পারত। এখন তার ভাঙ্গা লাঙলের বাস্তব পরিস্থিতিটা যেন ওকে অসীম পীড়া দিতে লাগল। বর্ষার জল পড়বার সময় এসে গেছে। মাটি এখনো তৈরী হ'ল না। সমস্তটা বছর কি তবে সবাই মিলে উপোস করবে? ফুকুদিদি কি করবে? কোলের বাচ্চা দুধ পাবে কোথায়? তার শুকনো হাড়ে ভূষণ্ডীর রাজপুত্র মাথা কুটে মরবে। ওবাইদ মোল্লার চোখের সামনে হামুর চেহারাটা যেন ভেসে উঠল। মাথা ভর্তি গোছা গোছা চুল, ঠোঁট দু'টো কমলালেবুর কোয়ার মত রসে যেন টুসটুস করছে! খিদে পেলে ঠোঁট দু'টো তার ভাঙ্গা ভাঙ্গা দেখায়। বড় বড় এক জোড়া চোখ কুচকে আসে অবলীলাক্রমে, গোল গোল হাত-পাগুলো সে ছুঁড়তে থাকে সামনে পিছে। রাজপুত্রের খিদের সংকেত বুঝতে কারো অসুবিধে হয় না। কিন্তু ভাঙ্গা লাঙল দিয়ে ওবাইদ মোল্লা কাউকে তো রক্ষে করতে পারবে না। কথাটা গভীরভাবে ভাবতে গিয়ে সে যেন থেমে গেল মুহূর্ত কয়েকের জন্যে। ফিরে যাবে না কি? ওসমান গণির কাছারি-বাড়ির মিটিং তো এখনও চলছে। ওবাইদ মোল্লা উল্টো দিকেই হাঁটতে লাগল। ইচ্ছে ক'রে সে হাঁটছিল না, হামুই যেন ওকে পথ দেখিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। খিদের জ্বালায় হাত-পা ছুঁড়ছে হামু।

উল্টো দিকের রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে ওবাইদ মোল্লা এসে পৌঁছল

নবীন কামারের বাড়িতে। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সে খুবই বিস্ময় বোধ করল। ওসমান গনির কাছারি-বাড়ির রাস্তা সে ভুল করল কি ক'রে? তবে বোধহয় হামুই ওকে টেনে এনেছে নবীন কামারের বাড়ির দরজায়। হামুও চায় না ওবাইদ চাচা তার লাঙলের লোভে ধর্ম হারায়। অভাব তো তার সারা জীবন ধরেই চলেছে। কিন্তু লালু শেখের মত সে তো পারে না পরের বাড়িতে সিঁধ কাটতে? ওবাইদ মোল্লার আত্মবিশ্বাস ফিরে এল। বেশ, নতুন লাঙলের চেয়ে পুরনো ধর্ম তার অনেক বড়।

"নবীন ভাই বাড়ি আছ নাকি?" স্বর চড়িয়ে ডাকল ওবাইদ মোল্লা।

নবীন কামারের ছোট ছেলে বেরিয়ে এল বাইরে। বলল, "আজ বোধহয় আর ফিরলেন না বাবা।"

"আচ্ছা, কাল আবার আসব।"

ওবাইদ মোল্লা হতাশ হয়ে ফিরে এল নবীন কামারের দরজা থেকে।

রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে ওবাইদ মোল্লা বলল:

"বুঝলি মেহের, দুনিয়া থেকে ব্যারাম-পীড়া যেমন উঠবে না, মানুষের দুঃখও তেমনি ঘুচবে না। এই মনে কর—ভূষণ্ডীর মাঠ-ভর্তি রয়েছে ধান, ঘরের কলসি ভর্তি রয়েছে সোনা। তাতে কি আমরা সুখের দরিয়ায় ভাসতে পারব? পারব না। কেন পারব না মেহের?"

বিবি মেহেরউন্নিসা জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। সে মাদুরের ধার ঘেঁষে ওপাশ ফিরে শুয়ে রইল।

"দূরে সরে গেলি যে মেহের?" জিজ্ঞাসা করল ওবাইদ মোল্লা।

"সুখের দরিয়ায় ভাসতে ভাসতে তো জনম কাটল। এবার একটু ধার ঘেঁষে শুচ্ছি।" জবাব দিল মেহেরউন্নিসা।

ওবাইদ মোল্লা অন্ধকারে মাদুরের ওপর হাত ফেলে অনুভব করল যে, মাঝখানের ছেঁড়া অংশটা গত কয়েক দিনে আরও বড় হয়েছে। দু'জনে গা লাগিয়ে শুতে গেলে একজনের দেহের সঙ্গে মাদুরের কোন সম্পর্কই থাকে না। ছেঁড়া মাদুরের চোখা চোখা কোণগুলো গায়ে ওদের বিঁধতে থাকে।

ওবাইদ মোল্লা বলল, "তুই ঠিকই বলেছিস মেহের, মানুষের দাব-দরিয়ার শুধুগায়ে ভেসে থাকাও চলে না। আমার তো গণ্ডারের চামড়া। পেরেক ঠুকলেও ব্যথা পাই না। কিন্তু তোর কথা আলাদা মেহের। কাঁথাখানাও দিয়ে দিলি।" ওবাইদ মোল্লা হাত বাড়াল মেহেরউন্নিসার দিকে। একটু থেমেই সে বলল, "দেহটা তোর আজও বেশ আঁটসাঁট আছে।"

বিবি মেহেরউন্নিসা আরও একটু সরে গেল দূরে।

"রাগ করলি মেহের? তুই কেবল ছেঁড়া মাদুরের ফাঁকটাই দেখছিস?"

"মাঠ-ভর্তি ধান দেখছ, কলসি-ভর্তি সোনা দেখছ তুমি—কই গত পাঁচ বছরের মধ্যে একটা মাদুর কিনতে পারলে না?" মেহের বিবি সরে গেল মাদুরের বাইরে।

"নতুন মাদুর কিনলেও ফারাকটা বোধহয় বুঝবে না।" "কেন?" ও-পাশ থেকে প্রশ্ন করল মেহের বিবি।

"ফারাকটা তো ছেঁড়া মাদুরের নয় মেহের, ফারাকটা হচ্ছে মনে, তোর কোলে একটা ব্যাটা এল না।"

মেহের বিবি সরে এল ওবাইদ মোল্লার কাছে। বলল, "তুমি তো জোয়ান-মর্দ মানুষ, গফুরের বোনটার শাদি হয় নি, তাকে তুমি শাদি কর না।"

ওবাইদ মোল্লা মেহের বিবিকে দু'হাত দিয়ে টেনে নিয়ে এল নিজের বুকের ওপর। জিজ্ঞাসা করল, "তুই আবার শাদি করবি মেহের? কে জানে, আমার দোষেই বোধহয় তোর ছেলে হ'ল না।"

"কার দোষে কি হয়, আমরা তার কি জানি?"

বিবি মেহেরউন্নিসা তার চোখ দু'টো চেপে ধরল ওবাইদ মোল্লার কণ্ঠাস্থির নীচের দিকে।

"কাঁদছিস মেহের?" ওবাইদ মোল্লা হাতের চাপ দিয়ে মেহের বিবিকে টেনে তুলল নিজের মুখ পর্যন্ত। তারপর দু'পাঁচ মিনিট কেউ কোন কথা কইল না, চুপ ক'রে রইল। দেহের শক্তির মধ্যে ভাষার শক্তি বিলুপ্ত হ'ল। কিন্তু ভাষার বিলুপ্তি সাময়িক। কারণ, দেহ থাকে না, ভাষা থেকে যায়। সুস্থ

মেহের মধ্যে কেবল স্বাস্থ্যবিজ্ঞানই আছে, সূক্ষ্ম ভাষার মধ্যে আছে মানব সভ্যতার পুরো ইতিহাস।

একটু পরে মেহের বিবি বলল, "তুমি ভূষণ্ডীর পাথর চিরে ফসল বার করতে পার আর আমার—" কথাটা অসমাপ্ত রেখে মেহের বিবি সরে এল মাদুরের মাঝ-দরিয়ায়। তারপর আগের কথাটা শেষ না ক'রেই সে উপসংহার টানল, "চেষ্টা করলে পুরুষ মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই।"

এবার ওবাইদ মোল্লা বলল, "মানুষের সাধ্যই বা কতটুকু? রক্তমাংসে দানা বাঁধলেই সন্তান হয় না। সৃষ্টির পেছনে চাই মহব্বত।"

"মহব্বত? তোমার আমার মধ্যে কি মহব্বত নেই?" জানতে চাইল মেহেরউন্নিসা।

"সন্তান হওয়ার মহব্বত জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও থাকে। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বড় মহব্বতের কথা বই-কেতাবে লেখা না থাকলে, মানুষ বোধহয় কেবল লাঙলই ঠেলত। মেহের, লালু শেখের মত ব্যাটা যদি তোর পেটে আসত, কি করতিস তা হ'লে? একটা দোজক পয়দা করার চেয়ে, কিছু পয়দা না করা অনেক ভাল।" চিত হয়ে শুয়ে ওবাইদ মোল্লা দীর্ঘতম প্রয়াস দ্বারা একটা খুব জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। ওর পাশে শুয়ে মেহের বিবি যেন সহসা দেখতে পেল, সম্ভোগ-মত্ত মুহূর্তগুলো কেঁচোর মত ঘরের মধ্যে কিল্‌বিল করছে। প্রত্যেকটা কেঁচো যেন এক একটা লালু শেখ!

চেঁচিয়ে উঠল বিবি মেহেরউন্নিসা, "খোদা মেহেরবান! খোদা মেহেরবান!"

ভোর হওয়ার আগেই যথাসময়ে ওবাইদ মোল্লার ঘুম ভাঙল। কিন্তু শয্যা সে ত্যাগ করল না। মাঠে যাওয়ার তাড়া নেই আজ। লাঙলটা ভেঙে গেছে, কোনো একটা ব্যবস্থা না-হওয়া পর্যন্ত ভূষণ্ডীর মাটির বুকে ঢেউ উঠবে না। নবীন কামার বসিরহাট থেকে কখন ফিরবে তারও কোন ঠিক ঠিকানা নেই। বেলা একটু বাড়লে সে যাবে নবীন কামারের বাড়িতে। পুরনো ঋণ যা আছে তা থাক। নতুন ঋণ আর সে করবে না, চার গণ্ডা পয়সা সে নবীনকে দিতে পারবে।

ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে একটু একটু আলো আসছিল। ওবাইদ মোল্লা বিছানায় শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করতে লাগল। গায়ে যেন তার পেরেক ফুটছে। বাইরের আলো ওকে টানতে লাগল। সব চাষীকেই টানে।

মেহের বিবিরও ঘুম ভেঙেছে অনেকক্ষণ আগেই। মাঝে মাঝে চোখ খুলে সে ওবাইদ মোল্লার ছটফটানি দেখছিল। অস্ত্র ছাড়া যেমন সৈন্য বাঁচে না, ধর্ম ছাড়া বাঁচে না মোল্লা-পুরোহিত, লাঙল ছাড়া তেমন চাষীও বাঁচতে পারে না। ওবাইদ মোল্লার ছটফটানির যন্ত্রণাটা যেন মেহের বিবিকেও অস্থির ক'রে তুলল। চোখ বুজে আর থাকতে পারল না। সে বলল, "বেলা হয়েছে—একবার সয়ফুল্লার কাছে যাও না।"

"কেন ?" অবাক হ'ল ওবাইদ মোল্লা।

"লাঙলটা ওরা তোমার জন্যেই রেখেছে। গফুর বলেছে, এবার থেকে চাষীদেরই বাদশাহী সুরু হ'ল। গফুর মিথ্যে বলবে না।"

"গফুর আর কি বলেছে ?" জানতে চাইল ওবাইদ।

"সে অনেক কথা। শুনলে তুমি কষ্ট পাবে। তোমার সম্বন্ধ লাঙলের সঙ্গে, অন্য কথা শুনেই বা লাভ কি ?"

"লাভ নেই সত্যি বৌ, কিন্তু ওসমান গণির ঠিকানা তো আমি বলতে পারব না।" ওবাইদ মোল্লা উঠে বসল।

একটু ইতস্তত করবার পরে, মেহের বিবি বলল, "ওসমান গণি যে আমাদের দুশমন, সে-কথা তুমি অস্বীকার করতে পারবে না।"

"অস্বীকার আমি করছি না, কোনদিন করবও না। আমাদের খুন চুষে খেয়েছে এই ওসমান গণির দল। কিন্তু ওসমান গণি যখন আমাদের কাছে মেহমান হয়ে এসেছে, তখন আমরা তাকে ধরিয়ে দিই কি ক'রে ? চাষীর বাদশাহীতে যদি ধর্ম না থাকে, তা হ'লে সেই বাদশাহীতে আমার কোন লোভ নেই মেহের। ওসমান গণি খারাপ লোক, কিন্তু 'আজানের' মধ্যে খারাপ ছিল কি ? বন্ধ করল কেন আজান দেওয়া ?"

গোয়াল ঘরের দিক থেকে সয়ফুল্লা ডাকল, "মিঞা সাহেব বাড়ি আছ না কি ?"

মেহের বিবি জিজ্ঞাসা করল, "সয়ফুল্লার গলা না ?"

"তাই তো মনে হচ্ছে।"

"এতো ভোরে কি চায় ও ?"

"বোধ হয় পুরনো ঋণ শোধ দিতে এসেছে। ওসমান গণির গোলায় তো চালের অভাব ছিল না।"

"লুঠের চাল আমরা চাই নে, বলে দিও সয়ফুল্লাকে।" শাসিয়ে উঠল বিবি মেহেরউন্নিসা।

গ্রহণ ও প্রত্যাহারের মাঝখানে একটা ছোট্ট সরু সুতোর ব্যবধান দেখতে পেল ওবাইদ মোল্লা। হয়তো বা এই ব্যবধানটাই ধর্ম-অধর্মের ব্যবধান।

বাইরে বেরিয়ে এসে সে খুবই অবাক হ'ল। সয়ফুল্লা সঙ্গে ক'রে একটা নতুন লাঙল নিয়ে এসেছে। রোদের আলোয় ফালের মুখটা চিক্‌চিক্ করছিল।

সয়ফুল্লা বলল, "পার্টি থেকে প্রস্তাব পাশ হয়েছে, সুলতানপুরে লাঙল পাওয়ার যোগ্য চাষী ওবাইদ মোল্লাই বটে। এটা ঘরে তুলে রাখো। নতুন জমি বিলি হবে তোমার নামে। ভূষণ্ডীর মরামাটিতে আর তোমায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে না মিঞা সাহেব। দেখছ কি? হাওয়া বদলেছে। আরবদেশের হাওয়া এ নয় গো, লালদুনিয়ার হাওয়া—বুক চিতিয়ে হাওয়া টানবে চাষী মজুরের দল। নাও, লাঙলটা ধরো।"

"দরকার হ'লে আমি কিনে নিয়ে আসব। লুঠের মাল তো আমি নিতে পারব না সয়ফুল্লা। ওসমানগণি কি তার সম্পত্তি সব লিখে দিয়েছে মিঞা সাহেব ?"

সয়ফুল্লার জবাব শুনবার জন্যে ওবাইদ মোল্লা আর অপেক্ষা করল না। মিনিট পাঁচেক পরে ভুড়ুৎ ভুড়ুৎ তামাক টানতে টানতে ওবাইদ মোল্লা রওনা হ'ল ভূষণ্ডীর মাঠের দিকে।

•

গত রাত্রেই নবীন কামার বসিরহাটের কাজ শেষ ক'রে সুলতানপুরে ফিরে আসছিল।

বড়ছেলে কানাই আজ পনেরো দিন থেকে শয্যাশায়ী। বেশ ভারী রকমের ব্যারাম হয়েছে তার। কিন্তু হরেন ডাক্তার ব্যারামের নামটা আজ পর্যন্তও

কাউকে জানায় নি। কলকাতায় পাস করা ডাক্তার সে। বাড়িতে ডেকে আনলে দু'টাকা ভিজিট দিতে হয়। সুলতানপুরের পুরনো ডাক্তার রামতনু রায় রোগীর অভাবে ডাক্তারখানার দরজা প্রায় বন্ধ ক'রে দিয়েছে। অবশ্য ছোটখাটো সর্দি-কাসির মত অসুখ-বিসুখে রামতনু রায়ের ওষুধ এখনো কিছু কিছু চলে। হরেন ডাক্তার আসবার পর বড় ব্যারামের রোগীরা কেউ আর রামতনু রায়ের কাছে যায় না। কে জানে, হরেন ডাক্তার এসেছে ব'লেই হয়তো সুলতানপুরে বড় ব্যারামের হিড়িক প'ড়ে গেছে।

সকালে নবীন কামার যখন বসিরহাটে যাচ্ছিল ঘোড়ার পায়ে নাল বাঁধবার জন্যে, তখন রাস্তার ওপরেই রামতনু রায়ের সঙ্গে তার দেখা হ'লো।

রামতনু রায় জিজ্ঞাসা করল, "কি রে নবীন, কানাই না কি খুব ভুগছে?"

"হ্যাঁ ডাক্তার, পনরো দিন হ'লো। খুবই ভারী ব্যারাম।" বলল নবীন।

"পনরো দিন যখন, ব্যারাম ভারী-ই হবে। আমার হাতে আজ পর্যন্ত কোন রোগী সাতদিনের বেশী ভোগে নি। তোর বুকে সেবার সর্দি বসল, মনে আছে? ক'দিন লাগল সারাতে?" জবাব শুনবার জন্যে রামতনু রায় চেয়ে রইল নবীনের দিকে। নবীন তার যন্ত্রের বাক্সটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিয়ে বলল, "কানাই খুব বড় অসুখেই পড়েছে। হরেন ডাক্তার এরই মধ্যে দু'বার ভিজিট নিয়ে গেছে। অসুখটা এখনো সে ধরতে পারে নি।"

"মাত্র দু'টো ভিজিটেই কি বড় অসুখ ধরা যায় নবীন?" একটু হেসে রামতনু রায় পুনরায় বলল, "সুলতানপুরে আগে কখনো বড় রকমের ব্যারাম-পীড়া দেখা যেত না। আজকাল ডাক্তারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রোগের সংখ্যাও বাড়ছে। হরেন ডাক্তার পেতলের সাইনবোর্ড লাগিয়ে বসবার পর এ অঞ্চলে হরেক রকমের বড় বড় ব্যাধির আমদানি হ'লো। চললি নাকি?"

"হ্যাঁ ডাক্তার। রোজগার করতে হবে তো। বসিরহাটে একটা বড় কাজ পেয়েছি। দত্তবাবুদের ঘোড়ার পায়ে নাল বাঁধতে হবে। দুটো টাট্টু আর দু'জোড়া পাঞ্জাবী পক্ষীরাজ। তা ছাড়া একা গাড়িটার চাকা দু'টোতেও মেরামতের কাজ আছে।"

"কাজ তো অনেক দেখছি।" হাসতে হাসতে রামতনু ডাক্তারই আবার

বলল, "এত টাকা নিয়ে কি করবি নবীন? বেশী টাকার ঝকমারি অনেক।"

"বেশী টাকাটা কোথায় দেখলে তুমি? দু'দশ টাকা আয় না করলে হরেন ডাক্তারকে ডাকব কি ক'রে?"

"হাওয়া বদলেছে নবীন। এবার থেকে ডাক্তারেরা সব তোদের ঘরে ঘরে যাবে। ভিজিট লাগবে না। গরীব লোকেদের পোয়া বারো!"

"ভোটের যুদ্ধ আসছে না কি ডাক্তার?" প্রশ্ন করল নবীন কামার।

"এবার থেকে ভোটের চেঁচানি সব উঠে গেল রে নবীন। চাষীমজুরদের রাজত্বে কোন দলাদলি থাকবে না।"

"আমি এবার চলি, বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। হরেন ডাক্তারকে ডাকতে হবে, ভিজিটের টাকাটা যোগাড় হওয়া চাই। কাল হয়তো অসুখের নামটা জানা যাবে।"

"মাত্র তিন ভিজিটেই যদি অসুখের নাম জানা যাবে, তবে আর হরেন ডাক্তারকে বড় ডাক্তার বলত না। আসল কথাটা কি জানিস নবীন?" রামতনু রায় আসল কথাটা বলবার জন্যেই বোধ হয় কিছুক্ষণের জন্যে চুপ ক'রে রইল। নবীন কামারও চেয়ে রইল রামতনু রায়ের দিকে। চশমাটা এরই মধ্যে স্থানচ্যুত হয়ে নবীনের নাকের ডগায় ঝুলছে। কানের সঙ্গে চশমাটা সুতো দিয়ে বাঁধা না থাকলে মাটিতে পড়ে যেত অনেকক্ষণ আগেই।

ডাক্তার রায় বলল, "আসল কথাটা হচ্ছে, গরীবকে মারবার জন্যে বড়লোকদের ষড়যন্ত্র চলেছে চারদিকে। যেমন বড় বড় রোগ সৃষ্টি করতে হয় বড় ডাক্তার হওয়ার জন্যে। ভেবে ছাখ্ নবীন, আগের দিনের মতো যদি অসুখ-বিসুখ না থাকত, তবে হরেন ডাক্তার কি করত সুলতানপুরে? ওকি ছুটছিস যে নবীন? বুড়ো বয়সে যদি হোঁচট খেয়ে পড়িস!"

"হোঁচট খেলেও আমায় দত্তবাবুদের কাজটা করতে হবে। পক্ষীরাজের পায়ে নাল্—"

বাধা দিয়ে রামতনু ডাক্তার বলল, "একটু সবুর ক'রে যা নবীন, দত্তবাবুদেরই পায়ে নাল বাঁধবার কাজ জুটবে তোর। পক্ষীরাজ আর ছুটবে না।

ছুটবে বুড়ো দত্তর দু'টো জোয়ান ছেলে। খবর রাখিস, হরেন ডাক্তার পালিয়েছে ?"

"পালিয়েছে ?" নবীন কামার কানে-বাঁধা সুতোটা টান মারল। চশমাটা উপর দিকে না-উঠে ঢলে পড়ল নাকের ডগা ঘেঁষে। রামতনু রায় বলল, "একেবারে পগার পার। লালফৌজেরা হিসেব চেয়েছিল। কেবল টাকার হিসেব নয়, রোগের হিসেবও। কানাই ছোঁড়ার রোগটা এল কোত্থেকে ? বসিরহাটের বাজার থেকে।" আসল কথাটা জানিয়ে দিল রামতনু রায়।

"বসিরহাটের বাজার ?" চোখ তুলে চাইল নবীন কামার।

"হ্যা গো কামার দাদা, হ্যা। বাজারে কেবল গভর্ণমেণ্টের চাল-আটা বিক্রি হ'তো না, সরকারী মেয়েছেলেও বিক্রি হ'তো। হরেন ডাক্তার যেত কানাইকে সঙ্গে নিয়ে সেই অঞ্চলে চিকিৎসে করতে।"

"কানাই সঙ্গে যেত কেন ডাক্তার ?" জিজ্ঞাসা করল নবীন।

"বড় ডাক্তারের বড় ব্যাগটা বয়ে নিয়ে যেত কানাই। কখনও কখনও সিকি-আধুলি জুটতো ওর। এখন ? এখন কতো গণ্ডা সিকি-আধুলি হরেন ডাক্তার বার ক'রে নিল ? বসিরহাটের বাজারে হরেন ডাক্তারের সবচেয়ে বড় ব্যবসা চলতো, জানিস নবীন ?"

মুহূর্তের জন্যে নবীন কামার পক্ষীরাজের কথা ভুলে গেল, ভুলে গেল বুড়ো দত্তর দুটো জোয়ান ছেলের কথা। সে জিজ্ঞাসা করল, "হরেন ডাক্তার ব্যবসা করত কেন, তার কাজ তো চিকিৎসে করা ?"

"নবীন, এ-আমলে ব্যবসা বাদ দিয়ে চিকিৎসে হয় না। তাইতো লালফৌজেরা আজ সব হিসেব দেখতে চাইছে। হাওয়া বদলেছে নবীন।"

"হরে মুরারে, হরে মুরারে! যাই—" নবীন কামার আর অপেক্ষা করতে পারল না। সে ছুটল বসিরহাটের দিকে। রামতনু ডাক্তার পেছন থেকে দেখল, নবীন কামারের হাতে যন্ত্রের বাক্সটা গলা-কাটা কইমাছের মতো কেঁপে কেঁপে উঠছে।

দত্ত বাবুদের বাড়িতে ঢুকতে পারল না নবীন কামার।

লালফৌজরা বাড়ি ঘেরাও ক'রে রেখেছে। জোয়ান ছেলে দুটো প্রাচীর টপকে পালিয়েছে। বুড়ো দত্ত বেতো পা দুটো টেনে টেনে অতি কষ্টে প্রাচীর পর্যন্ত এসেছিল, টপকাতে পারে নি। ছল ছল চোখে বুড়োটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল যে ছেলে দু'টো অবলীলাক্রমে উঁচু প্রাচীর টপকে লাফিয়ে পড়ল ওপারে। ছেলেরা পেছন ফিরে একবার চেয়েও দেখল না! বুড়ো দত্ত শেষ মুহূর্তে চীৎকার ক'রে জিজ্ঞাসা করল, "বৌমাদের ফেলে যাচ্ছিস, সামলাবে কে?"

প্রাচীরের উপর থেকে ছোট ছেলে জবাব দিল, "চাচা, আপনা প্রাণ বাঁচা।"

ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে গল্প শুনছিল নবীন। লালফৌজকে সে জিজ্ঞাসা করল, "বুড়ো বাপকে চাচা বলতে ওদের মুখে বাধল না?"

লালফৌজ জবাব দিল, "মুখে লাগাম ছিল না কমরেড, তাই ওরা পালিয়ে গেল।"

সমস্তটা দিন বসিরহাটে ঘুরে ঘুরে নবীন কামার একটা পয়সাও রোজগার করতে পারল না। রোজগার করবার সময়ও পেল না সে। তার চোখের ওপর যে-সব ব্যাপার ঘটতে লাগল, তাতে সে একেবারে তাজ্জব ব'নে গেছে। সাবেক আমলের সেপাই-দারোগার কেউ আর রাস্তা-ঘাটে নেই। একদল লোক বসিরহাটের বাজারে হামলা করছিল। চণ্ডু শেঠের কাপড়ের দোকানটা লুঠ হ'লো ওরই সামনে। লুঠ ক'রে যখন ওরা সবাই পালাচ্ছিল, কোথা থেকে হুস্ ক'রে একগাড়ী লালফৌজ বন্দুক উঁচিয়ে এসে দাঁড়িয়ে গেল চণ্ডু শেঠের দোকানের সামনে। বটগাছতলায় বসে নবীন কামার দেখল, চণ্ডুকে ধরে নিয়ে গেল লালফৌজেরা। মস্তবড় ভুঁড়ির ওপর দিয়ে ওর দড়ি বাঁধা রয়েছে, দু'জন লালফৌজ দড়ি ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে ওকে। বটগাছতলা দিয়েই ওরা গেল। যন্ত্রের বাক্সটা সরিয়ে রাখল নবীন কামার। ছ'মাসের বাচ্চা-হাতীর পায়ের পাতার মতো চণ্ডু শেঠের পায়ের পাতা চওড়া। যন্ত্রের বাক্সটাকে মাড়িয়ে দিলে, বাক্সটার আর থাকবে কি? মাত্র দু'হাত দূরে দিয়ে চণ্ডুকে যেতে দেখল নবীন। চশমাটাকে নাকের ওপর ঠেলা দিয়ে তুলে দিল সে। দেখল চেয়ে, চণ্ডু শেঠের কোমরটা দেহ

থেকে লোপ পেয়েছে। লোপ পেয়েছে বুক। গলার তলা থেকে তলপেটের ছ'ইঞ্চি নীচু পর্যন্ত সবটাই ভুঁড়ি। এতো কাছে চণ্ডু শেঠকে সে আগে কখনও দেখে নি। ওরা চলে যাওয়ার পর গাছতলায় যেন একটা ভূমিকম্প হয়ে গেল। নবীন কামার তার নিজের শুকনো বুকের হাড়ের ওপর হাত রেখে দু-চার ছটাক মেদ-মজ্জার অনুসন্ধান করতে লাগল। কোথায় মেদ? কোথায় মজ্জা? পুরো বসিরহাট সাব-ডিভিশনের মেদ-মজ্জা তো সব চণ্ডু শেঠের গায়ে। রবীন্দ্রনাথের ভারততীর্থে নবীন কামারদের আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাংলার নবীনরা চণ্ডুর এক দেহে যেন লীন হয়ে গেছে অনেক দিন আগেই। আর্য, অনার্য কিংবা পাঠান মোগলের সমস্যা বাংলার মাটির সমস্যা নয়। কিন্তু চণ্ডুরা বাংলার মাটিতে ঘুণ ধরিয়েছে। মাটির তলার সার চেটে খাচ্ছিল চণ্ডু মহাজনের দল।

নবীন কামার হাঁটতে হাঁটতে গেল বাজারের দক্ষিণ দিকে। হাতে তার যন্ত্রের বাক্সটা ঝুলছে। দত্ত বাবুদের কাছে আর তার কাজ জুটবে না। অভাব অভিযোগের সময় দু'-চার টাকা দত্ত বাবুরা যে ওকে দিত, সে-কথা নবীন অস্বীকার করতে পারে না। পূজোর সময় বুড়ো দত্তর কাছ থেকে নবীন প্রতিবছরই দু'খানা ক'রে ধুতি পেয়েছে। ছেলে-মেয়ের বিয়েতে সে কখনও বাদ পড়ত না। বিপদে-আপদে দত্ত বাবুরাই ছিল ওর একমাত্র ভরসা। আজ সে, দত্তবাবুদের শেষ স্বচক্ষেই দেখে গেল! আহা, বৌ-মা দুটোর যেন কি হবে! জিভ দিয়ে মাড়ির ওপর টোকা মেরে নবীন আফশোসের আওয়াজ বার করল। স্বামী হওয়ার বাবুগিরি করতে পারো, আর বিপদের সময় বৌকে রক্ষা করতে পার না? দু'দুটো লক্ষ্মী প্রতিমা লাল মামুদের সামনে ফেলে দিয়ে গেলি কি ক'রে? ঐ মামুদ ছোঁড়াকে নবীন চেনে। খুব ভাল ক'রেই চেনে। গজনীর মামুদ নয়, বসিরহাটের কাদির মিঞার ছেলে। দত্ত বাবুদের ঘোড়াগুলোকে দলাই-মলাই করত। এখন সে লাল টুপি প'রে বন্দুক হাতে দত্ত-বাড়ির ফটকে পাহারা দিচ্ছে! না—নবীন কামার বাড়ির ভিতর ঢুকবার চেষ্টা করবে একবার। নুন যখন সে খেয়েছে, গুণ গাইবে না কেন? নুন না খেলেই বা কি, বিপদে-আপদে মানুষ যদি

মানুষকে সাহায্য না করে তবে হাত-পাগুলো আছে কেন? কেবল ঘোড়ার পায়ে নাল বাঁধবার জন্যে তো হাতের সৃষ্টি হয় নি? নবীন কামার ডান হাতটা চিৎ ক'রে নিজের চোখের সামনে তুলে ধরল। চামড়াটা কুঁচকে গেছে। আঙুলগুলোতে না আছে মাংস, না আছে রক্ত। পাঁচটা আঙুল বন্ধ ক'রে সে হাওয়ার গায়ে ঘুষি মেরে দেখল, পাঞ্জাতে তার জোর আছে কি না। দুর্বল বোধ করল নবীন কামার। হাপরের হাওয়ার মতো নাক দিয়ে তার বাতাস বেরুতে লাগল ভস্ ভস্ ক'রে। নাঃ, লড়াই করবার বয়স কিংবা স্বাস্থ্য তার আর নেই। ঘোড়ার পায়ে নাল ঠোকা ছাড়া এ হাত দিয়ে আর কিছুই সে ঠুকতে পারে না। আহা, দু' দুটো লক্ষ্মী প্রতিমা—

"কোন্ প্রতিমার কথা বলছ গো কামার দাদা?" জিজ্ঞাসা করল নন্দ পাল, বসিরহাটের বড় কুমোর। "হ্যাঁ? তুই কোত্থেকে নন্দ? আমি লক্ষ্মী প্রতিমার কথা বলছিলাম বুঝি?"

"ব'লে আর লাভ কি নবীন দা, কাদামাটির কাজকর্ম সব উঠে যাবে। এই সেদিন বিশ টাকার রঙ কিনে আনলুম, এখন সবটাই ঘরে পড়ে রইল।"

"লাল রঙয়ের কদর বাড়ল নন্দ। ছোঁড়ারা তো দিনরাত দেখছি জামা-কাপড়ে লাল রঙ লাগাচ্ছে। লাল যদি থাকে, তবে এই ফাঁকে বেচে ফেল্। কাদামাটির মুখে রঙ মাখিয়ে আর পয়সা পাবি নে নন্দ।" "তা যা বলেছ নবীন দা! যন্ত্রপাতির যুগে কুমোরদের আর আঙুল চলছে না। ভাব আর ভক্তি না থাকলে কেবল আঙুল নাড়লেই প্রতিমা গড়া যায় না। তা তুমি বসিরহাটের বাজারে কেন?"

"এসেছিলাম কাজকর্মের খোঁজে। ভাবছি এবার ঘরে ফিরব।" সামনের দিকে নজর পড়ল নবীন কামারের। জিজ্ঞাসা করল, "হ্যাঁরে নন্দ, সরকারী রেশনের দোকান দেখছি খোলা পড়ে রয়েছে, কিন্তু ওখানকার ঐ ভাঙা ঘরগুলোর সামনে লালফৌজরা পাহারা দিচ্ছে কেন?"

"ওগুলোও সরকারী মেয়েছেলেদের ঘর।"

"কি বললি, সরকারী মেয়েছেলে?" নবীন কামারের চশমাটা নড়ে উঠল।

"হ্যাঁ গো—সরকার থেকে লাইসেন্স নিতে হয়।"

যন্ত্রের বাক্সটা নবীন কামারের হাতে থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল। গলার ভিতরটাও শুকিয়ে উঠেছে। তবুও জিজ্ঞাসা করল, "পাহারা দিচ্ছে কেন ?"

"লালফৌজেরা ওখানে আর কাউকে ঢুকতে দেবে না। ওরাই আজ তিন দিন থেকে মেয়েছেলেগুলোকে খাবার-দাবার দিচ্ছে। যাই বলো না কেন, কেউ তো ইচ্ছে ক'রে খারাপ হয় না। কাজটা ওরা ভালোই করেছে নবীন দা।"

"খুবই ভাল করেছে নন্দ। ব্যারাম-পীড়া থেকে ছোঁড়াগুলো বাঁচবে। কিন্তু ব্যবসা উঠে গেলে, মেয়েছেলেগুলো বাঁচবে কি করে ?"

"শুনলুম, দত্ত বাবুদের বাড়িতে ওরা সব উঠে যাবে। সেখানে ওদের জন্যে কাজকর্মের ব্যবস্থা হচ্ছে। মেয়েছেলেদের কাজের অভাব কি বল ? জামা কাপড় সেলাই—"

বাধা দিয়ে নবীন কামার বলল, "এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কল্পনাই করা যায় না। আহা, এই ব্যবস্থাটা যদি ওরা একমাস আগে করত, তা হ'লে কানাই—"

"কানাই ?"

জবাবটা সামলে নিল নবীন কামার। বলল, "হরেন ডাক্তার এদিকটায় খুব পসার জমিয়েছিল, বুঝলি নন্দ ?"

"জানি, সবই জানি দাদা। কিন্তু কানাই—"

"ও হাঁ, কানাই। মাঝে মাঝে কানাই হরেন ডাক্তারের ব্যাগটা বয়ে নিয়ে আসত। সিকিটা আধুলিটা হরেন ডাক্তার কানাইকে বখশিস দিত। আমার কিন্তু পছন্দ হ'তো না, বুঝলি নন্দ ?"

"কেন ?"

"ও-সব বড়লোকদের দাঁত-খোঁচানো মাংস ! আমরা কেন যাব কুকুরের মতো সিকি-আধুলি কুড়োতে ? এবার চলি। দত্তবাবুদের সঙ্গে দেখা হ'ল না।" নবীন কামারের হাতে যন্ত্রের বাক্সটা তখন পর্যন্ত কাঁপছে।

নন্দ পাল খানিকটা দূর ওর সঙ্গে সঙ্গে এল। বাজারের পুব দিকের

রাস্তাটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান পর্যন্ত এসে নন্দপাল বলল, "দাদা, দত্ত বাবুদের কাছে কাজ আর জুটবে না। কেউ নেই সেখানে।"

"কেন, বুড়ো দত্ত কোথায় গেল? বৌ-মা দু'জন?"

একটু আগেই আমি দেখলুম, লালফৌজরা বুড়ো দত্ত আর বৌ-মাদের রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জেলখানায়। বাড়িটা খালি ক'রে দিতে হবে কি না।"

নবীন কামার কোন মন্তব্য করল না। মাঠের রাস্তা ধ'রে হাঁটতে লাগল অতি দ্রুত গতিতে। নবীন কামারের হাতের চেয়ে পায়ের শক্তি অনেক বেশী আজ। বসিরহাট থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া তারও কোন রাস্তা ছিল না আর।

ভূষণ্ডীর মাঠের মধ্যে দিয়ে সোজাসুজি রাস্তা ধরল নবীন। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। বড় রাস্তা ধরে সুলতানপুরে পৌছুতে গেলে অনেক বেশী সময় নেবে। হয়তো ভোর রাত্রির আগে সে ঘরে ফিরতে পারবে না। ভূষণ্ডীর মাঠ দিয়ে এ-অঞ্চলের লোক কেউ চলা-ফিরা করে না। ভূত-পেত্নীর ভয় কিছু নেই। অকল্যাণের ভয়টাই সব চেয়ে বেশী। বংশ পরম্পরায় সবাই দেখে আসছে, ভূষণ্ডীর মাটিতে তৃণ পর্যন্ত জন্মাতে চায় না। সবাই জানে, পতিত ভূষণ্ডীর বন্ধ্যা মাটির ছোঁয়া লাগলে অকল্যাণ হয়।

নবীন নিজেও সে-কথা জানত। কিন্তু আজ আর কোন অকল্যাণকেই সে ভয় পায় না। অকল্যাণের চূড়ান্ত সে আজ নিজেই দেখে এসেছে, মর্মে মর্মে অনুভব করেছে অকল্যাণের দংশন। মানুষের মন থেকে যদি শুভবুদ্ধি লোপ পেল, তবে ভূষণ্ডীর মাটিতে কল্যাণের প্রয়োজন কি? হরেন ডাক্তার যা পাপ ক'রে গেল তার চেয়ে বড় পাপ কল্পনা করাও অসম্ভব। বাপ-বৌকে রক্ষা করবার জন্যে ছেলেরা নিজেদের প্রাণ দিতে পারল না, উপরন্তু প্রাচীর টপকে পালিয়ে গেল! কিন্তু পালিয়ে গেল কেন? কোন কিছু কি বাঁচাতে পারবে দত্তবাবুর ছেলেরা? নিজেদের দেহ দু'টোকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি? কানাইয়ের চেয়েও খারাপ ব্যাধিতে দত্তবাবুর ছেলেরা ভুগছে নিশ্চয়ই, নইলে

বাপ-বৌদের ফেলে ওরা কিছুতেই পালাতে পারত না। সমাজ-সংসারের কোথাও তো সে কল্যাণ দেখতে পাচ্ছে না। বাজারের মেয়েছেলেগুলোকে পাঁক থেকে উদ্ধার করার মহৎ কাজ হাতে নিয়েছে ব'লে ভদ্র বাড়ির বৌদের রাস্তায় বার করার দরকার ছিল কি? একটা ভাল কাজ করতে গিয়ে যদি দশটা খারাপ কাজ করতে হয়, তা হ'লে কোন কাজ না ক'রে বাড়িতে বসে থাকাই ভাল। বাড়িতে বসে থাকবার জন্যেই বোধহয় নবীন কামার ছুটছিল সুলতানপুরের দিকে। পঞ্চাশ বছরের জীবনে যা সে দেখে নি, একদিনে তার চেয়ে সে অনেক বেশী দেখল আজ। ভূষণ্ডীর কোন অকল্যাণই তাকে আর স্পর্শ করতে পারবে না। ইচ্ছে হ'ল, যন্ত্রের বাক্সটা সে ফেলে রেখে যাবে ভূষণ্ডীর মাঠে। রোদ-বৃষ্টিতে পুড়ে যাক, পচে যাক, তার আর দুঃখ নেই। সে আর কাজ করবে না। দু'বেলা ভাত খেয়ে দেহটাকে বাঁচিয়ে রাখবার তার আর কোন প্রয়োজনই নেই।

অন্ধকার ভূষণ্ডীর মাঠে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল নবীন কামার। যন্ত্রের বাক্সটা হাত থেকে ছিটকে পড়ল খানিকটা দূরে। ট্যাঁক থেকে দেশলাই বার ক'রে একটা কাঠি জ্বালল সে। সামনে চেয়ে দেখল, একটা কালো কুচকুচে পাথর! পাথরের ওপরের দিকটায় ফুলের মালা পরানো রয়েছে। নবীন কামার অন্ধকারের মধ্যে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

সন্ধ্যের সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত আর অবনী মণ্ডল প্রত্যেক দিনই রাত্রের খাওয়াটা শেষ ক'রে ফেলে। ওবাইদ মোল্লার কাছ থেকে ওরা একটা কুপি পেয়েছে। কেরাসিন তেলও যোগাড় ক'রে দিয়েছে ওবাইদ। কেরাসিন তেলের দুর্ভিক্ষ এ-অঞ্চলে নতুন নয়, বহুদিন আগে থেকেই চলছে। বসিরহাটের রাজপুত বণিক হরদেও বাবু ধানচালের কারবার করে না। এদের রক্তে কেবল কেরাসিন তেলের গন্ধ। চালের কালোবাজারে টাকা আছে, পাপও আছে। কেরাসিনের কালোবাজারে পাপ নেই, টাকা আছে। হরদেও বাবুর বাপ রাজপুতানায় খাদ্যের অভাবে মারা গেছে প্রায় বিশ বছর আগে। সেই থেকে

সে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে বেচাকেনার কারবার করবে না ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হরদেও বাবু ইচ্ছে করলেই এক একটা চালের দানা ছ'পয়সায় বিক্রি করতে পারত, মন্বন্তরের পঞ্চাশ লাখ শবদেহের উপর আরও এক লাখ সে চাপিয়ে দিতে পারত, কিন্তু হরদেও বাবু পাপের ভয়ে তেমন কারবার করে নি। কারবার তার কেরাসিন তেলের। আবু পাহাড়ের কোন্ এক পণ্ডিত হরদেও বাবুর হাত দেখে বলেছিলেন, "হাতে তোমার বহুৎ টাকা। কোন শকত্ চীজ থেকে টাকা আসবে না, আসবে তরল পদার্থ থেকে। তরল পদার্থের মধ্যে বদ্‌বু থাকবে মগর রুপিয়ামে কোই বদ্‌বু থাকবে না।"

ব্যবসার চীজ বাংলে দিয়েছিল আবু পাহাড়ের পণ্ডিত। কিন্তু কোন্ প্রদেশ থেকে যে রুপিয়া আসবে তার ঠিকানা জানবার জন্যে হরদেও বাবুকে কষ্ট ক'রে পাহাড় তো দূরের কথা, একটা টিপির ওপর পর্যন্ত উঠতে হয় নি। সোজা এসে সে গড়িয়ে পড়েছে হাওড়া-পুলের পূব দিকের ঢালুতে, যেখানে কলকাতা পুলিশের সতর্ক-সেপাইটা লাল আর সবুজ আলো জেলে কেবল গাড়ি-ঘোড়ার যাওয়া-আসা নিয়ন্ত্রণ করে!

কেরাসিন তেল ফুরিয়ে যাবে ব'লে মুকু বিকেলবেলায়ই ডাল-ভাত রান্না ক'রে রাখে। প্রতিদিন ডাল-ভাত রান্না করতে করতে মুকু একজন বড়দরের শিল্পী হয়ে উঠেছে। রান্না-শিল্প সম্বন্ধে মুকু আর ক'দিন পরে থিসিস দিতে পারবে। আজকে বসন্ত গিয়েছিল সুলতানপুরের হাটের দিকটায়। বেড়াতেই গিয়েছিল সে। নতুন টাঁকার দশটাকার নোটখানা ওর পকেটে ছিল। হাটের মধ্যে ঢুকে সে প্রত্যেকটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সকল রকম জিনিসের দামদস্তুর করতে লাগল। কোন বিশেষ জিনিস কেনবার তার ইচ্ছে ছিল না। দশটাকার নোটখানা ভাঙাবার প্রয়োজনেই বসন্ত দাঁড়াল এসে বেগুন-বিক্রেতার সামনে।

"কতো ক'রে সের?"

"ছ' আনা।"

"ছ' আনা?" বসন্ত প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

"কেন, পুরনো আমলে কত ছিল?" জিজ্ঞাসা করল বেগুন-বিক্রেতা।

বসন্ত জবাব দিতে পারল না। পুরনো আমলের কথা সে জানে না। ঢাকা জিলার বিক্রমপুর থেকে সে সোজা কলকাতায় এসে উঠেছে। কলকাতায় আসবার পর থেকে সে রিফিউজী। উত্তর-দক্ষিণ এবং মধ্য-কলিকাতার বাজার বসন্ত দেখে নি। ওর মনে পড়ল, বিক্রমপুরে চার পয়সার বেশী বেগুনের সের কোন দিনই ছিল না। বসন্ত ভাবছিল। এমন সময় বেগুন-বিক্রেতা পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, "কি গো মশাই, চুপ ক'রে রইলে কেন? বলো, পুরনো আমলে, কত ক'রে সের ছিল?"

"বোধ হয় দু' টাকা।" এই ব'লে বসন্ত সরে পড়ল ওখান থেকে। ভাল ক'রে না বুঝেসুঝে বেগুন কেনার দরকার নেই। বসন্ত এসে দাঁড়াল আলুর দোকানের সামনে।

"কতো ক'রে সের?" জিজ্ঞাসা করল বসন্ত।

"এক টাকা আট আনা।"

বসন্ত এবার চিৎকার করল না। কে জানে, পুরনো আমলে বোধহয় অনেক বেশী দর ছিল।

বসন্ত ইতস্তত করছে দেখে আলু-ওয়ালা বলল, "আলুর দরটা আগের চেয়ে ডবল হ'য়ে গেছে। আমাদের লালফৌজদের জন্তে অনেক আলুর দরকার হচ্ছে কি না! আমরা খদ্দেরদের তাই বলছি, এক সের দরকার থাকলে এক পোয়া কিনতে। একটু কষ্ট হবেই।" আলুর দোকানেও বসন্তর সুবিধে হ'ল না। সরে এল ওখান থেকে। হাটের ঐ কোণের দিকটায় লাল আলু বিক্রি হচ্ছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, "লাল আলুগুলো বড্ড শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন? দর কতো?"

"চার আনা সের।" জবাব দিল দোকানী।

"কিছু কম হবে না গো?" এবার বসন্তকে দেখে মনে হ'ল সত্যিকারের খদ্দের।

"চার আনার এক পয়সাও কম নয়। সারা দেশ তছনছ হয়ে গেল, আর তুমি মশাই দর কমাতে চাইছ?"

"তছনছ যা হয়েছে সবই তো মাটির ওপর, কিন্তু লাল আলু তো জন্মায় মাটির নীচে? যাক, আধসের দাও।"

এই সময় পিঠের ওপর বন্দুক বেঁধে একজন লালপ্রহরী এসে দাঁড়াল বসন্তের কাছে। নতুন টাকার নোট খানা বার করতে বসন্ত ভয় পেল। এ-অঞ্চলে এখনও হয়তো দশ টাকার নোট এসে পৌঁছয় নি। পকেটে হাত দিয়ে বসন্ত দেখল, কংগ্রেসী আমলের একটা আধুলি রয়েছে।

লালফৌজ এসে জিজ্ঞাসা করল দোকানদারকে, "কোন জুলুম-টুলুম তো হচ্ছে না মিঞা সাহেব?"

"তোমরা থাকতে আর কেউ কি জুলুম করতে পারবে?" বলল দোকানী।

"এখানেই ডিউটি দিচ্ছি, দরকার হ'লে খবর দিও।" লালপ্রহরীটি বসন্তের দিকে একবার তেরছাভাবে চেয়ে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল অন্য দিকে। বসন্তর তবু ভয় কাটল না। জিজ্ঞাসা করল, "পুরনো আধুলি চলবে?—নইলে টাকা ভাঙাতে হবে।"

"পুরানো সিকি আধুলি চলবে চোত্ত মাস পর্যন্ত। কিন্তু পুরনো টাকা আর চলবে না।"

বসন্ত পকেট থেকে আধুলিটা বার ক'রে বলল, "এক সের দিয়ে দাও। ভেতরে পচা বেরুবে না তো মিঞা সাহেব?"

"সে তো হলফ ক'রে বলতে পারব না মশাই। আলুর ভেতরে কি হচ্ছে, কেমন ক'রে বলি?"

এক সের আলু কিনে বসন্ত বিকেলবেলাতেই ফিরে এল।

ভূষণ্ডীতে বাস্তু গড়ছে সুকু। অনেক পরিকল্পনা ছিল ওর এই নতুন কাজে। গোয়াবাগানের সমাজ সে অস্বীকার করেছে, পাটোয়ারবাগানের ব্যবস্থাও ওর মনঃপুত হয় নি। এবার সে সুযোগ পেয়েছে একেবারে নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন সমাজের গোড়া পত্তন করবার। সাড়ে তিন জন মানুষ নিয়েই ওর সমাজ গড়ে উঠছে বটে, কিন্তু সুকুর বিশ্বাস, এতে থাকবে সাড়ে তিন হাজার বছরের প্রগতি।

লাল আলুর ঠোঙাটা হাতে নিয়ে এসেই বসন্ত দাঁড়াল সুকুর সামনে। আলগা

ইটের উনোনের ওপর মাটির হাঁড়িটা চাপিয়ে দিয়ে সুকু বলল, "বসন্ত, আমি বিশ্বাস করি না যে, আমার রান্নার মধ্যে কোন 'ঐতিহাসিক অনিবার্যতা' আছে।"

"কেন বিশ্বাস করেন না?" প্রশ্ন করল বসন্ত।

"করি না এই জন্যে যে, ভাত রান্না করা বা না করা নির্ভর করছে আমার ওপর, ঐতিহাসিক অনিবার্যতার ওপর নয়। ইচ্ছে করলে আমি ভাত নাও রাঁধিতে পারি।"

"যদি না রাঁধেন, তবে আমরা বলব যে, ইচ্ছে থাকা সত্বেও আপনি ভাত রাঁধতে পারলেন না। আপনার ইচ্ছের চেয়ে ইতিহাসের ইচ্ছে অনেক বড়। আপনার ওপর কিছুই নির্ভর করছে না।"

সুকু সহসা হাততালি দিয়ে উঠল। বলল, "বিশ বছর আগে তোমার মত ছাত্র যদি এত কাছে পেতুম, তা হ'লে বিপ্লবের অর্থ দিতুম বদলে। দেবার ক্ষমতা যে আমার আছে তা তুমি অস্বীকার করতে পারো না বসন্ত। ভাবছি ভূষণ্ডীর সম্বন্ধে আমি নতুন নিয়ম চালু করব।"

"চালু করলেই যে আপনার নিয়ম চলবে তার কি প্রমাণ আছে?"

"পৃথিবীতে কোন নিয়মই অচল থাকতে পারে না। ইতিহাস পড়ে আমরা জানতে পেরেছি যে, যখন যে-দলের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকে তখন তারা সব রকম নিয়মই চালিয়ে দিতে পারে। নিয়মগুলো চলে যতদিন না বিরোধী দল ক্ষমতা পেয়ে সেইগুলোকে আবার অচল ব'লে ঘোষণা করে। দলের হাতে যতদিন ক্ষমতা থাকবে, ভালমন্দ বিচারবোধও তাদের ততদিন থাকবে না। কারণ, দলের চব্বিশ ঘণ্টার রাজনীতি হচ্ছে ক্ষমতা থেকে অপসারিত না হওয়া। বসন্ত হাতে ক'রে কি নিয়ে এলে?"

"লাল আলু। কেবল ডালভাত খেয়ে খেয়ে পেট আমার ভরছে না।"

"কিন্তু ডালভাত ছাড়া আমি তো আর কিছু রাঁধতে জানি না!"

"একটা সাদাসিধে তরকারি রাঁধলেই হবে। আমি তো সর্বহারা-কারী পেলেই সন্তুষ্ট।" উনোনের পেছন দিকে দাঁড়িয়ে বলল বসন্ত।

"বসন্ত, আমি তো তরকারি রাঁধবার টেকনিক জানি না—অথচ তোমাকে

ভাল ক'রে না খাওয়াতে পারলে মনে আমি শান্তি পাই না। প্রথম দিনটা আমায় একটু দেখিয়ে দেবে?" ঝুকু উনোনের ও-পাশে গিয়ে বসন্তর গা ঘেঁষে বসল। আজকাল ছোঁয়াছুঁয়িতে বসন্তর আর উদ্বেগ আসে না। আপত্তিও করে না বসন্ত।

বসন্ত বলল, "থাক গে—ভাতের মধ্যে গোটা পাঁচেক ফেলে দিলেই হবে। তা ছাড়া আলু যত লালই হোক, আপনি তো তরকারি রাঁধতে কলকাতা থেকে পালিয়ে আসেন নি।"

ঝুকুর ভাঙ্গা চোয়ালে হাসির হিল্লোল উঠল। বসন্তর বাঁ হাতের অনামিকা আঙুলটা টেনে নিয়ে সে বলল, "বসন্ত, তোমার জন্যে আমি একটা আংটি গড়িয়ে দেব।"

"ভূষণ্ডীর মাঠে সোনা-রূপোর দোকান নেই।" গম্ভীরভাবে ঘোষণা করল বসন্ত।

"সোনা রূপো ছাড়া বুঝি আংটি হয় না? বুর্জোয়াদের কাছে প্রেমের চেয়ে সোনার দাম বেশী।"

"তা বেশী। কিন্তু প্রেম দিয়ে তো আংটি তৈরি করা যায় না।"

"যায়, যদি দু'জনের মনের সমর্থন থাকে।"

বসন্ত কোন কথা না ব'লে উঠে পড়ল। আজ সমস্ত দিনটা অবনী মণ্ডলের সঙ্গে দেখা হয় নি। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, এতক্ষণে তার ঘরে ফেরবার কথা। বসন্ত চলল অবনী মণ্ডলকে খোঁজ করতে।

মাঠের মধ্যে লাঙলটা পড়ে রয়েছে, অবনী মণ্ডল নেই। এক হাত জমি পর্যন্ত চাষ করা হয় নি। ওবাইদ মোল্লাকেও সে দেখতে পেল না। মাঠের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল বসন্ত। সহসা যেন ওর বাঁ হাতের অনামিকায় কেমন একটা স্নিগ্ধ কম্পন সে অনুভব করল। চামড়ার তলায় বসন্তের হাওয়া বইছে না তো? ফাল্গুনের মাঝামাঝি সময়, ভূষণ্ডীর মরা চামড়ায় বসন্তের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, অথচ বসন্ত দাসের সর্বশরীর শিরশির করতে লাগল! অবাক হ'লো বসন্ত দাস। রিফিউজীর জীবনে এ কোন্ উপসর্গ এসে উদয় হ'লো? তবে কি, নিয়মিত দু' বেলা ডাল ভাত খাওয়ার ফলে শরীরের নিয়ম-

কাহুন সব বদলে গেল ? গত পাঁচ বছর ধরে কলকাতার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে তার শরীরে ক্রমাগত কম্পন উঠেছে, কিন্তু সে তো অনাচারের কম্পন। সে কম্পনের অনুভূতি আলাদা। বসন্তর আজও মনে পড়ে, শ্যামবাজার থেকে বালিগঞ্জ পর্যন্ত শত শত খাবারের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে খালি পেটে সে অসংখ্য সাইনবোর্ড পড়েছে, চোখ দিয়ে গিলেছে প্রতিটি অক্ষর। কিন্তু পেটের খিদে মেটাতে পারে নি। বিক্রমপুরের পাড়া গাঁয়ে এমন নিয়ম কিছুতেই চলতে পারত না। একজনের ভাতের থালার সামনে দাঁড়িয়ে আর একজন এমনি ক'রে খিদের জ্বালায় কাঁদবে, তেমন ঘটনা ওর তো কখনও চোখে পড়ে নি। এমন বিক্রমপুর ছেড়ে বসন্ত স্বর্গে যেতেও আপত্তি করত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকতে পারল না সেখানে। রাজনৈতিক পণ্ডিতদের ভাঁওতায় প'ড়ে ওকে হতে হ'লো বাস্তুহারা। রাজনীতির পণ্ডিতেরা বোধহয় এ-যুগের সবচেয়ে মারাত্মক মূর্খ।

ভূষণ্ডীর মাঠে রাজনীতি নেই। সাইনবোর্ডও নেই। সেই জন্যেই বোধহয় বসন্ত কলকাতা ছেড়ে ভূষণ্ডীর মাঠে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু আজ আবার ওর দেহে-মনে নতুন রকমের কম্পন উঠেছে। অনামিকার অলংকার সোনার নয়, প্রেমের। এ কেমন অলংকার ? ফাল্গুনের মাঝামাঝি সময়ে এমন ক'রে ওকে উস্কে দিল কে ? কোকিল-দোয়েল প্রভৃতি ভূষণ্ডীর মাঠে কারবার বন্ধ করেছে কত যুগ আগে, কে জানে !

'যৌবনবেদনারসে-উচ্ছল' বৃক্ষশাখা ভূষণ্ডীতে একটিও নেই। কোকিল-দোয়েল যদি বসবার জায়গা না পায়, তবে ওরা লক্ষ টাকা ঘুষ পেলেও প্রিয়তমার কাছ থেকে লিপি আনতে সম্মত হবে না।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে বসন্ত ফিরে যাচ্ছিল হুকুর কাছেই। তাহ'লে অনামিকার রহস্য, হুকুরই রহস্য। যে ভারতবর্ষে বিপ্লব আনতে পারে, সে কেন পারবে না বসন্তর দেহ-মনে যৌবন আনতে ? হুকু বোধহয় চুপ ক'রে বসে থাকতে পারে না, প্রতিমুহূর্তে ওকে কিছু-না-কিছু একটা আনতে হয়। যে ঘুমোয় তাকে জাগিয়ে দেয় হুকু। যে জেগে আছে, তাকে ঘুমও পাড়ায় হুকু। হুকুর কথা অমৃত সমান।

ফেরবার মুখে বসন্ত দাসের নাক-মুখ দিয়ে ফুরফুর ক'রে নতুন ঋতুর বাতাস ঢুকতে লাগল। হাল্কা বাতাস এ নয়। এ বাতাসের মধ্যে গভীরতা আছে। আছে মন্থনের অতলস্পর্শী উত্তম।

বসন্ত ভাবল, ভূষণ্ডীর আলো বাতাসও বোধ হয় মুকুর নিয়মে চলছে। অদ্ভুত ক্ষমতা ঐ ভদ্রমহিলার। দিনরাত কেবল টানে, কাছে আনতে চায়। ইচ্ছে করলে, সে হয়তো হাওয়াই দ্বীপের ঝড়-বাদল ভূষণ্ডীতে টেনে আনতে পারে। পূব আকাশের নরম সূর্যকে তাতিয়ে দিতে পারে মুকু। বসন্তর মনে উত্তেজনার সঞ্চার হ'লো। ভদ্রমহিলাকে অগ্রাহ্য করা উচিত হবে না। সে যখন ওকে টানছে, বসন্ত ওর কাছেই যাবে। কিন্তু টানছে কেন? বসন্ত নিজের কাছেই নিজে প্রশ্নটা উত্থাপন করল। ভদ্রমহিলা বড় ঘরের মেয়ে, বয়সেও বড়— বিদ্যাবুদ্ধি তার অগাধ। বসন্তর মধ্যে এমন কি সে দেখল? কয়েক দিন সে ডাল-ভাত খেয়ে শরীরটাকে তাগড়া ক'রে তুলেছে বটে, কিন্তু তাতে আকৃষ্ট হওয়ার কি আছে?

তাহ'লে মুকু বোধহয় নির্ভর করতে চায় বসন্তর ওপরে। কিংবা রাজনীতির ষড়যন্ত্র নিয়ে মাথা ঘামানোর সুযোগ নেই ব'লে মুকু চায় জীবনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে। কোন কিছু একটা ভাঙতে না পারলে মুকু যেন বেকার জীবনের দংশন অনুভব করে। ওর জীবনটাই যেন একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের প্রস্তুতির মধ্যে গড়ে উঠেছে। খোলা আকাশের নীচে, ফাঁকা জায়গায় মুকু দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না—পারবে মনে ক'রেই সে পালিয়ে এসেছে বসন্তর সঙ্গে। সোজা, সরল ও সুস্থ জীবনের মধ্যে ফিরে যাওয়ার জন্যেই মুকু হয়তো প্রতি মুহূর্তে নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করছে। গত বিশ বছরের গর্তটা থেকে কিছুতেই সে বেরিয়ে আসতে পারছে না। বেরিয়ে আসতে না পারাটাই তো মুকুর জীবনের বড় ট্র্যাজেডি। মুকুর ব্যথা শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ব্যথা।

বসন্ত অতো কঠিন মনস্তত্ত্বের মধ্যে মাথা গলাতে পারল না। পারবার প্রয়োজনই বা কি! মুকুর প্রতি ওর মনোভাব নরম হয়ে এসেছে। ক্রমে ক্রমে জল হয়ে যাবে। বয়সবেশী মহিলাকে ভালবাসতে পারবে না, কিংবা পারা উচিত নয় তেমন কথা মার কাছে বসন্ত শোনে নি। তেমন কোন সামাজিক

বাধা-নিষেধ আছে ব'লে বসন্ত জানে না। তা ছাড়া, ভালবাসার সঙ্গে বয়সের কি সম্পর্ক? সম্পর্ক থাকলেও, বসন্ত তা মানবে না। সে দ্রুতপদে হাঁটতে লাগল ঘরের দিকে।

সোজাসুজি মুকুর সামনে এসে দাঁড়াতে পারল না বসন্ত। যৌবনের প্রথম প্রেম জীবনের সবচেয়ে বড় কীর্তি। ছ'ইঞ্চি দূরে দাঁড়ানো প্রিয়তমাকে সব কিছু উজাড় ক'রে দিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু অতো তাড়াতাড়ি দেওয়া যায় না। হাত বাড়ালে মনে হয়, ছ'-ইঞ্চির দূরত্ব ছ'-হাজার মাইল। বসন্ত কল্পনা করতে লাগল, হামু বিচালির বিছানায় শুয়ে হাত-পা নাড়ছে। হামুর দিকে চেয়ে রইল বসন্ত। একটু পরে ওর দৃষ্টি থেকে উধাও হ'লো হামু। কেবল হামুর জন্ম নাড়িটা যেন একটা পাকানো দড়ির মত হয়ে বসন্তের চোখের সামনে ভেসে উঠল। দড়িতে তৈরী হ'লো একটা ফাঁস,—শূন্য দিয়ে সেটা ভেসে আসতে লাগল বসন্তর গলার দিকে। ভয় পেয়ে বসন্ত তার দু'হাত দিয়ে নিজের গলাটা চেপে ধরল। আসলে, বসন্ত চেপে ধরল হামুর জন্মমূল। কোথেকে এল হামু? জ্ঞানাচ্ছাদিত অবয়বের মধ্যে কলঙ্ক নেই, থাকা অসম্ভব। ভগবান নিজেই যখন নিষ্কলঙ্ক, তখন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কলঙ্ক থাকবে কি ক'রে? কিন্তু সৃষ্টির আগের অবস্থা কি? হামুর অবয়ব প্রাপ্তির পূর্বে কি কোন পরিকল্পনা ছিল না? ছিল। বসন্ত ভাবল, মুকুর ইচ্ছেতেই হামুর জন্ম সম্ভব হয় নি, অনেক পুরুষের সাহায্য নিতে হয়েছে। পুরুষটি কে? কথাটা ভাবতে গিয়ে বসন্তর মন থেকে ফাল্গুনের হাওয়া গেল উবে, কি রকম একটা ঘৃণার উত্তাপ যেন ওকে ঘিরে ধরল চারদিক থেকে। বসন্ত ওখানে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। কখন যে সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে বসন্ত তা টের পায়নি। ভূষণ্ডীর ফাঁকা মাঠে গভীর অন্ধকার। সাধারণ অন্ধকার নয়। অন্ধকারের মধ্যেও রয়েছে মন্থনের গভীরতা। বসন্ত অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বসে রইল শোবার ঘরের পেছনে। হামুর প্রতি সে বোধহয় অবিচার করেছে। হামুর কোন অপরাধ নেই। থাকতে পারে না। মুকুর কার্যকলাপের ওপর ওর কোন নিয়ন্ত্রণ-অধিকার ছিল না। থাকলে হামু নিশ্চয়ই আপত্তি জানাত। আপত্তি জানালেই কি মুকু তা শুনতো? শুনতো না। কারণ, মুকু ভগবানের আপত্তি শোনে নি, ধর্মের

অনুশাসন অগ্রাহ্য করেছে। হুকু ভুল করেছে, গুরুতর ভুল করেছে। কিন্তু মানুষের ভুল হবে না এই বা কেমন যুক্তি? বনমানুষের সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য ঠিক কোন্ জায়গা থেকে হারিয়ে গেল বসন্ত তা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতে লাগল। বনমানুষ বোধহয় ভুল বুঝতে পারে না। মানুষ পারে। নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের ভুল মানুষের স্বাভাবিক ভুল। নইলে জগৎ-সংসারে বাস করত কে? মানুষের বদলে বনমানুষ।

বসন্ত এসে ঢুকল শোবার ঘরে। হামুকে কোলে নিয়ে সে হুকুর কাছে যাবে। নির্ভুল জগতের মানুষ সে হতে চায় না। নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার স্বাভাবিকতার মধ্যে যদি সংগ্রাম থাকে তো থাক, বসন্ত দাস তাতে আর ভয় পাবে না। যা স্বাভাবিক, তা-ই সত্য। এবং সত্যই ভগবান।

বসন্ত অন্ধকারের মধ্যে হাত বাড়িয়ে দিল। বিচালিগুলো টিপে-টিপে দেখতে লাগল, কিন্তু হামুকে সে খুঁজে পেল না।

সমস্তটা দিন হলধরকে নিয়ে ব'সে রইল অবনী মণ্ডল। দুপুরের দিকে সে একবার এসেছিল ভাত খাওয়ার জন্যে। খেতে বসে সে কারো সঙ্গেই আজ আর ইচ্ছে ক'রে কথা বলে নি। বসন্ত জিজ্ঞাসা করেছিল, "অবনীদার দেহ-মন ভাল আছে তো?"

"এমন সোনার সংসারে যে স্থান পায় তার দেহ-মনের ক্ষয় নেই বসন্ত ভাই।" অবনী মণ্ডল চলে গেল মাঠের দিকে। বসন্ত কিংবা হুকু কেউ জানতে পারল না হলধর কিংবা ভাঙ্গা লাঙলের কথা।

পাথরের সামনে বসে সে চোখ বুজে রইল। অবনীমণ্ডল জানে, পুরোহিত ছাড়া পুজো হয় না, শাস্ত্র-লেখা মন্ত্র ছাড়া হয় না দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। কিন্তু ভূষণ্ডীর মাঠে না আছে পুরোহিত, না আছে শাস্ত্র। অবনী মণ্ডল কি করবে? চোখ বুজে প্রাণ ঢেলে সে যদি হলধরের পায়ে লুটিয়ে পড়তে পারে, তবে কি ভাঙ্গা ফাল্ জোড়া লাগবে না? অবনী মণ্ডল লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। মাঝে মঝে চোখ খুলে সে দেখতে লাগল, ফালের দিকে। তবে কি সে ঠিক মত ডাকতে পারছে না? সন্ধ্যে পর্যন্ত অবস্থার কোন পরিবর্তন হ'লো না। উপুর

হয়ে মাটিতে পড়ে একটানা চারঘণ্টা সে ডাকল, ডাকল হলধরকেই—কিন্তু হলধরের আগ্রহ প্রকাশ পেল না লাঙলের দিকে হাত বাড়াবায়।

অবনী মণ্ডল ফিরে এল ঘরে। সন্ধ্যের একটু আগেই খাওয়াটা শেষ করতে না পারলে, কুপির তেল নষ্ট হবে অকারণে। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে আবার ফিরে আসবে হলধরের কাছেই।

অন্ধকার ঘরে হামু শুয়েছিল। অবনী মণ্ডল নিজেও চাষীর ছেলে, কিন্তু হামুর কথা ভেবে অবনীর চোখে প্রায় জল আসবার উপক্রম। সে হলধরের কাছেই মনে মনে প্রার্থনা করল, "হামুর জন্যে একটা বিছানার বন্দোবস্ত ক'রে দাও ঠাকুর। জানি তুমি লাঙলের দেবতা, কিন্তু দেবতা তো বটে। হামুর বড্ড কষ্ট! না হয় ফালটা এখন পড়েই থাক, তুমি ওর বিছানা যোগাড় ক'রে দাও হলধর।"

হামুকে কোলে নিয়ে অবনী মণ্ডল এল মুকুর কাছে। ভাতের হাঁড়িটা সামনে নিয়ে মুকু কি যেন ভাবছিল। একেবারে তন্ময় হয়েই ভাবছিল। অবনী মণ্ডলের উপস্থিতি সে লক্ষ্য করে নি। মুকুকে দেখতে পেয়ে হামু মায়ের কোলে যাবার জন্যে হাত-পা নাড়তে লাগল।

"মুকু দিদির যেন চৈতন্য নেই?" বলল অবনী।

চট ক'রে ভাতের হাঁড়ির ওপর হাত রেখে মুকু ব'লে উঠল, "চৈতন্য নেই মানে? এই তো তোমার জন্যে ভাত নিয়ে বসে আছি?"

অবনী মণ্ডল কেবল একটু হাসল। মুকুর কথা সে বোধহয় বিশ্বাস করে নি। মুকু সত্যিই ভূষণ্ডীর মাঠে ছিল না। কোন্ ঊর্ধলোক থেকে যে সে বিচরণ ক'রে এল, মুকু ছাড়া কেউ তা বলতে পারবে না। মানুষ ভিড়ের মধ্যে বাস করলেও বোধহয় কোন-কোন মুহূর্তে সে একলা বোধ করে, পালিয়ে যায় নিজের গোপন সাম্রাজ্যে যেখানে সত্যের আরশিতে নির্ভাবনায় সে তার বাস্তব প্রতিবিম্ব দেখতে পায়। ভূষণ্ডীর বাস্তবতায় মুকু তার সবটুকু দেখতে পায় না। বিশ্ববিপ্লবের আগুনে গোটা বিশ্বের বাস্তব রূপ মুকু দেখতে পেয়েছে, কিন্তু বিশ্বের তুলনায় নিজের বিন্দুবৎ অস্তিত্বের পুরোটা সে দেখতে পেল না কেন? মুকু বলল, "তোমরা খেয়ে নাও অবনীদা, নইলে কেরাসিন নিয়ে মুস্কিলে পড়বে। তেল যা

আছে দু'চার দিনের বেশী আর চলবে না।" একটু থেমে ঝুমু জিজ্ঞাসা করল, "হামুর বাপ কোথায় অবনীদা?"

অবনী মণ্ডল হামুকে চেপে ধরল বুকের ওপর। ওর গোপন প্রশ্নের জবাব পেয়েছে আজ। মাঠের মাঝখানে অবনীমণ্ডলের সঙ্গে ওদের চেনা-পরিচয় হয়েছে বটে, কিন্তু হামুকে যেন সে প্রাণঢেলে এযাবৎ কাল ভালবাসতে পারে নি। কেমন একটা সন্দেহের অঙ্কুশ ওকে খোঁচা মারত মাঝে মাঝে। বসন্ত ও ঝুমুর সম্পর্ক যেন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নয়! উৎফুল্ল হয়ে অবনী মণ্ডল বলল, "ঝুমুদিদি, তুমি আমায় বাঁচালে!"

সানকিতে ভাত বাড়তে বাড়তে ঝুমু জিজ্ঞাসা করল, "কেন?"

"আমার কি রকম মনে হ'তো, যেন ভূষণ্ডীর ওপারের মাঠে তোমার সঙ্গে বসন্ত ভাইয়ের চেনা হয়েছে ঠিক আমার সঙ্গে চেনা হওয়ার ঘণ্টা দু'য়েক আগে। হামুর ওপর আমি অবিচার করেছি দিদি।"

"পিতৃ-পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত বুঝি হামুকে তুমি আদর করতে পারছিলে না অবনীদা?" ভাতের সানকি এগিয়ে দিল ঝুমু।

"মিথ্যে বলব না, ঠিক তাই। ক'দিন থেকেই ভাবছিলাম, তোমায় জিজ্ঞাসা করব। আমরা গেঁয়ো মানুষ—রাগ করলে না তো দিদি?"

"না, রাগ করব কেন। জারজ ছেলেকে বোধহয় তার নিজের মা-ও ভালবাসে না। তোমার সন্দেহ আমি টের পেয়েছিলাম।"

হামুকে কোলে নিয়েই অবনী মণ্ডল ভাত খেতে বসল। সহসা ভাতের মধ্যে লাল আলুর উপস্থিতি লক্ষ্য করল অবনী। ঝুলে-পড়া গোঁফের তলা দিয়ে একটা লম্বা আলুর সবটাই মুখের মধ্যে গলিয়ে দিয়ে অবনী মণ্ডল থেমে থেমে ঘোষণা করল, "জয় হোক লাল সাম্রাজ্যের। কিন্তু লাল আলু কোথায় পেলে দিদি?"

"বসন্ত গিয়েছিল সুলতানপুরের হাটে। একটা হাঁক দাও না অবনীদা। ও গেল কোথায়?"

সামনের দিকে চোখ তুলতেই ঝুমু দেখল, বসন্ত বেড়ার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে মাথা নীচু ক'রে। হামুর সামাজিক ইজ্জৎ রক্ষা করল বিক্রমপুরের বসন্ত দাস।

খাওয়ার পর্ব শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগেই।

ঘণ্টা দুয়েক গল্পগুজবের পর সবারই ঘুম আসতে লাগল। অবনী মণ্ডল অন্য দিন বক্তৃতায় প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে মত্ত হয়ে উঠত, বর্ণনা করত হাজিমহন্মের কমরেড-কাহিনী। দু'-মণ ধান থেকে কি ক'রে তের মণ চাল গজাত, তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ত মাটিতে। আজ কিন্তু সে আলাপ-আলোচনায় তেমন ভাবে যোগ দিতে পারল না। হুকু এবং বসন্ত জানে, অবনীমণ্ডল আজও মাটিতে লাঙল দিতে পারে নি, দিনটা নাকি তেমন ভাল নয়।

ঘরের সামনে দু'হাত উঁচু ক'রে মাটি তুলে নিয়েছে অবনী মণ্ডল। খড়ের চালটা সামান্য একটু সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে যেন ভোর রাতের হিম ওকে স্পর্শ করতে না পারে। মাথার ওপর দু'-দশটা খড় থাকলেই চাষীদের আর মাথা গুঁজবার অসুবিধে হয় না। আলাপ-আলোচনার মাঝখানে অবনী মণ্ডল বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েছিল। দু'-এক ডাকের পর হুকু তার সাড়া পেল না। হামুও ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে নিয়ে হুকু চলে গেল ঘরের মধ্যে। বিচালি দিয়ে সমস্তটা ঘর জুড়ে বিছানা সেই প্রথম দিন থেকেই পাতা ছিল।

প্রতিদিনই হুকু বসন্তর একটু আগে গিয়েই ঘরে ঢোকে। জামাটা ঝুলিয়ে রাখে বেড়ার গায়ে। শাড়ি অবশ্য ওর দু'-খানাই ছিল। দু'-একদিন পর পর শাড়ি দু'খানা উল্টেপাল্টে সে ব্যবহার করে। জামার সংখ্যা মাত্র একটা। বসন্ত ঘরে ঢুকবার আগেই হুকু বাতিটাকে দেয় নিবিয়ে। রাত্রের কয়েক ঘণ্টায় ব্যবহার যদি কমে, তবে জামাটার ব্যবহার বাড়বে কয়েক দিন বেশী।

হামুকে শুইয়ে দিয়ে হুকু আজও বাতিটাকে নিবিয়ে দিল। জামাটাকে যথারীতি টাঙিয়ে রাখল বেড়ার গায়ে। তারপর সে ডাকলো, "বসন্ত—"

বাইরে থেকে কোন জবাব এল না। জবাব দেবে না ব'লেই বসন্ত চুপ করেছিল। আজকে আর ঘুম আসবে না। তাই সে ভাবছিল, অবনীদার পাশেই শুয়ে থাকবে। জবাব না পেয়ে হুকু পুনরায় ডাকলো, "বসন্ত—বসন্ত, ভেতরে এস। আমার কাপড় ছাড়া হয়ে গেছে।"

বসন্ত অবাক হ'লো। স্থকু কাপড় ছাড়ে না কি? আশ্চর্য। ভদ্রমহিলার মন থেকে বোধহয় শুভবুদ্ধি লোপ পেয়েছে। আরও কি সব কথা ভাবতে গিয়ে লজ্জা পেল বসন্ত দাস। অন্ধকারে দাঁড়িয়েই সে চোখ দুটো নীচু ক'রে রাখল মাটির দিকে। ভূষণ্ডীর সমাজে কথা উঠবে ব'লে সে আর মুখোস প'রে থাকতে পারবে না। নিন্দা-সুখ্যাতির চেয়ে চরিত্র অনেক বড়। চরিত্র না থাকলে ভূষণ্ডীর মাঠে গড়বে কি স্থকু? কেবল খড় আর বাঁশ দিয়েই তো বাস্তু গড়া যায় না। আরও অনেক রকমের কথা সে ভাবতে লাগল। এমন সময় স্থকু এল বাইরে। ডাকলো, "বসন্ত?" বসন্ত তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিল উল্টো দিকে। বসন্তর রোমকূপে অপরিমিত ঘাম জমেছে। ভদ্রমহিলার বোধহয় আজ আর কোন শ্লীলতা জ্ঞানই নেই। সে উল্টো দিকেই মুখ ক'রে বলল, "আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন, আমি আজ বাইরেই শোব।"

"আমার ভয় করছে বসন্ত।"

"কোন ভয় নেই, আমরা তো বাইরেই রইলুম।" বসন্ত বলল দৃঢ়কণ্ঠে।

আরও একটু সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে স্থকু জিজ্ঞাসা করল, "তুমি উল্টো দিকে মুখ ক'রে কথা কইছ কেন? আমার দিকে চেয়ে কথা কও।"

বসন্ত ভাবল, এবার তাকে বুঝি মাঠের মধ্যেই নেমে পড়তে হয়। সে আজ রাত্রিটা ভূষণ্ডীর অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে থাকবে। আজ আর সে কিছুতেই স্থকুর দিকে চাইতে পারবে না। কিন্তু অবনীদার যদি ঘুম ভেঙ্গে যায়? ছিছি, ভদ্রমহিলা বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি করছেন আজ।

স্থকু বলল, "একলা ঘরে আমি শুতে পারব না। তুমি যদি বাইরে ব'সে থাকো, তা হ'লে অবনীদাকেই ভেতরে গিয়ে শুতে বলব।" পরিস্থিতি আরও গুরুতর হয়ে উঠছে মনে ক'রে বসন্ত বলল, "না, না, অবনীদাকে ডাকবার দরকার নেই। আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন, আমি আসছি।'

স্থকু ভাবল, বসন্ত তার অধিকারের সিকি ইঞ্চি জায়গাও কাউকে ছেড়ে দিতে রাজী নয়। স্থকুর আকর্ষণ বসন্ত আর অগ্রাহ্য করতে পারছে না। বসন্তর মনে অধিকার-বোধ জন্মেছে। স্থকু জিতছে। ভগবানকে সাক্ষী না রাখলে স্ত্রী-পুরুষের প্রেম পরিশুদ্ধ হয় না তেমন ধর্মশাস্ত্র বসন্তর দেহাতী মনও

আর স্বীকার করবে না। ঝুকু যেন দেখতে পেল, বাইবেল, বেদ এবং কোরাণের পৃষ্ঠাগুলো সারা ঘরময় ছড়িয়ে রয়েছে। ইচ্ছে করলেই সে বিচালির বদলে কাগজ দিয়ে শয্যা রচনা করতে পারে। পারে বসন্তকে দিয়ে প্রাচীন জগতের নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন করাতে। লঙ্ঘন করিয়েছে মনে ক'রেই ঝুকু এসে শুয়ে পড়ল বিছানায়। বিচালির চোখাচোখা মুখগুলো ঝুকুর গায়ে বিঁধতে লাগল। ঝুকুর তবু মনে হ'লো, বিচালিগুলো সব বেদ-বাইবেলের নরম নরম ছাপা-কাগজ!

কিছুক্ষণ পরে ঘাম মুছতে মুছতে বসন্ত এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। ওখানে দাঁড়িয়েই সে সোজা চাইল ঘরের মধ্যে। কিছুই দেখা গেল না। ভূষণ্ডীর অন্ধকার আদিম অন্ধকার।

বিছানায় শুয়েই ঝুকু বুঝতে পারল বসন্ত আসছে। বসন্তর দূরত্ব যত কমতে লাগল, মাঝখানের মুহূর্তগুলো ঝুকুকে ঠেলতে লাগল তত দূরে। কেমন একটু ভয় এল ওর মনে। সে একটু একটু ক'রে সরে যেতে লাগল বিছানার ধারের দিকে। ঝুকু বুঝতে পারল, বসন্তর মাতৃ-শিক্ষা হেসে উড়িয়ে দেবার মত হাল্কা জিনিস নয়। বসন্তর রুচি-বোধ আছে। আছে ধর্ম-বোধও। ভূষণ্ডীর ফাঁকা মাঠে এক নির্জন ঘরে যে-মানুষটা ওরই পাশে শুয়ে ঘুময় তাকে ইচ্ছে করলেই হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না। ব্যবধান ঘোচান যায় না বৈজ্ঞানিক জড়বাদের সাঁকো দিয়েও। সাঁকোর দুপ্রান্ত ছুঁতে পারে না ও-পারের মাটি। ঝুকুর মনে ভয় বাড়তে লাগল, বসন্তকে হারাবার ভয়। ক'দিন আগে যাকে সে ফেলে দিতে পারত, ক'দিন পরে তাকেই আবার ধ'রে রাখতে হচ্ছে!

নিঃশব্দে বসন্ত এসে শুয়ে পড়ল বিছানায়। বাঁ হাতটা লম্বা ভাবে দিল ছড়িয়ে, হামুর গায়ে ওর হাত লাগল না। হামু কি আজ জায়গা বদল করল? বসন্ত তার নিজের বুকে হাত দিয়ে ভাবল, হামুর জায়গা বদল হওয়ার আর কোন সম্ভাবনাই নেই। ঝুকুর সাধ্য নেই এখানে হাত দেবার। আজ বোধ হয় ঝুকু হামুকে টেনে নিয়েছে নিজের দিকে। তা নিক, বসন্ত আর তাই নিয়ে ঝুকুর সঙ্গে ঝগড়া করবে না। কে জানে, বসন্তকে টানতে পারল না ব'লেই

শুকু হয়তো হাসুকে টেনে নিয়েছে নিজের কাছে। হাসি চেপে বসন্ত কথাটা আরো একটু গভীর ভাবে ভাবতে গিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল, নিজেই তা টের পেল না।

অবনী মণ্ডল দাওয়ায় শুয়েছিল বটে, কিন্তু এক মিনিটের জন্যও ঘুময়নি। হলধর আজ ওকে ঘুমতে দেবে না তা সে মনে মনে জানত। কাউকে কোন কথা সে জানায় নি, সমস্তটা দিন অবনী মণ্ডল একা-একাই হলধরের সান্নিধ্য উপভোগ করেছে। কেবল উপভোগই করে নি, বোঝবার চেষ্টাও করেছে সে, দুনিয়ায় এতো মানুষ থাকতে হলধর কেন তার কাছে এসে ধরা দিয়েছেন। তবে কি সে অপর পাঁচজনের চেয়ে বেশী ধার্মিক? অবনী মণ্ডলের নিজের তেমন বিশ্বাস নেই। হালিশহরে সে পাঁচটা বছর কাটিয়ে এল, পাঁচ মিনিটের জন্যেও সেখানে কমরেড বাবুরা ওকে ধর্মপালন করতে দেয় নি। তবে হাঁ, মনে মনে সে সব সময়েই ভগবানকে ডেকেছে। লাঙল ঠেলতে ঠেলতে হঠাৎ সে লাঙল ঠেলা বন্ধ ক'রে দিয়ে ভেবেছে ভগবানের কথা। অতি সঙ্গোপনে অবনী মণ্ডল প্রার্থনা করেছে তাঁরই কাছে, কবে সে হালিশহরের জোয়াল থেকে মুক্তি পাবে। জোয়ালই বটে। গরুগুলোর মতো সেও কমরেড বাবুদের তাড়া খেয়ে বাঁধা রাস্তায় ছুটত। রাত্রিবেলা এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে দু'দণ্ড একা একা বসে জিরুতে পারত না সে। কোথা থেকে সব মাষ্টার এসে হাজির হ'তো। জিজ্ঞাসা করত, "কি ভাবছ কমরেড মণ্ডল?"

"কিছু ভাবিছি না, জিরুচ্ছি।"

"মানুষকে কিছু না কিছু ভাবতেই হয়।"

"তা হয়। তবে চাষীরা চাষের কথাই ভাবে।"

এবার মাষ্টার ব্যাটা চেঁচিয়ে উঠল, "কি ভাবছিলে কমরেড? সত্যি বল, ধরা পড়ে গেছ কিন্তু।"

"তোমরা মশাইরা আমার মনের কথা জানতে চাও কেন? আট ঘণ্টার জায়গায় বারো ঘণ্টা তো কাজ ক'রে দিয়ে এলুম?"

"আমাদের রাজত্বে কেউ মনের কথা লুকিয়ে রাখতে পারে না কমরেড। তোমার দেহ এবং মন দু'টোই আমরা চাই। এবার বল কি ভাবছিলে কমরেড ?"

"ভাবছিলাম, ঠাকুর দেবতার কথা।"

"আ! আমরা জানতুম তুমি নিজের সর্বনাশ নিজে করছ। ঠাকুর-দেবতা তোমার বারোটা বাজাচ্ছে। অন্যান্য কমরেডদের থেকে তোমায় সাতদিন আলাদা ক'রে রাখতে হবে কমরেড। তোমার ব্যামো হয়েছে—ডাক্তার-বদ্যি চাই।"

তারপর সাতদিন সে একটা আলাদা ঘরে আবদ্ধ হয়েছিল। মলমূত্র ত্যাগের জন্যে সে কেবল দু'বার ক'রে বাইরে বেরুতে পারত। দু'টো করে পাহারাওয়ালা বাইরে থাকত দাঁড়িয়ে। বাপ্ রে, কী ডাক্তারী-ই না চলল সাতদিন। চব্বিশ ঘণ্টা ধ'রে ঠাকুর দেবতার বিরুদ্ধে কেবল বক্তৃতা, আর বক্তৃতা। দাওয়ায় শুয়ে অবনী মণ্ডল আজ পুরনো দিনের সে-সব কথাও ভেবেছে। ভাবতে ভাবতে ওর মনে হয়েছে, সে এক মুহূর্তের জন্যেও ঠাকুর-দেবতার ওপর বিশ্বাস হারায় নি। অতএব সে ধর্মচ্যুত নয়। ধর্ম হারালে সে বোধহয় হালিশহরে টিকে থাকতে পারত। দশেপাঁচে মিলে একথালা ভাত ভাগ ক'রে খেতে কোন অসুবিধে হ'তো না। কিন্তু কেবল ভাত খাওয়ার জন্যেই তো সে হালিশহরে থাকতে পারে না। সে তো সারাজীবন ধরে দেখছে, গরুগুলোও ঘাস খায়, রাত্রিবেলা ঘুময়। কমরেড বাবুদের পাল্লায় প'ড়ে অবনী মণ্ডলও প্রায় গরুর মতো চারপেয়ে জানোয়ার হয়ে উঠছিল। হাতের প্রয়োজন না কি কেবল লাঙল ঠেলবার জন্যে, ধান কাটবার জন্যে—প্রার্থনা করবার জন্যে নয়। হুঃ! ঘাড় এবং মাথার সৃষ্টি হ'লো কেন? দেবতার পায়ে নত হয়ে দু'পাঁচ মিনিট পুজো করার জন্যে নয়? মোট বইবার জন্যে মাথা চাই, ঘাড়ও চাই। অবনী মণ্ডল কেবল ধানের বোঝা মাঠ থেকে বয়ে এনেছে গত পাঁচটা বছর। মাঝে মাঝে ওর মনে হয়েছে, হাত দুটো বোধ হয় দু'এক বছর পরে আর হাত থাকবে না। পায়ের মত আকার হয়ে সামনের দিকে ঝুলে পড়বে। হালিশহরে গরুর সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ কি? তার চেয়ে বগুড়া জেলাতেই তার ফিরে যাওয়া ভাল

পাকিস্তানের জুলুম যতো বেশীই হোক, অবনী মণ্ডলকে ওরা গরুর মত চারপেয়ে জানোয়ার তৈরি করতে পারবে না। দু'চার ঘা বসিয়ে দিলেও সে মানুষের মত চেঁচাতে পারবে, কিন্তু এখানে সে কেবল পারছে হাম্বা হাম্বা আওয়াজ করতে। চীৎকারের ভাষা বোঝা যায়, হাম্বা-আওয়াজের ভাষা বোঝা যায় না। অতএব, অবনী মণ্ডল একদিন বেরিয়ে এল হালিশহরের ঘাটাল থেকে।

বসন্ত ঘরে গিয়ে ঢোকবার পর অবনী মণ্ডল উঠে বসল। ওদের স্বামী-স্ত্রীর মান-অভিমানের খেলা ও এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে দেখছিল। বসন্তটা বড্ড ছেলেমানুষ! ছেলেমানুষ? ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখবার জন্যে অবনী মণ্ডল পুনরায় শুয়ে পড়ল। শুয়ে প'ড়ে প্রথমে সে মুকুর কথা ভাবল। বয়সটা যেন তার বসন্তর চেয়ে বেশী ব'লেই মনে হয়। কত বেশী? নাঃ—অনেক বেশীই হবে। বসন্তকে দেখলে বিশ বাইশের বেশী মনে হয় না, কিন্তু মুকু দিদিকে বোধহয় তিরিশের নীচে নামানো যায় না। বগুড়া জিলার কথা ভাবতে লাগল অবনী মণ্ডল। বগুড়া জিলার জোড়া জোড়া স্বামী-স্ত্রীর চেহারাগুলো ওর চোখের সামনে ভাসতে লাগল। কিন্তু বসন্ত আর মুকু দিদির মত স্বামী-স্ত্রী ওর একটাও চোখে পড়ল না। তবে, সমাজ ছাড়া এ কেমন স্বামী-স্ত্রী? পুরুষমানুষরা হয়তো খুব তাড়াতাড়ি অধর্ম করতে পারে, কিন্তু মেয়েছেলেরা সহজে অধর্ম করে না। মুকু দিদির মত শিক্ষিত মেয়ে রিফিউজী হতে পারে, তাই ব'লে এত বড় একটা অধর্মের কাজ সে কিছুতেই করবে না। বসন্তর লোভ যত বেশীই হোক, যত লম্বাভাবেই সে হাত বাড়াক না কেন, মুকু দিদিকে সে ছুঁতে পারবে না। তবে? জটিল চিন্তার মধ্যে জড়িয়ে পড়ল অবনী মণ্ডল। হলধর তো লাঙলের দেবতা। অতএব তাঁর কাছে সাহায্য চেয়ে লাভ নেই। প্রেম-প্রণয়ের দেবতা হয়তো অবনী মণ্ডলকে সাহায্য করতে পারত, কিন্তু উপস্থিত তার দেবতার সঠিক নামটা কিছুতেই মনে পড়ল না। হঠাৎ ওর মনের ওপর দিয়ে বিদ্যুতের মত একটা আলোর রেখা চলে গেল। অবনী মণ্ডল যেন সেই ক্ষণিক আলোর মধ্যে দেখতে পেল, বসন্ত আর মুকু দিদি মুখ ভার ক'রে ব'সে আছে। বয়সের বাধাটা যেন ওদের মিলনকে সম্ভব হতে

দিচ্ছে না। কঠোর সংগ্রাম চলেছে দু'জনের মনে মনে। তারপর, মুকু বিড়ি যেন বলল যে, প্রেম ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে বয়সের উঁচু-নীচু কোন অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে না। হ্যাঁ, বিশ্বাসযোগ্য কথাই বটে। অবনী মণ্ডল এবার উঠল। ধীরে ধীরে হেঁটে চলল হলধরের কাছে। লাঙলের ফালটা সে খুলে রেখে এসেছে, হয়তো এর মধ্যেই জোড়া লেগে গেছে। না লাগলেও, ভোর হওয়ার আগেই লেগে যাবে। বিশ্বাস রাখতে পারলে, হলধর জোড়া লাগিয়ে দেবেনই। এতোগুলো মনুষকে উপোস ক'রে মরতে দেবেন না তিনি। ভূষণ্ডী হালিশহর নয়। সেখানে ধান ছিল, দেবতা ছিল না। এখানে ধানও থাকবে, দেবতাও থাকবে। উৎফুল্ল মনে অবনী মণ্ডল মধ্যরাত্রির হাওয়া গায়ে লাগাতে লাগাতে অতিক্রম করতে লাগল ভূষণ্ডীর মাঠ।

মুকুও ঘুময় নি। ভাবছে। ভাবছে ওর নিজের কথা। বসন্তকে মুকু বোধহয় ভালবেসেছে। প্রথম যৌবনে বিনয়প্রকাশকে ভালবাসতে ওর কত না কষ্ট পেতে হয়েছে। হাজার রকমের লুকোচুরির বেড়াজাল টপকাতে হয়েছে ওকে। সামাজিক ও পারিবারিক বাধা ছিল সংখ্যাতীত। সোজা রাস্তা ধ'রে গন্তব্যস্থানে কোনদিনই সে পৌছুতে পারে নি। হাঁটতে হয়েছে অনেক পথ, বাঁকা গলি পার হ'তে হয়েছে অসংখ্য।

কিন্তু ভূষণ্ডীর ফাঁকা মাঠে তো কোন বাধাই নেই, তবে কেন সে বসন্তর কাছে পৌছুতে পারছে না? এক পা এগুতে গেলে, দশ পা পিছিয়ে আসে কেন? তবে কি বসন্তকে সে ভালবাসতে চাইছে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে? কিংবা জীবন ধারণের প্রয়োজনে মুকু একজন প্রতিপক্ষ চায়? প্রতিপক্ষ ছাড়া মুকু বোধহয় এক মুহূর্তও বাঁচতে পারে না। ঘাত-প্রতিঘাতের সংযমী শিক্ষা মুকুর মজ্জাগত। চুপ ক'রে ব'সে থাকলেও, হাড়-মজ্জায় খানিকটা ঠোকাঠুকি হ'লে মন্দ হয় না। চক্রান্ত প্রয়াসী মনের আঙিনায় সহজলভ্যের প্রতি মুকুর তেমন কোন আকর্ষণ নেই। হাজার কয়েক গলির রাস্তা না ঘুরে এলে মুকু বোধহয় বসন্তকে স্পর্শ করতে চায় না। ঘরের সামনে দিয়ে রথে চেপে রাজার দুলাল চলে গেল তো, মুকুর বয়েই গেল। পাটোয়ারবাগানের বসন্ত দাস যদি জীবনের চড়াই-উৎরাই এবং নানাবিধ বাঁকা পথ পার হয়ে আসতে পারে, তবেই

সে স্বাভাবিক হতে পারবে। বাতায়ন-কোণ থেকে মুকু ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারবে ওর হার-ছেঁড়া মণি, বসন্তর ধুলোপায়ের গুঁতো খেয়ে যদি সে মণি গুঁড়ো হয়ে যায় তাতেও মুকুর মেরুদণ্ড খাড়া থাকবে। বক্ষের মণি সে ফেলে দেবে তারই পায়ে যার পদচিহ্নে মুকু দেখতে পাবে চুষে-নেওয়া রক্তশূন্য কঙ্কালের বিক্ষিপ্ত অস্থি। বসন্ত আসুক, পীড়নের কাঁটাতার গলায় পরেই আসুক—মুকু তাকে ফিরিয়ে দেবে না। কাঁটাতারের মালা দিয়েই হবে ওদের শুভপরিণয়।

এই সময়ে বেড়ার ফাঁক দিয়ে মুকু যেন দেখতে পেল ভূষণ্ডীর মাঠে আগুন জ্বলছে। বিছানা ছেড়ে লঘুপদে মুকু বাইরে এল। অবনী মণ্ডলকে সে দেখতে পেল না। ব্যাপার কি? মুকু শাড়ির আঁচলটাকে দু'ভাঁজ ক'রে বুকের ওপর লেপ্টে দিল। তারপর দাওয়ার ওপর থেকে নেমে এল মাঠে।

নবীন কামার দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে কেবল পাথরের ভগবানকেই দেখল না, অবনী মণ্ডলকেও দেখল। দেখল, কে একজন মানুষ চোখ বুজে বসে রয়েছে পাথরের সামনে। অন্যদিন হ'লে নবীন কামার চিৎকার ক'রে উঠত। কিন্তু আজ সমস্তটা দিন বসিরহাটে যা দেখে এসেছে তারপর নবীনের আর মৃত্যুভয় নেই। মরে যেতে পারলে যেন ভালই হ'তো। মধ্যরাত্রিতে ভূষণ্ডীর মাঠ অতিক্রম করার সাহস তারই হবে যার সাহসের আর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই যত্ন ক'রে জীবনটাকে ধরে রাখবার। পঞ্চাশ বছর তো বাঁচল, আর কি হবে ধরিত্রীর ওপর বোঝা বাড়িয়ে।

নবীন কামার দ্বিতীয় কাঠি জেলে কুপিটা খুঁজে বার করল। কুপী জ্বালাবার পর নবীন জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কে গো?"

"আমি অবনী মণ্ডল, বগুড়া জেলা চেনো?"

"তা এখানে কি করছ?"

"হলধরের সেবা করছি।"

"কোথায় পেলে হলধরকে?"

"ভূষণ্ডীর মাটিতে।"

"ভূষণ্ডীর মাঠিতে ?" ভূত দেখলে বোধহয় নবীন কামার একটা ভড়কে যেতো না। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, "এখানে তুমি এলে কি ক'রে ?"

"হলধরই টেনে নিয়ে এলেন। আমরা রিফিউজী গো রিফিউজী। কিন্তু তুমি কে ?"

"আমি নবীন কুণ্ডু, কামারগিরি আমাদের জাতব্যবসা।"

হলধর চলেছেন! লাঙলের দেবতা তাঁর ক্রিয়া-কর্ম সুরু করেছেন!

অবনী মণ্ডল এগিয়ে এসে নবীন কামারের হাত চেপে ধরে বলল, "দাদা, এবার তুমি উপায় ক'রে দাও, ভাঙ্গা ফাল্ জোড়া লাগিয়ে দাও। ওখাইছ ভাই তো তোমার নাম করতেই অজ্ঞান, সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ। ওরে দাদা, আমার পা দু'টো যে টলছে!"

"ব'সো ব'সো। আমরা তো রিফিউজীদের জায়গা দিই নি, মাঠে ময়দানেই বস।" নবীন কামার ট্যাঁক থেকে বিড়ির বাণ্ডিল বার করল। সমস্ত দিনে একটা পয়সাও সে রোজগার করতে পারে নি। তা না পারুক, ট্যাঁকের সঞ্চয়ও সে আজ খরচ ক'রে ফেলবে। ভূষণ্ডী থেকে সে ফতুর হয়েই ঘরে ফিরবে আজ। বিড়ি ধরিয়ে অবনী মণ্ডল গল্প সুরু করল।

সে হাঁটতে আরম্ভ করল বগুড়া জেলার পাড়গাঁ থেকে। সঙ্গে বৌ ছিল। শহরের শুকনো প্যাকাটি-মার্কা বৌ নয় দাদা, গায়ে-গতরে থাবা থাবা মাংস! তামার পয়সা পিছলে পড়ত এদিক ওদিক। ওরে দাদা, সে কি বৌ রে! নিতম্বে তার নয়ন ফেললে তামাম দুনিয়া হেঁটে আসা যায়। আমি আর চৌকিদার পেছনে, বৌ চলেছে আগে আগে। আমরা দু'ক্রোশ রাস্তা হেঁটে এলুম বগুড়া স্টেশন পর্যন্ত। তারপর? রেলগাড়ি ছুটতে লাগল শেয়ালদার দিকে। সে কি দোলানি! ডাইনে বাঁয়ে হেলে দুলে গদাই লস্করী চালে তার সামনে গমন! ওরে দাদা, যতোই তুমি দুলে দুলে চলো, আমার সেই বৌয়ের মতো দোলানি তুমি কোথায় পাবে? তার নিতম্বের নাচন দেখতে ধানের চারা লম্বা হ'লো, চৌকিদারের চরণ কাঁপল, স্বর্গে বোধহয় অপ্সরীদের সরম এল ইত্যাদি। আরও অনেক রকমের বর্ণনা সে দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় নবীন কামার বাধা দিয়ে বলল, "থাক, বৌকে নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভাল।"

"কেন দাদা ?" অবনী মণ্ডলের মনে আজ তুফান উঠেছে। হারানো অতীত কথা কইছে আজ বক বক ক'রে।

নবীন কামার জিজ্ঞাসা করল, "তারপর কি হ'লো ? গাড়ি তো ছুটছে শেয়ালদার দিকে।"

"কেবল গাড়ি ছুটবে কেন নবীনদা, রিফিউজীরাও ছুটছে। ঘরবাড়ি, ধানের ক্ষেত, পাটের ক্ষেত, তিসি, সরষে, মসুর সব ফেলেই ছুটছে। কে কোথায় রইল, আঁতুড়ঘরে ক'জন, ব্যামোর শয্যায় পড়ে রইল কে কে, কোন খবরই কারও জানা নেই। সবাই ছুটছে। হিন্দুস্থানের বাবুরা সব ডাকছে, মন্ত্রী-সান্ত্রীরা ঠাকুর দেবতার পা' ছুঁয়ে সব হলফ করেছে, আমাদের জায়গা দেবে। হিন্দু বাড়ির কুকুর বেড়াল, এমন কি মাছিগুলো পর্যন্ত চলল হিন্দুস্থানের দিকে। তারপর—"

"তারপর কি হ'লো অবনী ?" নবীন কামার আর অবনী মণ্ডল দু'জনেই দ্বিতীয় বিড়ি ধরাল।

"তারপর শেয়ালদায় গিয়ে দেখি মানুষের চেয়ে মাছির ভিড় বেশী। ওরে দাদা, হাজার হাজার মাছি এসে ভন্ ভন্ করছে। বৌ-টা মরে গেল ! ইস্টিশনে পড়ে রইল বত্রিশ ঘণ্টা—মানুষ কেউ আসে না, কেবল মাছি আর মাছি। শহর নয় তো কলকাতা, একটা মস্ত বড় নর্দমা।"

মাথা নেড়ে সায় দিল নবীন কামার। তারপর বাকী জীবনটার বর্ণনা দিতে অবনী মণ্ডলের খুব বেশী আর সময় লাগল না। বৌ মরে যাওয়ার পর সে বড্ড একা-একা বোধ করছে। জগৎ সংসারে কোথাও সে একটাও সাচ্চা মানুষ খুঁজে পেল না। দেহের কষ্ট সে কোন রকমে সয়ে গেছে। কিন্তু মনের কষ্ট সে আর সইতে পারছিল না। এমন সময় মুকুদিদির কোলে হামু এসে উপস্থিত। মুকুদিদি, হামু আর বসন্তকে পেয়ে অবনী মণ্ডল এই যেন প্রথম পচা ডোবা থেকে পারে উঠে এল। মাথা তুলে দেখল, জগৎ-সংসারের সবাই নর্দমার মাছি নয়। ভুবণীর আকাশ, বাতাস এবং সূর্যের আলো বগুড়ার সহজ জীবনের আবহাওয়া ফিরিয়ে এনেছে। হলধরের কাছে দিন রাত সে প্রার্থনা করছে, আর যেন কোনদিনও ওকে শহরে সভ্যতার পচা ডোবায় গিয়ে গা

ঢাকা দিতে না হয়। নাসারন্ধ্রের নীচেটা পর্যন্ত পচা জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখার কষ্ট আর সে সইতে পারবে না।

যন্ত্রের বাক্সটা গুছিয়ে দিল অবনী মণ্ডল নিজেই। কাঠকয়লাগুলো একটা ঠোঙার মধ্যে সুতো দিয়ে বাঁধা ছিল ব'লে নবীন কামারের আগুন জ্বালাতে কোন অসুবিধা হ'লো না। হাপরের হাওয়া মেরে মেরে আগুনের তেজ বাড়াতে লাগল সে। ফালটা পুড়তে লাগল। পুরোপুরি লাল হওয়ার পর নবীন কামার তার জাত-ব্যবসার কৃতিত্ব দেখাবে। কৃতিত্ব আসে হাতের কায়দা থেকে, সৃষ্টি আসে মন থেকে। নবীন কামারের হাত আছে, মনও আছে। সে কেবল মিস্ত্রি নয়, শিল্পীও বটে। কিন্তু ইদানিং কেউ আর তার লৌহ শিল্পের প্রতি কদর দেখায় না। তাই সত্যিকারের জাত-ব্যবসা তার উঠে গেছে। ঘোড়ার খুরে নাল বেঁধে আর ফুটো বাসন মেরামত ক'রে নবীন কামার সংসার চালায়, হরেন ডাক্তারকে দু'টাকা ক'রে ভিজিট দেয়।

সুকু এসে দাঁড়াল হলধরের সামনে।

নবীন কামার হাতুড়ি রেখে জোড় হাত ক'রে সুকুকে নমস্কার করল। সুকুর সমাজে জনসংখ্যা বাড়ল। সুলতানপুরের দূরত্ব কমতে লাগল ক্রমে ক্রমে।

পরের দিন ভোরবেলা ভুড়ুৎ ভুড়ুৎ তামাক টানতে টানতে মাঠে এসে উপস্থিত হ'লো ওবাইদ মোল্লা। দূর থেকেই সে দেখতে পেয়েছে অবনী ভাই তার মাঠে লাঙল দিচ্ছে। কল্কের মুখটা ডান হাত দিয়ে চেপে ধ'রে সে ছুটতে লাগল উর্ধ্বশ্বাসে।

"কি ভাই অবনী, ব্যাপার কি? কোথা থেকে কি হ'লো?" অবনী মণ্ডলের সঙ্গে চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করল ওবাইদ।

"সবই হলধরের দয়া।" লাঙলের চাপে ভূষণ্ডীর বন্ধ্যা মাটি ফেটে পড়ছে দু'দিকে চরচর ক'রে।

ওবাইদ মোল্লা বলল, "তা হ'লে তো দেখছি পাথরের অসাধ্য কিছুই নেই! দেখি, লাঙলটা আমার হাতে একটু দাও। ঠেলা দিয়ে একটু আরাম ক'রে দেখি। এই নাও হুঁকোটা ধর।"

অবনী মণ্ডল হুঁকোতে টান মারল। ওবাইদ মোল্লা গরুর লেজের নীচে খোঁচা মেরে বলল, "হেট্, হেট্।"

মোল্লা-মণ্ডলের মনেও আজ হলধর নিজেই বোধহয় আনন্দের লাঙল চালাচ্ছে!

এক চক্কর ঘুরে এসে ওবাইদ মোল্লা লাঙলটা ছেড়ে দিল অবনী মণ্ডলের হাতে। বলল, "তোমার জমি তুমি চাষ কর।"

হুঁকো টানতে টানতে ওবাইদ মোল্লা অবনীর পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। অবনীকে সঙ্গ দিচ্ছে সে।

হঠাৎ থেমে গেল ওবাইদ মোল্লা, "দাঁড়াও একটু অবনী ভাই।"

"কেন?"

"আমায় একটু পাথরের কাছে নিয়ে চল।"

"পাথর নয়, হলধর।"

"হ্যাঁ, হলধর। তাঁর কাছে আমি তোমার মতো উপুড় হ'য়ে প'ড়ে থাকতে চাই।"

"কেন ভাই ওবাইদ মোল্লা?"

"বিবির জন্তে একটা বাচ্চা চেয়ে নেব। হামুর মতো ডাগর-ডোগর সাহেবী বাচ্চা না হলেও চলবে। যেমন তেমন টুকরো টাকরা মানুষের বাচ্চা হ'লেই মেহের বিবির আর কোন দুঃখ থাকবে না।"

"ওবাইদ ভাই, দুঃখ দুনিয়া থেকে উঠবে না। মানুষ থাকলে তার দুঃখও থাকবে। তবে হ্যাঁ, ঘরে একটা বাচ্চা না থাকলে চাষী-গেরস্থের কেবল লাঙল ঠেলাই সার। কিন্তু হলধর তো লাঙলের দেবতা?"

হুঁকোটা অবনী মণ্ডলের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে ওবাইদ মোল্লা ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল পশ্চিম দিকে। এখনো হামুর সঙ্গে তার দেখা হয় নি। দুকু দিদির সঙ্গে দু'দণ্ড গল্প করলেও মনটা জুড়ায়। বসন্তই বা কি করছে? লাউ-কুমড়োর গাছগুলোতে ঠিক মত জল দিয়েছে তো? কিছুক্ষণ হাঁটবার পর ওবাইদ মোল্লার মনে হ'লো, ভূষণ্ডীর সংসারটা দুকুদিদি বেশ সাজিয়েগুছিয়ে তুলেছে। প্রথম দিনটাতে সব কিছুরই অভাব ছিল। কিন্তু ক'দিনের মধ্যে

অভাবের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। অভাবের কথা নিয়ে চিন্তা না করলে বোধহয় অভাবের বোঝা অনেক কমে যায়, ভাবল ওবাইদ মোল্লা। তবুও ভাবনার তার শেষ নেই। হামুকে দিয়ে মেহের বিবি কি তার নিজের অভাবটা ঘোচাতে পারবে না? কিন্তু দুধের স্বাদ তো ঘোল দিয়ে মেটানো যায় না! ভূষণ্ডীর পাথর ভাঙা ফাল জোড়া দিতে পারে, পারে না দিতে মেহের বিবির কোলে একটা ব্যাটা তুলে দিতে। সমস্ত দুনিয়াটা যেন ওবাইদ মোল্লার সামনে একটা মস্ত বড় পাথরে রূপান্তরিত হয়ে গেল! ওবাইদ মোল্লা এসে দাঁড়াল ঘরের সামনে। তাকে দেখেই বোধহয় হামু হাত-পা ছুঁড়তে লাগল তার কোলে উঠবার জন্যে। মুহূর্তের মধ্যে পাথরটা যেন গ'লে গ'লে গড়িয়ে পড়তে লাগল ভূষণ্ডীর পোড়া মাটিতে। ওবাইদ মোল্লা হাত বাড়িয়ে হামুকে তুলে নিল কোলে।

তৃতীয় ভাগ

মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে আমি কুইনসপার্কের বাড়িতেই উঠলাম। উঠিয়ে দিল বিনয়প্রকাশ। সে আগে থেকেই মিটিং ক'রে পার্টির অনুমোদন নিয়ে রেখেছিল। বিনয়প্রকাশ ঠিক ক'রে রেখেছিল যে, রমলা আর শীলাও আমার সঙ্গে থাকবে, থাকবে রুক্মিণীও।

তিন তলার ঘরখানাতে আমার ঘুমোবার জায়গা করা হয়েছে। যে খাটখানায় মা আর অনীতা ঘুমোত, সেই খাটখানাই আছে। নতুন ক'রে কোন আসবাব আর আনা হয় নি। আমাদের আদর্শবাদের মধ্যে পশ্চাৎ-অস্বীকৃতি অতি স্বাভাবিক সঙ্কল্প। তাই গোটা পশ্চাৎটাই আমরা প্রতিক্রিয়াশীলতার পুনরাবৃত্তি ব'লে মনে করি। করি এই জন্যে যে, প্রতিক্রিয়াশীলতার মধ্যে প্রগতি নেই। গতির সঙ্গে প্রগতির বন্ধন অচ্ছেদ্য এবং গতি-ই হচ্ছে ডায়লেকটিক। ডায়লেকটিকসের 'সত্যই' হ'লো আমাদের জীবনদর্শন।

অনীতা আর মায়ের ব্যবহৃত ভাঙ্গাচোরা আসবাবগুলো চোখে পড়তেই প্রগতির মুখে বাধা পড়ল। পরের মুহূর্তটা যেন আর সামনের দিকে চলতে চায় না, আমায় ঠেলতে লাগল পিছন দিকে। প্রতিটি পরের মুহূর্তের বুকে রয়েছে উন্নতির আবেগ, অথচ আমি খুঁজতে লাগলুম ক্ষয়ে-যাওয়া পশ্চাতের পরিত্যক্ত স্মৃতি! মনে হ'লো, মা বুঝি ফলের রসের গেলাস হাতে নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। বিদেশ-প্রত্যাগত সন্তানের জন্যে মায়ের মমতা বোধহয় ফলের রসের চেয়েও সরস হয়ে উঠেছে। গেলাসটা আমার হাতে তুলে দিয়ে তিনি হাত বুলোতে লাগলেন আমার সারা গায়ে। তাঁর হাতের ছোঁয়ায় আমার জীবনদর্শনের উত্তাপ যেন ক্রমশই ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল। মনে হ'লো মা বোধহয় আমায় ডাকলেন, "খোকা—" বাঙালী-মায়ের চোখে

তাঁর সন্তানরা কোনদিনও সাবালক হয়ে উঠতে পারে না। সন্তানের 'খোকাত্ব' ঘোচে না সারা জীবনেও। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি ঘামতে লাগলুম। উত্তাপ কমে যাচ্ছে। অনীতা যেন কোথা থেকে ছুটে এসে আমার হাতে একটা বড় তোয়ালে তুলে দিয়ে বলল, "দাদা, মুখটা মুছে ফেল।" বুর্জোয়া-আবহাওয়া উপভোগ করতে গেলে ইতিহাসের গতি যাবে বন্ধ হয়ে মনে ক'রেই, আমি যেন ধমকে উঠলুম, "স্বর্গে গেলেও ঢেঁকি তার অভ্যাস ছাড়তে পারে না, আর তোরাও—"

পেছন থেকে কে যেন বলল, "কি দেখছেন?"

বাধ্য হয়েই চাইতে হ'লো পেছন দিকে। দেখলুম, মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে রুক্মিণী।

জিজ্ঞাসা করলুম, "কেমন আছ রুক্মিণী?"

"ভাল আছি। আপনি ভাল আছেন তো?" রুক্মিণীর কণ্ঠে আত্মীয়তার সুর। রুক্মিণী কাছে আসছে। আসছে অনিবার্যভাবেই। আমি পরিষ্কার দেখতে পেলুম, রুক্মিণীর চোখে মুখে রয়েছে গভীর প্রতীক্ষা। এ প্রতীক্ষা আমারই জন্যে।

একটু পরে রুক্মিণীকে নিয়ে চ'লে এলুম দু'তলার খাবারঘরে। টেবিলে অনেক রকমের খাবার সাজানো রয়েছে। রুক্মিণী বলল, "নির্ভয়ে খেতে পারেন, সব খাবারই পরীক্ষা করা হয়েছে।"

"কে পরীক্ষা করল, তুমি?"

"না, সরকারী পরীক্ষক।"

"তুমি করলেও আমার কোন আপত্তি হ'তো না রুক্মিণী।"

"আপনার ব্যক্তিগত আগ্রহ কিংবা আপত্তির জন্যে আইন তৈরী হয় নি। আইন তৈরি করেছে পার্টি। তৈরি করা প্রয়োজন ছিল ব'লেই করেছে।"

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললুম, "এর চেয়ে সত্যি কথা আমিও বলতে পারতুম না। তুমি ঠিক বলেছ রুক্মিণী। আমাদের বিশ্বরাষ্ট্রে বাস করার সবচেয়ে বড় সুবিধে হচ্ছে যে, আইন-কানুনের ঝকমারি নিয়ে মানুষকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। তাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের কর্তৃত্বও

থাকবে পার্টির হাতে। অনাবশ্যক সময় নষ্ট করতে হবে না একটা মানুষেরও।"

দুধের পাত্রটা হাতে নিয়ে রুক্মিণী জিজ্ঞাসা করল, "আর একটু দুধ দেব? এত কড়া চা খেলে লিভার খারাপ হবে।" রুক্মিণী আমার চায়ের পেয়ালায় দুধ ঢালল। ঢালল একটু বেশী ক'রেই। তারপর সে বলল, "পার্টির হাতে সবকিছু তুলে দিলেও লিভারটা বোধহয় বাঁচিয়ে চলার দায়িত্ব আপনারই। আপনার দেহ-রক্ষী কমরেড ঘোষের কাছে শুনলুম, সন্ধ্যের পর হুইস্কী না খেলে আপনার নাকি ঘুমের ব্যাঘাত হয়। কমরেড ঘোষকে আমি সতর্ক ক'রে দিয়েছি। এখন থেকে সে কেবল দেহ-রক্ষী নয়, আপনার লিভার-রক্ষীও হ'লো।"

"তোমার কথা আমি শুনব কেন?"

"না শোনেন, পার্টি থেকে আইন পাস করিয়ে নিয়ে আসব।" একটু থেমে রুক্মিণীই আবার বলল, "মানুষ বোধহয় তার ব্যক্তিগত জীবনের সাম্রাজ্যে খানিকটা স্বাধীনতা রাখতে চায়। সবটুকু পার্টির হাতে তুলে দিলে মানুষের মনের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। ব্যক্তিস্বাধীনতাকে রক্ষা করবার জন্যে মানুষ চিরদিন যুদ্ধ ক'রে এসেছে। সেই যুদ্ধের ইতিহাসই হচ্ছে সভ্যতার ইতিহাস।—মাছ ভাজাটুকু খেয়ে ফেলুন।"

"মাছভাজা? ও হ্যাঁ মাছভাজা। কিন্তু তুমি তো ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা বলছিলে রুক্মিণী?" এই ব'লে আমি পাইপের মুখে তামাক ভরতে লাগলুম। তারপর তামাকটা ভাল ক'রে ধরিয়ে নিয়ে বললুম, "বেশী পিছন দিকে যেতে চাই নে, মাত্র গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস খুলে দেখতে বলছি তোমায়। তথাকথিত স্বাধীন দেশগুলোয় ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক কি ছিল? ব্যক্তির স্বাধীনতা কি রাষ্ট্র তার আইন পরিষদের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে হরণ ক'রে নিচ্ছিল না? গত পঞ্চাশ বছরের আইনগুলো তবে একবার পড়ে দেখো। গোষ্ঠীর সুখসুবিধার দিকে নজর রেখেই রাষ্ট্র ক্রমশ মানুষের স্বাধীনতা নিচ্ছিল কেড়ে। রুক্মিণী, আমরাও ওদের আদর্শ মেনে নিয়েছি। ব্যক্তিস্বাধীনতা আমরাও কেড়ে নিলুম। নিলুম একদিনেই। ক্রমে ক্রমে কেড়ে নিতে গেলে সময় যেত নষ্ট হয়ে।—তুমি চা খেয়েছ রুক্মিণী?"

"খেয়েছি। কিন্তু রাজতন্ত্র তুলে দিয়ে তবে লাভ হ'লো কি? রাজার হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তুলে দিলুম একটা দলের হাতে। দলের হাতের ক্ষমতা আবার টুকরো টুকরো হয়ে পড়িছত হ'লো বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে। দপ্তরগুলোর মধ্যে দিয়ে দলের স্বৈরাচার ব্যক্তির কাছ থেকে কেড়ে নিল তার স্বাধীনতা এবং দায়িত্ববোধ। কমরেড চৌধুরী, কোনো এক বিশেষ রাজার অত্যাচারের চেয়ে দল এবং দপ্তরগুলোর অত্যাচার কি বেশী নয়? আমার মনে হয়, আপনাদের রাজনীতির শেষ বিবর্তন এসে থামবে আপনাদেরই পেছন দিকের দরজায়। হয়তো বা রাজতন্ত্র সেই পেছন দিকের দরজা দিয়ে প্রবেশের পথ খুঁজছে।"

"পেছনে আমাদের দরজা নেই রুক্মিণী, ইস্পাতের প্রাচীর। রাজতন্ত্র সেখানে মাথা ঠুকে মরবে, কিন্তু প্রবেশের পথ পাবে না। আর এক পেয়ালা চা দাও না রুক্মিণী। মাদ্রাজের কফির গন্ধ যেন এখনও যাচ্ছে না।"

টি-পট থেকে রুক্মিণী চা ঢালতে লাগল। চীনামাটির চেয়েও ওর হাতের রং বেশী সাদা। মনে হ'লো, পাটোয়ারবাগানের কলঙ্ক ওর কোথাও দাগ বসাতে পারে নি। টি-পটের নল দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। গরম চায়ের ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে আমি রুক্মিণীর মুখের দিকেই চেয়েছিলাম। হাত-ঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে রুক্মিণী বলল, "আমায় এবার যেতে হচ্ছে। সন্ধ্যের সময় ফিরব।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "কোথায় যাচ্ছ?"

"পড়তে।"

"কি পড়তে?"

"মার্কসবাদ। কিংবা নতুন সভ্যতার স্বরবর্ণও বলা চলে।"

"এখনও কি তোমার স্বরবর্ণ শেখা হয় নি রুক্মিণী?"

"প্রায় হয়ে এসেছে। সময় বেশী লাগবে না। শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে এমন একটা সহজ বৈজ্ঞানিক কৌশল আছে যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও সবকিছু শেখা যায়। বুর্জোয়া পদ্ধতির চেয়ে অনেক ভাল।"

রুক্মিণীকে এগিয়ে দেবার জন্যে ওর সঙ্গে সঙ্গে একতলা পর্যন্ত নেমে এলুম।

আমাকে দেখে লাল প্রহরীরা একটু দূরে সরে গেল। বাড়িটার মধ্যে দু'গজ দূরে দূরে এক একজন ক'রে প্রহরী মোতায়েন করা হয়েছে। রুক্মিণীকে বললুম, "তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির ওপর তোমার খুব বেশী শ্রদ্ধা নেই। বুর্জোয়া দেশের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে গর্ব করারই বা কি ছিল? তিরিশ চল্লিশ বছর আগে, ছাত্রদের চরিত্র গঠন করার কাজই ছিল শিক্ষকদের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু ক্রমে সে-আদর্শ আর রইল না। চরিত্র গঠনের চেয়ে বড় হয়ে উঠল তাদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সুযোগ দেওয়া। ফল দাঁড়াল কি? শিক্ষকরা কঠিন নিয়মানুবর্তিতার পথ দিলেন ছেড়ে। ছাত্রদের প্রশ্রয় দিতে লাগলেন অতিরিক্তভাবে। রুক্মিণী, আমরা সেই বুর্জোয়া সমাজের পুরনো পদ্ধতিটাই পুনরুজ্জীবিত করেছি মাত্র। কঠিন নিয়মানুবর্তিতার পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা শিক্ষণীয় বিষয়গুলোর ওপর এনেছি কেবল লৌহ-নিয়ন্ত্রণ। অনাবশ্যক সময় নষ্ট করবার সুযোগ আমরা কাউকেই দিতে চাই না। ব্যক্তি-স্বাধীনতার অজুহাতে রাষ্ট্রকে দুর্বল করার অর্থ কি? রাষ্ট্র সবল থাকলে মানুষের সবলতা অপরিহার্য।"

"সেই সব সবল মানুষ দিয়ে আপনাদের কলকারখানা কিংবা কৃষিকাজ চলবে কিন্তু সভ্যতা চলবে না। শিল্প, সাহিত্য কিংবা কাব্যের জন্যে চাই ব্যক্তি-মন, অভিজ্ঞ অনুভূতি আর—"

"আর বোধহয় বস্তু-উত্তীর্ণ এক লোকত্তরীত গোলকে যাওয়ার স্বাধীনতা, কেমন? রুক্মিণী, বস্তুর নিজস্ব ডায়লেটিক যেদিন তুমি বুঝতে পারবে সেদিন তোমার কাছে কোন কিছুই আর অস্পষ্ট থাকবে না। মন স্বাধীন নয়। কারণ বস্তুর প্রতিবিম্ব থেকেই মন তার আসল সত্তা খুঁজে পেয়েছে। শিল্প, সাহিত্য এবং কাব্য ইত্যাদি সবই বস্তুর ডায়লেটিকসের সঙ্গে বাঁধা। এরা ডায়লেটিক্যাল জড়বাদের আদেশ মেনে চলবে।"

"একেবারে উল্টো বিশ্লেষণ দীপক বাবু!"

"একেবারে নূতন সভ্যতা রুক্মিণী দেবী!"

"কি জানি—"রুক্মিণী মাথা নীচু ক'রে ভাবতে লাগল। তারপর সে বলল, "কি জানি, মনে হচ্ছে মার্কসবাদের খণ্ড সত্যকে আপনারা আরও খণ্ডাকার

ক'রে নিয়েছেন। বোধহয় কোন আদর্শবাদই সম্বন্ধের ব্যবধানে নির্ভেজাল থাকে না। কমরেড চৌধুরী—"রুক্মিণী হঠাৎ থেমে গেল।

বিনয়প্রকাশ একটা ফাইল হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াল আমাদের সামনে। সঙ্গে এসেছে রমেন বটব্যাল, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগের কমিশার। রুক্মিণী তার হাতের বইগুলোকে বুকের ওপর চেপে ধ'রে ধীরে ধীরে হেঁটে চলে গেল বাইরের ফটক দিয়ে।

আমরা এসে বসলুম খাবারঘরে। অনেক দিন পরে রমেন বটব্যালকে দেখলুম আমি। আমরাই একদিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম যে, রমেনকে আমরা ভারতবর্ষের গোর্কী তৈরি করব। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "নতুন কিছু বই-টই লিখলে নাকি রমেন?" "বই?" রমেন যেন ফিরে এল অন্য এক জগৎ থেকে, "পুরনো বই যা ছিল ধাপার মাঠে সব জ্বলছে। গতকাল থেকে ধাপায় আমরা আগুন জ্বালিয়েছি। বুর্জোয়া সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে নিজের লেখা বইগুলোও সব পুড়ছে।"

টি-পটের গায়ে হাত দিয়ে দেখলুম সেটা ঠাণ্ডা। দেহরক্ষী কমরেড লতিফ একটু দূরেই দাঁড়িয়েছিল। তাকে বললুম গরম চা নিয়ে আসতে। "কমরেড কমিশারদের বোধহয় চা খাওয়া হয়নি?" বিনয়প্রকাশ বলল, "হয়েছে। আরও এক পেয়ালা খেতে অবশ্য আপত্তি নেই।" এই ব'লে বিনয়প্রকাশ তার ফাইল খুলল। ফাইলের মধ্যেই চোখ রেখে সে বলল, "তিনজন রাষ্ট্রদূত আজ দর্শনপ্রার্থী। ইংরেজ আর মার্কিন রাষ্ট্রদূতদের সময় দেওয়া হয়েছে পনর মিনিট ক'রে। বর্মার রাষ্ট্রদূতকে সময় দিয়েছি এক ঘণ্টা। কমরেড চৌধুরী, আপনার আলোচনার বিষয় হ'লো পররাষ্ট্র নীতি।"

এই সময় গরম চা এল। বিনয়প্রকাশ তার নিজের পেয়ালাটা সামনের দিকে টেনে নিয়ে বলল, "পার্টি-মিটিং-এ কাল পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা হয়েছে। ইংরেজ আর মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কাছে আপনাকে বলতে হবে যে আমরা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে বন্ধুভাবেই বাস করতে চাই। কারণ শত্রুতা করবার মধ্যে ঐতিহাসিক অনিবার্যতা যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ আমরা শত্রুতা করতে পারি না। তা ছাড়া ইংরেজ আর মার্কিনদেশের সঙ্গে

আরও কিছুদিন আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হবে। কমরেড চৌধুরী, মার্কিন মুল্লুক থেকে কোটিখানেক বস্তা গম আনা যায় কি ?"

"যায়, যদি আমাদের অর্থবিজ্ঞানের মধ্যে মার্কিনী গমের ঐতিহাসিক অনিবার্যতা থাকে। কিন্তু, এত তাড়াতাড়ি গমের অভাব ঘটল কেন কমরেড ?"

"মনে হচ্ছে, কৃষকেরা পার্টির কাছে জমির স্বত্ব ছেড়ে দিতে চায় না। সমবায় পদ্ধতি ওরা স্বীকার করছে না।"

"যারা কৃষি-সমবায়ে এসে শ্রমিক হতে চায় না, তাদের ঘরে রেখে এল মন্বন্তরের মহারোগ। অনটন ও উদ্বৃত্তের মধ্যে সমন্বয় আনবে মন্বন্তর! কমরেড, বিশ্বের নিজের স্বভাবের মধ্যেই রয়েছে বিরুদ্ধ পরিস্থিতির সংঘর্ষ, আমরা তার জন্যে দায়ী নই।"

"নিশ্চয়ই না।" সম্মতি জানাল বিনয়প্রকাশ। তারপর বিনয়প্রকাশই আবার বলল, "বর্মার রাষ্ট্রদূত একজন বৌদ্ধ। আর বুদ্ধ ছিলেন ভারতবর্ষেরই সন্তান। অতএব বর্মার সঙ্গে যে আমাদের কৃষ্টির সম্পর্ক রয়েছে সেই কথাটা দু'চারবার স্পষ্ট ক'রে উচ্চারণ করতে পারলেই বৌদ্ধ রাষ্ট্রদূতের চোখে রাজনীতির প্যাগোডা আর ধরা পড়বে না। পার্টির বিশ্বাস নির্ভুল। আপনি দপ্তরে আসছেন কখন কমরেড চৌধুরী ?"

"এক ঘণ্টার মধ্যেই।"

"তা হ'লে অন্য সব কাজের কথা দপ্তরে বসেই হবে।" বিনপ্রকাশ উঠল।

রমেন বটব্যাল বলল, "কমরেড চৌধুরী, হরিঘোষের গোয়াল সাফ করতে আরও তিন চারদিন হয়তো লাগবে। 'দেহি পদ পল্লব মুদারমের' বুর্জোয়া বদবু পর্যন্ত লোপ না করতে পারলে গণসাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না। ধাপার মাঠে তাই আমরা আগুন জ্বালিয়েছি।"

"জ্বালিয়েছ বটে কিন্তু এখান থেকে তো ধাপার আগুন দেখা যাচ্ছে না রমেন ? তবে কি আলেকজান্দ্রিয়ার আগুনের চেয়ে ধাপার আগুন বড় নয় ?" রমেন আমার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগেই বিনয়প্রকাশ বলল, "আমরা

বুর্জোয়া সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ করেছি গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে। তিন চারদিনের মধ্যেই কমরেড বটব্যাল একটা সভা ডাকবেন। আমাদের আদর্শ মেনে নিয়ে তাঁরা যদি গণসাহিত্য সৃষ্টি করতে চান, তবে আমরা তাঁদের কালিকলম ব্যবহার করবার সুযোগ দিতে চাই। কমরেড চৌধুরী, সেই সভার সভাপতির কাজ আপনিই করবেন।"

ওরা দু'জন কখন যে চলে গেছে আমি তা টের পাই নি। খাবার ঘরেই বসেছিলাম। আমি বোধহয় আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ছুটতে ছুটতে ভারতবর্ষের দিকেই আসছিলাম। রাস্তায় দূরত্ব খুব বেশী নয়, কিন্তু অনেকগুলো শতাব্দী পার হয়ে আমায় আসতে হ'ল ধাপার মাঠে। বুর্জোয়া সাহিত্য পুড়ছে! আলেকজান্দ্রিয়ার বিজ্ঞজনদের কান্নার সুর আমি শুনেছি। ধাপার মাঠে এসে শুনতে পেলুম, কান্নার সুর গেল বদলে! চণ্ডীদাস থেকে সুকান্ত পর্যন্ত বিভিন্ন সুর, বিভিন্ন বক্তব্য, কিন্তু অর্কেষ্ট্রা সেই একই। বাংলার অর্কেষ্ট্রা। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বিরাটত্বের চেয়েও বড় আমাদের এই কবিকণ্ঠের কাব্য-কীর্তন। আমরা ভারতবর্ষের যে-কোন একটি প্রদেশ নই, আমরা যে-কোন ভারতবর্ষের বিশেষ একটি প্রদেশ। আমরা বাঙালী—আমাদের চটকল নেই। নেই আমাদের বসন-বাসন। কিন্তু আমাদের অর্কেষ্ট্রা আছে। আমরা জাত নই, জাতি। কোন জাতিরই সবকিছু থাকে না। আমাদেরও নেই। নেই আমাদের টাকা। কিন্তু অর্কেষ্ট্রার ঐতিহ্য আছে। আমাদের ঐতিহ্য-বলাকার গায়ে কাঁচা মাটির গন্ধ, 'বদবু' নয়। মাটির গন্ধ নিয়ে আমাদের ঐতিহ্য-বলাকা উড়েছে দীপ্তিমান আকাশের দিকে। ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা সে উত্তীর্ণ হয়েছে। আমাদের রবীন্দ্র-পূর্ব যুগ আছে, আছে রবীন্দ্রোত্তর যুগও। সবগুলো যুগই বাঁধা আছে বাংলার অর্কেষ্ট্রায়। টাকা আমাদের নেই। চটকল থেকে আমরা কেবল টাকা নিয়ে যেতে দিই নি, আমরা দিয়েছি মা-বোন-স্ত্রী-পুত্রের দেহ থেকে বালতি বালতি রক্ত। শাসন ও শোষণের মধ্যে আছে বদবু, কিন্তু বাংলার রক্তে বদবু নেই। তাই বাংলার ব্লাড-ব্যাঙ্ক ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক। বাংলার বড়বাজার ভারতবর্ষের সেরা বাজার। সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগের কমিশার বাংলার ইতিহাস জানে না।

সামনেই দাঁড়িয়েছিল শীলা। সে জিজ্ঞাসা করল, "বিড় বিড় ক'রে নিজের মনে কি বলছিলে দীপুদা ?"

"কই, কিছু না তো !"

"নিশ্চয়ই বলছিলে। তোমার ঠোঁট নড়ছিল কেন ?"

"তা হ'লে আমার মধ্যে দিয়ে অন্য কেউ বোধহয় কথা কইছিল—বোধহয় স্রুকু, কিংবা অনীতাও হ'তে পারে।"

"অনীতাদির হওয়াই সম্ভব।"

"কেন রে ?"

"দিদি বলেছে যে, তোমার মনের খানিকটা অংশ চিরকাল দিদির মধ্যেই থাকবে। দিদিকে তুমি কোনদিনও ত্যাগ করতে পারবে না দীপুদা।"

"কি বললি, কি বললি শীলা ?—না, না থাক। কিছুই আর তোকে বলতে হবে না।" শীলাকে কাছে টেনে নিয়ে পুনরায় বললুম, "তোর স্রুকুদিও বোধহয় আমার মনের মধ্যে দিয়ে কথা কয়।"

"তুমি বড্ড ঘেমে উঠেছ দীপুদা। পাখাটা জোরে চালিয়ে দিই ?"

"না, থাক। চল্ এবার যাই। হ্যাঁরে শীলা, বাড়িঘর সব পছন্দ হয়েছে তোদের ?"

বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শীলা নীচু গলায় মন্তব্য করল, "পাহারাওয়ালা গুলো না থাকলে হয়তো পছন্দই হ'তো দীপুদা।"

•

দু'টো দিন কেটে গেল ছোট-বড় সভা-সমিতির কাজ নিয়ে। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত থেকে সুরু ক'রে পাড়াগাঁয়ের পার্টি-সেক্রেটারী পর্যন্ত বহুলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎও করতে হ'ল। পাড়াগাঁয়ের পার্টি-সেক্রেটারীরা প্রায় সবাই কৃষক-সম্প্রদায়ের লোক। প্রত্যেকের হাতেই বিনয়প্রকাশের সই করা প্রবেশপত্র রয়েছে। এরা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি যে, গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের করিডোর দিয়ে কোন দিন তারা বুক ফুলিয়ে হাঁটতে পারবে। ওরা জানে, পুরনো আমলের রাজভবন ছিল রূপকথার চেয়েও অসত্য। আজ এরাই এসেছে

ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় নেতার কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে। গত দু'দিন থেকে আমি সব নতুন মানুষ দেখছিলাম, দেখছিলাম মাটির মানুষ। এমন নির্ভেজাল কাঁচামালের প্রচুর সংস্থান থাকতেও বুর্জোয়া ভারতবর্ষ রাষ্ট্র গড়তে পারে নি! বিড়লা পার্ক আর বড়বাজারের চর্বি দিয়ে যে রাষ্ট্র গড়া যায় না, তার প্রমাণ রেখে গেল বুর্জোয়া ভারতের শেষ ইতিহাস।

কাজ শেষ ক'রে কুইনসপার্কে ফিরে আসতে রাত গভীর হয়ে যায়। রমলা আর শীলার সঙ্গে দেখা হয় না, ওরা ঘুমিয়ে পড়ে। রুক্মিণী জেগে ব'সে থাকে আমারই জন্যে। দু'তলায় যে-ঘরটায় অনীতা থাকত সেই ঘরটাতে এখন রুক্মিণী থাকে। নীচে গাড়ির শব্দ পেলেই রুক্মিণী এসে দাঁড়ায় একতলার বারান্দায়। একতলা থেকে দু'তলার খাবারঘর পর্যন্ত সে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসে। খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সঙ্গ দেয় রুক্মিণী।

রুক্মিণী আজ বলল, "আমার খুব ইচ্ছে করে, আপনার খাবার আমি নিজের হাতে তৈরি করি। কিন্তু রান্নাঘরের কাছে সরকারী লোকেরা আমায় যেতে দেয় না।"

"কেন ?"

"বোধহয় আমায় ওরা বিশ্বাস করে না।"

"খানিকটা বিশ্বাস নিশ্চয়ই করে। নইলে, ভারতবর্ষের সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষটার এত কাছে তুমি আসতে পারতে না রুক্মিণী। তোমরাই ছিলে আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু—তুমিই এসেছ আজ সবচেয়ে কাছে। কেন এলে ?"

"কঠিনতম মানুষটার দুর্বলতম মুহূর্তগুলো কেড়ে নেবার জন্যে। নেহাত অপ্রয়োজনে তুমি যা ফেলে দেবে, সেই উচ্ছিষ্টটুকু সযত্নে তুলে নেব আমি। নইলে বেঁচে থাকব কেন ?"

মুহূর্ত কয়েকের জন্যে আমি চুপ ক'রে বসে থাকতে বাধ্য হলুম। অতি অল্প সময়ের মধ্যে রুক্মিণী যেন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে আমার জীবনদর্শনের মহাসত্য প্রমাণ করবার জন্যে একেবারে উল্টো দিকে, এন্টিথিসিসের মত। এখন থেকেই বুঝি অপেক্ষা ক'রে বসে থাকতে হবে সেই পরম মুহূর্তটির জন্যে

তখন ঘটবে বৈপরীত্যের সমন্বয়। সমন্বয় থেকে আসবে প্রগতি, আসবে অনিবার্য আনন্দই। ঠেলে দিলেও রুক্মিণীকে ফেলে দেওয়া যাবে না। একটু পরে আমি বললুম, "বেঁচে থাকবার জন্যে উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে বেড়াবে কেন? নতুন সাম্রাজ্যের বৈষয়িক বিরাটত্ব তোমায় মুগ্ধ করে না রুক্মিণী?"

"না। তোমার দুর্বল মুহূর্তের উচ্ছিষ্ট-পরমাণু জড়জগতের বিরাটত্বের চেয়েও বড়। চল, রাত অনেক হয়েছে, উঠে পড়ি। আবার কাল সকাল থেকেই তো কাজের চাকা ঘুরতে থাকবে।"

"ঘোরাব আমিই।"

"ঘুরবে তুমিও। চাকার সঙ্গে গোটা সাম্রাজ্যটাই তো বাঁধা রয়েছে। জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে এ-চাকা এক মুহূর্তের জন্যেও থামবে না।"

রুক্মিণী দু'তলার সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে রইল। পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আমি উঠতে লাগলুম তিন তলায়। দূরত্ব খুবই সামান্য, কিন্তু জীবনের নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলো দু-তলা তিন-তলার দূরত্বের মধ্যে নিয়ে এল দীর্ঘতম ব্যবধান।

পরের দিন রমেন বটব্যাল সভা আহ্বান করল গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের বড় ডাইনিং-রুমে। আমাকেই সে সভাপতি করেছে। বুর্জোয়া সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ করা হয়েছে। তাঁদের অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে আসছি আমরাই। তাঁদের সুযোগ দিচ্ছি আমাদের আদর্শবাদ মেনে নেওয়ার জন্যে। নতুন সভ্যতায় সৃষ্টি হবে নতুন সাহিত্য। সৃষ্টি করাব আমরাই, করাব এঁদের দিয়েই। পচনশীল বুর্জোয়া সাহিত্যের দুর্গন্ধ থেকে এঁদের মুক্তির পথ খুঁজে দিয়েছে পার্টি। ধাপার মাঠের আগুন তাই আজও নেবে নি, বুর্জোয়া সাহিত্য পুড়ছে।

সন্ধ্যের সময় বেরুবার আগে শীলা দাঁড়িয়েছিল সামনেই। ওকে বললুম, "আজ আর রাত্তিরে হয়তো ফিরবই না। তোরা কেউ যেন অপেক্ষা করিস নে আমার জন্যে।"

"আজ আমি ব'সে থাকব দীপুদা", গলা-বন্ধ কোটটা আমার হাতে দিয়ে শীলাই বলল, "তোমার সঙ্গে-সঙ্গে আমিও রাত জাগব।"

"সমস্ত রাত কি করবি ?"

রমলা এল ঘরে, বলল, "প্রার্থনা করব। প্রার্থনা করব, ধাপার আগুনে তুমি নিজেও যেন না পুড়ে মর দীপুদা।"

"ধাপার আগুনের খবর তোরাও রাখিস না কি ? কিন্তু প্রার্থনা দিয়ে তো আগুন নেবান যায় না রমলা ?"

"যায় দীপুদা। প্রার্থনা ছাড়া মানুষ করবেই বা কি ? শেষ পর্যন্ত মানুষ প্রার্থনাই করে। করে এইজন্যে যে, তা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।"

"কেন, আমাদের দমকলগুলো কোথায় গেল ?"

"তোমার মনের আগুন নেবাতে পারবে না ব'লেই তারা বোধহয় আসে নি দীপুদা।"

সময় হয়ে গেছে ব'লে আমি আর তর্ক করার প্রয়োজন বোধ করলুম না। চলে এলুম ঘরের বাইরে। ডান দিকে চেয়ে দেখলুম, খোলা ছাদের ওপর হাঁটু ভেঙে বসে পড়েছে শীলা। শীলা প্রার্থনা করছে। জগদ্ধাত্রীর তালাবন্ধ ঘরখানা শীলার কাছ থেকে খুব দূরে নয়।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলুম। দু'দিকে লালপ্রহরীরা সব সজাগ ও সতর্কভাবে পাহারা দিচ্ছে। মাইনে আর মাগ্‌গী ভাতার রেট বাড়াবার জন্যে এরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এখানে খৈনী খাচ্ছে না। এরা পাহারা দিচ্ছে। গণরাষ্ট্রের মালিক তো ওরাই। সুখ-সুবিধের রেট বাড়াবার কলকাঠি এদেরই হাতে। আমরা তাই ধর্মঘট ও মাইনে বাড়াবার যাবতীয় মিটিং-আন্দোলন বে-আইনী ব'লে ঘোষণা করেছি। কাজ করতে হবে। আট ঘণ্টার জায়গায় বারো ঘণ্টা কাজ না করলে গণরাষ্ট্রের উন্নতি হবে কি ক'রে ? বিশ-ত্রিশ বছর পর্যন্ত মাইনে বাড়াবার সুবিধে থাকবে না তা এরা জানে। না জানলে এরা বেশী মাইনের জন্যে হাঁ ক'রে বসে থাকত, আন্দোলন ক'রে সময় নষ্ট করত। অর্থনীতি বিভাগের কমিশার কমরেড রাও তাই ঘোষণা করেছেন যে, আমাদের রাষ্ট্রে ধর্মঘট থাকবে না, উপোস-প্রতিবাদ থাকবে না। কেন থাকবে ? রাষ্ট্র তো আমাদেরই। আমরাই মালিক। নিজের বিরুদ্ধে কে কবে কোথায় আন্দোলন করেছে ? প্লেটোর রিপাবলিকেও প্রতিবাদ আছে, কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রে থাকবে

না। জানি, বিশ-ত্রিশটা বছর একটু কষ্ট হবে, মাইনে বাড়ানো চলবে না। পুঁজিবাদী অর্থনীতি ভাঙবার জন্যে বারোয় জায়গায় যোল ঘণ্টাও কাজ করতে হবে। হবেই করতে। টোটালিটারিয়ান অর্থনীতির মধ্যে টোটাল মানুষটাকে না পেলে ত্রিশ বছর পরেই বা মাইনে বাড়বে কি ক'রে? হরপ্পা থেকে নেহেরু পর্যন্ত যদি অপেক্ষা করতে পেরে থাকো, তবে মাত্র আর ত্রিশটা বছর অপেক্ষা করবে না কেন? এই শতাব্দী পৃথিবীর প্রথম শতাব্দী নয়। তার আগেও শতাব্দী ছিল। ভারতবর্ষে পণ্ডিতের অভাব কোনদিনই হয় নি। ভুখা-তপস্যার মন্ত্রমুগ্ধ ভারতবাসী আজকের মত সেদিনও চেয়েছিল পণ্ডিতের দিকে। অপেক্ষা ওরা করেছে, অপেক্ষা ওরা করতে জানে। তোমরা লক্ষ লক্ষ বছর নষ্ট করেছ, আমাদের কেন দেবে না ত্রিশটা বছর? মাত্র ত্রিশটা। যে-কোন বাঙালী বাবুর গড়পরতা আয়ুষ্কালের চেয়েও কম!

আমি এলাম তিন-তলার ডাইনিং-রুমে। ঘরের মেজেতে প্রকাণ্ড একটা লাল কার্পেট পাতা রয়েছে। কমিশার রমেন বটব্যাল দরজায় দাঁড়িয়েছিল আমারই অপেক্ষায়। সভাপতির আসন গ্রহণ করার পরে আমি চাইলুম সামনের দিকে। বেশ খানিকটা দূরে বুর্জোয়া সাহিত্যিকরা সব বসেছেন একসঙ্গে, আমাদের উল্টো দিকে। দু'টো আলাদা জগতের অস্তিত্ব বুঝতে আমার এক মুহূর্তও লাগল না। ভেঙে-পড়া সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মত বুর্জোয়া সাহিত্যিকরা সব বসেছিলেন মাথা নীচু ক'রে। ওঁরা পরাজিত, ওঁরা ভগ্ন। ওঁরা নাগরিক, আমরা কমরেড।

কমিশার রমেন বটব্যাল বলতে আরম্ভ করল, "কমরেডগণ ও প্রাক্তন ভারতবর্ষের নাগরিক সাহিত্যিকগণ,—

"সভ্যতা-সুন্দরীর অঙ্গ থেকে আমরা নীলশাড়ি খুলে নিয়েছি। এ যাবৎকাল বাংলায় 'আঙিনা' দিয়ে কেবল নীলশাড়িই যাওয়া-আসা করত। লালের বাহার ছিল না। এবার থেকে আমরা আর কোন প্রাদেশিক আঙিনা রাখলুম না। ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করলুম। লালের ঐতিহ্য বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট থেকে বিশ্বরাষ্ট্রের পিপলস্ পাবলিশিং হাউস পর্যন্ত বিস্তৃত। অতএব নতুন সাহিত্যের পটভূমিকা বিরাট। এই নির্দিষ্ট পটভূমিকাটিকে কেন্দ্র ক'রে এবার আমরা

সত্যিকার গণসাহিত্য সৃষ্টি করব। সাহিত্য বলতে গণসাহিত্য ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না।"

কথা-শিল্পী নাগরিক রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় একটু নড়েচড়ে বসলেন। শরীরটা তাঁর আজ ভাল ছিল না। দীর্ঘ দিন ধ'রে অভাব, উদ্বৃত্ত এবং আবার অভাবের যাতনায় তিনি ভুগেছেন। তাঁর পাশেই বসেছিলেন কথা-শিল্পী-নাগরিক নীলকণ্ঠ বাগচি। ভীষণ-বিক্রি উপন্যাসের সংখ্যা তাঁর অনেক। তাঁদের দিকে চেয়েই রমেন বটব্যাল সুর চড়িয়ে বলতে লাগল, "কালি এবং কাগজের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ছিল না ব'লে বুর্জোয়া সাহিত্যিকরা হাল্কা সৌখিনতাকে জীবনের সত্য ব'লে প্রচার ক'রে এসেছেন। এবার আমরা সাহিত্যের ছক তৈরি করেছি, যে-ছকের মধ্যে থাকবে কেবল গণসাহিত্যের ভবিষ্যৎ। থাকবে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের প্রগতি। সাহিত্যিকদের সবচেয়ে সার্থক সৃষ্টি হবে তখনই যখন তাঁরা গোষ্ঠী জীবনের মধ্যে সাংসারিক উন্নতির প্রেরণা আনতে পারবেন। জড়বাদের বাইরে মানুষের প্রেরণার কোন উৎস থাকতেই পারে না। প্রাক্তন কথাশিল্পীদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো আমাদের সঙ্গে একমত হ'তে পারবেন না। তাতে অবশ্য আমাদের কোন অসুবিধে হবে না। কারণ, তাঁদের উপন্যাস কিংবা কবিতা ছাপবার সুবিধে আর ভারতবর্ষে রইল না। যাবতীয় ছাপা সংক্রান্ত ব্যাপার রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। হবে কাল সকাল থেকেই।— নাগরিক বন্দ্যোপাধ্যায় মাথা নীচু ক'রে ব'সে আছেন কেন?"

"এন্‌জিনা পেক্‌টরিস।" এই ব'লে নাগরিক বাগচি মশাই রাজীব বাবুর পিঠের দিকে ডান হাত দিয়ে চাপ দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত দিয়ে মুখটা উপর দিকে তুলে ধ'রে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে, কি হ'ল? রক্তের চাপ বাড়ল, না হার্টের কষ্ট হচ্ছে?"

"হার্টের কষ্ট হচ্ছে।" বললেন রাজীব বাবু।

রমেন বটব্যাল ঈষৎ হেসে বলতে লাগল, "আমাদের কমরেড লেখকদের জন্যে আমরা এলগিন রোডের বড় নার্সিং-হোমটা আলাদা ক'রে দিয়েছি। সব খরচের দায়িত্ব নিয়েছে রাষ্ট্র। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের লেখকদের এন্‌জিনা পেক্‌টরিস হবে না তো হবে কি? তবুও কি আপনারা আমাদের নতুন সভ্যতায় বিশ্বাস

স্থাপন করবেন না? রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎই সাহিত্যের ভবিষ্যৎ। মানুষের ভবিষ্যৎও রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেই জন্যেই আমরা পুরো রাসেল স্ট্রীটটা করেছি লেখক-পাড়া। কাউকে ভাড়া দিতে হবে না। আসুন আমাদের নতুন রাষ্ট্রে, কার্ড দিয়ে দিচ্ছি। কার্ডখানা ফটকের প্রহরীকে দেখালেই রাসেল স্ট্রীটের অট্টালিকায় ঢুকে পড়তে পারবেন অনায়াসেই। নাগরিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যদি কিছু বলবার থাকে, তিনি এবার বলতে পারেন।"

"অনায়াসে কলকাতার একটা সরু গলিতে পর্যন্ত ঢুকতে পারি নি ভাই। জীবনীশক্তি তাই শেষ হয়ে গেছে অনেকদিন আগেই। কোন রকমে টিকে ছিলুম, আর বোধ হয় বেশী দিন বাঁচব না।" এই ব'লে নাগরিক রাজীব বাবু হাতের কনুই দু'টো টেবিলের উপর রেখে একটু ঝুঁকে বসলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, "আমায় আপনারা ক্ষমা করবেন, কারণ আমি আমার নিজের কথাই বলছি। বিজ্ঞানের নানাবিধ দানবিক উপায় দ্বারা অধুনা মন এবং মগজ আয়ত্তে আনা যাচ্ছে ব'লে খবর পেয়েছি। কিন্তু যে-ক'টা দিন আমি আর বাঁচব, আমায় আপনারা বিজ্ঞান-বিবর্জিত হয়েই বাঁচতে দিন।

"আমার সাহিত্যে আপনারা কেলেঙ্কারি দেখতে পেয়েছেন, কথাটা তর্ক সাপেক্ষ। কিন্তু তর্ক আমি করব না। তর্ক করব না এই জন্যে যে, সাহিত্যে আমার বিন্দুমাত্র কেলেঙ্কারি নেই। তবে কেন নতুন ক'রে বই লেখবার আহ্বান আমি গ্রহণ করব? রাসেল স্ট্রীটের উদ্যান সংলগ্ন মনোরম অট্টালিকায় কিংবা কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী স্বাস্থ্যকর স্যানাটরিয়ামে বসবাস করলেই সুস্থ সাহিত্যের সৃষ্টি হবে তা আমি বিশ্বাস করি না। কারণ, প্ল্যান ক'রে যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন, তাঁদের দলে আমি নই। আপনারা সবাই আমার চেয়ে বিদ্বান ব্যক্তি। বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞতায় আপনাদের সমালোচনা অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু প্রাক-বিপ্লবী যুগের নিবিড় নিকটে দাঁড়িয়ে যাঁরা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা সত্যিই সমালোচক নন, গণৎকার। সাহিত্যের পশ্চাৎ আছে, আছে বর্তমান। কিন্তু সাহিত্যের ভবিষ্যতে আছে ভবিষ্যৎ বাণী। ভবিষ্যৎ বাণী বিজ্ঞান নয়। রবীন্দ্রযুগে দাঁড়িয়ে কেউ আজকের ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন ব'লে আমার জানা নেই। যে-সাহিত্য সৃষ্ট হয় নি তার জন্যে

আপনাদের এত সাগ্রহ-প্রতীক্ষা কেন? ফরাসী কবি র‍্যাঁবোর ভবিষ্যৎ কেউ ভ্যালেরীর কাব্য-প্রতিভায় দেখতে পাবেন ব'লে আশা করেন নি। রবীন্দ্রোত্তর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃজন-বিস্ময় 'অর্কেষ্ট্রা' কোন সাহিত্য-গণৎকারের গণনায় ধরা পড়ে নি। কিন্তু আরাগঁ-র ভবিষ্যৎ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। দেখতে পাচ্ছেন এই জন্যে যে, তাঁর কাব্য-জলাশয় আপনাদের আদর্শবাদের প্রাচীর দিয়ে আবদ্ধ। তাই সাহিত্য আসবার আগে এসেছে আদর্শবাদ, এসেছে সমালোচনা। এসেছে ছক। হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এসেছে, আমিও তা দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু ছকের সাহিত্য গ্রহণ করা প্রয়োজন বোধ করি নি। সাহিত্য আসবে তার নিজের তাগিদে, নিজের ছন্দে, নিজের তালে। উচুনীচু রাস্তা দিয়েই আসবে সে। কোন বিশেষ সভ্যতার রোলার দিয়ে জীবনের মাটি সমতল ক'রে দিলে কি হবে, সে আসবে না আপনাদের আদেশ মত। আসেও নি। সমাজ-বিবর্তনের মধ্যে আপনারা হয়তো ঐতিহাসিক অনিবার্যতার বিজ্ঞান দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু সমাজতত্ত্ব সাহিত্যের মূল প্রেরণা নয়।"

মনস্তাত্ত্বিক ব্যানার্জি জিজ্ঞাসা করলেন, "সাহিত্য যখন কোন ছকের তোয়াক্কা রাখে না, তখন শেষ জীবনে সাহিত্যের ক্ষুরে রাজনীতির শান দিচ্ছিলেন কেন? নমুনা দেখাব?" রমেন বাধা দিয়ে বলল, "নমুনা নেই, ধাপার মাঠে সব ছাই হয়ে গেছে।"

রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, "ছাই হয়ে আর যাবে কোথায়? মূলের শক্তি রয়েই গেল। কোন একদিন বাংলার মাটি থেকে আবার ওরা গজিয়ে উঠবে। আমায় আপনারা কোন রকমেই দুঃখ দিতে পারবেন না। কারণ আমি মরছি আমার নিজের ধর্মবিশ্বাস নিয়েই। আমার মনের মাটিতে পরধর্মের অঙ্কুর উদ্গম হওয়ার আর কোন সম্ভাবনাই নেই।

"শ্রীমান বন্দ্যোপাধ্যায় যদিচ আমার সাহিত্যকে ক্ষুরের সঙ্গে তুলনা করতে বাধ্য হয়েছেন (নইলে রাজনীতির শান দেওয়া চলে না।) তবুও আমি বলব তিনি আমায় যথেষ্টভাবে অপমান করতে সমর্থ হন নি। আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, রাজনীতি নিয়ে আমি কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি

করতে পারি নি। কিন্তু পারা উচিত ছিল। জীবনের সত্য আলেখ্য যদি আঁকতে হয়, তাহ'লে আজকের মানুষকে রাজনীতির ছোঁয়াছুঁয়ির বাইরে এনে কল্পনা করা অসম্ভব। সভ্যতা ও কৃষ্টি বলতে আজ যা আমরা বুঝতে পারি, দু-তিনশ' বছর আগে কি তা পারতুম? উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে অর্থনীতি ও রাজনীতি মানুষের ধ্যান-ধারণার বিষয়বস্তু হয়ে পড়েছে। মানুষ নিয়েই যখন সাহিত্যের কারবার তখন রাজনীতি কিংবা অর্থনীতি বাদ দেবেন কি ক'রে? যুগে যুগে তাই সাহিত্যের বিষয়বস্তু বদলায়। কোন কোন যুগে কেবল শিল্পকলা এবং সাহিত্যের সীমাবদ্ধতার মধ্যেই কৃষ্টির গণ্ডি টানা হ'তো; কিন্তু আজকের দিনে অর্থনীতি ও রাজনীতির দিকে পক্ষপাতিত্ব না দেখালে কৃষ্টি বাঁচে না। অতএব সাহিত্যও বাঁচে না। ডিকেন্সের "দুই শহরের কাহিনী" আজকের জগতে আধখানা শহরের কাহিনীও নয়। সভ্যতা ও কৃষ্টির হস্ত প্রসারণের মধ্যে শিল্প, কলা, সাহিত্য, রাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি সবই আজ আলিঙ্গনাবদ্ধ। একের সঙ্গে অপরের যোগাযোগ নিবিড়। শিল্প কিংবা সাহিত্যকে পৃথকভাবে কল্পনা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর এ এক অতি চমকপ্রদ অবস্থা! প্রতিটি মানুষকে জড়বাদ বিজ্ঞান এমনভাবে গ্রাস ক'রে ফেলেছে যে, জীবনের অন্যান্য যাবতীয় সমস্যাই হয়ে পড়েছে গৌণ। "পল্লী সমাজ"-এর রমা-রমেশ সমস্যা আজকের দিনে একজন ষোল বছর বয়সের মার্কসবাদী বালকের মুখে হাস্য উদ্রেক করে। কিন্তু সবচেয়ে বিপদ হয়েছে যে, একাকী পাশে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর এই চমকপ্রদ অবস্থাও কেউ দেখতে পাচ্ছে না। যে-দলেই হোক একদিকে যোগ দিতেই হবে। নিরিবিলিতে নিঃসম্বল হয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকাও সম্ভব নয়। কিন্তু সাহিত্যিকদের দাঁড়িয়ে থাকাই তো কাজ। তাঁরা পর্যবেক্ষণ করবেন, অনুভব করবেন। আনন্দ ও নিরানন্দের অনুভূতি-মন্থন থেকে প্রতিভার পাত্র পূর্ণ হয়ে উঠবে ক্রমে ক্রমে। সাহিত্যিকদের জন্যে তাই দশটা-পাঁচটার কাজ থাকে না, তাঁদের কাজ চব্বিশ ঘণ্টার। পার্ট-টাইমের কাজ সাহিত্যিকদের নয়। তাই তাঁরা সারা জীবন দুঃখ ভোগ করেন, তবুও ছকের গণ্ডিতে ধরা দিতে চান না। টাকা, পয়সা, মজুর, ম্যানেজার দিয়ে কারখানা চলে—সাহিত্য চলে না। আমায় আপনারা ক্ষমা করবেন, আমি

আপনাদের রাসেল স্ট্রীটের কারখানায় যেতে পারলুম না। দয়া ক'রে আমায় নিরিবিলিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দিন। বাকী জীবনটা ধাপার মাঠের আশেপাশেই ঘুরব। সমাজে কেবল 'আলিওশা' থাকলে চলবে কেন, 'ডিমিট্রি' এবং 'আইভানও' থাক। থাক 'কারামাজোভ' বংশের বিংশ শতাব্দীর নব সংস্করণ। আইন ক'রে রুখতে যাবেন কেন, ছক কেটে রাস্তা বাৎলে দেওয়ার দরকার কি? আধুনিক মানুষের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং বিজ্ঞান-প্রবণতার পরশপাথর থেকে সাহিত্যের সোনা যাচাই ক'রে নিতে কোন অসুবিধাই হবে না। একটা গোটা জাতি যদি বিপ্লবের অস্ত্র দিয়ে নিজেদের আঘাত করতে চায় তো করুক। তা থেকেও সাহিত্য আসবে। আসবে 'ভারখোভিনস্কি' ও 'স্টাটোভ' ইত্যাদিরা। ডস্টয়ভস্কির বুকের জ্বালা কিসের? সমস্ত জীবন কষ্ট পেয়ে গেলেন কেন? কি তিনি চেয়েছিলেন? সেই দুর্লভ বস্তুটি কি? তাঁর অনুসন্ধানকে পুনরুজ্জীবিত করাই আমি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্প-সৃষ্টির প্রয়াস ব'লে মনে করি। বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ইংরেজ কবির উক্তি আমার প্রেরণার উৎস। আমি বিশ্বাস করি, জীবনে ঐতিহ্যই যথেষ্ট নয়। এবং কোন যথেষ্টই যথেষ্ট নয় ঐতিহ্য ছাড়া।"

কমরেড বন্দ্যোপাধ্যায় বাধা দিয়ে বললেন, "একটু আগেই আপনি রমা-রমেশের কথা উল্লেখ ক'রে একটি ষোল বছর বয়সের বালকের মুখে হাস্য উদ্রেক করিয়েছেন। কিন্তু আপনি কি জানেন যে, আপনার লেখা প'ড়ে ষোল থেকে একশ' ষোল বছর বয়স্ক কোন মানুষেরই কোন কিছু উদ্রেক হয় না? তার কারণ, আপনার লেখায় কোন জীবন-দর্শন নেই।" নাগরিক রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় সহসা ডান দিকের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। নীলকণ্ঠ বাগচি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে, রয়েলটির হিসেব দেখাতে চাও না কি? রয়েলটির টাকা ওঁরা দেখতে চান না।"

"পকেট থেকে ট্যাবলেট বার করছি। মাথা ধরেছে।" রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় দু'টো ট্যাবলেট খেলেন। সামনেই টেবিলের ওপর জলের গেলাস ছিল। কমিশার ও কমরেডদের দিকে চেয়ে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরায় বলতে লাগলেন, "জীবন-দর্শন বলতে আপনারা আপনাদের বিশেষ একটি আদর্শবাদ

ছাড়া আর কিছু বুঝতে পারেন না তা আমি জানি। কিন্তু আমার লেখায় জীবন-দর্শন নেই, সে-কথা কি প্রমাণ হয়েছে? এই সম্পর্কে আমাদের একটী কথা মনে রাখতে হবে যে কথা-সাহিত্যিক প্রধানত দার্শনিক নন। কথা-সাহিত্যিকের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর পাঠক-পাঠিকাদের মনে আবেগ সৃষ্টি করা, ইমোশন। যিনি যত বেশী ইমোশন সৃষ্টি করতে পারবেন তিনি ততবেশী সক্ষম লেখক। কিন্তু ইমোশনকে শিল্পের পর্যায়ে তুলতে হ'লে জীবন-দর্শনের সাহায্য অত্যাবশ্যক। নইলে চরিত্রসৃষ্টি হবে না, হবে না প্লট তৈরিও। দর্শন আসবে তত্ত্ব হিসেবে নয়, আসবে সাহিত্যকে শিল্পের স্তরে টেনে তুলবার জন্যে।

"জীবন-দর্শনও সোজাসুজি শিল্পের স্তরে পৌছুতে পারছে না। ইমোশন ও জীবন-দর্শনের মাঝখানে কথা-সাহিত্যিক তৈরি করেছেন একটা সেতু—সৌন্দর্য-তত্ত্বের সেতু, এস্থেটিকস্। ইমোশন, জীবন-দর্শন ও সৌন্দর্যতত্ত্ব মিলে তৈরী হয়েছে সাহিত্যের হায়ারআর্কি।

"জীবন ও জগতে সব সময়ে যা ঘটছে তার যথাযথ চিত্র আঁকলেই সাহিত্য বাস্তব-ধর্মী হয় না। কথা-সাহিত্যিক তা আঁকবেনও না। তার কারণ, তিনি চরিত্রগুলোকে এমনভাবে সৃষ্টি করছেন যার মধ্যে রয়েছে তাঁর জীবন-দর্শনের উদ্দেশ্যবাদ, চরিত্রগুলো স্বাধীন নয়। লেখকের সৌন্দর্যানুভূতিই চরিত্রগুলোর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে। এবং তিনি সব সময়েই সচেষ্ট, কি ক'রে তাঁর পাঠক ও পাঠিকার মনের পেয়ালা আবেগের সুধা দিয়ে পূর্ণ ক'রে তুলতে পারেন। এই ফল পাওয়ার জন্যে কথা-সাহিত্যিক জীবন থেকে ততটুকুই নেবেন যতটুকু তাঁর উদ্দেশ্যবাদকে পাঠক-পাঠিকার মনে সত্য ব'লে ফুটিয়ে তুলতে প্রয়োজন হবে। কথা-সাহিত্যিক প্রধানত কল্পনা-বিলাসী। অতএব তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি তাঁর নিজের নিয়মকানুনের পথ ধ'রেই চলবে। এখানে তিনি মুক্ত। কারণ, তিনি শিল্পী। তাঁর হায়ারআর্কির আইন ছাড়া তিনি অন্য কোন আইনই মানবেন না। মানতে গেলেই তাঁর শিল্পী-মনের উন্নতি হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে। শিল্পী-মনের উন্নতি যখন গণ্ডীর সীমা অতিক্রম করবে, তখনই কেবল শিল্প-সৃষ্টি সম্ভব। শিল্পী-মনের ক্রমোন্নতি হয়, কিন্তু শিল্পের মধ্যে কোন ক্রমোন্নতি নেই। শিল্প-সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে শিল্প। তার অগ্র-পশ্চাতে ক্রমোন্নতির স্তর নেই। কিন্তু

আপনারা এসব কথা স্বীকার করবেন না, আমি জানি। আপনাদের জীবন-দর্শন এসেছে ইউরোপ থেকে। মার্কসবাদের ছকের মধ্যে সাহিত্যকে পুরোপুরি ভাবে ঢুকিয়ে দিতে না পারলে, আপনারা জগতের কোন সাহিত্যেই জীবন-দর্শন খুঁজে পাবেন না।

"বাংলা সাহিত্যের ফাঁকা মাঠে আপনারা তাঁবু ফেলেছেন অনেকদিন আগেই। দোষ আমাদেরই। আমরা দিক নির্ণয়ে ভুল করেছি। মানবতা মানুষেরই মনের ধর্ম। মানুষের চোখ দিয়েই মানুষকে দেখতে হবে। আমরা কি তাই দেখেছি? আপনারাও কি দেখছেন? বিজ্ঞানের দৃষ্টি অস্বীকার করবার নয়, কিন্তু দৃষ্টির সবটুকুই বিজ্ঞান নয়। ভুল আমাদেরই। মনের ধর্মকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে ধরতে পারলুম না ব'লে মনস্তত্ত্বের হাওয়া দিয়ে স্ত্রীলোকের কাপড়-চোপড় উড়িয়ে দিতে লাগলুম। বাস্তব-ধর্মী সাহিত্য চাই। রিয়ালিজম।

"এখানেও আমরা ভুল করলুম। ভাবপ্রবণতার গিল্টি করা অলঙ্কারকে সাহিত্যের পাকা সোনা ব'লে বাজারে চালু ক'রে দিলুম। প্রচার ও প্রতিপত্তির জোরে রুচির মুখে কালি মাখালুম আমরাই। দোষ আমাদেরই। ভাবপ্রবণতা থেকে অশ্লীলতা যে মাত্র এক দৌড়ের রাস্তা, সে-কথাও আমাদের মনে রইল না। রিয়ালিজমের নামে পরিশুদ্ধ প্রেরণার প্রয়োজন আমরা অস্বীকার করলুম। বাস্তব-ধর্মী সাহিত্য চাই। আমাদের হাতের কাছে মনঃসমীক্ষণের হাপর আছে। ইচ্ছে মত হাওয়া ছাড়তে পারি, কম-বেশি করবার ক্ষমতা আমদের হাতেই। প্রয়োজন হ'লে হাওয়ার জোরে কাপড় চোপড় উড়িয়ে দিতে পারি। দিয়েছিও তাই। বাস্তব-ধর্মী উত্তাপের মধ্যে আমরা কেবল সাহিত্যই খুঁজি নি, যৌনও খুঁজেছি। কেন খুঁজলাম? টাকার অভাব পড়লেই টাকা খুঁজতে যাব। না পেলে, মুড়ির কলসিতে মায়ের লুকনো টাকা চুরি করব। তেমনি যৌন-বোধের অভাব ঘটলেই আমরা যাব যৌন-বোধ খুঁজে আনবার জন্যে। বাস্তব জীবনে যদি তা না পাই, আমাদের হাতের কাছে হাপর আছে নায়িকার গায়ে মৃদু মৃদু হাওয়া লাগাব। কিন্তু তাতেও তো রিয়ালিজম এল না! হাওয়া দিয়ে কাপড় উড়িয়ে দেওয়া যায়, সম্ভোগের বলিষ্ঠতা পাওয়া যায় না—পাওয়া যায় না ক্লাইম্যাক্স। এবার বোধহয় রিয়ালিজম আসছে। আমার এবং আপনার কাছ থেকে নায়িকা

পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। বলিষ্ঠ পুরুষ চাই। চাই প্রোটিন ও ভাইটামিন। বাংলার সাড়ে চার ফুট কঙ্কালগুলোতে মজ্জা নেই, নায়িকা থাকবে কেন? রিয়ালিজম কোথায়? প্রোটিন ও ভাইটামিনের অভাবটা রিয়েল, নায়িকার পালিয়ে যাওয়াটা রিয়েলিজম। হাওয়া দিয়ে কাপড় উড়িয়ে দেওয়াটা বাস্তব নয়—অন্তত বাংলা সাহিত্যে তো নয়ই। ইউরোপ আমেরিকার কথা ছেড়ে দিন। ওদের হাতে উদ্বৃত্ত প্রচুর। অতএব লম্পির আগ্রহ ওদের থাকতে পারে। লম্পির মধ্যেও সুস্থ মনোবৃত্তি থাকা চাই, নীতি চাই, সৃষ্টির প্রেরণা চাই। নইলে শিল্প সৃষ্টি হবে না। হচ্ছেও না। সাহিত্যের নামে তাই পৃথিবীর বাজারে আজ অশ্লীলতা-পণ্য সবচেয়ে বেশী কাটছে। সুতরাং দোষ আমাদেরই।

"কিন্তু আপনারাই বা সৃষ্টি করলেন কি? এ যাবৎকাল আপনাদের কবিতা-উপন্যাস-গল্পের মধ্যেই দেখেছি কেবল অক্ষরের মিছিল—ভুখা মিছিল। মিছিল দেখে দেখে যেন কবিতার লাইন টেনে যাচ্ছেন। আঁকা-বাঁকা, ভাঙ্গা-চোরা কত রকমের লাইন! মানুষ একটুও বসছে না, ঘুমোচ্ছে না এবং বিশ্রামও করছে না। কেবল মিছিল আর মিছিল। ওরা ভাত খায় না, জল খায় না, তবে ওরা খায় কি? আপনাদের নায়ক-নায়িকারা যখনই খায়, খায় কেবল পাথর আর নর্দমার জল। কেন জলের ওপর তো খাদ্যমন্ত্রীর কোন নিয়ন্ত্রণ-আইন ছিল না? টালার ট্যাঙ্ক তো আমার চোখের ওপরেই ছিল?

"আপনারা ভুখা-মিছিলের ছক-কাটা সাহিত্যের দোকান খুললেন সর্বত্র। আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন, আমি ছুটি চাই। স'রে যেতে চাই ধাপার মাঠে। ধাপার মাঠের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আমি পুণ্যতীর্থের প্রেরণা পাব। আমি দল চাই নে, ঝগড়াও চাই নে। ঝাড়ুদার হয়ে ধাপার মাঠের ময়লা সাফ করতে চাই। আমি সাহিত্য-সেবক, ময়লা সাফ করবার যোগ্যতা আমারই আছে। সব সাহিত্যিকেরই থাকে, ভবিষ্যতেও থাকবে। আমায় আপনারা বুর্জোয়া ব'লে গাল দিন, আমি আর আপত্তি করব না। আপনাদের সভ্যতা যখন এসেই গিয়েছে, তখন আমি আপত্তি করলেই বা শুনবেন কেন? তবু আমি আবার বলছি যে, সাহিত্য চলবে তার নিজের নিয়মানুবর্তিতায়। জীবন থেকেই তার উপাদান খুঁজে বার ক'রে নেবে।

কোন কিছুই সাহিত্যের কাছে অস্পৃশ্য হয়ে থাকবে না। রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি যা কিছু মানুষ প্রয়োজনবোধে গ্রহণ করবে, সাহিত্যও তা হাত বাড়িয়ে টেনে তুলে নেবে শিল্পের স্তরে। জীবনের উপাদান যদি বাড়ে, সাহিত্যের উপাদানও বাড়বে। কিন্তু আপনাদের জীবন-দর্শনের ছকের মধ্যে সাহিত্য কোনদিনও বাড়তে পারবে না, দম আটকে মারা যাবে। যাবে এই জন্যে যে, জীবন-দর্শনের প্রায় সবটুকুই দখল ক'রে বসেছে রাজনীতি, এবং যে-রাজনীতি মানব-ভাগ্যকে চিরদিনের জন্যে বেঁধে রাখবে রাষ্ট্রহীন রাষ্ট্রের ইউটোপিয়ার সঙ্গে। সেই জন্যেই আপনাদের জীবন-দর্শনের শেষ আমি দেখলুম। দেখলুম, ডায়লেকটিক্যাল জড়বাদ রাষ্ট্রহীন রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করতে পারল না। আপনারা আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।"

নমস্কার করতে গিয়ে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। মনস্তাত্ত্বিক ব্যানার্জি উঠে এলেন নিজের আসন থেকে। সঙ্গে সঙ্গে স্ট্রেচার এসে গেল। তিনি নিজেই কোলে ক'রে রাজীব বাবুকে স্ট্রেচারের ওপর তুলে দিয়ে লাল-প্রহরীদের বললেন, "এলগিন রোডের নার্সিং-হোমে নিয়ে যাও। চিকিৎসার যেন কোন ত্রুটি না হয়।—উঃ কী হাল্‌কা শরীর? বুর্জোয়া রাষ্ট্রে প্রোটিন কি একেবারেই ছিল না?"

নাগরিক রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় স্ট্রেচারে চেপে চলে গেলেন। চলে যাওয়ার পর সভায় আবার স্বাভাবিকতা ফিরে এল।

রমেন বটব্যাল রাজীব বাবুর বক্তৃতার কোন উল্লেখ না ক'রে বলতে লাগল, "অতএব—"

অতএব? সভাস্থ সভাই যেন চমকে গেলেন। "অতএব" এল কেমন ক'রে? কমিশার রমেন বটব্যাল তো এখন পর্যন্ত কোন কিছুই প্রমাণ করতে পারে নি। তা ছাড়া ওর বক্তৃতার শেষ লাইন কারুরই মনে নেই। থাকবার কথাও নয়, মাঝখানে একটা শতাব্দী পার হয়ে গেছে! রমেনও তা বুঝতে পেরেছে। বুঝতে পেরেছে ব'লেই সে হঠাৎ ধাক্কা মারার টেকনিক দিয়ে প্রত্যেককে সজাগ ক'রে তুলল, যেন মাঝখানে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় কোন বক্তৃতাই দেন নি!

"অতএব,—" রমেন দ্বিতীয় বার ধাক্কা মারল। চেয়ে দেখল চারদিকে যে সবাই শতাব্দীর ব্যবধান-বিস্ময় কাটাতে পেরেছে কি না। ঘরের এ-কোণ থেকে সে-কোণ পর্যন্ত বেশ ধীরে ধীরে মাথাটা সে ঘোরাতে লাগল। আমি বুঝতে পারলুম, রমেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় নিচ্ছে। নিচ্ছে বোধহয় নিজেরই বিস্ময় কাটাবার জন্যে। ওর বক্তব্যের সবটুকুই সম্ভবত রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় ব'লে দিয়ে গেছেন। রমেন নতুন বক্তব্যের সন্ধান করতে লাগল মনে মনে। কিন্তু ওর নিজের হাতের কাগজের দিকে নজর পড়তেই রমেন বুঝতে পারল যে, নতুন ক'রে কোন কথাই সে বলতে পারবে না। কাগজের মধ্যে পার্টি আগেই ছক কেটে দিয়েছে। ছকের বাইরে আসা ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

"অতএব, কমরেডগণ আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সাহিত্যের যাবতীয় বিষয়বস্তু এবং টেকনিক প্রভৃতি পার্টির দপ্তর থেকে প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত লেখবার স্বাধীনতা কারুরই থাকবে না। কিন্তু কেন?" রমেন এবার পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে কপালের ঘাম মুছল।

"কৃষকের যেমন গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে কৃষিকাজ চালান অসম্ভব, লেখকের পক্ষেও তেমনি স্বাধীন মনোভাব নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কৃষকের মত লেখকও পার্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণের মধ্যে কৃষকের ফসল হবে ভাল এবং বেশী। লেখকেরও তেমনি সুবিধে হবে। তার কেবল ভাল লেখাই আসবে না, বেশী লেখাও আসবে। রাষ্ট্রের প্রকাশ-ভবন থেকে ছাপা হবে এবং বিলিও হবে। আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির তেমন কোন সুবিধে ছিল না। তাঁরা লেখবার প্রেরণা পেতেন ভগবানের কাছ থেকে, অথচ ভগবানের কাছ থেকে টাকা পেতেন না। টাকা সংগ্রহ করতে ছুটে যেতে হ'তো কলেজ স্ট্রীটে। কিন্তু কলেজ স্ট্রীটেই বা টাকা কোথায়? ইট, সুরকি আর সিমেণ্ট কেনবার জন্যে প্রকাশকেরা টাকা সব খরচ ক'রে ফেলেছিলেন। আবার দু'চার দিন বই বেচা হোক, আঠারজন লেখকের বই বেচে টাকা তাঁরা যোগাড় করুন, তবে তো লেখকরা আর এক কিস্তি টাকা পাবেন? অতএব লেখকদের

এন্‌জিনা পেক্টরিস কিংবা রক্তের চাপের আধিক্য স্বাভাবিক ব্যাপার নয়, বুর্জোয়া সমাজের ব্যাপক ষড়যন্ত্রের ফল।

"কমরেডগণ, এবার থেকে আপনাদের প্রেরণার উৎস হবে পার্টি, এবং পার্টিই আপনাদের টাকার সংস্থান করবে। টাকা পাওয়া এবং না-পাওয়ার ডায়লেকটিকসের সমন্বয় ঘটল এসে পার্টির সিন্দুকে। দু'টো বিরুদ্ধ পরিস্থিতির সংঘর্ষ থেকে সিন্‌থিসিস এল—এল বেশী টাকা। অতএব আপনাদের সাহিত্য আসবে পার্টি লাইন দিয়ে। নিজের তাগিদে নয়, নিজের ছন্দে কিংবা নিজের তালে নয়। রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির বুর্জোয়া বুজরুকি ধরা পড়েছে। ধরেছি আমরাই, ধরেছে পার্টি। আমরা তার জন্য শাস্তি দিতেও কসুর করি নি। ধাপার মাঠে আগুন জ্বালিয়েছি—"হাত ঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে রমেন হিসেব ক'রে বলল, "আগুন জ্বালিয়েছি ঠিক নব্বই ঘণ্টা সতের মিনিট আগে।"

বুর্জোয়া সাহিত্যিক নীলকণ্ঠ বাগচি গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের মেজে থেকে কোঁচার তলার দিকটা টান দিয়ে নিজের ঘাড় পর্যন্ত তুলে নিয়ে এলেন। একটা রুমালের সাধ্য নেই তাঁর ঘাড়ের ঘাম অপসারিত করার! ভীষণ-বিক্রি উপন্যাস-গুলো তাঁর ধাপার আগুন সহ্য করতে পারে নি। স্রেফ ঘাম হয়ে গ'লে পড়ছে তাঁর ঘাড়ের ওপর থেকে। স্ত্রীর বহু পুরনো বিয়ের লাল বেনারসীখানার মাঝখানাটায় গোল ক'রে কেটে নিয়ে তিনি আলখিল্লার মত গলা থেকে পা পর্যন্ত ঝুলিয়ে এসেছিলেন সাহিত্য সভায় যোগ দিতে। ভেতরের সাদা পাঞ্জাবি আর শঙ্খ-মার্কা গেঞ্জিটা ঘামে চুপচপ করছে। রাজনীতির বিষ তিনি সারা জীবনে ছুঁয়ে দেখেন নি—তাঁর চারদিকের পুরুষ এবং মেয়েরা জাগ্রত অবস্থায় রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই ভাবত না। তিনি পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলেন, যুবক-যুবতীদের মনের সমাজে একটা নতুন ইমারত তৈরি হচ্ছে। তার আলাদা নির্মাণভঙ্গী, তার স্থাপত্যের মধ্যে স্থবিরতা নেই—নেই পিতা-পিতামহের পরিচয়-চিহ্ন। রাজনীতির পাদপ্রদীপে নতুন ইমারতের অর্থ-নৈতিক গৌরব-চূড়া তাঁর চোখের সামনে প্রতিদিন স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, তবুও তিনি সেদিকে চেয়ে দেখেন নি। নতুন ব'লেই হয়তো তাতে অনিশ্চয়তার ভয় ছিল। কিন্তু নীলকণ্ঠ বাগচির কণ্ঠ এত নীল কেন? নতুন ইমারত দেখবেন

না ব'লে তিনি চোখ বুজে ক্রমাগত পুরনো বিষ পান করেছেন। পিতা-পিতামহের পচাগলা সমাজের নর্দমা-আশ্রিত সমাজতত্ত্ব হয়েছে ওঁর উপন্যাস-বাহিনীর হাতে সবচেয়ে সেরা অস্ত্র। কেবল সমাজতত্ত্ব কিংবা যৌনতত্ত্ব দিয়ে ইমরাতকে আঘাত করা যায় না। তিনি মানুষ দেখতে পান নি। দেখতে পাননি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে মানুষ বদলাতে আরম্ভ করেছে। মানুষের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প এবং সাহিত্য বদলে গেল। পদীপিসীকে নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি ক'রে আর কোন লাভ নেই। লাভ নেই, মধ্যবিত্তের মেয়েগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাছতলায় দাঁড় করিয়ে প্রেম-প্রণয়ের উপন্যাস লেখার। পদীপিসী স্বর্গলাভ করেছেন বিংশ শতাব্দী সুরু হওয়ার আগেই। রমাকে শরৎচন্দ্র পাঠিয়ে দিয়েছেন বাবা বিশ্বনাথের দরজায়। বৈধব্যের অসত্য-জাঁতায় কিরণময়ীর যৌন-বোধ লুপ্ত ক'রে দিয়ে গেছেন শরৎচন্দ্র নিজেই, তবুও তো সাহিত্য-শিল্পের মধ্যে রিয়ালিজম্ এল না! নীলকণ্ঠ বাগচির উপন্যাস-বাহিনীর তবে সার্থকতা কি? কোন্ সমাজের বুকের এরা মার্চ করবে? মধ্যবিত্ত সমাজ? কিন্তু বাংলায় কি মধ্যবিত্তসমাজ আছে? নীলকণ্ঠ বাগচি প্রমাদ গণলেন। ইচ্ছে ক'রেই গণলেন। রিয়ালিটি তিনি দেখতেও চাইছেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের গাছতলা তিনি দেখবেন, বেদ-বেদান্তের গুরুগৃহের মধ্যে দৃষ্টিপাত করবেন, অথচ কলেজ স্ট্রীটের নালন্দায় তিনি কাপড় আর জুতোর দোকান দেখবেন না! তিনি দেখবেন না যে, বাংলায় আজ আর মধ্যবিত্ত নেই। আছে অল্প-সংখ্যক ধনী আর ডেস্টিটিউট। ডেস্টিটিউটের যৌন অবৈজ্ঞানিক এবং অসত্য। কেবল অসত্য নয়, অশ্লীল। নীলকণ্ঠ বাগচির ঘামের স্রোত কমে এল। ধাপার আগুন বোধহয় নিবে আসছে।

সময়ের হিসেব ক'রে রমেন বটব্যাল একটু আগেই ঘোষণা করেছে যে, নব্বই ঘণ্টা সতর মিনিটের মধ্যে গত আটাত্তর কিংবা আট হাজার বছরের কলঙ্ক মোচন হয়েছে ধাপার মাঠে। স্লেট এবার পরিচ্ছন্ন হ'লো। কোন রকম আঁচড় কাটা নেই। নতুন সাহিত্যের স্বরবর্ণ এবার লেখা হবে। সে পুনরায় সুরু করল, "বুর্জোয়া সাহিত্যিকরা এযাবৎকাল সাহিত্যের আফিম নিয়ে কারবার করছিলেন। নতুন সাহিত্য থেকে আমরা আফিমের কারবার তুলে দিলুম।

নিজের তাগিদে সাহিত্য-শিল্প যদি আসে, তবে তার সঙ্গে আফিমও আসবে। ধর্ম-আফিম যেমন ক্ষতিকারক, সাহিত্য-আফিমও তেমনি সর্বনেশে নেশা। আমি অনুরোধ করছি, বুর্জোয়া সাহিত্যিকরা আমাদের ছকের-শিক্ষা গ্রহণ করুন, পার্টি আপনাদের তাহলে কোদাল হাতে দিয়ে দামোদরের খাল কাটতে পাঠাবে না। উপস্থিত আমরা মাত্র পাঁচজন কমরেড সাহিত্যিক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি। তাঁদের পাঁচখানা উপন্যাসও আমরা ছেপেছি। বিক্রি কত হয়েছে জানেন?" এই ব'লে রমেন দক্ষিণ দিকে দৃষ্টিপাত করল। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটি যুবক সামরিক কায়দায় ছট্ ক'রে উঠে পড়ল। দাঁড়াল পাশাপাশি। পোষাক-পরিচ্ছদ সবার একই রকম। উচ্চতায় কেউ কারুরই মাথা ছাপিয়ে উঠতে পারে নি। বুকের ছাতিও সবারই সমান সমান।

রমেন বটব্যাল পাঁচখানা একই সাইজের বই উপর দিকে তুলে ধ'রে বলতে লাগল, "উপন্যাস পাঁচটির বিষয়-বস্তু মাটি এবং লোহা। মাটি এবং লোহা না থাকলে মানুষ খাবে কি? কারখানা চলবে কি করে, চাষের কাজ চলবে কেন? সুতরাং মানুষের চেয়ে মাটি ও লোহা গোষ্ঠীর জীবনের কাছে বেশী প্রয়োজনীয়। এই উপন্যাস পাঁচটির নায়করা তাই মানুষ নন।"

নীলকণ্ঠ বাগচি আবার ঘামতে আরম্ভ করলেন। রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত তিনিও স্টেচারের ক্যানভাসের ওপর লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়বার জন্য হৃদপিণ্ডের দৌর্বল্য-ব্যাধিকে মনে মনে আমন্ত্রণ করতে লাগলেন। আমন্ত্রণ করলে কি হবে বলিষ্ঠ হৃদপিণ্ড হঠাৎ দুর্বল হবে কেন?

নীলকণ্ঠ বাগচি চুপ ক'রে ব'সে এ-সব দৃষ্টি-গ্রাহ্য জড়বাদের দৃষ্টান্ত দেখতে পারছিলেন না। তিনি একটু বৈচিত্র্য আস্বাদন করার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে উঠলেন।

তিনি রমেনের দিকে চেয়ে বললেন, "এক মিনিটের জন্য আপনার বক্তৃতায় একটু বাধা দিতে চাই। একটা কথা নিবেদন করতে পারি কি?"

"কথা নিবেদন করা যায় না, কথা বলতে হয় নাগরিক নীলকণ্ঠ বাবু। বলুন।" ধমকে উঠল রমেন। নীলকণ্ঠ বাগচি দাঁড়ালেন। বেশ সোজা হয়েই দাঁড়ালেন। কাপড়ের কোঁচাটা ইতিমধ্যে তিনি মাটি থেকে তুলে আলখিল্লার তলায় পেটের দিকটায় গুঁজে দিয়েছিলেন।

তিনি বললেন, "আপনাদের উপন্যাসে মাটি আর লোহার পক্ষে নায়ক হওয়া কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু ওরা নড়াচড়া করবে কি ক'রে? মানুষের হাতেই তো ওরা নড়বে চড়বে। মাটি ও লোহার বাস্তবতা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু বাস্তবকে অতিক্রম ক'রে অতি-বাস্তবের নৈর্ব্যক্তিক উচ্চতায় না উঠতে পারলে শিল্প সৃষ্টি হতে পারে না। সুপার রিয়ালিটিই তো আসল রিয়ালিটি?"

কমিশার রমেন বটব্যাল সহসা হেসে উঠল। তুবড়ী বাজীর মত প্রথমে ওর হাসির আওয়াজটা ধীরে ধীরে শুরু হয়ে শেষের দিকটায় উচ্চ গ্রামে এসে পৌঁছল। শেষ হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে সমবেত কমরেডরা সব একসঙ্গে হেসে উঠল। অনেকগুলি তুবড়ী বাজীর বিরাট আওয়াজ! হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল গ্রেট ইষ্টার্ণের ঘরে। রমেন হাসল ব'লেই ওরা হাসছে। সত্যযুগের আরামপ্রিয় লোকরাও বোধ হয় এমন ক'রে হাসতে পারত না। নীলকণ্ঠ বাগচির লাল আলখিল্লাটা যেন নৌকোর পালের মত হাসির আওয়াজে ফুলে ফুলে উঠছে। তাঁর দু'পাশের বুর্জোয়া সাহিত্যিকদের হাসির মধ্যে তরঙ্গের চেয়ে বাতাস ছিল বেশী। হাসির বুক চিরে গলা দিয়ে ওঁদের বাতাস বেরুচ্ছিল। নীলকণ্ঠ বাগচি অসহায় বোধ করতে লাগলেন। দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল। তিনিও তাই হাসতে হাসতে শেষ পর্যন্ত চেয়ারের মধ্যে ঝুপ ক'রে বসে পড়লেন।

এবার রমেনের হাসি থামল। অতএব কমরেডদের হাসবার আর কোন কারণ রইল না। মুহূর্তের মধ্যে ঘরের নৈঃশব্দ গভীর হয়ে গেল। বই পাঁচখানা হাতে নিয়েই রমেন আবার সুরু করল, "নাগরিক নীলকণ্ঠ বাগচি বসে পড়েছেন। বসে পড়ার অর্থ হচ্ছে, তিনি তাঁর হাস্যকর প্রশ্নের জবাব চান না। হাস্যকর প্রশ্নের জবাব হাস্য ছাড়া আর কি হতে পারে? কমরেডগণ, আপনাদের অবগতির জন্যে উপন্যাস পাঁচটির বিক্রির সংখ্যা আমি ঘোষণা করছি।" রমেন পকেট থেকে একখানা কাগজ বার ক'রে তাতে চোখ বুলোতে লাগল। তারপর বলল, "গতকল্য বেলা পাঁচটা ছ-মিনিট পর্যন্ত গড়ে পঞ্চাশ হাজার পয়েন্ট পাঁচ ক'রে প্রতিটি বই বিক্রি হয়েছে।"

নীলকণ্ঠ বাগচি পাথরের মত অনড় অবস্থায় বসে রইলেন। নড়াচড়া করার আর তিলেক মাত্র সাধ্য রইল না।

রমেন বলল, "কি ক'রে সম্ভব হ'লো? সাহিত্য থেকে অহিফেনের অংশটা ফেলে দিয়ে আমরা এনেছি টেক্‌নোলজী। একে বলা যেতে পারে, সাহিত্যের প্রযুক্তিবিদ্যা। কি রকম? সাহিত্য নিয়ন্ত্রণ করা যেমন পার্টির কাজ, সাহিত্য পরিবেশন করাও পার্টিরই কাজ। আমরা কেবল লেখাচ্ছি না, আমরা পড়াচ্ছিও। প্রত্যেক অফিসের মেহনতকারী কর্মচারীদের মাইনে থেকে আমরা পাঁচ পারসেণ্ট ক'রে টাকা কেটে রাখছি বই কেনবার জন্তে। আপনাদের স্মরণ থাকতে পারে, তিন দিন আগে আমরা এই উদ্দেশ্তে একটি আইন পাস করিয়ে নিয়েছি। রাষ্ট্র আপনাদেরই, অতএব আইনও আপনাদের। সাহিত্যের টেক্‌নোলজী আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে না এলে প্রত্যেকেই যার যার ইচ্ছে মত বই কিনে ফেলতো। সে-রকম একটা প্রতিক্রিয়াশীল মানসিক অবস্থা আমরা সহ্য করব কেন? সুতরাং জনসাধারণ কি কি বই পড়বেন তাও আমরা আইনের বিবিধ ধারা অনুসারে ঠিক ক'রে দেব। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের মত আমরা বিজ্ঞাপনের চমক দেখিয়ে জনসাধারণকে ঠকতে দেব না। কমরেডগণ, আমাদের প্রধান নেতা কমরেড চৌধুরী এবার সাহিত্যিকদের পুরস্কার বিতরণ করবেন।" রমেন বটব্যাল বসে পড়ল। কলকাতা জিলার পার্টি সেক্রেটারী কমরেড মাইতি পাঁচটি মেডেল কাঠের ট্রেতে ক'রে সাজিয়ে নিয়ে টেবিলের উপর রাখলেন। নীলকণ্ঠ বাগচি তাঁর ডান দিকে চেয়ে দেখলেন, বুর্জোয়া সাহিত্যিক বিপুল দত্তের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে: সমস্ত জীবন সাহিত্য-সাধনা করেছেন বিপুল দত্ত। আড়াই টাকা দামের গল্প লিখতে লিখতে শেষ পর্যন্ত এসে সাময়িক কাগজের উন্নতির যুগে তিনি ত্রিশ টাকার গল্প লিখেছেন। কী কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে তাঁকে টানা চল্লিশটা বছর! কেউ তাঁকে এতটুকু উৎসাহ পর্যন্ত দেয় নি, প্রত্যেকের কাছে পেয়েছেন কেবল অবহেলা। প্রথম জীবনে তিনি যদি একটা মেডেল পেতেন, হয়তো তাঁর ভাগ্যের স্রোত তাঁকে টেনে নিয়ে যেত বড় সৃষ্টির মহাসাগরের দিকে। বিপুল দত্ত মেডেল পান নি, পেয়েছেন মুষ্টিভিক্ষা। তিনি বসে বসে দেখতে লাগলেন, নতুন রাষ্ট্রে

মুষ্টিভিক্ষা নেই, আছে মেডেল। মাটির মেডেল হ'লেই বা ক্ষতি কি, মেডেল তো বটে!

আমি মেডেল পাঁচটির দিকে চেয়ে দেখলুম এগুলো মাটির নয়, সোনারও নয়। রূপো দিয়ে তৈরী। আমি বক্তৃতা আরম্ভ করলুম, "কমরেডগণ, আমাদের রাষ্ট্রে সোনার অভাব অত্যন্ত গুরুতর হয়ে উঠেছে। পুঁজিবাদীরা পালিয়েছে মার্কিনী-উড়োজাহাজে চেপে সোনার কাঁড়ি সঙ্গে নিয়ে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এত বড় লুটের কাহিনী কোন্ রাজত্বে পাওয়া যায়? হিন্দু, পাঠান, মুঘল না ইংরেজ রাজত্বে? কোথাও না কমরেড, কোথাও না। একমাত্র কংগ্রেস রাজত্বেই এ'টা সম্ভব হ'লো। উড়োজাহাজের পেট-ভর্তি সোনা, পাগড়ির ভাঁজে ভাঁজে সোনা! যত পেরেছে নিয়ে গেছে। এমন কি বুড়োগুলো পর্যন্ত নড়া-দাঁত ফেলে দিয়ে সোনার দাঁত বাঁধিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেল! এর সত্য ইতিহাস লিখবে কে? লিখবেন আপনারাই।

"কমিশার কমরেড বটব্যাল সাহিত্যের টেক্‌নোলজী সম্বন্ধে আপনাদের কাছে যা বললেন, আশা করি আপনারা সবাই তা বুঝতে পেরেছেন। দুগ্ধবতী গাই দাঁড়িয়ে থাকলেই বাঁট থেকে দুধ পড়ে না। কাউকে না কাউকে বাঁটে হাত লাগাতেই হয়, হাত না হোক কল্ লাগাতে হয়। নইলে দুধ পাওয়া যায় না। আমাদের পার্টিও আজ সাহিত্য-দুগ্ধ দোহনের ঐতিহাসিক দায়িত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সাহিত্য-সৃষ্টির কল্ পার্টির হাতে। সাহিত্য বুনো ঘাস নয়, যেখানে-সেখানে গজাবার স্বাধীনতা তার নেই। নেই তার প্রমাণ, এই পাঁচখানা উপন্যাস। নতুন রাষ্ট্রের প্রথম টেকনোলজীক্যাল্ বিস্ময়! কেবল ফাঁকা বিস্ময় নয়, সাক্ষী সাবুদ সহ বিশ্বাসযোগ্য বিস্ময়। হাত দিয়ে আমরা ছুঁতে পারছি, চোখ দিয়ে পড়তে পারছি। অবিশ্বাস করবার আর রইল কি? কারামাজোভ ভাইদের যথেচ্ছাচারিতা এতে নেই, একটা মেয়েছেলেকে নিয়ে চার ভাইয়ের টানাটানি নেই। লোকোত্তরীত জীবনের ভাঁওতাও নেই। এতে আছে সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্তিতা—টেকনোলজী। রসের পেয়ালা পূর্ণ হবে না বটে, কিন্তু বুকের ছাতি চওড়া হবে। কমরেডগণ, এই পুরস্কার তবে কার প্রাপ্য? এই গৌরব অর্জন করল কে? প্রকৃতপক্ষে পার্টির নব-উদ্ভাবিত

সাহিত্যের টেকনোলজী। কিন্তু মেডেলগুলো সযত্নে রক্ষা করার অধিকারী কমরেড সাহিত্যিকরা। ইনক্লাব-জিন্দাবাদ।" চারদিকে হাততালির আওয়াজ।

সাহিত্যিক বিপুল দত্ত ভাবের ঘোরে তলিয়ে গেছেন। সমবেত বুর্জোয়া সাহিত্যিকরাও হাততালি দিচ্ছিলেন, কিন্তু চেয়েছিলেন বিপুল দত্তর দিকে। বিপুল দত্তর কি হ'লো? চোখের জল শুকোচ্ছে না কেন? পঁচিশ ইঞ্চি মাপের সরু বুকটা দু'হাত দিয়ে চেপে ধ'রে রয়েছেন। দু'-পাটি দাঁতের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হচ্ছে, চোয়ালের হাড় দু'টো তাই উঁচু হয়ে উঠেছে। গত চল্লিশ বছরের অভিমান আর বোধ হয় তিনি চেপে রাখতে পারছেন না। আড়াই টাকা দামের গল্প তাঁর পাঁজরার হাড়গুলোকে ভেঙে চুরমার ক'রে দিয়েছে। কোলে বাবুদের বাজারে এক সের কুচো চিংড়ির দাম দু'টাকা বত্রিশ পয়সা!

পুরস্কার বিতরণের পর আমি আবার উঠলুম। গলার স্বরটা একটু চড়িয়ে দিয়ে ঘোষণা করলুম, "আমরা বুর্জোয়া সাহিত্যিকদের শেষবারের মত অনুরোধ করছি যে, তাঁরা আমাদের আদর্শ গ্রহণ করুন। ধাপার মাঠের ধ্বংসাবশেষ নিয়ে অনুতাপ করবার প্রয়োজন নেই। গোষ্ঠী-জীবনের সুখ সমৃদ্ধির চেয়ে ধাপার মাঠ কি বড়? যাঁরা আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চান, তাঁরা সব এদিকে চলে আসুন। এত বড় সুযোগ আপনাদের ভগবানও দিতে পারতেন না। আমরা আপনাদের কার্ড দিয়ে দিচ্ছি, রাসেল স্ট্রীটে চলে যান। বাগানওয়ালা বড় বাড়িতে বসে সাহিত্য-সাধনা করুন। প্রকাশকের দরজায় ধরনা দিতে হবে না, কুচো চিংড়ি খাওয়ার দুঃখ ও লজ্জা থেকে মুক্তি পাবেন। কচি-কচি ছেলে-মেয়েগুলো কুচো চিংড়ি গিলে গিলে পনর বছর বয়সেও কচি-ই রয়ে গেল। বাড়তে পারল না। রাসেল স্ট্রীটে সবচেয়ে ভাল খাবার আপনাদের জন্যেই আমরা যোগাড় ক'রে রেখেছি। আসুন—"

আমি চেয়ে রইলুম বুর্জোয়া সাহিত্যিকদের দিকে।

নীলকণ্ঠ বাগচির লাল আলখাল্লায় একটু দোলা লাগল। পা দু'টো যেন নড়েচড়েও উঠল। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত উঠতে পারলেন না। চেয়ে রইলেন

সিলিং-এর দিকে। কেবল নীলকণ্ঠ বাগচি নন, অন্যান্য সবাই সিলিং-এর সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

বিপুল দত্তর ভাবের ঘোর কেটে গেছে। তিনি—কেবল তিনি-ই ও-পাশ থেকে গ্রেট ইস্টার্নের চকচকে মেঝে অতিক্রম করতে লাগলেন। সবাই চেয়ে রইল বিপুল বাবুর দিকে। শতাব্দী পার হচ্ছেন তিনি। ধাপার মাঠের চেয়ে গোষ্ঠী-জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি অনেক বড়। বিপুল দত্ত নিঃশব্দে হেঁটে আসছেন আমাদের দিকে। তিনি পশ্চাৎ দেখতে পেয়েছেন, দেখতে পেয়েছেন ভবিষ্যৎ। কি ছিল তাঁর পশ্চাতে? এই তো সেদিনের কথা। কংগ্রেসী আমলের কথাটি তখনও ফুরোয় নি, নটে গাছটিও মুড়োয় নি। ছেলেদের স্কুল বন্ধ ছিল। গান্ধীজীর জন্ম-তারিখ। দুপুর বেলা বিপুল বাবু বাড়ি ফিরেছেন। সেজো আর ছোট ছেলে, তপন ও স্বপন দু'জনে ভাতের থালা সামনে নিয়ে ব'সে ব'সে কাঁদছে। মা চেয়ে রয়েছেন ছেলে দু'টির দিকে। তিনি সেকেলে মানুষ, রাজনীতি বোঝেন না। বুঝতে পারেন না প্রধান মন্ত্রী এবং মুখ্য মন্ত্রীদের এক লাইন বক্তৃতা। ওসব আন্তর্জাতিক পুরুষদের তিনি দেখেন নি। তিনি দেখেছেন ছেলেদের চোখের জল। ভাত থেকে ধোঁয়া উঠছে, সেই সঙ্গে একটা গোবর-পচা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে ঘরময়। নরকের ধাপাতেও এমন বদগন্ধ নেই। বিপুল দত্ত দাঁড়িয়ে রইলেন চুপ ক'রে। এই মাত্র তিনি প্রকাশকের বাড়ি থেকে ফিরছেন। নতুন বইয়ের পাণ্ডুলিপি দিয়ে একশ' টাকা আগাম নিয়ে এসেছেন। নতুন বইতেও তাঁর নায়ক নায়িকার অনেক দুঃখ আছে। প্রেমের দুঃখ, যৌন দুঃখ, বেকার জীবনের দুঃখ ইত্যাদি। কিন্তু তপন ও স্বপনের দুঃখ তিনি লিখতে পারেন নি। এ কেবল দুঃখ নয়—একটা জাতির গোটা ভবিষ্যৎকে নর্দমার জলে ভাসিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র!

স্ত্রী বললেন বিপুল বাবুকে, "ছেলে দু'টো খেতে বসে রোজই কাঁদে। রেশনের চাল ওরা খেতে পারছে না।"

"সত্যিই তো! কিন্তু কি করি বল তো?"

ছোট ছেলে স্বপন উঠে এসে বাবার হাত দিয়ে নিজের চোখের জল মুছতে লাগল। সেণ্ট জেভিয়ার্সে পড়ে স্বপন। বড়লোকদের ছেলেরা আসে গাড়ি

চেপে—ভাল ক'রে খেয়ে-দেয়ে। স্বপন বললে, "বাবা, তুমি বাইরে থেকে চাল আন না কেন ?"

"বাইরে থেকে ?" বিপুল দত্ত প্রশ্ন করলেন।

"হাঁ বাবা, আমাদের ক্লাশের কেউ তো রেশনের চাল খায় না। সচি, সরোজ, প্রশান্ত কেউ না।"

"তবে ওরা চাল পায় কোথায় স্বপন ?"

"কালোবাজার থেকে ওদের বাবারা কিনে নিয়ে আসেন। ইস্কুলে যতক্ষণ থাকি, ভাল ক'রে পড়তে পারি না বাবা—সব সময় পেটের মধ্যে মোচড় দেয়, ব্যথা করে। এ-ভাত আমি আর খাব না বাবা—তুমি আমায় খেতে ব'লো না।" ঝর ঝর ক'রে স্বপনের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

আজ গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের সভাকক্ষে বসে বিপুল দত্ত এতক্ষণ সেই সব পুরনো কথাই ভাবছিলেন। স্বপনদের জন্যেই তিনি এযাবৎকাল সাহিত্য-সাধনা করেছেন। কিন্তু সর্বক্ষণ যদি পেটে মোচড় দেয়, তবে স্বপনরা তো সাহিত্যে মন দেওয়ার সময় পাবে না। কার জন্য সাহিত্য, কেন সাহিত্য ? সাহিত্যের চেয়ে জগৎ বড়, জগতের চেয়েও বড় জীবন। কই সেই জীবন ? স্বপনের পেটে যে-ব্যথা সেই ব্যথার মধ্যেই কি জীবনের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে না ?

বিরাট হর্ষধ্বনির মধ্যে বিপুল দত্ত রাসেল স্ট্রীটে প্রবেশ করবার সরকারী আদেশপত্র গ্রহণ করলেন।······

সভাশেষে নীলকণ্ঠ বাগচি চলে এলেন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল থেকে। একটা সরু একমুখো গলির পাঁচ নম্বর বাড়িতে তিনি থাকেন। বিছানার পাশে ছোট্ট একটা টেবিল। চেয়ার রাখবার জায়গা নেই ব'লে বিছানায় বসেই তিনি লেখাপড়ার কাজ করেন। আজও তিনি বসলেন এসে বিছানায়। টেবিলের ওপর সাদা কাগজ পাতাই ছিল। কলমটা নিয়ে বসলেন তিনি ব্যগ্রভাবে। নতুন সাহিত্য লিখবেন। তিনি জানেন, ছাপার কোন সুযোগ নেই। তা না থাক্, তিনি সাহিত্যিক। লেখাই তাঁর ধর্ম। অতএব তাঁকে লিখে যেতে হবে। কিন্তু কি লিখবেন ? বিষয়বস্তু কি ? নীলকণ্ঠ বাগচির মনে যেন কোন কিছুই দানা বাঁধছে না। তবে কি তিনি ভুল করলেন ? রাসেল স্ট্রীটে

উঠে যাওয়া কি তাঁর উচিত ছিল না? যুগে যুগে সাহিত্যের বিষয়বস্তু যদি বদলায়, তবে এ যুগের বিষয়বস্তু তিনি গ্রহণ করলেন না কেন? তাঁর পক্ষে বই লিখে গোটা পাঁচেক মেডেল পাওয়া খুবই সহজ হ'তো। তিনি শক্তিশালী লেখক। হঠাৎ তাঁর মনে হ'লো, মেডেলগুলো তো সাহিত্যিকদের দেওয়া হয় নি। ছক-কাটা নিয়মানুবর্তিতার উদ্দেশ্যেই মেডেলগুলো উৎসর্গ করা হয়েছে। কৃতিত্ব মানুষের নয়, পার্টির। অতি-চিন্তায় নীলকণ্ঠ বাগচির চোখ দু'টো বুজে আসছিল, তিনি কোথাও মানুষ পাচ্ছেন না। কলমটা রেখে দিয়ে তিনি যেন হাত দু'টো প্রসারিত করলেন। নতুন রাষ্ট্রের চতুর্দিকে ঘড়ির কাঁটার মত হাত দু'টো ঘোরাতে লাগলেন। হাতে তাঁর মানুষ ঠেকছে না। পুরনো রাষ্ট্রেও মানুষের অভাব ছিল। অভাব পূরণের জন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু আজ যেন নীলকণ্ঠবাবু দেখলেন, রক্ত-মাংসের মানুষগুলো সব সরে গেল—বিরাট শূন্যতার মধ্যে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল কোটি কোটি কলের মানুষ।

কলমটা ধরতে গেলেন নীলকণ্ঠ বাগচি। কিন্তু পারলেন না। দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলেন শোভা দেবী। শোভা দেবী তাঁর জীবনসঙ্গিনী। তিনি এলেন সামনের দরজা দিয়ে। সোজা হয়ে দাঁড়ালেন নীলকণ্ঠ বাগচির উল্টো দিকে। ও কি বেশ তাঁর? মধ্যবয়সে বুকের পাঁজরা ঠেলে মাংস এলো কোত্থেকে? দুধ পায় নি, মাখন পায় নি, ছানা পায় নি খেতে—চচ্চড়ি-খাওয়া শুকনো পাঁজরায় শোভা বাগচির এ কি উচ্ছ্বাস! নীলকণ্ঠবাবু হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলেন উল্টো দিকে। লাল শাড়ি, লাল ব্লাউজ—লালের বাহার মাথা থেকে পা পর্যন্ত। ব্লাউজের হাতায় নতুন ডিজাইন—বুকের দু'দিকে কাস্তে-হাতুড়ির ছোট ছোট ছবি।

শোভা দেবী বললেন, "মিটিং আছে, রাতে আর ফিরব না।"

"মিটিং? মিটিং কেন? কোথায় মিটিং?" নীলকণ্ঠ বাগচির ঠোঁট থেকে শব্দগুলো ভেঙে ভেঙে গড়িয়ে পড়তে লাগল মাটিতে।

"বিবাহিত মেয়েদের মিটিং। পচা গলা মাংস সব ফেলে দিয়ে তাজা মাংস সাপ্লাই দেবে পার্টি। শুকনো হাড়ের ব্যথা আর আমায় কাঁদাবে না।" ঘড়ির দিকে চেয়ে সময় দেখলেন শোভা দেবী।

তারপর বললেন, "রাষ্ট্র গড়ায় দায়িত্ব কেবল পুরুষদের নয়, মেয়েদেরও।" শোভা দেবী চলে যাচ্ছিলেন। আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন তিনি, "নতুন নিয়ম যদি না মানো, তবে কলম চালিয়ে আর লাভ নেই। কোদাল হাতে বেরিয়ে পড় দামোদরের খাল কাটতে। পশ্চিম বাংলার খাদ্যের অভাব ঘুচবে।"

নীলকণ্ঠ বাগচি দেখলেন, ভাসানের দেবীর মতো শোভা দেবীও পিঠ দেখিয়ে বিদায় নিলেন বড় গঙ্গার দিকে।

বিসর্জনের ঢাকের বাজনা যেন তাঁকে পাগল ক'রে তুলল। তিনি বুঝতে পারলেন, কলমের কাজ তাঁর ফুরিয়েছে। একান্ন নম্বর পার্কার তাঁর বমি ক'রে ফেলে দিয়েছে বুর্জোয়া কালির শেষ বিন্দু।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগের মিটিং শেষ হয়েছে এক ঘণ্টা আগেই। লাউঞ্জে বসে বিশ্রাম করছিলাম। রাত প্রায় দশটা বাজে। সাড়ে দশটায় সুরু হবে অর্থনীতি বিভাগের সভা। গত ছ'মাসের হিসেব দেবেন কমরেড রাও।

গ্রেট ইস্টার্নের প্রতি ঘরেই কাজ চলেছে। করিডোরে লোকের চলাচল দিনের বেলার মতই জীবন্ত। ঘড়ির কাঁটার মত কর্মের গতি বয়ে চলেছে অবিরাম। এখানে কেউ কর্মচারী নয়, সবাই কর্মী। সময়ের চাবুক খেয়ে এরা চলে না, সময়ের লাগাম প'রে এরা ছুটছে কর্মের বোঝা পিঠে নিয়ে। দশটা-পাঁচটার তাড়া নেই এদের। চব্বিশ ঘণ্টার কর্মী এরা সবাই।

আমি লাউঞ্জে বসে আছি একা। দেহরক্ষী কমরেড লতিফ দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। ছোটাছুটির কাজ আমার নয়। আমার কাজ ভারতবর্ষকে ছোটানো। ভারতবর্ষ-তুরঙ্গের পিঠে বসে আছি আমি। বসে আছি বটে, কিন্তু একটানা ছ'মাস অশ্বপৃষ্ঠে বসে থাকতে পারে কোন্ জকি? ভাল ঘোড়াকে বিশ্রাম না দিলে সে কতদিন ছুটবে? ঘোড়ার কথা জানি না, আমি নিজে তো লাউঞ্জে ব'সে বিশ্রাম করছি, পান করছি হুইস্কী। সঙ্গী কেউ নেই, সঙ্গী ছাড়া হুইস্কী খাওয়ায় আমোদ থাকে না কিছুই। কিন্তু সঙ্গী পাব কোথায়? লাউঞ্জে

প্রবেশ করবার পূর্বেই লাল প্রহরীরা লাউঞ্জ থেকে সবাইকে সরিয়ে দিয়েছে। বলা যায় না, এরই মধ্যে হয়তো বুর্জোয়া গুপ্তঘাতকেরা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাত্রাজ্ঞের প্রতিরোধ আন্দোলন বাংলা দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। বাঙালীর তাতে সুবিধেই হয়েছে। জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে মিলে গেছে পুরোপুরি। বিরোধিতা ছাড়া বাঙালীর প্রতিভা প্রকাশ পায় না। উল্টো দিকে না দাঁড়াতে পারলে বাঙালী বসে পড়ে। তবুও সে ভিড়ের মধ্যে গিয়ে মিশে যেতে পারে না।

দু'চার পেগ খাওয়ার পর একটু মৌতাত এল। মনে হ'ল, ক্রমে ক্রমে আমি সরে যাচ্ছি এক আলাদা রাজ্যে। রাষ্ট্রহীন রাষ্ট্রের প্রগতিহীন আবহাওয়ায় আমার পরমায়ু যেন একটা নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে এসে আবদ্ধ হয়ে আছে। এগুতে পারছে না। আবহাওয়া আছে, হাওয়া নেই। আলো আছে, তার ক্ষয় নেই। জীবন আছে, তার বৃদ্ধি নেই। পথ আছে, প্রতিপথ নেই। জীবন ও জগৎ থেকে ডায়লেকটিকসের দ্বন্দ্ব বুঝি উহ্য হয়ে গেল! আমি হাঁটতে লাগলুম একটা রাস্তা ধ'রে। প্রকাণ্ড চওড়া রাস্তা। রাষ্ট্রহীন রাষ্ট্রের কোথাও আর পুলিস নেই। একটা হাইপথিটিক্যাল মানবজাতি যেন আমার চোখের সামনে সত্যিসত্যি বিরাট এক গণদেহ লাভ করেছে! আলাদা ভাবে কেউ হাঁটতে পারছে না। যখনই হাঁটছে, হাঁটছে সমগ্র মানবজাতি। চলন ও মননের সমষ্টিগত শক্তি লক্ষ কোটি কিলোওয়াট বিদ্যুতের চেয়েও ভয়ংকর! আমি চওড়া রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলুম দ্রুত গতিতে। কোথাও একটু হাওয়া নেই, সবই বিদ্যুৎ-আচ্ছন্ন। পাটোয়ারবাগানের সরু গলিতেও বোধহয় ঋতু পরিবর্তন হ'তো, কিন্তু রাষ্ট্রহীন রাষ্ট্রে একই ঋতু, বিদ্যুতের ঋতু। তাতে পরিবর্তন নেই, আছে মন্থন। আছে আর্তনাদ, কিন্তু বোবা।

হঠাৎ অনীতা এসে উপস্থিত হ'ল আমার সামনে। মনে হ'ল কোত্থেকে যেন ফুরফুর ক'রে হাওয়া বইছে। অনীতা আমার দিকে চেয়ে ছিল। আমি বোধহয় অনীতাকেই খুঁজছিলুম। খুঁজছিলুম এইজন্যে যে অনীতা আমার স্বপ্নের অংশ। কেবল অংশ নয়, এ্যান্টিথিসিস। হঠাৎ দেখি, হুকুও এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে। হুকুর এ কি চেহারা? বড়কাকা বেঁচে থাকলে তিনি কি

ভাবছেন ? গোয়াবাগানের ঐতিহ্যের মুখে এমন ক'রে কালি মাখাল কে ? অনীতা ও আমার মাঝখানে মুকু যেন সমন্বয়। ওদের খণ্ড ব্যক্তিত্ব নিয়েই পুরো ব্যক্তি। পুরো চরিত্র। তিনটে ব্যক্তিত্ব, কিন্তু ব্যক্তি একই।

অনীতাকে জিজ্ঞাসা করলুম, "কি দেখছিস ? রাষ্ট্রহীন রাষ্ট্র ?"

"না। দেখছি, তারও বাহিরে।" মৃদু হেসে জবাব দিল অনীতা।

"বুঝেছি, তুই বোধহয় দেখছিস ক্রুশের কষ্ট !"

অনীতা এগিয়ে এল আরও কাছে। বলল, "তোমার মনের গহ্বর দেখছি, গহ্বরের গভীরতা।"

"কতদূর পর্যন্ত দেখলি রে অনি ? গোয়াবাগান না বেথেলহেম অবধি ?"

"সৃষ্টি-রহস্যের প্রথম অবধি, যেখান থেকে শুরু হয়েছে বিশ্ব-গতির আইন। যাঁর থেকে গতির আরম্ভ তাঁকেও দেখেছি দাদা।"

"ও: ! অবতার-টবতার নাকি রে ?"

"না, ইন্‌কারনেশন। অনেক দূরে আছেন তিনি, আবার তোমারই দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি অপেক্ষা করছেন। তোমার অসৎ-অভিজ্ঞতার মধ্যেও তিনি অক্ষয়। তুমি পরিত্যক্ত নও, তুমি প্রিয়। নইলে সৎ এবং সত্য তুমি দেখবে কি ক'রে ? জীবন ও জগতের প্রগতি রাষ্ট্রহীন রাষ্ট্রে এসে থেমে যাবে কেন ? মানুষ বৃহত্তর ডায়লেকটিকের সন্ধান জানে। দাদা, তোমার কি মনে পড়ে সেই কবিতার লাইনগুলো ?

—To plunge to the bottom of the gulf, hell or
heaven, what does it matter ?
To the bottom of the unknown to find
something new !"

আমি হেসে উঠলুম। চেয়ে দেখলুম মুকুর দিকে। সে যেন পাথরের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিরুদ্ধ পরিস্থিতির সমন্বয়ের ধাক্কা সামলাচ্ছে মুকু !

অনীতার দিকে চেয়ে বললুম, "উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী দেশে ফিরে যাওয়া খুবই কঠিন। কঠিন বুর্জোয়া কবিদের কবিতার লাইনগুলো কুড়িয়ে আনা। মনে হয় কত দূর ! কত পেছনে পড়ে আছে মধ্যবিত্তের সভ্যতা ! বিশ্ব আজ

গণদেহ লাভ করেছে। গণ-অনুভূতির মধ্যে আমরা সব এক একটা অনুভূতি-বিন্দু। একই চেতনা, একই ইন্দ্রিয়। তাই পেছনের শতাব্দীগুলো সব উঁচু-নীচু মনে হয় না। একখণ্ড সমতল মাটির মত ওরা পড়ে আছে বন্ধ্যাত্বের পরমায়ু ঘিরে। আমরা যদি স্মরণ না করি, ওরা পড়েই থাকবে, কোনদিনও দাঁড়াতে পারবে না। স্মরণ করবার স্বাধীনতা আমাদের নেই, আছে গণমনের।"

"কিন্তু দাদা—" অনীতা মুকুর দিকে একবার চেয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "দাদা, তাহ'লে এতগুলো বছর কি করলে?"

"কিছুই না। কবি বলছেন: Vacant shuttles weave the wind. অনীতা, শূন্য মাকুর মধ্যে রয়েছে বন্ধ্যাত্বের আর্তনাদ। এ-আর্তনাদ বোবা। গুমরে গুমরে মরছে। তাই তার সৃষ্টি পেল না ভাষা, পেল না আলাদা অস্তিত্ব। গণদেহের মধ্যে মানব-জ্ঞানের অতীত দ্বিতীয় কিছু সত্য আর নেই।"

কথা শুনে মুকু যেন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "দীপুদা, আমার খোকাকে তোমরা নিতে পারবে না। তার আলাদা অস্তিত্ব কিছুতেই তলিয়ে যেতে দেব না গণদেহের সর্বগ্রাসী মুখ ব্যাদনের মধ্যে। আমার ভাঙা বাস্তু ঘিরেই আবার সে সৃষ্টি করবে নূতন সভ্যতা। খোকা আমার খোকা—ঐ ওরা বুঝি আসছে! দীপুদা!"

"হাঃ, হাঃ, হাঃ! 'I have lost my sight, smell, hearing, taste and touch' অনি, মনে পড়ে কবির এই লাইনটা?"

সামনে দাঁড়িয়েছিল বিনয়প্রকাশ। আমার হাসির শব্দ শুনে দেহ-রক্ষী কমরেড লতিফ বুর্জোয়া শত্রুর সন্ধান করছিল লাউঞ্জের মধ্যেই। বাকি হুইস্কিটুকু শেষ ক'রে বিনয়প্রকাশকে বললুম, "এইমাত্র মুকু আর অনীতা এসেছিল। একটা কবিতা আওড়ে দিতেই শূন্য মাকু দুটো স'রে পড়ল।" বিনয়প্রকাশ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল এসে আমার উল্টো দিকে। আমি দেখলুম, ওর মুখের ওপর কোথাও একটু নরম জায়গা নেই। চামড়াটা বেশ আঁটসাঁট। চামড়া ঢিলে হয়ে যাবে ব'লেই বিনয়প্রকাশ বোধহয় হাসে না। তাছাড়া স্বরাষ্ট্র বিভাগের কমিশার যদি হাসবার অভ্যাস করে, তবে ভারতবর্ষের ক্রেমলীন

তো কফি হাউসের আড্ডাখানা হয়ে উঠবে। বিনয়প্রকাশ তার হাতের ফাইলটা খুলে টেবিলের উপর ছড়িয়ে রাখল। একটা হিসেব দেখছিল সে। দেখা শেষ হওয়ার পর বিনয়প্রকাশ বলল, "অর্থনীতি বিভাগের কমিশার কমরেড রাও আগামী মাসে এক লক্ষ মজুর চাইছেন। গেল মাসে দু'লক্ষ সাপ্লাই দিয়েছিলাম।"

"দিতেই হবে। অর্থ নৈতিক উন্নতির চূড়াগুলো যদি জনসাধারণ দেখতে না পায়, তবে পুঁজিবাদ উঠিয়ে দিয়ে লাভ হ'ল কি? আমাদের এখন মজুরের স্টক কত?" ফাইল দেখে বিনয়প্রকাশ বলল, "এ পর্যন্ত আমরা আড়াই লক্ষ লোকের বিচার করেছি। তা থেকে মুক্তি পেয়েছে পাঁচজন। সুতরাং মোট স্টক ছিল দু' লক্ষ, উনপঞ্চাশ হাজার ন'শো পঁচানব্বই। গত মাসে দু' লক্ষ খরচ হয়েছে। অতএব আজকের তারিখে স্টক আছে পাঁচজন কম পঞ্চাশ হাজার।"

"পাঁচজন মুক্তি পেল কি ক'রে? বিচারের মধ্যে ফাঁক থেকে যাচ্ছে না তো? বুর্জোয়া দুর্বলতা যেন বিচারকদের দৃষ্টিবিভ্রম না ঘটায়।"

"তা ঘটাবে না। পাঁচজনের মধ্যে তিনজন বন্দী-শিবিরেই মারা গেছে। আর বাকী দু'জন বোধহয় বাড়ি গিয়ে মারা যাবে। কিন্তু সবচেয়ে অসুবিধে হচ্ছে যে, বর্তমান মজুর স্টকের গড়পড়তা বয়স একান্ন পয়েন্ট তিন। বহুমূত্র ও রক্তের চাপের আধিক্য স্টকের শ্রম-ক্ষমতাকে খর্ব করেছে প্রভূত পরিমাণে।"

পাইপের মধ্যে ভাল ক'রে তামাক ভর্তি ক'রে ধরিয়ে নিলুম। দু'-চারটে টান দিয়ে ধোঁয়া বার করলুম প্রচুর পরিমাণে। তারপর বললুম, "স্টকের স্বাস্থ্যের রিপোর্ট আমার জানবার দরকার নেই। আমি জানতে চাই এই সব বুর্জোয়া মাংসপিণ্ডগুলোর অর্থ নৈতিক পোটেনশিয়ালিটি। এদের অন্তর্নিহিত শ্রমশক্তির টোটাল উৎপাদনের সঙ্গে খরচের কি অনুপাত—রেশিও?"

ফাইল হাতড়ে বিনয়প্রকাশ একটা কাগজের টুকরো বার ক'রে অঙ্ক কষতে বসল। পাইপের ধোঁয়া সারা ঘরের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। আমি তাই বসে বসে দেখতে লাগলুম। করিডোরে লাল-প্রহরীরা চলাফেরা করছে। দেহরক্ষী কমরেড লতিফ কুতুব মিনারের মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন

সেই পাঠান আমল থেকে। বিনয়প্রকাশ ক্রমশই ফাইল থেকে এক একটা ক'রে সবগুলো কাগজই বার করতে লাগল। আমি বললুম, "অঙ্কপাত বার করা সোজা নয়। মেডিকেল রিপোর্ট থেকে প্রত্যেকটি মানুষের খুঁটিনাটি শারীরিক খবর বার করতে হবে। অসুখ-বিসুখের সূক্ষ্ম তথ্য চাই। জীবনী-শক্তির গ্রাফ চাই। কত টাকার ওষুধ খাওয়ালে এরা কত ঘণ্টার কাজ দিতে পারবে। মোট কাজের মূল্য কত। প্রত্যেকটি মানুষের গড়পড়তা আয়ুকালের ইন্‌ডেক্স কি। কোন্ আবহাওয়ায় কোন্ কোন্ মানুষের কাছ থেকে কম খরচায় বেশী কাজ পাওয়া যাবে। সেই অনুসারে গ্রুপ তৈরি করতে হবে। কোন গ্রুপ মাটি কাটবে, কোন্ গ্রুপ যাবে জঙ্গল কাটতে, সে-সবও হিসেব করতে হবে। আমাদের অর্থনীতি থেকে পুঁজিবাদ উঠে গেছে কিন্তু জটিলতা অনেক বেড়েছে। অঙ্ক বড় হ'লেই জটিল হয়। প্রত্যেকটি মানুষের 'নম্বর' বার করতে না পারলে আমাদের অর্থনীতির কোন অর্থ থাকে না। কমরেড, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বুর্জোয়াদের রক্তের চেয়ে দামোদরের জলের দাম অনেক বেশী।" কমরেড রাও তাঁর ফাইল হাতে নিয়ে দরজার ও-পাশে অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমার কথা শেষ হওয়ার পরে তিনি ধীরে ধীরে ঘরে এলেন। আমি বিনয়প্রকাশকে জিজ্ঞাসা করলুম, "সাড়ে দশটা কি বাজে নি? কমরেড রাও, আপনার মিটিং ক'টায়?"

বিনয়প্রকাশই জবাব দিল, "আজ মিটিং আমরা বাতিল ক'রে দিয়েছি।"

"কেন? মিটিং বাতিল করলে কেন?" আমি বেশ একটু জোরে জোরেই জিজ্ঞাসা করলুম। বিনয়প্রকাশ চুপ ক'রে রইল। আমি করিডোরের দিকে চাইতেই দেখি কমরেড কৃষ্ণান এসে দাঁড়িয়েছেন। মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন। বক্তব্য ছাড়া কমরেড কৃষ্ণান চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবেন, এ আমার ধারণার বাইরে। বিস্মিতভাবে আমি সবার দিকেই মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলুম। পৃথিবীর বুকে আমরাই প্রথম স্বর্গ গড়তে যাচ্ছি। বিস্মিত হওয়ার সময় আমাদের নেই। আমি কমরেড রাওকে জিজ্ঞাসা করলুম, "ব্যাপার কি? আপনাদের চোখে মুখে শোকের ছায়া কেন? মার্কিন-নৌবাহিনী দক্ষিণ-ভারতের উপকূলে সৈন্য নামিয়েছে না কি?" কমরেড রাও জবাব না দিয়ে

নিঃশব্দে লাউঞ্জ থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। কমরেড রুস্তানও দেখলুম, সরে গেলেন দৃষ্টির বাইরে। বিনয়প্রকাশ চেয়েছিল অঙ্কের দিকে। আজ প্রায় বিশ বছর পরে আমার সহকর্মীদের চোখেমুখে ভাবপ্রবণতার অভিব্যক্তি আমি এই প্রথম দেখলুম। এঁরা যেন সবাই আজ বৈজ্ঞানিক জড়বাদের বাইরে এসে নিঃশব্দে পায়চারি করছেন। কেবল তাই নয়, মনে হ'ল, অঙ্কের হিসেবের উপর টস্ ক'রে এক ফোঁটা চোখের জলও পড়ল। বিনয়প্রকাশ হুইস্কি খায় না, তাই সে কাঁদতে পারে। ওয়েস্টল্যাণ্ডের কান্না ক্রেমলিনে কেন? মাতলামি ক্রেমলিনে নেই। ওয়েস্টল্যাণ্ডের কবি মহাপ্রস্থানের পথে নস্তি হয়ে উঠে গেছেন। বিনয়প্রকাশের চোখের জলের ওপর দিয়ে কবি কি তবে নৌকা বেয়ে ফিরে এলেন মহাপ্রস্থান থেকে? আমাদের শিল্প তো শিল্পের প্রয়োজনে আসবে না। শিল্প আসবে কেবল রুটির প্রয়োজনে। তবে মহাপ্রস্থানের কবি আবার ফিরে আসবেন কেন? অর্ধশ্বেতাঙ্গিনী মূলাটোর কাম-শয্যায় শুয়ে ফরাসী কবি নাকি জানলা দিয়ে স্বর্গের আলো দেখেছেন? বিনয়প্রকাশ দেখছে কি? অঙ্কের হিসেব? স্বর্গের আলোর মধ্যেও কি অঙ্ক আছে? কিন্তু ভারতবর্ষের ক্রেমলিন তো ওয়েস্টল্যাণ্ড নয়, নয় মূলাটো রমণীর কাম-শয্যা!

"বিনয়, নাটক সহ্য করতে পারি, নৈঃশব্দ আর সহ্য করতে পারছি না। ব্যাপার কি?"

"তোমার মায়ের বুকে গুলি লেগেছিল, তিনি মারা গেছেন।" বলল বিনয়প্রকাশ।

"Alas! All is abyss—action, desire, dream, speech!"

কমরেড, অঙ্কের হিসেব যেন ভুল না হয়—" লাউঞ্জের সামনে করিডোর, কেউ সেখানে আর নেই। একটা একটা ক'রে আলো নিবে যেতে লাগল। দেহরক্ষী কমরেড লতিফ অন্ধকারের দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। এ কোন্ অন্ধকার? কোথা থেকে এল? কেমন ক'রে ক্রেমলিনে এসে ঢুকে পড়ল? চতুর্দিকের পটভূমিকা যেন ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে ভীক ভঙ্গীতে চেয়ে রইল অন্ধকারের দিকে। বর্বর যুগের অন্ধকার শতাব্দীর সিন্ধু পার হয়ে এসেছে নতুন আলোককে গ্রাস করতে। তবে কি নিগ্রো রমণীর অর্ধাঙ্গ সত্যিই সাদা

নয়? সাদা কালোর ত্বকের নীচে দুঃখ ভোগের পালল-চূর্ণ দানা বেঁধে উঠছে। দানা না বাঁধলে পাললিক শিলা তৈরী হবে না, হতে পারে না। হিমালয়কে ভেঙে দেখো, কি আছে তাতে? পালল-চূর্ণ, দুঃখের পালল। ওয়েস্টল্যাণ্ডের মোহভঙ্গ না হ'লে কবি হিমালয়কে দেখতে পেতেন না। বিশ্বাসের হিমালয়, চূড়া যার ছাড়িয়ে গেছে জীবনের আকাশ ফুঁড়ে।

"তুমি কি ভাবছ বিনয়?"

"ভাবছি অনীতার কথা।"

"আমি কেবল অনীতার কথাই ভাবছি না, ঝুকু কাছে থাকলে আমি বেঁচে যেতুম।"

"তা' হ'লেও বোধহয় তুমি বাঁচতে পারতে না।"

"কেন?"

"তোমাকে চিমটি কাটলে ব্যথা পায় অনীতা, ব্যথা পায় ঝুকু। তিনটে অংশ মিলে একটা অস্তিত্ব। ওদের দুঃখ না ঘুচলে তোমার দুঃখ ঘুচবে না।"

"বিনয়প্রকাশ, রাত না পোহাতে মায়ের মৃতদেহ পুড়িয়ে দাও। কাউকে জানতে দিও না, শ্মশানের আগুনে তাঁর সব পরিচয় পুড়ে যাক। কমরেড রাওকে বল, মিটিং স্থগিত রাখবার দরকার নেই।"

"কাল সকালে বিরাট শোভাযাত্রা বেরুবে। ভুলের সংশোধন আমরা করব।"

"না, না, না। কমরেড, পার্টির নেতা আমি, আমার আদেশ মানতে হবে সবাইকে।"

"আপনি আদেশ করুন।" সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বিনয়প্রকাশ। সামনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করল রুক্মিণী। মাথার ওপর থেকে একটা আধ হাত লম্বা বেণী ঝুলছে পিঠের ওপর, গায়ে হাফ-সার্ট, পরনে খাকী শ্ল্যাক্‌স, হাঁটু-অবধি গামবুট। রুক্মিণী গট গট ক'রে হেঁটে এসে আমার হাত চেপে ধরল। এ কোন্ রুক্মিণী? সে বলল, "এক্ষুনি একবার বাড়ি যেতে হবে, চল।"

হেসে ফেললুম। নেতার ওপর নেতৃত্ব করছে রুক্মিণী! আমি উঠলুম। পা

আমায় টলতে লাগল। হুইস্কির নেশায় নয়, আমি বোধহয় বিনয়প্রকাশের কাছে ধরা পড়ে গেছি। ধরা পড়বার ভয় রইল রুক্মিণীর কাছেও।

আমি আর রুক্মিণী কুইনস্ পার্কে এলুম।

অনেক রাত। শীলা ঘুমিয়ে পড়েছে। রুক্মিণী গেছে রমলার ঘরে। ওরা তিনজনেই এক ঘরে শোয়। বাইরে থেকে কুইনস্ পার্ক সুরক্ষিত। সেক্রেটারী কমরেড সিং একটু আগে শেষ দেখা ক'রে চলে গেছেন। আজ আর তাঁর কোন বক্তব্য ছিল না, ছিল না ফাইল।

তিনতলার ঘরে পায়চারি করছিলুম। ঘুম আসবার কথা নয়। পুলিশের গুলি খেয়ে মা আজ মারা গেছেন! ও-পাশের ঘরটায় মা বসে পুজো করতেন। কোথায় মা, কোথায় তাঁর জগদ্ধাত্রী! রাষ্ট্রবিপ্লবের বিশেষ একটি দিনে আমি এসেছিলুম মার কাছে। পেছন থেকে মাকে প্রণাম ক'রে আমি কুইন্স পার্ক ত্যাগ করেছিলুম। মা মালা গাঁথছিলেন আর গুন-গুন ক'রে গান করছিলেন—'বিপদে যেন না করি আমি ভয়।' সত্যিই তিনি ভয় করেন নি। ধর্মরক্ষার জন্য তিনি প্রাণ দিয়েছেন। প্রাণ দিয়েছেন কমিশনার বিনয়প্রকাশের লাল পুলিসের হাতে। কোটি কোটি নিরক্ষর ভারতবাসী ধর্ম মানে না, মানে কুসংস্কার। আমাদের তিনতলার ছাদেও কুসংস্কার ছিল। কিন্তু কালীঘাটের রাস্তায় মা আজ বোধহয় সত্যিকারের ধর্ম পালনের জন্যই গিয়েছিলেন।

ঘরের এক কোণে অনীতার সুটকেসটা পড়ে রয়েছে। সিনিয়ার দিয়ে অনীতা যেবার কারশিয়ং থেকে কলকাতায় ফিরে এল, এই সুটকেসটাই ও সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিল। এ-বাড়ি ত্যাগ করার সময় অনীতা কিছু নিয়ে যায় নি। কি মনে ক'রে আজ ওর সুটকেসটা খুললুম আমি। সুন্দর গোছগাছ ক'রে কাপড়-চোপড় সাজানো রয়েছে। তবে কি অনীতা পালিয়ে যাবে ব'লে আগে থেকেই প্রস্তুত হচ্ছিল? কাপড়ের ওপর হাতির দাঁতের তৈরী একটা ক্রুশ পড়ে রয়েছে। মনে হ'লো সেটাও যেন কে অতি যত্নসহকারে সাজিয়ে রেখেছে।

হঠাৎ বাঁদিকের কোণে আরও একটা সুটকেস আমার নজরে পড়ল।

এ কার স্যুটকেস? ডালাটা টান্ দিয়ে খুলে ফেললুম। শাড়ির ওপরে পড়ে রয়েছে 'মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌সের পত্রাবলী'। তারই পাশে শ্বেতপাথরের তৈরী একটা বুদ্ধমূর্তি। চিনতে আমার এক মুহূর্তও লাগল না। মুকুর স্যুটকেস। গোয়াবাগান থেকে এ-স্যুটকেস এখানে কেমন ক'রে এল? খুবই আশ্চর্যবোধ করলুম। বিনয়প্রকাশের প্রথম উপহার এই বইখানা। বইটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে এক টুকরো কাগজ পড়ল মেঝেতে। তুলে নিয়ে দেখলুম, মুকুর লেখা। মুকু লিখেছে: আমি মরে গেলে, আমার সবকিছু পাবে দীপুদা। আমি মার্ক্সিস্ট, তাই আমার আত্মা নেই। কিন্তু মৃত্যুর পরে আমি আর মার্ক্সিস্ট থাকব না, অতএব তখন আমার আত্মা থাকবে। দীপুদা গো, মৃত্যুর পরে আমি তোমার এবং আমার আত্মাও তোমার। ইতি মুকু।

পেছন দিকে চাইতেই দেখি, রুক্মিণী এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, মুকুর সঙ্গে ওর অনেক সাদৃশ্য আছে। মুকুর প্রথম যৌবনের উত্তাপ পেয়েছে রুক্মিণী। মুকুর মত ঢিলেঢালা করে শাড়ি পরে, চেয়ে থাকে মুকুর মতো আদর-প্রত্যাশী চোখে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "রুক্মিণী, স্যুটকেস গুছিয়ে রাখলে কি হবে, মুকু আর অনীতাকে তো ধরে আনতে পার নি?"

"আসবে, ওদের প্রয়োজনেই ওরা আসবে।" বলতে বলতে এগিয়ে এল রুক্মিণী।

"নাঃ! গোয়াবাগান থেকে যারা একবার বেরিয়ে গেল তারা কেউ আর ফিরে এল না। একদা গৌরীশংকর চৌধুরী বেরিয়ে এসেছিলেন একান্নবর্তী পরিবার থেকে, ভেবেছিলেন তিনি গোয়াবাগানকে পরিত্যাগ করলেন। আজ দেখছি তাঁর গোটা কুইন্স পার্কটাই পরিত্যক্ত হয়েছে। রুক্মিণী, এই বাড়িটার একতলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত আমি ওঠা-নামা করি, কিন্তু মনে হয় এখানে আমি বিশ্রাম করছি, রাত কাটাচ্ছি, থাকতে আসি নি। নিজের এই ঘরের বাইরে এক ইঞ্চি জায়গাও আমি চিনি না। অনীতাও এখানে রাত কাটাতে এসেছিল, থাকতে আসে নি। গোয়াবাগানের সম্পদ কুইন্স পার্কের বড় দারিদ্র্য। এই বাড়িটা কাউকে ধরে রাখে না, গোয়াবাগান রাখে।"

মিষ্টি হেসে রুক্মিণী জিজ্ঞাসা করল, "নতুন কর্মীদের ইস্কুল খোলা হয়েছে কোথায় জানো?"

"না তো।"

"গোয়াবাগানে। আমার উপরই ভার পড়েছিল গোয়াবাগানকে পরিচ্ছন্ন করবার।"

"তাই নাকি? বড়কাকার লাইব্রেরীটার কি হ'ল?"

"ঘরটা আছে, বইগুলো নেই। লরী-ভর্তি ক'রে কমরেডরা ধাপায় নিয়ে ফেলে দিয়ে এসেছে। শঙ্করাচার্য এবং রামানুজ প্রভৃতির গলিত দেহের পচাগন্ধ গোয়াবাগানে আর নেই। ঠাকুর ঘরের সামনে সেই বুড়ো সবেদা গাছটায় এখন জন্মেছে নব-কিশলয়। প্রাচীন অট্টালিকায় আমরা নবজীবনের কল্লোল তুলেছি। বুর্জোয়া-কিল্বিষ ধুয়ে ফেলেছি মার্কসবাদের পুণ্য দিয়ে।"

"আশ্চর্য! তুমি কেন গোয়াবাগানের জীবনে ঢুকে পড়লে রুক্মিণী?"

"না ঢুকলে তোমায় আমি উদ্ধার করব কি ক'রে?"

"উদ্ধার? আমি কি তলিয়ে গেছি নাকি যে, আমায় তুমি উদ্ধার করতে চাইছ?"

"তলিয়ে যাওয়ার ভয় আছে। তুমি তো কোনদিনও গোয়াবাগানের বাইরে আসতে পারো নি।"

মুহূর্তের মধ্যে বুকের ভেতর তোলপাড় সুরু হ'লো। বুঝতে পারলুম, অতি নিঃশব্দে রুক্মিণী আমার জীবনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। উদ্দেশ্য কি রুক্মিণীর? তার পিতার খণ্ডিত মস্তকের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে সে কি পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে? তাই যদি হয়, তবে রুক্মিণীর অনুপ্রবেশের চাতুর্য অতীব প্রশংসার যোগ্য। রুক্মিণী আমায় ভালবাসে, হয়তো বিবাহিত-জীবনের মিলন-আকাঙ্খা সুদূরপরাহত বলে ও আর মনে করে না। সবচেয়ে বড় নেতার শয্যা আজ সবচেয়ে মলিন। আকর্ষণের আয়োজন তাতে বিন্দুমাত্র নেই। কমিউনিস্ট জীবনের বৈরাগ্যের মধ্যে রুক্মিণী তবে পাবে কি? তা হ'লে রুক্মিণী বোধহয় তার প্রতিশোধের রাস্তা তৈরি করছে আমারই জীবনের মাঠের ওপর দিয়ে। নির্জন মাঠে রুক্মিণী আমায় একা পেতে চায়। আমি তো একাই। হয়তো সে

চায় আমি অসতর্ক হই। একেবারে বোধশক্তি হারিয়ে অসতর্ক না হ'লে রুক্মিণী আমায় আঘাত করবে না। তাই যদি হবে, তা হ'লে রুক্মিণী কেন হুকু আর অনীতাকে গ'ড়ে তুলছে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে আমারই চোখের সামনে? কতো তুচ্ছ এই কুড়িয়ে পাওয়া ময়লা কাগজের মতো হুকু আর অনীতার সুটকেস দু'টো! রুক্মিণী তাই-ই কুড়িয়ে এনেছে পুনর্গঠনের মাল-মশলা ভেবে। কিন্তু রুক্মিণী জানে না যে, সুটকেসের চামড়ায় প্রটোপ্লাজম নেই। আমি জিজ্ঞাসা করলুম,—"রুক্মিণী, মায়ের বুকে ক'টা গুলি লেগেছিল?"

আদর প্রত্যাশী চোখ দু'টো এবার ওর ছলছল করতে লাগল। জানলার ধারেই আমি দাঁড়িয়েছিলুম। রুক্মিণী এসে দাঁড়াল আমার গা ঘেঁষে। বলল, "দু'টো। একটা জগদ্ধাত্রীর বুকে, অন্যটা তাঁর নিজের বুকে।"

"জগদ্ধাত্রী তো পড়ে রয়েছে ও-পাশের ঘরে, মাটির আবরণ ফেটে খড় বেরিয়ে পড়েছে।"

"বিসর্জনের পরে মাটি আর খড় ছাড়া থাকবেই বা কি?"

"তবে জগদ্ধাত্রীর বুকে গুলি লাগল কি ক'রে?"

আমার ডান হাতটা ওর নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে প্রশ্নের জবাব খুঁজতে লাগল রুক্মিণী। জিজ্ঞাসা করলুম, "আমার হাতের মধ্যে তো জবাব নেই, তবে দেখছ কি?"

"দেখছি শাদা চোখেই কোন দাগ দেখা যায় কি না। কারো কারো চামড়ার ওপরেও দাগ ভেসে ওঠে।" এই বলে সে আমার হাতটা নিয়ে ওর বুকের ওপর রাখল। আস্তে ক'রে চাপ দিল হাতে। মুখে ওর কয়েকটা রেখা ভেসে উঠল। জিজ্ঞাসা করলুম, "হাতের বোঝা বয়ে লাভ কি?"

"বুঝবার জন্য যে, বারুদের আগুন মায়ের বুকের কতোটা পুড়িয়েছে। মা কেবল একলাই ছিলেন না, তাঁর বুকে জগদ্ধাত্রীও ছিলেন।"

"রুক্মিণী!" দু' হাতের মধ্যে ওকে টেনে নিয়ে বললুম, "এমন নোংরা হাতের মধ্যে তুমি ধরা দিতে চাও কেন?"

"তোমার হাতের নোংরা পরিষ্কার করবার তপস্যা করছি আমি। বাকী রাতটুকু তুমি আমায় ধরে রাখো। তোমার নিষ্কলংক ঠোঁটের মধ্যে দিয়েই

তোমার মনের কলংক আমি চুষে নেব। কণ্ঠ আমার নীল নয়, কিন্তু রক্ত আমার বিষাসক্ত। সর্ব ভারতের এডোনিস তুমি সম্বৎসর, আজ রাতে নাই বা হলে এডোনিস, এ্যানিমেল্ হও। আমি ভয় পাবো না। দেয়াল ধরে উঠবার শিক্ষা তুমি-ই আমায় দিয়েছ। দেয়াল-ঘেরা পিঞ্জরে আমি আজ গ্রেডিয়েটার—তুমি নরসিংহ। হাতে আমার অস্ত্র নেই, ঠোঁটে আছে অক্ষয় প্রেম। তোমার হাতের ছোবল আমার বুকে কোন দিনই ওজনের ক্লান্তি আনবে না। আনবে না জ্বালা।"

এক মিনিটের ব্যবধানে আমি বিশ বছর পেছনে চলে গেলুম! "ছা-ড়ো!!" রুক্মিণী ধীরে ধীরে হেঁটে চলে গেল খোলা দরজার দিকে। দাঁড়াল একটু। উল্টো দিকেই মুখ ক'রে বলল, "শম্ভু মাইতির বল্লমের দাগ তুমি উঠিয়ে দিলে আজ। পরিশুদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন ছিল আমার। মনের শুচিতা ফিরে পেলুম।" রুক্মিণী নিঃশব্দে দু'তলার সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। কলংক চুষে নেয়ার রুক্মিণী আর পরিশুদ্ধ হওয়ার রুক্মিণী কি এক?

বাকী রাতটুকু আর ঘুম এল না। জানলা দিয়ে রাস্তার ও-পাশের মাড়োয়ারীর বাড়িটা দেখা যায়। মাড়োয়ারীরা ওখানে আর কেউ নেই। সমস্ত কুইনস্ পার্কটাই জনসাধারণের কাছে নিষিদ্ধ এলাকা। কৃষি বিভাগের কমিশার কমরেড মিশ্র ঐ মাড়োয়ারীর বাড়িতে থাকেন। তারপরের বাড়িটায় থাকেন গুপ্ত পুলিশের ভাইস-কমিশার ওল্গা কাকীমা। পিসেমশাই রণদা ব্যানার্জি মাঝে মাঝে এখানে এসে রাত্রি যাপন ক'রে যান। বিবাহের নতুন আইন পাশ হওয়ার পরেই প্রথম বিচ্ছেদ, ওল্গা কাকীমার বিবাহ বিচ্ছেদ ছোটকাকার সঙ্গে। এবং প্রথম বিবাহ পিসেমশাই-র। অতএব, ওলগা কাকীমা আমার ওল্গা পিসিমা হ'য়েছেন। মিটিং ছাড়া তাঁর সঙ্গে আমার এক রকম দেখাই হয় না। কাকীমা কিংবা পিসিমা ব'লে সম্বোধন করবার সুযোগ আমার আজও আসে নি। কমরেডের চেয়ে কাকীমা কিংবা পিসিমা-ডাক নিশ্চয়ই বেশি সম্মানের নয়। পিসেমশাই আসাম-অঞ্চলের গুপ্ত পুলিশের একজন বড় কর্মচারী।

ছোটকাকার সামনে অন্ধকার। তাঁর আর গোয়াবাগানে থাকা সম্ভব

হয় নি। কলকাতার বাইরে একটা বন্দী-শিবিরের কমাণ্ডার হয়েছেন তিনি। খারগোস্তু টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের ওলগা এখন তাঁর ভগ্নিপতির বৌ।

রাত্ত প্রায় শেষ হ'য়ে আসছে। বেলা আট-টার সময় মার শবদেহ নিয়ে শোভাযাত্রা বেরুবে। খুব লম্বা শোভাযাত্রা। আমরা কালিঘাটের কুসংস্কার আইন ক'রে বন্ধ ক'রে দিয়েছিলুম। মন্দিরের কাছে যাওয়ার অধিকার ছিল না কারও। ধর্ম-ধর্ম ক'রে ভারতবর্ষের লোক বহু শতাব্দী চিৎকার করেছে। আমরা দেখতে চেয়েছিলাম, ভারতবর্ষের সত্যই কোন ধর্ম ছিল কি না। আইন পাশ হওয়ার পর একটা লোকও আসে নি এ-অঞ্চলে ধর্মকে ধ'রে রাখবার জন্যে। এক-ফোঁটা রক্ত দেয় নি একটা মানুষ আমাদের আইন অমান্য করতে। রক্তের চেয়েও ধর্ম বড়। কেবল মায়ের রক্তই সে-কথা প্রমাণ করেছে। লাল প্রহরীদের আদেশ তিনি শোনেন নি, অনুরোধ তাদের অগ্রাহ্য করেছেন। লাল প্রহরীরা জানতে পারে নি, তারা আমার মায়ের বুকে গুলি করছে। রাষ্ট্রের আইন কেবল মায়ের ধর্মবোধকেই সজাগ করতে পারল। রুক্মিণী বোধহয় ঠিকই বলেছিল যে, মা কেবল একলাই ছিলেন না, তাঁর বুকে জগদ্ধাত্রীও ছিলেন।

জানলা দিয়ে নিচের দিকে চাইলুম। দোতলার ঘর থেকে আলো এসে পড়েছে বাগানের গাছে। রুক্মিণীও কি তবে ঘুমোয় নি? অনীতার মতো রুক্মিণীও কি পুজো-প্রার্থনা করে? রুক্মিণী পুজো করবে না। আজ সে জীবনের তরঙ্গে গা এলিয়ে দেবে। ভেসে যাবে বাকী-রাত্রির দু'ঘণ্টার স্রোতে। ঘুমোতে সে পারবে না। রুক্মিণী আমার ভালবাসা পেয়েছে। আমার সুখ্যাতি সে করবে বাকী রাতটুকু।

সুখ্যাতি হয়তো করবে, কিন্তু সুখ্যাতির মধ্যে যদি ভালবাসার ক্ষমা না থাকে? পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধের জন্যে রুক্মিণীর অনুপ্রবেশ হয়তো ছড়িয়ে পড়বে আমার রক্তের স্রোতে। সে হয়তো আমার ধমনী মুখে ছিদ্র খুঁজে বেড়াচ্ছে। খুঁজুক রুক্মিণী তার আঘাতের পথ। আমি জীবন চেয়েছি, মৃত্যু এসে দাঁড়াবে সামনে। অন্তর্দ্বন্দ্ব সুরু হ'য়েছে ভ্রূণের পরিচ্ছন্নতা থেকেই। প্রকৃতির পরমাণুতেও চলেছে অন্তর্দ্বন্দ্ব। জীবন তো পরমাণুরই অংশ। পৃথিবীর চেয়েও বড় পরমাণু।

হঠাৎ যেন আমার মনে হ'ল, বোধহয় সেই জন্তেই আমি আজ বিশ বছর ধরে সংগ্রাম করছি। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের শোষণ না থাকলে আমি কি করতুম? রাজনীতির উচ্চতর ক্ষেত্রেও সংগ্রাম স্পৃহা স্বাভাবিক। দৈনন্দিন জীবনেও তো সংগ্রামের শেষ নেই। রোগ, শোক, দুঃখ দারিদ্র্য এবং অভাব-অভিযোগের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে মানুষকে। পৃথিবী কেবল তার অক্ষর উপর ঘুরছে না, মানুষগুলোকেও তার বুকের ওপর ঘোরাচ্ছে। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকলে, মানুষ মরে যেতে চাইত। শিল্প, কলা ও সাহিত্যের জন্ম হ'তো না। বড্ড একঘেয়ে লাগত একটানা সুখের পৃথিবী। ডায়লেকটিকস তাই জীবনের স্বাভাবিক দর্শন। ট্রয়নগরীর হেলেন দরজা ধাক্কা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলে তাকে পেতে ইচ্ছা করে না, কারণ যুদ্ধের সুযোগ তাতে নেই। পাওয়ার মধ্যে না-পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেই পাওয়ার প্রয়াসে প্রাবল্য আসে। আসে টেনশন। টেনশনই তো আর্ট।

সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় নামতে আরম্ভ করলুম। রুক্মিণীকে একলা রেখে আমি আলাদা ভাবে রাত্রি জাগতে পারছি না। দোষ তো রুক্মিণীর। এতো কাছে এল কেন রুক্মিণী? মুখটা উঁচু ক'রে চোখ বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল কেন? কিন্তু ভালবাসার জন্যেই যে ও চোখ বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল, তাই বা সত্যি হবে কি কারণে? শম্ভু মাইতির স্পর্শ ওকে এক মুহূর্তের জন্তেও সুস্থ বোধ করতে দেয় নি। বুর্জোয়া মনের এক বিশেষ অবস্থায় শম্ভুরা চিরদিনই ওদের কাছে অশুচি। রুক্মিণী হয়তো সেই অশুচি অবস্থাটা উত্তীর্ণ হ'তে চেয়েছিল। পরিশুদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনে সে এসেছিল ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান নেতার কাছে। রুক্মিণীকে স্পর্শ না করার ঘৃণা হয়তো আমারই থাকা উচিত ছিল। তা' হলে আমি নিশ্চয়ই ওকে ভালবাসি। নইলে স্পর্শ করলুম কেন?

দরজার কাছে এসে অতি নিঃশব্দে দাঁড়ালুম আমি। দরজার দিকে পেছন দিয়ে রুক্মিণী কি যেন লিখছিল। ঐ টেবিলটায় ব'সে অনীতাও লেখাপড়া করত। কতো শুচি, কতো শুচিতা ছিল অনীতার টেবিলের! রুক্মিণী আজ ভোর রাত্রে সেই টেবিলে বসে হয়তো প্রেমপত্র লিখছে। মুখে তো সব কথা

বলা যায় না। অনীতাও পারত না সব কথা সবার কাছে বলতে। ভোর-রাত্রের কথা সে ভগবানকেই নিবেদন করত।

রুক্মিণীকে শত্রু মাইতি অশুদ্ধ করতে পারে নি। রুক্মিণী দেয়াল ধরে দাঁড়িয়েছে; মাথা উঁচু ক'রে হাঁটছে সে। সংসারের কোটি কোটি সীতার চেয়ে রুক্মিণী বোধহয় অনেক বড়। অন্তত ছোট নয়। কোটি কোটি সীতার জীবনে সুযোগ আসে না অগ্নিপরীক্ষার। রুক্মিণীর এসেছিল। রামায়ণের আগুন গল্প, পাটোয়ারবাগানের আগুন বাস্তব।

বিড়ালের মতো পা ফেলে ফেলে এগুতে লাগলুম আমি। পাওয়ার মধ্যে না-পাওয়ার সংশয় আসছে। আসছে টেন্‌শন। রুক্মিণী কাঁদছে। গোটা গোটা অক্ষরগুলো চোখের জলে শক্ত হ'তে পারছে না। পেছনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কি লিখছ রুক্মিণী?"

"রিপোর্ট—বিনয়প্রকাশকে দিতে হবে। প্রতিদিন দিতে হয়।"

"রিপোর্ট?" চোখের পাতা আমার নড়ল না। চেয়ে রইলুম রুক্মিণীর দিকে। রিপোর্ট? কিসের রিপোর্ট? আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরতে লাগল। আসছে ডায়লেকটিকসের দর্শন। তিন তলায় যে চুম্বন ভিক্ষা করেছে, দু'তলায় সে রিপোর্ট লিখছে। লিখছে আমারই বিরুদ্ধে। আমার গোপন মনের ছবি আঁকছে রুক্মিণী। কাল সকালেই পেশ করতে হবে গুপ্ত-পুলিশের কমিশার বিনয়প্রকাশের কাছে। রুক্মিণী গুপ্তপুলিশের কাজ নিয়েছে। কাজ নিলেই কাজ ফুরোয় না, কাজ বাড়ে। রুক্মিণীরও বেড়েছে। মনের সমুদ্রে স্রোতের সংখ্যা বাড়ল। রিপোর্ট লেখা সহজ, জীবনের অঙ্ক অনেক জটিল। কিংবা অঙ্ক কষে জীবনের জটিলতার হিসেব পাওয়া যায় না।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলাম। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলুম না। এটা ছিল অনীতার পড়বার ঘর, প্রার্থনার গীর্জে। যাক, ভালই হ'ল। ষোল আনা পাওয়ার সোনায় চোদ্দ আনা খাদ মিশল না-পাওয়ার। হাঁটতে লাগলুম দরজার দিকে। একা আর হাঁটতে পারছিলুম না। মনে হ'ল দু'দিকে আমার দাঁড়িয়ে আছে হুকু আর অনীতা। মনে মনে বললাম, "আয় তোদের

দু'জনের ঘাড়ে দু'টো হাত রেখে চলে যাই নতুন গ্রহে। আমরা তিনে মিলে পথ ভোলা এক পথিক ছিলুম যেথা।"

পথ রুখে দাঁড়াল রুক্মিণী। দুদু আর অনীতাকে রুক্মিণী বোধহয় ঈর্ষা করে। "আমার ভালবাসার ষোল আনাই তুমি দাবি করছ কেন? আমায় যেতে দাও। ঘুম আসছে।" বললুম রুক্মিণীকে। "ষোল আনার-ষোক্কার ওপর তোমার ঘুমের-আঁটিও আমি চাই। তুমি ঘুমোবে, আমি পাশে বসে থাকব। সঙ্গে-শোবার দাবি এখন মুলতুবী থাক।" রুক্মিণীর চোখের জল শুকিয়ে গেছে এরই মধ্যে। বোধহয় কাঁদবার আর দরকার নেই। কাল আবার রিপোর্ট লিখবার সময় কাঁদবে রুক্মিণী। আরও একপা দরজার দিকে এগিয়ে গেলুম। রিপোর্ট-লেখা হাত দিয়ে রুক্মিণী আমার ডান হাতটা চেপে ধরল। ভারতবর্ষের সবচেয়ে শক্ত হাত, যে-হাত দিয়ে কোটি রুক্মিণীর গলার মাংস আমি খেৎলে দিতে পারি। বললুম, "পথ ছাড়ো, পেলে তো অনেক।"

"অনেক পেলে চলবে কেন, সব অনেকের সবটুকু যোগফলই আমার। জেগে থাকবার ঘণ্টাগুলোর সঙ্গে তোমার ঘুমিয়ে থাকবার মিনিটগুলোও আমায় দাও। দুদু-অনীতা কিছুই পাবে না। তোমার গর্ব নিয়ে ওরা বেঁচে থাক, কিন্তু ওদের খণ্ড নিয়ে তোমায় আমি বাঁচতে দেব না।"

"জোর ক'রে কোন কিছুই বলা চলে না রুক্মিণী। খণ্ড যখন সমগ্র হ'তে চাইছে, সমগ্র তখন খণ্ড হওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। জীবনের নিশ্চয়তার মধ্যে মৃত্যুর নিশ্চয়তা এক বিন্দু কম নয়। দুদুর মস্তিষ্ক-বাষ্প যখন মৌসুমী বায়ুতে ভর দিয়ে চলেছে হিমালয়ের দিকে, আমার মনের বাষ্প তখন সবেমাত্র গরম হচ্ছে। দুদুর মতো হয়তো আমিও একদিন হিমালয়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে পড়ব বৃষ্টি-বিন্দু হয়ে, মিশে যাব সমুদ্রের সমগ্রতায়। এই তো জীবন। তিনতলায় যখন সৃষ্টির স্পন্দন উঠল, দু'তলায় তখন মৃত্যুর রিপোর্ট লেখা হচ্ছে! তোমার কোন অপরাধ নেই রুক্মিণী, আমি জানি তুমিও বাঁচবার চেষ্টা করছ। বৃষ্টি-বিন্দুর মতো তোমারও খণ্ড-অস্তিত্ব মৌসুমী বায়ুর অপেক্ষায় আছে। পাহাড়ের গা দিয়ে গড়িয়ে পড়বার অপেক্ষা। সমুদ্রের সঙ্গে মিশে যাওয়ার

স্বাভাবিক। অথবা মুষ্টি-বিন্দুর মধ্যে সমুদ্রের প্রতীকাও স্বাভাবিক, অতএব সত্য। তোমার কোন অপরাধ নেই রুক্মিণী, তুমি তোমার স্বভাবের বাইরে যাও নি, যায় নি বিনয়প্রকাশও। যাওয়ার সাধ্যই ছিল না। গুপ্তরিপোর্ট লিখবার মধ্যেই তোমার বাঁচবার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিনয়—বিনয়কে দিয়েছে রাষ্ট্র। নইলে কংগ্রেসী আমলের এক ঠিকাদারের মেয়ে ভারতবর্ষের সর্বশক্তিমানের ঘরে আশ্রয় পেত না।"

রুক্মিণী পথ ছেড়ে দিল।

আমি তিন তলায় উঠতে লাগলুম। রুক্মিণী সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে যেন নিজের মনেই বলল, "আমার তা হলে মরে যাওয়াই উচিত।"

"কিন্তু মরতেও পারবে না, যদি আত্মহত্যা না করো। মার্কসবাদের কোথাও আত্মহত্যার নরম আবেগ নেই, এমন কি সমর্থনও নেই। মার্কসবাদে নেই বলেই হুকু নেপালের আগুনে আত্মহত্যা করে নি। নইলে করত।"

"করে নি বটে, কিন্তু এমন ক'রে বেঁচে থেকেই বা লাভ কি?"

সহসা ঘুরে দাঁড়ালুম। সিঁড়ির মাঝপথে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা করলুম, "কেমন ক'রে বেঁচে আছে হুকু?"

"অতি অশ্লীল পরিবেশের মধ্যে। বিশ-বাইশ বছরের একটা ছেলের সঙ্গে ঘর করছে। একটা বাচ্চা হয়েছে।"

আবার নেমে এলুম নিচে। রুক্মিণীর হাত দুটো টেনে নিয়ে এবার নিজের বুকের ওপর রাখলুম। বললুম, "হাত দিয়ে যদি আলোড়ন অনুভব না করতে পারো তবে কান পেতে শোনো। রুক্মিণী, হুকুকে আঘাত দিয়ো না। ওর বাচ্চার গায়ে যেন দাগ না লাগে। পুরনো সভ্যতাকে জয় করেছি আমরা, আমাদের সভ্যতাকে জয় করবে হুকুর বাচ্চা। মানুষ বসবার অবকাশ পাবে না। জীবন ও জগতের সর্বত্র রয়েছে গতি। গতির মুখে বাধা পড়লেই সংগ্রাম অনিবার্য। ভ্রূণের অন্ধকারেও সংগ্রাম আছে। জীবন দর্শনের মূলে ফটের সঙ্গে মেফিস্টোফিলিসের সংগ্রামটাই একমাত্র সংগ্রাম নয়। আরও সংগ্রাম আছে। ফস্টের সঙ্গে বড় ফস্টের, মেফিস্টোফিলিসের সঙ্গে বড় মেফিস্টোফিলিসের সংগ্রাম চলছে অবিরাম। ফস্টের মধ্যে কিংবা মেফিস্টো-

জিনিসের মধ্যে যদি যুক্তি না থাকে, তবে যুক্তির আইন বাতিল করে [illegible] যুক্তি না থাকলে, পৃথিবীর মঙ্গল থাকবে কেন? রুক্মিণী, কুকুরকে বাঁচতে দাও, তার বাচ্চাটাও বাঁচুক। ধর্ম দিয়ে না বাঁচাতে পারো, মানবতা দিয়ে বাঁচাও।"

"মানবতা? তোমরা মানবতায় বিশ্বাস করো না কি?"

"আমরা না করি, তুমি তো করো?"

"কিন্তু আমাদের মানবতা লতাগাছের মতো। যদি সে একটা অবলম্বন না পায় তবে লতাগাছ মাটির বুকে হামাগুড়ি দিয়ে চলবে। ঊর্ধ্ব দিকে মাথা তুলতে পারবে না। সাধ্য নেই তার ঊর্ধ্বগামী হওয়ার। অতএব তার একটা অবলম্বন চাই।"

"অবলম্বন তাকে দাও।"

"ভগবান ছাড়া মানবতাকে ঊর্ধ্বগামী করার আর কোন অবলম্বন নেই।"

"রুক্মিণী!!"

উপরে উঠতে লাগলুম। পা দু'টো আমার কাঁপছে না কি? কাঁপছে। বোধহয় স্নায়বিক দুর্বলতাই এর কারণ। সিঁড়ি গুনে গুনে উঠতে লাগলুম তিন তলায়। চলার কোন শেষ নেই। রুক্মিণী নিচে দাঁড়িয়েই বলল, "তুকুর ঠিকানা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। কমিশার বিনয়প্রকাশের সবচেয়ে যোগ্য গুপ্ত পুলিশ আমি-ই। আমায় তুমি ক্ষমা করবে, তেমন আশা আমি করি না। কিন্তু ফেলে তুমি দেবে না এ-বিশ্বাস আমার রইল। জন্মান্তরের মিলন আমার এখন শেষ ভরসা।"

নিজের ঘরে এসে বাতিটা নিবিয়ে দিলুম। দাঁড়ালুম এসে জানালার ধারে। সমস্ত বাড়িটা যেন নিগ্রো রমনীর কলকলধ্যায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কবি বদ্‌লেয়ার দুলছেন, তবু ঘুমতে পারছেন না। পূতিগন্ধময় আবর্জনা থেকে আমোদের রস খুঁজে বেড়াচ্ছেন কবি। নরক! নরক ছাড়া আর কি? জগতের সবগুলো রাস্তাই যেন সেই দিকে গতি নিয়েছে। কর্মের রাস্তা, জ্ঞানের রাস্তা, প্রমোদের রাস্তা সবই গিয়ে সেখানে মিশবে।

কবি এবার জানলা খুলে দিলেন। অন্তলগহ্বরে তিনি যেন স্বর্গসুখ পাচ্ছেন না। জানলার বাইরে চেয়ে আছেন, আলোর ইঙ্গিৎ বিচ্ছুরিত হয় যদি? দান্তের গহ্বরের দিকেও তিনি দৃষ্টি ফেললেন। সেখানে কি হচ্ছে? নরকের সত্য কি? দান্তের মানুষরাও সেখানে কষ্ট পাচ্ছে। পাচ্ছে, কারণ ভগবানের ভালবাসা থেকে ওরা আলগা হয়ে আছে। এ-সত্য বোধ ওদের এল কোথা থেকে? নরকের আবর্জনা থেকেই। অসৎ অনুভূতির মধ্যে সৎ-এর প্রত্যক্ষতা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বদ্‌লেয়ার চেয়ে রইলেন বাইরের দিকে। শতাব্দীর বিজ্ঞান-সচেনতা কবির দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। কবি বোধ হয় একলা পড়লেন। কয়েকটা শতাব্দী পার না হয়ে এলে কেউ সম্ভবত তাঁর দিকে আর চেয়েও দেখবে না। না দেখলেই বা দুঃখ কিসের? তাঁর নিজের শতাব্দীর স্রোতের ওপর মাথা তুলতে না পারলে সময়ের সংকীর্ণতা তিনি পার হবেন কি ক'রে?

কুইনস পার্কের রাস্তাটাও অন্ধকার। অনেক দূরে একটা আলো দেখা যাচ্ছে। প্রত্যূষ আসতে এখনো অনেক দেরি আছে। হঠাৎ যেন মনে হ'ল রাস্তাটা রাস্তা নয়, নদী। ওপারে ঘরের দাওয়ায় ব'সে মাটির হাঁড়িতে ঝুকু ভাত রাঁধছে। ওর পাশে ব'সে রয়েছে অনীতা। বাচ্চাটাকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে অনীতা। একটা লতাগাছ বাঁশের গায়ে ভর দিয়ে ঘরের চালের দিকে মুখ বাড়িয়েছে। ছোট ছোট ফুল ফুটে রয়েছে লতাগাছের পাতার গোড়ায়। ভাল লাগছে দেখতে। ওরা দু-জনেই স'রে গেছে আমার কাছ থেকে। যাক না, ভালই তো আছে ওরা। ঝগড়া ওদের মিটে গেছে। সহসা আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম—ওদের বোধহয় একটু ছুঁতে চেয়েছিলাম আমি। ওদের স্পর্শ পেলে আমার হাতের স্পর্ধা হয়তো একটু কমতো। কিন্তু আমি ধরতে পারলুম না। হাত যত আমার লম্বা হচ্ছে ওরা স'রে যাচ্ছে তত দূরে। হতাশ ভাবে আমি চেয়ে রইলুম ওদের ঐ বিলীয়মান সংসারটির দিকে।

পূব আকাশে সূর্য উঠল। কলকাতার বাস্তব সূর্য। জানলাটা এবার বন্ধ ক'রে দিলুম। মলিন শয্যায় শুয়ে পড়লুম আমি। এক মিনিটের ব্যবধানে পিছিয়ে গিয়েছিলুম জীবনের বিশটা বছর। ফিরে পেয়েছিলুম আমার হারানো

যৌবন। এক ঘণ্টা পরেই আবার মনে হ'ল, আরও তিরিশটা বছর এগিয়ে গেছি আমি। তিরিশটা বছরের লম্বা মরুভূমি—প্রতিটি মুহূর্ত খরখরে বালির মত প'ড়ে রইল আমার সারা জীবন ঘিরে। নরকদ্বারে প্রতীক্ষারত কবি এবার ভাবছে, তার প্রথম কাব্যের নস্টালজিয়া রুক্মিণীর চোখের জল নয়, চুম্বন।

চতুর্থ ভাগ

ক্ষুধগীর মাঠে এই সবে রোদ উঠেছে। অবনী মণ্ডল বেরিয়ে গেছে মাঠের দিকে। তার নিজের হাতে চাষ করা জমিতে হলধরের করুণা-ময়ূর পেখম মেলেছে। সারাটা মাঠ জুড়ে একটা সবুজ পেখম। তারই বাঁ পাশে ওবাইদ মোল্লার জমি। গত দশ পুরুষ ধ'রে ধানের চারাগুলো তাদের পাহাড়ী-দেহের মত বেঁটে হয়ে থাকত। বয়স বাড়লেও এদের উচ্চতা কোনদিনও বাড়ে নি। ক্ষুধগীর মাটিতে কোদাল মেরে মেরে ওবাইদ মোল্লার হাতের মাংস সব লোহার মত শক্ত হয়ে গেছে। কখন-সখন মেহের বিবিকে ধরবার দরকার হ'লে ওবাইদ মোল্লা তার পিঠের তলা দিয়ে হাতটা অতি হাল্কাভাবে গলিয়ে দিয়ে মেহের বিবিকে নিজের কাছে টেনে আনতে যায়। লোহার শিকের মত আঙুলগুলো বিবির গায়ে খোঁচা মারতে থাকে। ভোরবেলা সূর্যের আলোয় মুক্ত বাহুর দিকে নজর পড়তেই মেহের বিবি দেখতে পায়, কতগুলো নীল বর্ণের দাগ। মনে হয়, ওবাইদ মোল্লা যেন ওর সর্বাঙ্গে সারারাত ধ'রে টিপসই বসিয়েছে। বিবির গায়ে হাত বুলবার মত এক ইঞ্চি সোহাগ-বিহ্বল মাংস নেই হাতের চেটোয়।

হলধরের মাথার ওপর ঘর উঠেছে। সুলতানপুরের হিন্দু চাষীরা খবর পেয়ে হলধরের চারদিকে মাটির দেয়াল খাড়া ক'রে দিয়েছে। মজুরি কেউ নেয় নি। মহাজন অবিনাশ চাটুজ্জ্যের বাড়ি থেকে ঢেউ-খেলানো টিন ওরা খুলে নিয়ে এসেছে। কারো কাছ থেকেই অনুমতি নিতে হয় নি। সুদখোর অবিনাশ চাটুজ্জ্যের বাড়িতে কেউ ছিলও না। তারা সব পালিয়ে গেছে, না লাল পুলিশরা ধরে নিয়ে গেছে সে-খবর সঠিক ক'রে কেউ বলতে পারে না। অবিনাশ চাটুজ্জ্যের মত চারপাঁচ ঘর মধ্যবিত্ত আজ নেই ব'লে সুলতানপুরের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় নি। সুলতানপুরের অল্পসংখ্যক হিন্দুচাষীদের সঙ্গে তাদের কেবল টাকার সম্বন্ধ ছিল, সুখদুঃখের সম্বন্ধ ছিল না। অতএব, সুলতানপুরের

শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা রাতারাতি উবে গেল ব'লে হলধরের রাতই হ'ল বোল আনা। অবিনাশ চাটুজ্যের শোবার ঘরের ঢেউ-খেলানো টিন এসে উঠল হলধরের মাথার ওপর।

শনিবার দিন ভোর বেলা থেকেই ভিড় জমতে থাকে ভূষণ্ডীর মাঠে। শনিবার দিনই হলধর ভূষণ্ডীর মাটি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। এ স্বপ্নে পাওয়া দেব্‌তা নয়, এ একেবারে নিজের ইচ্ছেয় উঠে আসা দেব্‌তা। অবনী মণ্ডল প্রচারের কাজটা খুব ভাল ক'রেই চালিয়ে দিল। শনিবার দিন ভূষণ্ডীর পতিত জমিতে মেলা বসতে লাগল। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের নতুন সিকি-আধুলি জমতে লাগল হলধরের পায়ের কাছে। সুলতানপুরের হিন্দু চাষীরা কেবল দেবতার পায়েই প্রণাম করে না, সিদেয় নেওয়ার আগে অবনী মণ্ডলের সামনে মাথা নিচু করে বলে, "আর জন্মের পুণ্যি না থাকলে এমন ভাগ্য কি হয় দাদা? চাষী-মজুরদের রাজত্ব শুরু হ'ল ব'লেই তো সাক্ষাৎ-হলধর এসে ধরা দিলেন! কংগ্রেসী আমলে এমন সুবিধে ছিল না।"

"না, সুবিধে আর ছিল কই? সবই গেল, কলকাতায় চলে এলুম রিফিউজী হয়ে।" বলল অবনী।

"আসতেই হবে, হলধরই টেনে আনলেন কি না। দেবতা যখন দয়া করলেম, ভূষণ্ডীতে এবার তিনি নতুন বাস্তু তুলে দেবেন। তিনিই তো দেবার মালিক, নইলে এখানকার পতিত জমিতে সবুজ রং-এর ঢেউ বইত না। ধানের চারাগুলো সাঁইসাঁই ক'রে বাড়ছে।"

হুকু তার নতুন বাস্তর দাওয়ায় ব'সে পতিত ভূষণ্ডীর শ্রীবৃদ্ধি দেখে আর মনে মনে খুবই অবাক বোধ করে। কেবল সে অবাকই হয় না, মাঝে মাঝে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। হুকু বুঝতে পারছে, ভূষণ্ডীর মাঠে বিরুদ্ধ-বিপ্লবের হাওয়া উঠেছে।

হামুকে বুকের ওপর চেপে ধ'রে সে তার নিজের বাস্তর দিকে দৃষ্টি দেয়। ছোট্ট এই সংসারটার মধ্যে কোথাও সে মার্কসবাদ দেখতে পায় না। মার্কসবাদের অস্বীকৃতিগুলোই যেন ওর চোখের ওপর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সামাজিক জীবনের বাইরে এই ভাঙা বাস্তটাই মূল্যবান ধনসম্পত্তি হয়ে উঠেছে। সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীর হাতে সে তার ব্যক্তি স্বাধীনতা সমর্পণ করে নি, হামু এবং বসন্তকে নিয়ে হুকু

ভূষণ্ডীর মাঠে গড়ে তুলেছে একটা পরিবার প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে অবনী মণ্ডল এবং ওবাইদ মোল্লার চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। এমন শুভাকাঙ্ক্ষী প্রতিবেশীদের নিয়ে হুকু বোধহয় পারে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে এই ভূষণ্ডীর মাঠে। এত সুখ এবং শান্তি সে কোথায় পাবে? এই ছোট্ট সংসারটাকে খাড়া রাখবার দায়িত্ব পালনের কাছে কোন আদর্শই আজ আর বড় মনে হয় না হুকুর। গাদা গাদা বই প'ড়ে কতগুলো বছরই না সে নষ্ট ক'রে ফেলেছে! মোটরগাড়ী চেপে হাওয়া খেতে বেরুতে পারে না ব'লে ওর আর কোন অভিযোগ নেই। ভারতবর্ষের সনাতন সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে হুকু যেন দেখতে পেল, কেমন একটা অল্পে-তুষ্ট মানসিক প্রশান্তি রয়েছে। সব কিছু পেয়েও তার কোন কিছুতেই নেশা জন্মায় না। পাশ্চাত্ত্যের জড়বাদ হার মেনেছে ভারতবর্ষের পরিবার-কেন্দ্রিক প্রশান্তির কাছে। এক একটা পরিবার যেন এক একটা গীর্জা! দাওয়ায় বসে হুকু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, ভূষণ্ডীর মাঠের এই পরিবার-গীর্জাটিকে সে বাঁচিয়ে রাখবে, সহস্র আঘাত থেকে সে রক্ষা করবে এর প্রতিটি ধূলিকণা। সমস্যা সমাধান করবার জন্যে পাশ্চাত্ত্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার দরকার ছিল না। মানুষ যত সুখেই থাক, সমস্যা তার থাকবেই।

সুলতানপুরের চাষীদের কথা ভাবতে লাগল হুকু। প্রত্যেকটি পরিবারের সঙ্গে সে আত্মীয়তা পাতিয়েছে। বাংলা দেশের এই বিরাট অংশটার সঙ্গে ওর পরিচয় ছিল না। হুকুর বিশ্বাস, কলকাতার নোংরা রাজনীতির ধোঁয়া চাষীবাংলার বুকের ওপর কোন রেখাপাতই করতে পারে নি। ওবাইদ মোল্লার ঘরে হুকু যেন এক রূপকথার পৃথিবী আবিষ্কার করেছে! চাষীদের নিত্য-অভাবের সংসারে সে দেখতে পেয়েছে নিত্যানন্দের সোনার কাঠি। এখানেও সমস্যা আছে, কিন্তু সমস্যাগুলো জীবনের সঙ্গে এমন স্বাভাবিকভাবে মিশে গেছে যে, কোন সমস্যার মধ্যেই এরা কৃত্রিম ভয়াবহতা দেখতে পায় না। যে-ভয়াবহতার জন্যে হুকু মার্কসবাদের অস্ত্র দিয়ে গোয়াবাগানের মজবুত সংসারটাকে ভেঙ্গে দিতে পারল, সেই ভয়াবহতা থাকা সত্ত্বেও এরা কিন্তু এদের ভাঙাচোরা সংসারগুলোকে আঘাত করতে পারে নি। জীবনের সবটুকু শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দিয়ে সংসারের নড়বড়ে খুঁটিগুলোকে এরা ধরে রেখেছে। সমস্যা যদি

স্বাভাবিক হয়, তবে সমাধানও তার স্বাভাবিকভাবেই আসবে। কেবল পুঁজিবাদ তুলে দেওয়ার জন্যে এতবড় বিপ্লবের প্রয়োজন ছিল কি? তা ছাড়া এ-বিপ্লবের অঙ্কুর আমরা আমদানি করেছি পাশ্চাত্ত্য থেকে। আমদানি জিনিষ যত ভালোই হোক, তা নিয়ে কোন দেশই সত্যিকারের সমৃদ্ধিশালী হ'তে পারে না। তা যদি হবে তা হ'লে জাতীয় ঐতিহ্যের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে হয়। আমরা যদি জাতিভেদ প্রথা তুলে দেওয়ার জন্যে আইন পাশ করতে পেরে থাকি, তবে কেন পারব না পুঁজিবাদ তুলে দেওয়ার জন্যে আইন পাশ করতে? একটু অপেক্ষা করলে হয়তো পারতুম, কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের আমদানি মার্কসবাদের অঙ্কুর সুড়ঙ্গপথ দিয়ে ঢুকে পড়ল ভারতবর্ষের কাঁচা মাটিতে। ঢুকে পড়তে সাহায্য করল ভারতবর্ষের শিক্ষিত শ্রেণী। মুকু ভাবল, সারা পৃথিবীর একই গণদেহের মধ্যে যদি কোনদিন শ্রেণীহীন বিশ্বরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়ে ওঠে, সেদিন যেন ভূষণ্ডীর নতুন বাস্তুটার মধ্যে জ্বালানো থাকে মানব-সভ্যতার সেই ব্যক্তিমনের মহামূল্যবান স্বাধীনতার দীপ।

সুলতানপুরের চাষীদের দেখে মুকুর মনে বিরুদ্ধ-বিপ্লবের হাওয়া উঠেছে। লোভ হয় নতুন নেতৃত্ব গ্রহণ করতে। ইচ্ছে করলেই মুকু এসে দাঁড়াতে পারে ওদের সামনে বিরুদ্ধ বিপ্লবের ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে। প্রকাশ্য দিবালোকে সহস্র লোকের সামনে দাঁড়িয়ে সে তার নিজের বক্তব্য কোনদিনই বলতে পারে নি। গত বিশটা বছর কেটেছে ওর অন্ধকারে। ছদ্মবেশ আর ষড়যন্ত্রের মুখোশ প'রে প'রে ওর নিজের মুখ গেছে হারিয়ে। আজ আর শত চেষ্টা করলেও মুকু তার হারানো মুখটা খুঁজে আনতে পারবে না। বাংলার কাদা-মাটিতে কাস্তে হাতুড়ির ঘা লেগে লেগে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য-রং গেছে বিলুপ্ত হয়ে। নব-অজন্তার গুহাগাত্রে মার্কসিস্ট মুকুর মুখোশটাই থাকবে খোদাই করা। ভারতবর্ষের শিল্প-তীর্থে ওর সত্য পরিচয় হারিয়ে গেছে চিরদিনের জন্যে।

•

ভোরবেলায়ই অবনী মণ্ডল মাঠে চ'লে এসেছে। হলধরের পায়ে নিড়ানিটা একবার ঠেকিয়ে নিয়ে সে এসে ব'সে পড়ল নিজের জমিতে। ধানগাছের

ফাঁকে ফাঁকে সব আগাছা জন্মেছে। আগাছার গোড়ায় নিড়ানি চালাচ্ছে অবনী। ওবাইদ মোল্লা কখন্ যে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সে তা টের পায় নি। ওবাইদ খুব মনোযোগ দিয়ে ওর হাতের আঙুলের ক্ষিপ্রতা পর্যবেক্ষণ করছিল। নিড়ানি চালাবার কলা-কৌশল যেন অবনী মণ্ডলকে শিল্পীর স্তরে টেনে তুলে এনেছে। উত্তীর্ণ হয়েছে সে কৃষিমজুরের সাধারণ মেহনতি-সীমা। নিড়ানির খোঁচায় মাটির বুকে শিল্প সৃষ্টি করছে সে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রসিকজনের মত ওবাইদ মোল্লা দেখতে লাগল ওর কৃষি-সৌন্দর্য। শুনতে লাগল বন্ধ্যা মাটির নতুন ভাষা, যে-ভাষার মধ্যে ভূষণ্ডীর জীবন পলে পলে প্রকাশিত হচ্ছে সর্বজনীন সম্ভ্রম নিয়ে।

সহসা নিড়ানির কাজ বন্ধ ক'রে অবনী মণ্ডল বলল, "জমির ওপর যদি চাষীর মালিকী সত্ব না থাকে, তবে বোধ হয় সে-জমিতে কোন চাষীরই হাত চলে না। মজুরী নিয়ে মাটি চাষ করা যায়, কিন্তু মাটিকে ভালবাসা যায় না। তুমি কি বল ভাই ওবাইদ?"

"যথার্থ কথা বলেছ। নাও, হুঁকোটা ধরো।" হাতের হুঁকো অবনীর দিকে এগিয়ে ধরল ওবাইদ মোল্লা।

দু-চার টান্ মেরে হুঁকোটা পুনরায় ওবাইদ মোল্লার হাতে তুলে দিয়ে অবনী মণ্ডল বলল, "শহরের বাবুরা বোধ হয় আমাদের কাছ থেকে জমি সব কেড়ে নেবে। চাষীর ইজ্জৎ মারবে শিক্ষিত বাবুরা।"

"কেন ভাই অবনী?"

"শহর থেকে বাবুরা আসবে কলের লাঙল চেপে। কার জমি কে যে কখন্ চ'ষে দিয়ে যাবে, আমরা তার হদিসই পাব না। সরকারী খাতায় জমির হিসেব থাকবে, থাকবে ফসলের হিসেবও। থাকবে না কেবল চাষীর মান-মর্যাদার হিসেব। জমির আর জাতজন্মের ঠিক থাকবে না ওবাইদ ভাই।"

"আমরা তবে কি করব?" ভয় পেয়ে প্রশ্ন করল ওবাইদ মোল্লা।

"আমরা চাষের কাজই করব, কিন্তু মজুরী দেবে বাবুরা। খবর রাখো, সুলতানপুর এবং আশপাশের পাড়াগাঁ থেকে ধনীচাষীরা ক্রমে ক্রমে উধাও হয়ে যাচ্ছে?"

"কোথায় যাচ্ছে ?"

"কোথায় যাচ্ছে ভগবান জানেন। সরকারী লোকেরা এসে তাদের জমি সব কেড়ে নিচ্ছে। এক সঙ্গে জমি চাষ হবে, আমরা সব ঘন্টা হিসেবে মজুরী পাব।"

যেন দশপুরুষের ব্যর্থতার যেন পুরস্কার পাচ্ছে মনে ক'রে ওবাইদ মোল্লা সহর্ষে ব'লে উঠল, "আমি তা হ'লে বেঁচে যাই। ভুবণ্ডীর পতিত জমিতে লাঙল ঠেলে ঠেলে দশ পুরুষ থেকে তো কেউ পেটের খোরাক জোটাতে পারে নি। মজুরীর পয়সা দিয়ে এবার পেট ভ'রে ভাত খেতে পাব। লাল টুপীর কেরামতি কম নয়। রাজত্বটা হাতে নিয়েই তো দেখছি শাজাহান মিঞা গরীব চাষীর ঘরে ঘরে চাল পৌঁছে দিয়ে আসছে। ভাই অবনী, সুলতানপুরে এত চাল বেশি হ'ল কি ক'রে ?"

"লোক সব কমে গেছে ব'লে। লোক আরও কমবে। সুলতানপুরের ভদ্রলোকেরা সব কোথায় গেল ওবাইদ ভাই ? কাউকে আজকাল আর দেখতে পাই নে। লোক যত কমবে চাল তত বেশি হবে। হুঁকোটা দাও দিকি, আর দু'টো টান্ দিয়ে দিই।"

অবনী মণ্ডল তামাক খেতে লাগল।

নবীন কামার যাচ্ছিল বসিরহাটে কাজের খোঁজে। হলধরের সামনে যন্ত্রের বাক্সটা রেখে সে প্রণাম করল মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে। প্রণামের চাপ যদি আর একটু বেশি হ'তো, তা হ'লে তার নাকের ডগার চশমাটা হয়তো ভেঙ্গে পড়ত দু-টুকরো হয়ে। হলধর চাষীর দেবতা, কামারের চশমা তিনি জোড়া লাগাতেন কি ক'রে ? নবীন কামারের পেছনে দাঁড়িয়ে প্রশ্নটা উত্থাপন করল ওবাইদ মোল্লা নিজের মনে। অবনী মণ্ডলও উঠে এসে দাঁড়িয়েছে নবীনের পাশে। চশমা মুছতে মুছতে নবীন বলল, "দিনরাত চোখ দিয়ে জল পড়ে। কিছুই আজকাল ভাল ক'রে দেখতে পাই নে।"

"তোমার বোধ হয় নতুন চশমা দরকার।" বলল অবনী মণ্ডল।

"বসিরহাটের দত্তবাবুরা কেউ নেই, থাকলে তাঁরা আমায় কলকাতা থেকে চশমা আনিয়ে দিতেন। বড়কর্তা সঙ্গে ক'রে আমায় কলকাতা নিয়ে গিয়ে-

ছিলেন সেবার। নইলে এই চশমাটাই বা জুটতো কি ক'রে?" এই ব'লে নবীন চশমাটা নাকের ওপর তুলে দিয়ে দু-দিকের কানে সুতো বাঁধতে বাঁধতে পুনরায় বলল, "কিছুই আর দেখতে পাই নে ভাই। ভালই হয়েছে, যা সব ঘটছে চারদিকে! দুঃখু কেবল, এত কাছে ব'সেও হলধরের চোখমুখ সব কেমন আবছা-আবছা দেখাচ্ছে।"

নবীন কামারের হাতে হুঁকো তুলে দিয়ে ওবাইদ মোল্লা বলল, "তোমার দৃষ্টি বোধহয় ঠিকই আছে নবীনদা। পাথরের ওপর সত্যিই কোন চোখমুখ নেই।"

মুখ থেকে হুঁকোটা আলগা ক'রে নবীন তার জবাবের সুরে প্রত্যয়ের ঝঙ্কার তুললো, "মনে যদি বিশ্বাস না থাকে, তবে মুখ থাকলেও দেখা যায় না।"

আলোচনাটা যেন সোজা পথ ধ'রে চলছে না মনে ক'রে অবনী মণ্ডল বলল, "আমরা মুখ্খু মানুষ। ঠাকুর-দেবতাকে নিয়ে তর্ক করবার বিদ্যা আমাদের নেই। যাকে দেবতা ব'লে মানি, তাঁর চোখ-মুখ না থাকলেও মানি।—তোমার চোখ দিয়ে বড্ড বেশি জল পড়ছে নবীনদা।"

"দু-চার ফোঁটা চোখের জল যদি না পড়ে, তা হ'লে সুলতানপুরের আগুন তো কোনদিনই নিভবে না অবনী।" নবীন কামার কল্কেটা মুখের সামনে এনে টিকের আগুনে ফুঁ দিতে লাগল।

একটু পরেই যন্ত্রের বাক্সটা হাতে নিয়ে নবীন কামার যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। বসিরহাট এখান থেকে কম দূর নয়। সন্ধ্যের মধ্যেই সেখান থেকে আবার ফিরে আসতে হবে। ওসমান গণির বাড়িতে মিটিং বসবে। নবীনকেও সেখানে উপস্থিত থাকবার জন্যে কমরেড শাজাহান অনুরোধ ক'রে খবর পাঠিয়েছে। ওসমান গণির বাড়িটা বেশ বড় এবং মজবুত ব'লে সেখানেই কমরেড শাজাহান তার অফিস খুলেছে। বড় মিটিং ডাকলেও কোন অসুবিধে হয় না। গত দু-মাস থেকে প্রায় প্রত্যেকদিনই সেখানে মিটিং বসছে। রাজনৈতিক মিটিং নয়, সুলতানপুরের আর্থিক এবং সামাজিক উন্নতি কেমন ক'রে এবং কত তাড়াতাড়ি সম্ভব হ'তে পারে, তারই পরামর্শ চলে প্রতিদিন। কমরেড শাজাহান পরামর্শ চায় নবীন কামারের কাছেও।

খুঁৎখুঁ এবং গরীব ব'লে সরকারী-পার্টি তাকে অবহেলা করে নি। মিটিং-এর ঘরে ব'সে নবীন যেন নতুন মানুষ ব'লে মনে করে নিজেকে। হঠাৎ সে ভাবতে থাকে, সুলতানপুরের প্রতি ইঞ্চি জমির সঙ্গে ওর আত্মীয়তা আছে। এক ইঞ্চি জমির যদি ক্ষতি হয় তা হ'লে ওর নিজের দেহেরও ক্ষতি হবে। এই সে প্রথম ভাবতে শিখল যে, দেশটা ওর নিজের। এমন ক'রে ভাবতে না পারলে, সেদিন কমরেড শাজাহানের প্রস্তাব সে সমর্থন ক'রে এল কেন? ধনী চাষীরা কৃষি-সমবায়ে যোগ দেবে না ব'লে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এক ইঞ্চি জমির স্বত্ব তারা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিতে রাজী হয় নি। কমরেড শাজাহান তাদের গ্রেপ্তার করবার প্রস্তাব পেশ করেছিল মিটিং-এ। দেশের কল্যাণের কথা ভেবেই নবীন সেদিন তার প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়ে এসেছিল। তারপর? তারপরে সুলতানপুরের ধনীচাষীদের সে আর চোখে দেখতে পায় নি। খালি বাড়িগুলোতে ক'দিন পরে নতুন লোক এল। বাঙালী ব'লে মনে হয় না তাদের। ধনীচাষীদের জমি চাষ করবার জন্যেই না কি কমরেড শাজাহান এদের নিয়ে এসেছে মাদ্রাজ মুলুক থেকে। ভালই হয়েছে। এরা না এলে, নতুন ফসল সব নষ্ট হয়ে যেত। সুলতানপুরে শুরু হ'তো মন্বন্তর। নবীন কামার কমরেড শাজাহানের প্রস্তাব সমর্থন ক'রে পুণ্যের কাজই করেছে। সেই ভোটের রাত্রে ঘুমুতে যাওয়ার আগে নবীন কামার ভগবানের কাছে জানতে চেয়েছিল যে, তার নিজের অধিকারে এক ইঞ্চিও জমি নেই ব'লে কি সে ধনীচাষীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিয়ে এল না? বোধ হয় না। তা যদি হবে তা হ'লে অন্যান্য চাষীরাও কেন ওদের বিরুদ্ধে ভোট দিল? হয়তো অন্যান্য চাষীদের অবস্থা তেমন ভাল নয় ব'লেই তারা ভোট দিয়েছে। ভোটের রাত্রিটা পার হয়ে গেছে তিনমাস আগেই। কিন্তু নবীন কামার আজো তার বিবেকের মধ্যে কি রকম একটা দংশন অনুভব করে। পাপের বোঝা কমাতে আসে হলধরের কাছে। আসে বটে, কিন্তু ফলাফল সে আজো জানতে পারে নি।

যন্ত্রের বাক্সটা ডান হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে নবীন চলে এল মাঠের মধ্যে। পেছনদিকে ফিরে বলল, "বেলা হয়ে গেছে দেখছি। কাজকর্ম কিছু জুটলে

হয়। যেতেও কম সময় লাগবে না। আজকাল আর ফুলবতীর মাঝখান দিয়ে সিধে রাস্তায় যাওয়া যায় না।"

অবনী মণ্ডল জিজ্ঞাসা করল, "কেন?"

"বসিরহাট থেকে সুলতানপুর পর্যন্ত রেল-লাইন বসছে। লাল পুলিশরা এদিকের রাস্তা দিয়েছে বন্ধ ক'রে।"

ওবাইদ মোল্লা উৎসাহিত হয়ে বলল, "এবার তা হ'লে বসিরহাটের বাজারে আমরা নিজেরাই শাক-সব্জি বেচতে যেতে পারব নবীনদা।"

"হাঁ, একেবারে নাশ্‌তা-পানি খেয়ে গিয়েই বাজারে বসতে পারবে। পাইকারদের অত্যাচার থেকে বাঁচলে।" অভয় দিল নবীন কামার। লুঙ্গির তলাটা কাছার মত করে পেছন দিকে টেনে দিয়ে ওবাইদ মোল্লা আগ্রহের স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "রেল-লাইন বসতে আর কতদিন লাগবে?"

"দশ মাইল রাস্তা ছ-মাসেই শেষ ক'রে ফেলেছে। বাকী দু-মাইল চোখের পলক ফেলতে ফেলতেই হয়ে যাবে ভাই ওবাইদ।"

"কল্ বসিয়েছে বুঝি?" জিজ্ঞাসা করল অবনী।

"না।" নবীন কামার কি যেন ভাবছিল। মিনিট পাঁচেক পর্যন্ত ভেবে নিয়ে সে হলধরের দিকে চেয়ে বলতে লাগল, "হাজার হাজার মজুর লাগিয়েছে লাইন বসাবার জন্যে। লাল পুলিশরা চারদিকে পাহারা দিচ্ছে। কাজে ফাঁকি দেবার উপায় নেই। কংগ্রেসী আমলে বাবুরা তো কাজ করত না, মাঠে ময়দানে গিয়ে মাইনে বাড়াবার জন্যে কেবল চেঁচাত। ছ-মাসের কাজ সাত বছরেও শেষ হ'তো না। এখন? এখন কি হ'ল?"

"কি হ'ল?" আনন্দের উচ্ছ্বাসে পাল্টা প্রশ্ন করল ওবাইদ মোল্লা।

"ছ-মাসেই লাইন বসানো শেষ হ'ল। বাবুরা সব মাটি কাটছে। জঙ্গল সাফ করছে, লাইন বসাচ্ছে। হাজার হাজার বাবু!......মজুরদের মধ্যে হরেন ডাক্তারকে দেখলুম। দেখলুম দত্তবাবুর বড় ছেলেকেও। পরের পয়সায় অনেকদিন ব'সে ব'সে খেয়েছ, এবার?"

"এবার কি?" উসখুস করতে করতে প্রশ্ন করল ওবাইদ।

"এবার সব বাড়তি চর্বি গেল কোথায়? ছ-মাসের মধ্যেই হরেন ডাক্তার

প্যাকাটির মত থরথর করছে। এবার? এবার তোমার ভিজিট কে দিচ্ছে বাবা? বড় ছেলেটার কী সর্বনাশই না ক'রে গেছে হরেন ডাক্তার। তবুও লাল পুলিশের হাতে একটা বিড়ি গুঁজে দিয়ে ভেবেছিলুম, হরেন ডাক্তারের সঙ্গে একটা কথা ব'লে আসব। দেখা করতে দিলে না। আমার হাতে লাল পুলিশরা একটা সিগারেটের প্যাকেট দিয়ে বললে, সিগারেট খাও, বাড়ি যাও। মজুররা যদি কাজ না করে, তবে রাষ্ট্র বড় হবে কি করে? অবনী, আমি তো সিগারেট খাই না, প্যাকেটটা তোমাদের কাছেই থাক।" নবীন কামার তার যন্ত্রের বাক্স থেকে সিগারেট বার করতে গিয়ে হঠাৎ সে বাক্সটা বন্ধ ক'রে ফেলল। অবনী মণ্ডল জিজ্ঞাসা করল, "ওটা কি তোমার বাক্সে? বাটি ভর্তি ক'রে ভাজা মাছ নিয়ে যাচ্ছ কোথায় নবীনদা?"

"না, না, ও কিছু না। লাল পুলিশদের সঙ্গে কথাবার্তা সব পাকা হয়ে গেছে। ওরা হরেন ডাক্তারকে মাছ ভাজা ক'খানা পৌঁছে দেবে। আমি জানি, হরেন ডাক্তার সোনা মাছ খেতে বড্ড ভালবাসত। হাঁ, হাঁ—পৌঁছে ওরা নিশ্চয়ই দেবে। অবনী—"

প্রাণপণে পা চালিয়ে নবীন কামার হাঁটতে লাগল বসিরহাটের দিকে।

একটু অন্যমনস্কভাবে অবনী মণ্ডল জিজ্ঞাসা করল, "আজ তা হ'লে ওসমান গণির বাড়িতে যাচ্ছ তো?"

"যাব, যাব। শাজাহান মিঞা মিটিং ডেকেছে। আমি ওদের জন্যে সব করতে পারি, কিন্তু ওসমান গণিকে ধরিয়ে দিতে পারি নে। সে আমার অতিথি। খোদা মেহেরবান।" বলতে বলতে ওবাইদ মোল্লা নেমে এল মাঠে। সঙ্গে এল অবনীও। সহসা দু-জনেই এক সঙ্গে আকাশের দিকে চোখ তুলতেই দেখতে পেল, নৈঋত কোণ থেকে শকুন উড়ে আসছে, অসংখ্য শকুন।

•

উনোনে এখনো আগুন দেয়া হয় নি। বেলা বেড়ে যাচ্ছে। দাওয়ায় বসে স্বরূ কি যেন লিখছিল। বসন্ত এসে দাঁড়াল ওর সামনে। জিজ্ঞাসা করল, "কি লিখছেন?"

"চিঠি।" মুখ নিচু ক'রেই জবাব দিল স্বরূ।

"কার কাছে লিখছেন ?"

"ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে। বসন্ত, উন্নতির যুগে কেউ তো আর চিঠি লেখে না, টাইপ করে। ডুপ্লিকেট রাখে—রাখে ফাইলে, অন্তরে নয়। কলম দিয়ে আমার গন্ত আসছে না।"

"তবে ?" বসন্তর বিস্ফারিত চোখে প্রচুর বিস্ময় !

"আমি কবিতায় চিঠি লিখছি। গদ্যের ভাষায় মনের গভীরতা প্রকাশ করা যায় না।"

"এটা তো গভীরতার যুগ নয়।" আলোচনার ওপর উপসংহার টানবার চেষ্টা করল বসন্ত দাস।

"তা হ'লে আমি বোধহয় বেদের যুগে বিচরণ করছি।" এই ব'লে ঝুকু তার কাগজের টুকরোটা ভাঁজ ক'রে রাখল। ওর নবতম কাব্যঐশ্বর্য ঝুকু সম্ভবত বসন্তকেও দেখাতে চায় না। তুলে রাখতে চায় ভবিষ্যৎ-বংশধরদের জন্যে। কেবল গৌড়জন নয়, বিশ্বজন অপেক্ষায় থাক আনন্দে সুধা পান করবার প্রতীক্ষা নিয়ে। বুভুক্ষু বাঙালী-জীবনের নগ্ন-মৃত্যুর অভিজ্ঞতায় এ-কাব্যের উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে না। যাবে ঝুকুর নিজেরই মজ্জা-মন্থনের নিবিড়তম যন্ত্রনাসম্ভোগের মধ্যে।

কবিতা-লেখা কাগজখানা হাতের মুঠোর মধ্যে ধ'রে রেখে ঝুকু নিজের মনেই আবৃত্তি করতে লাগল :

"তেলাপোকা আর
তেলাকুচা মাঝে
কোন ভেদ নেই,
কলোনীর এই
মাটির থালায়
ক্ষিধের জ্বালায়
এ-যুগের বিষ খেয়েছি চেটে।

বসন্ত, অতঃপর আমি যদি কবিতার ভাষায় কথা বলি, তাতে তোমার অসুবিধে হবে না তো ?"

"না, আমার যদি কবিতার ভাষায় জবাব দিতে না হয়।"

একটু হেসে কবিতা-লেখা কাগজখানা বসন্তর হাতে দিয়ে কুহু বলল, "ভবিষ্যতের কথা ভেবে লাভ নেই। কবিতা লিখছি তোমার জন্যেই।"

কুহু নেমে এল সামনের উঠোনে। ঘরের বাঁ দিকে বসন্ত একটা মাচা তৈরি করেছে। কয়েকটা লাউ গাছ এরই মধ্যে মাথা তুলেছে মাচার দিকে। দিন দশ-বারোর মধ্যেই গাছগুলো বাঁশের গায়ে ভর দিয়ে ছড়িয়ে পড়বে মাচার ওপর। সুলতানপুরের চাষীরা ভূষণ্ডীর এই বাস্তহারা পরিবারটির জন্যে একখানা কোদাল সংগ্রহ ক'রে দিয়েছে। কোদালখানা পড়েছিল মাচের ওপরেই। কুহু সেই কোদাল দিয়ে ঝপ ঝপ ক'রে কোপ বসিয়ে দিল ভূষণ্ডীর মাটিতে। ওবাইদ মোল্লা কথা দিয়ে গেছে, আজ সে লঙ্কা আর বেগুনের বিচি নিয়ে আসবে।

বসন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুহুর মাটি কাটা দেখছিল। কেবল দেখছিল না, বিস্মিত হচ্ছিল প্রতি পলে পলে। এমন অদ্ভুত ধরণের মেয়ে সে কোনদিনও চোখে দেখে নি। কুহু পারে না এমন কাজ বোধহয় দুনিয়াতে কিছুই নেই। যে-হাত দিয়ে সে এই একটু আগে কলম ধরেছিল সেই হাত দিয়েই সে এখন কোদাল ধরেছে। ভূষণ্ডীর পোড়া মাটি কেটে পড়ছে টুকরো টুকরো হয়ে। এমন বিপরীতের খেলা বসন্ত কোনদিনও দেখে নি। যে মেয়েটি তার গোয়াবাগানের বাড়িটা অনায়াসে ফেলে দিয়ে আসতে পারল, সে নিজেই আজ ভূষণ্ডীর ভাঙা বাস্তটাকে ধ'রে রাখবার জন্যে সর্বস্ব পণ করতে পারে! মেয়েটির বিপরীতমুখী চরিত্রের অত্যাশ্চর্য গঠন-নৈপুণ্য বসন্তকে ক্রমশই অভিভূত ক'রে ফেলছে। এক একবার মনে হয় নিজের জন্যে বসন্ত আর কিছুই ধ'রে রাখবে না। নীতি-দুর্নীতির পূর্ণকুম্ভটি কুহুর হাতে তুলে দিয়ে চিরদিনের জন্য সে নিশ্চিন্ত হবে। কি দরকার বিগতদিনের অস্তমিত সভ্যতা সূর্যের দিকে চেয়ে থাকবার? সারা পৃথিবীর ওপর যদি অন্ধকার নেমে আসে, বসন্ত কি পারবে তার নীতিবোধের প্রদীপ জ্বালিয়ে তা ঠেকিয়ে রাখতে? কুহু যখন ওকে ভালবাসে তখন স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্কটাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে নিলেই তো হয়। পুরোহিতকে বাদ দিয়ে দু-জনে মিলে একটা অনুষ্ঠান কি শেষ ক'রে

ফেলতেও পারল না ? বসন্ত ভাবল, হুকু যদি এবার তেমন একটা প্রস্তাব উত্থাপন করে, সে তা সহজেই মেনে নেবে। সারা সুলতানপুরের সামনে মুখোশ পরে সে আর কতদিন কাটাতে পারবে ? অবনীদার মুখের দিকে সে সোজাভাবে চাইতে পারে না। আসামীর মত মাথা নিচু ক'রে রাখতে হয়। তা ছাড়া হুকুর পাশে শুয়ে সে আর কতদিন এমনি ভাবে রাত কাটাবে ? হামু বড় হয়ে উঠলে সবই তো সে বুঝতে পারবে। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে বসন্ত ঘেমে উঠল অতি অকস্মাৎ। হুকুর দিকে সে চেয়ে রইল কৌতূহলের দৃষ্টিতে। কি চায় হুকু ? সুলতানপুরের প্রতিটি চাষীর ঘরে গিয়ে হুকু আত্মীয়তা পাতিয়ে এসেছে। প্রচার ক'রে এসেছে তার স্বামী-গর্বের কাল্পনিক কাহিনী। বসন্তর মত স্বামী পাওয়া খুবই ভাগ্যের কথা। এখন ব্যাটা যদি তার বাপের সংগুণ-গুলো পায়, তা হ'লে হুকুর আর বিন্দুমাত্র ক্ষোভ থাকবে না। রিফিউজীদের জীবন থেকে অভিযোগের সংখ্যাগুলো লোপ পাবে চিরদিনের জন্যে। চাষী বৌদের চুমু খেয়ে খেয়ে হামু কেবল বাড়ছে না, রাঙা হয়ে উঠছে। বসন্ত সবই জানে। কিন্তু হুকু ওকে সত্যিই ভালবাসে কি না তা সে আজো সঠিক ক'রে জানে না। কেবল হামুর সামাজিক মর্যাদা বাঁচিয়ে রাখবার জন্যেই সন্তানের মাতৃত্বে হুকু বোধ হয় দুঃখ বোধ করছে না। বিশ্ববিপ্লবের আগুন সে জ্বালিয়েছে বটে, কিন্তু সে-আগুনে হুকুর মনের সংস্কার পুড়ল কই ? উপরন্তু, একটা সুস্পষ্ট নীতিবোধ যেন সেই আগুন থেকে খাদহীন সোনার মত হুকুর মনে দানা বেঁধে উঠছে। মার্কসিষ্ট হুকু জীবনের মূল সমস্যাটিকে আজ আর বোধহয় কেবলমাত্র অর্থশাস্ত্রের আইন দিয়ে সমাধান করতে পারে না। হামুর জারজত্বের পাপ মুছে দেবার জন্যে বিশ্বরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পর্যন্ত সে পরিহার করতে প্রস্তুত। সুলতান-পুরের অশিক্ষিত চাষীসমাজের মধ্যে হুকু তার শেষ সম্ভ্রম বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে বসন্ত নিজের মনে বড় রকমের একটা আলোড়ন অনুভব করল। মনের রাজ্যে উন্নতির হাওয়া বইছে। বসন্ত এগিয়ে যাচ্ছে। প্রগতির টান্ সে আর সহ্য করতে পারছে না। জীবনের পুরনো আইন ও শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ছে অনিবার্য ভাবে। ভারতবর্ষের বৃহত্তম বিপ্লব বসন্তকে স্পর্শ করতে পারে নি, হুকু পারল। বোধহয় সত্যিই পারল।

কয়েক পা এগিয়ে এসে বসন্ত দাঁড়াল ঝুকুর সামনে। মাথা নিচে উপস্থিত হয় নি, কোদালটা আমায় দিন। মাটি কাটবে পুরুষমানুষ।" গলার স্বর দৃঢ়তা

কোদালটা ধরে রেখেই ঝুকু জিজ্ঞাসা করল, "ভূবণ্ডীর মাঠে তুমি পূর্বে ছিলে কোথায় বসন্ত?"

বসন্তর মাংসপেশীতে হিল্লোল উঠল। হিমন্তের বান ডাকল ওর সর্বাঙ্গে। একটা হেচকা টান্ দিয়ে সে কোদালটাকে ঝুকুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তুলে ধরল ওপরদিকে। তারপর ঝপ ঝপ ক'রে গোটা দশ কোপ বসিয়ে দিল ভূবণ্ডীর পোড়া মাটিতে। ঝুকুর পায়ের তলায় মৃদু কম্পন উঠল। সে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল মাটির দিকে। কোদালের মুখের সঙ্গে সাদা সাদা মাটি উঠে আসছে। ভূবণ্ডীর মাটিতে সম্ভোগ-লালসার স্পষ্ট-চিহ্ন ফুটে উঠল ঝুকুর চোখের সামনে।

ভূবণ্ডীর কম্পন যেন তার নিজের দেহেও প্রতিকম্পন তুলেছে।

এরই মধ্যে বসন্ত খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। হঠাৎ-হিমন্তের আক্রমণে কয়েকটা মুহূর্ত যেন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। সেই এলোমেলো মুহূর্ত ক'টাকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে গিয়ে বসন্ত একটু লজ্জিতই বোধ করল। মনে হ'ল কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে সে বোধহয় পা ফসকে প'ড়ে গিয়েছিল। এবার সে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওর মনের রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলায় সাবেক বাঁধুনীকে আর সে আলগা হতে দেবে না। ঝুকুর ভালবাসার সবটুকুই যদি ফাঁকি হয় তো হোক, সে তার নিজের গোপন কথাটিকে আজ পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করবে।

বসন্ত সহসা তার মুখটা ঘরের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যাবার জন্যে পা বাড়াল। মুখটা উল্টো দিকে রেখেই বসন্ত বলল, "আমি আসছি।"

ঝুকুর শাড়ীর আঁচলটা আজ আর কোনকিছুই গোপন ক'রে রাখতে পারছে না। ছেঁড়া জায়গাগুলো টেনে টেনে গিঁট বাঁধতে গিয়ে হ্রস্ব-আঁচলের আয়তন দিয়ে রোগা দেহটাকেও ঢেকে রাখা আর সম্ভব হচ্ছে না। ঝুকু তবু নিজের দিক থেকে টেনে টেনে শাড়ীর হ্রস্বতাকে লম্বা করবার চেষ্টা করতে লাগল।

একটু বাদেই বসন্ত একটা কাগজের প্যাকেট হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াল

বেরোতে পারে না? [illegible] ওর দিকে এগিয়ে এসে বলল, "শাড়ীখানা প'রে ফেলো, [illegible] নতুন শাড়ী।"

"তোমার এত লজ্জা কেন বসন্ত? আমাকে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করাই তো তোমার কাজ?" মৃদু মৃদু হাসতে লাগল সুকু।

"শাড়ীখানা প'রে এলেই বোধহয় প্রকাশ করবার কাজটা ক্রমে ক্রমে করা চলবে। নইলে—"

"নইলে কি?" সুকু কাগজের প্যাকেট থেকে শাড়ীখানা বার ক'রে গায়ের ওপরে ঝুলিয়ে রেখে পুনরায় প্রশ্ন করল, "নইলে কি বসন্ত?"

"নইলে প্রকাশ করবার আর কিছুই থাকবে না।" বসন্তর কথায় সুকু যেন উৎসাহ পেল। খুব কাছে এগিয়ে এসে সুকু তার ঠোঁটের ভাঁজে আদর-প্রত্যাশী ভঙ্গি ক'রে জিজ্ঞাসা করল, "কেমন ক'রে তুমি আমায় ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করবে?"

"যেমন ক'রে স্বামী তার স্ত্রীকে প্রকাশ করে।" বসন্ত তার জবাবের মধ্যে কিছুমাত্র অস্পষ্টতা রাখল না।

কিছুমাত্র অস্পষ্টতা রইল না ব'লেই সুকু সম্ভবত তার সবকিছু বক্তব্য হারিয়ে ফেলল নিজেদের মধ্যে। সংগ্রাম করবার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটুকু পর্যন্ত সুকুর জীবন থেকে উবে গেল। এবার ওকে মীমাংসায় আসতে হচ্ছে। ডায়লেকটিক্সের বই ঘেঁয়ে আর সে জীবনদর্শনের সত্য খোঁজবার সুযোগ পাবে না। ও যেন ওর অজ্ঞাতসারেই সরে গেল বসন্তর কাছ থেকে। ঠোঁটের ভাঁজে আদর সংগ্রহের ইঙ্গিৎ নেই। ওর যেন মনে হ'ল হামুর সামাজিক মর্যাদা বাঁচিয়ে রাখবার জন্যেই বুঝি সে বসন্তকে এতকাল স্বামী ব'লে প্রচার ক'রে এসেছে। বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে সমন্বয় একটা আসছে বটে, কিন্তু সে-সমন্বয়ের মধ্যে ভালবাসা আসছে না। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল সুকু। জীবনে যেন এই সে প্রথম সমস্যার সঙ্গে টক্কর লড়ছে। হামুর সামাজিক মর্যাদার বাইরে [illegible] মূল্য কি কানাকড়িও নয়? নয় ব'লে বসন্তকে তো সে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারছে না। বার বার ক'রে সে বসন্তকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু বসন্ত তবু ওর অনুভূতির সারা অস্তিত্ব জুড়ে বাঙ্‌ময় বাস্তব হয়ে আজ কথা

র সর্বস্ব। বসন্ত কেবল ওর মধ্যে স্বামীদের আশা নিয়ে উপস্থিত হয় নি, নিয়ে এসেছে এক অজাতলোকের দুঃস্বর সমাচার। কেবল দেহের বৈকল্যে আচারের ঢেউ লুটিয়ে পড়ছে না। ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সত্য, শিব সুন্দরের উর্ধ্বলোক। নত মস্তকে হুকু ভাবতে লাগল, এই মুহূর্তের সত্যটাই ওর জীবনে সত্য হয়ে থাক। ওর ভস্মীভূত-ভবিষ্যতের ছাই দিয়ে সে কোনদিনও বসন্তকে আর সাজাতে পারবে না। ঈষৎ-পূর্বের অভিজ্ঞতা-মূল্য দিয়ে বসন্তকে সে রক্ষা করবে চিরদিন। নিজের তৈরি বিষাক্ত-ব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসবার পথ খুঁজতে লাগল হুকু চৌধুরী।

বসন্ত জিজ্ঞাসা করল, "অনুষ্ঠানের একটা ব্যবস্থা করি, কি বলেন?"

"অনুষ্ঠান?" হুকু যেন উর্ধ্বলোক থেকে নেমে এল মাটির পৃথিবীতে, "অনুষ্ঠান কেন? প্রাক-বিপ্লবী যুগের স্ত্রী-পুরুষরা সাক্ষী রেখে বিয়ে করত। জীববিদ্যার বিজ্ঞান ওদের জানা ছিল না ব'লেই নারায়ণ শিলার সামনে ওরা প্রতিশ্রুতির মন্ত্র পড়ত। কিন্তু আমাদের প্রতিশ্রুতির মধ্যে কোন মন্ত্র নেই—নেই কোন সাক্ষী। সাক্ষী তুমি পাবেও না বসন্ত। ভালবেসেছ তুমি এমন একজন মেয়েকে যার কোন ঠিকানা নেই, দেহে স্বাস্থ্য নেই, বয়সে তোমার চেয়ে সে বড়—" একটু থেমে হুকু মাথা নিচু ক'রে বলতে লাগল, "গাড়োয়াল পাহাড় আমার সবকিছু হরণ ক'রে নিয়েছে। আমি গড়িয়ে পড়লুম পাহাড়ের গা বেয়ে……। এমন একজন কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়ের জন্যে তোমাদের নির্বাক নারায়ণশিলাও সাক্ষী থাকবেন না। বসন্ত, তাই তো আমি কবিতা লিখি। আমার দুঃখ কাব্যের দুঃখ। মহাকাব্য না হোক, খণ্ডকাব্য তো বটেই।"

বসন্ত কোন মতামত প্রকাশ করল না। হুকু তার ছেঁড়া আঁচলটাকে দড়ির মত ক'রে পাকাতে পাকাতে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার ভালবাসার উত্তাপ দিয়ে গাড়োয়াল পাহাড়টাকে গলিয়ে দিতে পার না?" বসন্ত কি জবাব দেবে? হুকুর প্রশ্নের মধ্যে প্রশ্ন কই, সবটাই তো খণ্ডকাব্য? অতএব বসন্ত দাঁড়িয়ে রইল চুপ ক'রে।

বসন্তর দেওয়া শাড়ীখানা আলোয়ানের মত ক'রে হুকু গায়ে জড়াচ্ছিল। সারা জীবন সে একলা ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেই সেজেছে। যৌবনের

প্রাবল্যে সে নিজেকে সাজিয়ে রাখত বিনয়প্রকাশের জন্যে। তাকানায় সেজেছে অনেক রকম রঙে, অনেক রকম ঢঙে। সেজেছে বিপ্লবের প্রয়োজনে। প্রতিদিনকার দেহ-সজ্জার মধ্যে থাকত ওর ছদ্মবেশ। ঝুকুর ট্র্যাজেডি কেবল ওর গোপন-দেহসজ্জায় মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মনের পুরো গঠনটাই হয়ে উঠেছে ছদ্মবেশ প্রয়াসী। নতুন শাড়ীখানা গায়ে জড়িয়ে আজ কিন্তু ঝুকু ভাবল, এবার ওর ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করবার সুযোগ এসেছে। শাড়ীর একটা অংশ মাথার ওপরে ঘোমটার মত টেনে দিয়ে ঝুকু অনুভব করল, বাংলা মায়ের মোটা শাড়ীখানার সামান্যতা বসন্তর হাতের ছোঁয়ায় অসামান্য হয়ে উঠেছে— অভিনন্দন-প্রতীক্ষায় শাড়ীখানা চঞ্চল! কাপড়ের ভাঁজে কোথাও উচ্ছৃঙ্খলতা নেই, রয়েছে বসন্তর সাচ্চা প্রেমের উন্মত্ত ঢেউ।

বসন্ত থেমে থেমে বলতে লাগল, "সুলতানপুরের হাটে এর চেয়ে ভাল শাড়ী আর পাওয়া যায় না।"

বসন্তর কথা শুনে ঝুকুর চোখ ছলছল করতে লাগল। ভবশংকর চৌধুরীও তার নিজের কন্যাকে এমন ক'রে কাছে টানতে পারেন নি! সে বলল, "এর চেয়ে ভাল কাপড় পৃথিবীর কোন্ হাটে পাওয়া যায় বসন্ত? হামুকে মাঝখানে রেখে ভেবেছিলুম, তোমাকে আমি দূরে সরিয়ে দেব। কিন্তু তুমি আজ আর এক ইঞ্চি দূরত্বও রাখতে দিচ্ছ না। মনে হচ্ছে ভাল কাপড় খুঁজে আনবার জন্যে নয় ঝুকু তোমার সঙ্গে আজ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পারে। বিশ বছর আগে তুমি কোথায় ছিলে?"

"নর্দমায়।" জবাব দিল বসন্ত।

"নর্দমা থেকে তুলে আনতে পারলে গোয়াবাগান মরত না। ঐতিহ্য-স্যাকরা বুড়ো হলেই আসল সোনা দেখতে পায় না। বসন্ত, আজ কেবল বারবার ক'রে মনে পড়ছে দীপুদার কথা। মনে হচ্ছে, দিদি যদি আজ আমার পাশে এসে দাঁড়াত, আমি পারতুম কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা আমার এই [illegible] শিবির থেকে বেরিয়ে আসতে। কিন্তু এসেই বা দাঁড়াব কোথায়? নরকদ্বার উন্মোচনের মধ্যে তো আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি নেই। কাঁটা-তার কেটে ফেললেই কি তোমার পাশে আমার স্থান হবে?"

...ন, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।"

...া বসন্ত, প্রতিশ্রুতি তুমি রাখতে পারবে না।······হায়, আমার পায়ের ...থেকে সবটুকু মাটি সরিয়ে নিয়েছে। তুমি পুরুষমানুষ। হাসুকে তুমি ...ও ক্ষমা করতে পারবে না।"

...া যদি নাই করতে পারি, তাতেই বা ভয় কিসের?"

"তোমায় আমি নষ্ট করতে চাই নে।"

"আপনি মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন।"

"ভয় নয় বসন্ত, ভাবনা। গভীর ভাবনা। পোড়া দেশটার চেয়ে তুমি আজ আমার কাছে অনেক বড়। সেই জন্তেই মনে লোভ আসে, তোমার পাশে এসে দাঁড়াই। কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ কি তুমি উদ্ধার করতে পারবে? পারবে না। বসন্ত, ছেলেবেলায় আমি একজন অভিভাবক চেয়েছিলুম, পাই নি। চেয়েছিলুম নির্ভর করতে। আমার বিশ্বাস ছিল, নির্ভরতায় মেয়েদের মহিমা বাড়ে। আমি সেই মহিমার অংশ পর্যন্ত পেলুম না! বিনয়প্রকাশ সরে গেল। তারপর? অতি দীর্ঘপথ অতিক্রম করলুম, বিশটা বছর। একটা আদর্শের থাবা এগিয়ে আসতে লাগল, গ্রাস ক'রে ফেলল আমার সমস্ত সত্তাকে। আমার মধ্যে জন্ম নিল এক ভয়াবহ নিঃস্তিক। পাড়োয়াল পাহাড়ের পাপ তাই আমার কাছে মুহূর্তের জন্তে অস্বাভাবিক মনে হয় নি। তুমি পালিয়ে যাও বসন্ত। নিজেকে অপবিত্র ক'রো না। তোমার কৌমার্যের স্বাক্ষর নিয়ে নতুন ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠা লেখা হবে। বিশ্বাস করো, আমার ঠোঁটে কোন মধু নেই, নেই উন্মাদনার এক রত্তি স্বাদও। তোমার নির্ভীক বলিষ্ঠতার প্রতি লোভ কি আমার কম?" কথা শেষ ক'রে হুকু চোখ তুলতেই দেখল, বসন্ত সরে গেছে খানিকটা দূরে। ক্রমে ক্রমে মাঠ পেরিয়ে সে চলে গেল দৃষ্টির বাইরে।

ভালই হ'ল। এ প্রত্যাখানের মধ্যে স্বাভাবিকতার সৌন্দর্য রয়েছে। সৌন্দর্যই সম্পদ। অনুতাপ এল হুকুর মনে যে, বসন্তকে সে কোনদিনই দীপুদা কিংবা দিদিকে দেখাতে পারবে না। হয়তো এই গোপন-সম্পদ বুকে আগলে ব'সে থাকতে হবে ভুষণ্ডীর মাঠে সারাটা জীবন।

সম্পদশালিনী হুকু চৌধুরী দাওয়ায় ব'সে চোখের জল ফেলছিল। সামনে

ধূ ধূ করছে ভুবণ্ডীর মাঠ। মনে হয় একটা অচৈতন্ত পৃথিবী যেন ঘুমোচ্ছে ওখানে—বেহুলর্বব পৃথিবীর মরা-দেহ! ওপারে যে কি হচ্ছে হুকু তার কিছুই জানে না। ব'সে ব'সে ভাবছে, নতুন গ্রহের কাঁচা মাটিতে সে তার নব-উর্বরের বীজ বপন করবে। সভ্যতা-বৃক্ষ বড় হবে কচি মাটির রস খেয়ে খেয়ে। কী বিচিত্র এই মানুষ জাতি! এদের সম্বন্ধে কোন উপসংহারেই যেন পৌছুন যায় না। বিদ্যা এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে গত বিশ বছর ধ'রে হুকু যে-উপসংহারে এসে পৌছুল, একটু আগেই বসন্তর সামনে তা গেল ভেঙে শত টুকরো হয়ে। কোথায় বিনয়প্রকাশ আর কোথায় এই বসন্ত দাস! তবু, বিনয়প্রকাশকে হুকু আজো মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নি। বিনয়প্রকাশ হাত বাড়ালে হুকু হয়তো উঠে দাঁড়াতে পারে। বিনয়প্রকাশ যা পারে বসন্ত তা পারে না। ডায়লেকটিকসের খেলা নিয়ে পুনরায় মেতে উঠল হুকু। চোখের জল যে তার কখন শুকিয়ে গেছে তা সে টের পেল না। সাইকেলে চেপে দাওয়ার সামনে এসে উপস্থিত হ'ল সুলতানপুরের পার্টি-সেক্রেটারী কমরেড শাজাহান। সাইকেলটা দাওয়ার গায়ে ঠেকিয়ে রেখে সে বলল, "আপনার কাছে পরামর্শ চাইতে এলুম।"

"বসুন। কি হয়েছে?" জিজ্ঞাসা করল হুকু।

"ভারতবর্ষের প্রতিরোধ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে বসিরহাট অঞ্চলে। কৃষকরা কেউ কৃষি-সমবায়ে যোগ দিতে চাইছে না। কংগ্রেসী সরকারের গুপ্তচররা কৃষকদের মধ্যে প্রচারকাজ চালাচ্ছে। আমার মনে হয়, এ-অঞ্চলের প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতা হচ্ছে ওসমান গণি। খোঁড়া পা নিয়ে সে যে কোথায় লুকিয়ে আছে, ওবাইদ মোল্লা তার হদিস দেবে না আমাদের। আপনি চেষ্টা করলে ওবাইদ মোল্লাকে বশে আনতে পারবেন।"

"আপনি আমার অতিথি, একটু চা করে দিই কমরেড?" গালের ওপর টোল ফেলে প্রশ্ন করল হুকু।

"তা—তা এক পেয়ালা চা খেলে মন্দ হয় না।" দাওয়ার ওপর ভার ক'রে ব'সে কমরেড শাজাহান কিছুক্ষণের জন্যে রাষ্ট্র-পরিচালনার দায়িত্ব ফেলে দিল ভুবণ্ডীর ফাঁকা মাঠে। চা তৈরির প্রয়োজনে হুকু উঠে যাচ্ছিল। কমরেড

...াব জিজ্ঞাসা করল, "আর তোমার ? বাবীটি কিন্তু আপনার খুবই কাঁচা।
...মেয়েমানুষ।"

"...আমার চেয়ে বয়সে ছোট। কিন্তু প্রণয়ের স্রোতে বয়সের হিসেবটা
...টোর মত হাল্কা।"

"...তা যা বলেছেন। সুলতানপুরের চাষীরা কিন্তু বদরুকে ফুটোর মত হাল্কা
...ন করে না।"

"তবে ?" হুকু ভয় পেয়েছে।

সিগারেট ধরিয়ে কমরেড শাজাহান বলল, "বদরুকে ওরা পীরের মত
...বি-ওজনের মানুষ মনে করে।"

হুকু চ'লে যাওয়ার পরে কমরেড শাজাহান দাওয়ায় ব'সে একটার পর
একটা সিগারেট ধরাতে লাগল। 'শেকল-ধূমপানের' ধোঁয়ায় ভূষণ্ডীর আকাশ
ঘোলাটে হয়ে আসছে।

ভূষণ্ডীর মাঠে কাজ করতে ওবাইদ মোল্লার আজ আর মন বসছে না।
কি হবে আগাছার গোড়ায় নিড়ানি চালিয়ে ? সারা জীবন ধ'রে ছুটো মানুষেরও
পেট ভরল না। শাজাহান মিঞার দলে যোগ দিলে কেমন হয় ? গত ছ-মাসে
সুলতানপুরের কত উন্নতি-ই না হয়েছে। বসিরহাট থেকে সুলতানপুর পর্যন্ত
রেল লাইনও বসে গেল। এবার এ-অঞ্চলে কলের লাঙল আসবে। মাথার
ঘাম পায়ে ফেলে লাঙল ঠেলার দরকার কি ? ভূষণ্ডীর পতিত জমি যদি
সরকারী লোকেরা নিয়ে নেয় তো ভালই। কৃষি-সমবায়ে সে মজুর খাটতে
রাজী আছে। মজুরীর নগদ পয়সা হাতে এলে পেট ভরে সে ভাত খেতে
পাবে। মেহের বিবিকে নিয়ে রেলে চেপে সে ঘুরে আসতে পারবে বসিরহাট
শহর। শাজাহান মিঞা ব'লে বেড়াচ্ছে যে, হিন্দুস্থানে না কি আর রাজা-
বাদশা নেই, রাজ্য চালাচ্ছে চাষী-মজুররা। এ ভোটের ধাপ্পা নয়, পাক্কা
কথা। ওবাইদ মোল্লা আজ অসময়ে ফিরে চলল ঘরের দিকে।

সুলতানপুরের সীমানার কাছে এসে ওবাইদ মোল্লা দেখল, দশ বারোজন
চাষী খুব উত্তেজিত ভাবে জটলা পাকাচ্ছে। ওপাশের একটা ঝাউ গাছের

ডালে অনেকগুলো শকুন বসে ছিল, তাও দেখল ওবাইদ মোল্লা। সে জিজ্ঞাসা করল, "ব্যাপার কি ভাইসাহেবরা? হামলা কিসের?"

রতন বিশ্বাস বলল, "শাজাহান মিঞাকে আমরা আর নেতা ব'লে মানব না।"

"কেন?"

"তার আইন-কানুন সব উল্টো-উল্টো। প্রথমে বললে, চাষীর রাজত্ব শুরু হ'ল আর এখন বলছে, জমি সব সরকারের হাতে দিয়ে দাও। আমরা কেন যাব মজুর খাটতে?"

"দেশের যদি তাতে উপকার হয়, তবে আপত্তি কেন?" ব্যাপারটা সব পরিষ্কারভাবে বোঝবার জন্যে প্রশ্ন করল ওবাইদ মোল্লা।

বদরুদ্দীন মিঞা বলল, "আমরা তো উপকার চাই নি বড় মিঞা, আমরা চেয়েছি জমি। আমরা মজুর খাটতে যাব কোন্ দুঃখে?"

"তবে যে তোমরা সেদিন ধনীচাষীদের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে এলে? লাল পুলিশরা তাদের সব ধরে নিয়ে গেল, কই তোমরা তো তখন শাজাহান মিঞার বিরুদ্ধে একটা কথাও ব'লো নি?" জিজ্ঞাসা করল ওবাইদ মোল্লা।

"আমাদের সে ভুল বুঝিয়েছিল। আমরা তাই ঠিক করেছি, সুলতানপুরের নেতা হবে বসন্ত। আজ রাত্রিতে মিটিং আছে। কলকাতা থেকে সরকারী লোক আসবে, তুমি যেয়ো বড় মিঞা। আমাদের ভোট না পেলে শাজাহান মিঞা গাছের একটা পাতাও নড়াতে পারে না। এ সরকারী কানুন।"

চাষীরা সব চ'লে যাওয়ার পরেও ওবাইদ মোল্লা দাঁড়িয়ে রইল ঝাউ গাছের দিকে চেয়ে। অতগুলো শকুন ওখানে ব'সে কি করছে? মনে পড়ল ওর তেরশো পঞ্চাশ সালের কথা। ওবাইদ মোল্লা চারদিকটা ভাল ক'রে দেখতে লাগল। না, কোথাও সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। বিদ্রোহী চাষীরা কেউ মাঠে এখনো লাঙল দেয় নি। ওবাইদ মোল্লার মনে ভয় এল। শকুনের ভিড় দেখে ভয়ের মাত্রা বাড়ল ওর। না, আর সে দেরি করবে না, শাজাহান মিঞার কাছে গিয়ে নাম লিখিয়ে আসবে। মজুরী পাক বা না পাক, কৃষি-সমবায়ে গিয়ে কাজ ক'রে দিয়ে আসবে ওবাইদ। এত এত জমিতে যদি ধান না জন্মায়,

তা হ'লে সুলতানপুরের সর্বনাশ কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ওবাইদ মোল্লা গাঁয়ের রাস্তার দিকে পথ ধরল।

কমরেড শাজাহান যাচ্ছিল দুকুর বাড়ির দিকে। সাইকেল থেকে নেমে সে দাঁড়াল এসে ওবাইদ মোল্লার সামনে। লাল টুপীটা তেরছাভাবে মাথার একদিকে বেশি ক'রে টেনে দিয়ে কমরেড শাজাহান বলল, "একটু দাঁড়াও মিঞাসাহেব।" তারপরে সে পকেট থেকে পিস্তল বার ক'রে সামনের গাছের দিকে গুলি ছুঁড়ল। একটা শকুন ঝুপ ক'রে প'ড়ে গেল মাটিতে, বাকীগুলো উড়ে গেল অন্যদিকে।

ঠোঁটের দুই প্রান্তে হাসির ঢেউ খেলিয়ে কমরেড শাজাহান বলল, "হাতের তাক্ দেখেছ মিঞাসাহেব?……তারপর, বাদশামিঞা, খবর কি? দুবতীর মাঠে যে একটা নতুন মহল খুলে বসেছ……মেহেরবিবি আপত্তি করে না?"

"তোবা! তোবা! এমন কথা মুখে আনলেও গোনাহ্ হয়। ওরা হিন্দু, পাপকে বড্ড ভয় করে।"

পিস্তলটা খেলনার মত দু-তিনবার উল্টেপাল্টে ওবাইদ মোল্লাকে ভাল ক'রে দেখিয়ে নিয়ে কমরেড শাজাহান বলল, "আমাদের লালসাম্রাজ্যে হিন্দুমুসলমান নেই। কংগ্রেসী আমলের সঙ্গে সঙ্গে ওরাও সব কবরে গিয়ে ঢুকেছে। পাপপুণ্যের সওদা সব খদ্দরের কাফনের তলায় চাপা পড়ে গেছে। মিঞাসাহেব, বসন্তদাস ব্যাটাছেলে বটে, কিন্তু সে তোমার দুকুবিবির মরদ নয়।"

"তোবা! তোবা!" লজ্জায় মাথা নিচু করল ওবাইদ মোল্লা।

"শরমে যে তোমার মুখের চামড়া গ'লে যাচ্ছে?" এই ব'লে কমরেড শাজাহান ওবাইদ মোল্লার দাড়িতে একটা মৃদু টান মেরে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি খোদা মানো?"

"মানি।"

"তা হ'লে খোদার নামে ওয়াদা ক'রে বলতে পারো যে, ওসমান গণির খবর তুমি জানো না?"

"খবর জানি, কিন্তু বলব না।"

"কেন?"

"মেহ্‌মানকে রক্ষা করা মুসলমানের ধর্ম।"

"তর্ক করবার সময় আমার নেই—" একটা সিগারেট ধরিয়ে কয়েক শাজাহান সাইকেলে চেপে চলে গেল ভূঁইতীর দিকে।

ওবাইদ মোল্লার মনে বড় উঠল। একটা নয়, অনেকগুলো ঝড়। শাজাহান মিঞার চোখের দৃষ্টি ওর ভাল লাগে নি। শকুনের দৃষ্টির চেয়েও ভয়াবহ ব'লে মনে হ'ল ওবাইদ মোল্লার। কৃষি-সমবায়ে গিয়ে নাম লিখিয়ে এলেও ঝড়ের বেগ আর কমবে না। সমস্যা ভিন্ন রকমের। ছোট ছোট কৃষকরা যদি তাদের জমি সব গভর্নমেন্টের হাতে তুলে দিয়ে আসে, তা হ'লেই কি সমস্যা সব মিটে যাবে? বোধহয় না, ভাবল ওবাইদ। অবনীভাই ঠিকই বলে। ওরা গোটা রাজ্যটাকেই চাইবে। শাজাহান মিঞার কাছে কোন কিছুই আর গোপন রাখা চলবে না। ওবাইদ মোল্লা ফিরে চলল বাড়ির দিকে। শিস্তলের শাসন শুরু হয়েছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি?

বসন্তর আর ছকুদিদির কথাটা কি সত্যি? সত্যি হ'লে হাম্ কি ক'রে হ'ল? "তোবা! তোবা!" মুখ নেড়ে আওয়াজ তুলতে তুলতে ওবাইদ মোল্লা পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরে এল ঘরে। এতটুকু পথ হাঁটতে আজ সে হাঁপিয়ে পড়েছে।

মেহের বিবি শোবার ঘরের দাওয়ায় ব'সে আলগা উনোনে রান্না চাপিয়েছে। রান্নাঘরটা ছেড়ে দিতে হয়েছে অতিথিকে। ওবাইদ মোল্লাকে ঢুকতে দেখে মেহের বিবি জিজ্ঞাসা করল, "আজ এত জল্‌দি জল্‌দি ফিরে এলে যে?"

"তবিয়ত আমার ভাল নেই আজ।"

"কেন, কি হ'ল? ব্যামো হয়েছে না কি?"

"হাঁ, ব্যামো তো বটেই। দেহের নয়, মনের। মেহের, শিক্ষিত লোকেরা এত মিথ্যে কথা বলে কি ক'রে? লেখাপড়া শিখলেই যেন ওরা ধর্মকে তাচ্ছিল্য করে। কেন করে মেহের?"

উনোন থেকে কড়াইটা নামিয়ে রেখে মেহের বিবি জিজ্ঞাসা করল, "কেন, কি হয়েছে?"

কড়াইটার মধ্যে দৃষ্টি পড়ল ওবাইদ মোল্লার। বড় মিঞার আমলের কড়াই এটা। শাদি হওয়ার পরে মেহের বিবি কোনদিনও এটা ব্যবহার করে নি।

রায় করবার দরকার হয় নি। আর অতিথির জন্তে যে মুর্গী রাঁধছে
ছে। পাইকারের কাছে পোষ দেওয়ার আর সুযোগ নেই ব'লে মোরগের
হের বিবি গাছ থেকে বেগুন তুলে এনেছে। ঘরের চালে একটা কুমড়ো
কে উঠেছিল। ওবাইদ মোল্লা যেমন, মেহের সেই কুমড়োটাও কেটে ফেলেছে
অতিথিকে ভাল ক'রে খাওয়াবে ব'লে।

কড়াই থেকে গরম শব্জী সানকীতে ঢালতে ঢালতে মেহের বিবি পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, "মাঠে কাজ করতে যাও নি?"

"গিয়েছিলাম। কাজে মন বসল না আজ। কি হবে কাজ ক'রে? মানুষ যদি ধর্ম হারায় তা হ'লে কতগুলো ডালভাত খেয়ে লাভ হ'ল কি?"

"কে ধর্ম হারিয়েছে?"

"বসন্ত আর কুমুদিনি। ওদের নাকি শাদি হয় নি।"

"তোবা! তোবা!" শব্জী-ভরা সানকীটা একটু দূরে সরিয়ে রেখে মেহের বিবি বলল, "খোদার এ কি মর্জি! শাদি না হ'তেই ওদের কোলে বাচ্চা এল·········আর ······"

"বিশ্বাস রাখ্ মেহের, বিশ্বাস রাখ্। তোর কোল জুড়েও বাচ্চা আসবে।"

রান্নাঘরের দিক থেকে অতিথির গলা শোনা গেল। গতকাল রাত্রিতে ওবাইদ মোল্লার কাছে ছদ্মবেশী ওসমান গণি এসে আশ্রয় চেয়েছিল। দাড়ি-গোঁফ কিছু নেই ব'লে ওবাইদ মোল্লা প্রথমে চিনতে পারে নি তাকে। রহমতপুরের সোলেমান চাচা কংগ্রেসী আমলে বড়মন্ত্রির সঙ্গে একবার খানা খেয়েছিলেন বটে, কিন্তু এখন তিনি খানা খাচ্ছেন নতুন রাষ্ট্রের বন্দীশালায়। ওসমান গণি ব্যাপার বুঝতে পেরে আগে থেকেই স'রে পড়েছিল। সোলেমান চাচার ঘরে চাচীর সংখ্যা ছিল তিন। রহমতপুর থেকে স'রে পড়বার সময় ওসমান গণি তার ছোট চাচীর 'বোরকা' প'রে বেরিয়ে এসেছিল বাড়ি থেকে।

"ভাই ওবাইদ, সেই দিন থেকে বোরকা প'রে জীবন আমার কাটছে রে। তুই তো ধর্ম মানিস, আমায় একটু আশ্রয় দিবি নে? বড়মন্ত্রি ফিরে এলে আবার আমাদের রাজত্ব শুরু হবে। তোর ঋণ আমি তখন সুদে আসলে ফিরিয়ে দেব।"

"আজকের বেলায় ক্ষমতা মানুষের নেই মিঞা সাহেব!"

"তবে?" ঘোমটায়-ঢাকা ওসমান গণির মুখে ভয়ের চিহ্ন দেখতে পেল ওবাইদ। সে বলল, "আশ্রয় দেবেন খোদাতালা।"

"ব্যস্, আমার আর কিছু দরকার নেই, তোর রান্নাঘরখানাতেই আমি মাথা গুঁজে প'ড়ে থাকব।" ওবাইদ মোল্লার স্বীকৃতির অপেক্ষা না রেখে ওসমান গণি ওর ঘাড়ে-ভর দিয়ে এগুতে লাগল অন্দর মহলের দিকে। কিছুটা দূর এগুবার পরে ওবাইদ মোল্লা বলল, "তোমাকে আশ্রয় আমি দিলাম বটে, কিন্তু খানাপিনার কি হবে? আমরা যে খুবই গরীব মিঞা সাহেব।"

"কেবল ডালভাত খেয়েই প'ড়ে থাকব রে ওবাইদ। তোর এখানে দাওয়াৎ খেতে আসি নি।" ওবাইদ মোল্লার কানের কাছে মুখ এগিয়ে ওসমান গণি ওকে অভয় দিল, "খরচা যা হবে, সব তোকে পরে হিসেব করে দিয়ে দেব। বিবিকে বলিস হিসেব রাখতে। সোনার লাঠি-টা আমি হাতছাড়া করি নি।"

"সোনার লাঠি?" চমকে উঠল ওবাইদ মোল্লা, "তরোয়ালটা কোথায় মিঞা সাহেব?"

"আছে। কৃষ্ণভীর মাঠে পুঁতে রেখেছি। বেহেশতে যাওয়ার আগে লাঠি-টা তোকেই দিয়ে যাব রে ওবাইদ। তোর বিবির আর সোনার অভাব থাকবে না।"

"আমাদের অভাব যে কি, তা তুমি জানো না মিঞা সাহেব!" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘোষণা করল ওবাইদ মোল্লা।

রান্নাঘরের দিক থেকে অতিথির গলার শব্দ শুনে মেহেরবিবি বলল, "গণি-সাহেব তোমায় ডাকছেন।"

"যাচ্ছি।...... মেহের—" ডাকল ওবাইদ।

"কি? কিছু বলবে?" জানতে চাইল বিবি মেহেরউন্নিসা।

"বলবার তো অনেক কথাই ছিল। একটু আগে শাজাহান মির্জার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে বলে, ওসমান গণি দেশের শত্রু।"

"সে ঠিকই বলে।"

"তবে তুই তাকে খাসী রান্না ক'রে খাওয়াচ্ছিস কেন ?"

"শত্রু হ'লেও অতিথি। তা ছাড়া বিচারের ভার তো আমাদের হাতে নেই।"

"ওসমান গণিকে ধরিয়ে দিলে শাজাহান মিঞা আমাদের সব দুঃখই ঘুচিয়ে দিতে পারে, জানিস ?"

একটু হেসে মেহের বিবি বলল, "আমাদের দুঃখ যে কি, তা তো শাজাহান মিঞা জানে না। ওরা ভাবে, টাকার অভাবটাই সবচেয়ে বড় দুঃখ।"

"টাকার অভাবটা খুব সুখের কথা তো নয় মেহের ? এই যে সারা দেশের মেয়েমর্দা মিলে দেশকে বড় করবার জন্যে দিনরাত মেহনত করছে, তা তো আমাদেরই সুখের জন্যে। আমার কি ইচ্ছে করে না তোকে একটা সোনার নোলক গড়িয়ে দিতে ? জানিস মেহের, লালটুপীর কেরামতি কত ? বসিরহাট থেকে সুলতানপুর পর্যন্ত রেললাইন বসছে। তোকে নিয়ে এবার আমি বসিরহাট শহর দেখতে যাব। ওসমান গণিদের জন্যেই তো আমরা দু-জনে মিলে একবারও রেলগাড়িতে চাপতে পারি নি। এবার তা হ'লে কি হবে ? এবার আমরা কি করব মেহের ?"

"আমরা দু-জনে মিলে খোদাতালার কাছে দোয়া মাঙব গণি সাহেবের জন্যে।…… 'ওসমান গণিদের কসুর তুমি মাফ ক'রো খোদা।'" অন্তরের প্রার্থনা ঠোঁটের ওপর মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিবি মেহেরউন্নিসা তোলা উনোনে ভাত চাপিয়ে দিল। বেলা হয়েছে, গণিসাহেবের ভাত খাওয়ার সময় হ'ল।

চা খাওয়া শেষ হওয়ার পরে কমরেড শাজাহান যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। তার আগমনের আসল উদ্দেশ্য রহু ঠিক বুঝতে পারে নি। সুলতানপুর এলাকায় বসন্তর উপস্থিতি যে কমরেড শাজাহান পছন্দ করছে না তা সে বুঝতে পেরেছে। চাষীরা সব বসন্তকে ভালবাসে। চাষীদের মধ্যে অসন্তোষের আগুন ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে সে সম্বন্ধেও রহু ওয়াকীবহাল। কমরেড শাজাহানকে হাতের মুঠোয় না আনতে পারলে জুনজীর বাস কি সে ধরে রাখতে পারবে ?

সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের ওপর হাত রেখে কমরেড শাজাহান বলল, "আপনারা আসবার পরে ভুবণ্ডীর শ্রী কিন্তু একেবারে বদলে গেছে।"

"হ্যাঁ, কচি কচি ধানের চারাগুলো দেখতে কী সুন্দরই না লাগে!"

"আমি বলছিলুম, ওখানে বেশ বড় রকমের একটা মন্দির তৈরি হয়েছে, হলধর না পাথর, কি একটা যেন থাকে ওখানে?" হুকুর পরিচালিত কচি ধানের কাব্যের রাস্তায় না গিয়ে কমরেড শাজাহান দৃষ্টি ফেলল সোজাসুজি মন্দিরের দিকে।

হুকু বলল, "পাথরটাই হলধর, মানে চাষীর দেবতা।"

"সিকি-আধুলি অনেক না কি জমে উঠেছে। কংগ্রেসী আমলে আমরা তো হাজার হাজার ফুটো-বাক্স বসিয়ে রাখতাম হাজার হাজার পূজো প্যাণ্ডেলে। কিন্তু এমন মুক্ত-হস্তে কেউ সেখানে ফুটো দিয়ে সিকি-আধুলি গলিয়ে দিত না। বিপ্লব শুরু হওয়ার আগে অবশ্যি ক্লাইভ স্ট্রিটের শতকরা নব্বইজন ধনীই গোপনে গোপনে পার্টির সিন্দুকে কোটি কোটি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিল। ঠেলা গাড়িতে ক'রে সে-সব কংগ্রেসী আমলের কাগজ আমরা দরিয়ায় ফেলে দিয়েছি। এপারে ছিলেন কালিঘাটের কালী আর ওপারে চেতলা। আপনি তো চেতলার সেই বস্তিগুলো দেখেন নি?"

"না।"

"ভালই করেছেন। সামনে এখন মাথা তুলেছেন হলধর। ঘরে ব'সে সবই দেখতে পাচ্ছেন।"

কি মনে ক'রে হুকু যেন অনমগুস্কভাবে ব'লে ফেলল, "নিজের ঘরে ব'সে অবনীরা তারশংস্কার মেনে চলছে।"

"নিজের ঘর?" কমরেড শাজাহান যেন লাল আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, "নিজের ঘর? ঘর সব রাষ্ট্রের। ঘর এবং পরিবার ব'লে আমাদের রাষ্ট্রে কোন আলাদা প্রতিষ্ঠান নেই। এবার আমি চলি। বড্ড দেরি হয়ে গেছে। বসন্ত দেখছি এখনো ফিরে এল না। চাষীরাও বোধ করি বসন্তর পায়ে সিকি-আধুলি দিয়ে পূজোটুজো কিছু একটা করছে। ও, ভাল কথা, আপনি বোধহয় জানেন না যে, কাজীপাড়ার ময়দানে শিগগীরই একটা

বিচার-আদালত বসবে? শিলচর কোর্ট। কলকাতা থেকে কয়েকজন বিচারকরা সব আসছেন। কিন্তু তার আগে ওসমান গনিকে খুঁজে বার করা দরকার। আদালত বসবার আগে আপনি অবশ্যি খবর পাবেন। চলি।" কয়েকজন খাকাহাল লাল টুপিটা মাথায় চাপিয়ে দিয়ে সাইকেলে উঠে বসল। সাহেবের দিকে চেয়ে রইল হুকু। মনে হ'ল, সারা দুনিয়া জুড়ে ভূমিকম্প হচ্ছে। বাস্তটা বুঝি ভেঙে পড়ছে! ভয় পেয়ে হুকু ঘরের ভেতর দিয়ে খুকু রামুকে বাইরে নিয়ে এল। বাস্তটাই কেবল কাঁপছিল না, হুকুর নতুন সংসারের চারকোণ-আর্কিটাও বুঝি লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। স্বামী, সন্তান ও বন্ধুকে নিয়ে গড়ে উঠছিল একটা স্বাভাবিক জীবনের রম্য-রচনা। সেখানেও দুঃখ আছে, অভিযোগ আছে। আছে জন্ম এবং মৃত্যুর পুরাতন প্যাটার্ন। ভাবতে ভাবতে হুকু বসে পড়ল দাওয়ায়। একটা দমকা হাওয়া এসে ওর মনের আকাশ থেকে নিশ্চিন্ত-মেঘটাকে যেন কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল! বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে ব'সে রইল হুকু। সমস্ত মুখখানাতে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। হাঁপানীর রোগীর মত সে নাক দিয়ে ভস্‌ভস্‌ ক'রে নিশ্বাস ফেলতে লাগল। কি করবে হুকু? পাঁচ হাজার বছরের চেষ্টায় মানুষ তার ঘরের খুঁটিগুলোকে শক্ত ক'রে তুলেছিল। এই শক্ত করার পেছনে রয়েছে মানব-সভ্যতার গোটা ইতিহাস। সেই ইতিহাসের প্রতিটি পাতায় সংখ্যাহীন সংগ্রামের কাহিনীগুলো আজ আবার নতুন ক'রে মনে পড়ল হুকুর। মানুষ তার ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করবার জন্যে পৃথিবীর প্রবলতম রাজা, বাদশাহ এবং সম্রাটদের সঙ্গে লড়াই করতে দ্বিধা করে নি। তার চিন্তার স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পারে নি বিগত দিনের অগণিত স্বৈরাচারী সম্রাটের দল। কিন্তু এযুগের রাজনীতি আজ এসেছে জ্ঞানবিজ্ঞানের ছদ্মবেশ নিয়ে, প্রগতি লোলুপ বিপ্লব-বিকৃত হুকুর আর সাধ্য নেই ব্যক্তিস্বাধীনতার খুঁটি-টাকে ধ'রে রাখবার। ঘর তাই ওর নড়ছে। শ্রেণীহীন বিশ্বরাষ্ট্রের বাইরে হুকু ভাঙা-বাস্তটা ধ'রে রাখবেই বা কি ক'রে? একই গণদেহের মধ্যে হুকুর দেহ যদি না মিশে যায়, তবে বিপ্লবের প্রয়োজন ছিল কি? বিশ্বগণমনের বাইরে হুকুর আলাদা মনের অস্তিত্ব নতুন রাষ্ট্র স্বীকার করবে কেন?

বসন্ত যে কখন ফিরে এসেছে মধু তা টের পায় নি। সকাল থেকে কোদাল দিয়ে মাটি তৈরি করছিল বসন্ত। সুলতানপুর পর্যন্ত রেললাইন হয়েছে। এবার থেকে বসন্তও পারবে তার লাউ কুমড়ো সব বসিরহাটের বাজারে নিয়ে যেতে। ফড়েওয়ালারা কেউ পারবে না ওর লাভের অংশ গ্রাস করতে।

বসন্ত যোগাযোগের পথ পেয়েছে। অর্জনের প্রথম পর্যায় সে পেয়েছে তৃতীয় বন্ধ্যা মাটিতে। সুলতানপুরে যেদিন হাট বসে, বসন্ত শাক-সব্জীর ঝুড়িটা সেদিন মাথায় ক'রে নিয়ে যায় সেখানে। নগদ দামে বিক্রি ক'রে আসে ওর কাঁচা সওদা।

শহর কলকাতায় ওর এমন সুবিধে হয় নি। চাকরীর খোঁজ করতে গিয়ে অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে। জীবন ও যৌবনের মহামূল্য সময় কলকাতার হৃদয়হীন রাস্তাগুলো ওর কেড়ে নিয়েছিল। সময় ওর নষ্ট হ'ল কেন? কংগ্রেসী রাষ্ট্রের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি কি পারত বসন্তর এই নষ্টসময়কে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসতে? রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব যারা বহন করবেন, তাঁরা কেন চাকরী খুঁজে দেবার দায়িত্ব বহন করবেন না? কলকাতার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বসন্তর মনে এমন ধরণের প্রশ্ন কতবারই না উঠত। কোন মন্ত্রি কিংবা উচ্চপদীয় ভাগ্যবান কর্মচারীর সঙ্গে ওর আত্মীয়তা নেই ব'লে যুবক বসন্তর অটুট স্বাস্থ্য এবং সময় সব গ'লে যাচ্ছিল প্রতি দিন। বিগত দিনের রাজা-বাদশাহদের মতো এ কোন্ রাষ্ট্রনায়ক পৃথিবীর বুকে নতুন তাণ্ডবের হাওয়া তুলেছে? চাকরী খোঁজবার দায়িত্ব বসন্তর নয়, দায়িত্ব রাষ্ট্র নায়কের। কেন এবং কি কারণে ভাগ্যবানদের কেউ একজন ওর আত্মীয় হ'ল না তার জবাব সে শহর কলকাতার কোথাও পায় নি। নতুন রাষ্ট্র বসন্তর প্রশ্নের জবাব দিয়েছে আজ। ছ' বছরের কাজ এগিয়ে গেছে ছ-মাসের মধ্যে। পেট ভ'রে খাবার মত চালডালের অভাব যেন সুলতানপুর থেকে উবে গেল ভোজবাজীর মত! সে সর্বত্রই দেখতে পাচ্ছে উদ্বৃত্ত। কিন্তু—কিন্তু কি যেন?

মধু ডাকছিল ওকে। কোদালটা ফেলে রেখে বসন্ত চলল ঘরের দিকে। মধুর কাছে গিয়ে পৌঁছবার আগে বসন্ত ভাবল, "সংসারে একটা কিছু পেতে গেলে মানুষকে বোধ হয় তার বিনিময়ে অনেক কিছু ছেড়ে দিতে হয়। যা

[illegible]নিক ভাবে আসে না, তাকে আনতে গেলে মূল্য দিতে হয় অনেক বেশী। [illegible]জনপুরের উদ্বৃত্ত পেছনে রয়েছে মানবমনের [illegible] কান্না আর [illegible]হাকার। মুখের সামনে ভাত তুলতে গেলে কানের পর্দায় যেন সেই [illegible]হাকারটা প্রতিধ্বনি তোলে।"

হামুকে বসন্তর হাতে তুলে দিয়ে হুকু জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় গিয়েছিলে?"

"যতন বিশ্বাসের কাছে।"

"কেন?"

"চাষীদের একটা মিটিং হচ্ছিল।"

"কাজটা ভাল করো নি বসন্ত।"

"কোন্ কাজটা?"

"চাষীদের সঙ্গে মেলামেশা করা।" হুকু তার কণ্ঠে আবেগের ঢেউ তুলে পুনরায় বলল, "তোমার জন্যে আমার বড্ড ভয় হয়। আজ না হয় কাল হামুর দায়িত্ব নেবে রাষ্ট্র। কিন্তু তোমার জন্যে শেষ পর্যন্ত আমার এই শুকনো হাত দু-খানাই পড়ে থাকবে ভূষণ্ডীর বন্ধ্যা মাটিতে।"

হামুকে বুকের ওপর চেপে ধ'রে বসন্ত হাসতে হাসতে বলল, "হামুর হাত-পা ছোঁড়া দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। এর পর ওকে শেকল দিয়ে বেঁধে না রাখলে সামলাতে পারবেন না।" হুকুর মুখে বিন্দুমাত্র হাসির ইঙ্গিৎ দেখতে পেল না বসন্ত। হুকু কি যেন ভাবছিল। ভাবছিল তন্ময় হয়েই। একটু পরে হুকু জিজ্ঞাসা করল, "একটা কথার জবাব দেবে? সত্যি জবাব?"

"মিথ্যে আমি বলি না।"

হুকু বসন্তর দিকে আরও একটু এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল, "ভারতবর্ষে এতবড় একটা বিপ্লব হয়ে গেল, তুমি সেই বিপ্লবের উত্তাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করলে কি ক'রে? খেতে পাও নি দিনের পর দিন। শোবার জন্যে একখানা ঘর পাও নি, তবু তুমি বিদ্রোহ করো নি। এতবড় বিস্ময়কর ঘটনা সম্ভব হ'ল কি ক'রে বসন্ত? কংগ্রেসী রাজত্বের দুর্ভিক্ষ তোমায় বিদ্রোহী করতে পারল না, কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের উদ্বৃত্ত কি তোমায় একটু টলাতেও পারবে না?"

"না।" বসন্তর সংক্ষিপ্ত জবাবের মধ্যে হুকু শুনতে পেল গভীরতম

প্রশ্নের সুর। সে জিজ্ঞাসা করল, "কোন্ সমাজের আর রাষ্ট্রের ব্যবস্থাটা আ
আমি জানতে চাই বসন্ত?"

ভাববার সময় না দিয়েই বসন্ত উত্তরটি বলে ফেলল, "আমার জীবনের
সমাজের আইন ও শৃঙ্খলা আমি কিছুতেই ভাঙতে পারি নে। এমন কী লোহ
আজ আমার মুখের সামনে এসেছে যার জন্যে পূর্বপুরুষদের এত কষ্টের তৈরি
ল এ্যাণ্ড অর্ডার সব আমি ভেঙে ফেলব?"

বিপ্লব-বিক্ষত স্বকু যেন জীবনের শেষ জুয়াতেও হেরে যাচ্ছে তেমন একটা উদ্বেগজনক আভাস ফুটিয়ে তুলল সারামুখে। তারপর ধীরে ধীরে সে জিজ্ঞাসা করল, "এতবড় বিশ্বাস তুমি কোথা থেকে পেলে বসন্ত?"

"কোন দিনও ভেবে দেখি নি। আমার হয়ে আপনি-ই জবাবটা খোঁজবার চেষ্টা করুন না। পৃথিবীর ইতিহাস তো আপনার মুখস্থই আছে।"

মাথা নিচু ক'রে ঐখানে দাঁড়িয়েই স্বকু ভাবতে লাগল। ভাবতে লাগল বসন্তর কথা। ছেলেটা যেন প্রতিদিনই ওর কাছে বড় হয়ে উঠছে। সাধারণ একজন সাদাচরিত্রের যুবক সে নয়। নতুন নিয়মের মধ্যে অনিশ্চয়তা আছে ব'লেই যে বসন্ত পুরনো নিয়ম সব ধ'রে রাখতে চায় তেমন বিশ্লেষণের মধ্যে স্বকু তার ভুল দেখতে পেল। হয়তো বসন্তর চরিত্র এত সহজে বুঝতে গিয়েই সে ওকে এযাবৎকাল বুঝতেই পারে নি। বসন্তর কাছে স্বকুর পরাজয় যেন ক্রমশই স্পষ্টতর হচ্ছে। প্রাক্-বিপ্লবী যুগের লক্ষ লক্ষ যুবকদের মত বিশ্বাসহীনতার ব্যর্থ মনস্তাপে সে নিজেকে কোনদিনও তিক্ত ক'রে তোলে নি। মেরুদণ্ডহীন সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করা সম্ভব ছিল না ব'লেই সেদিন ওরা সবাই চেয়েছিল নুতন বিশ্বাস। বিশ্বাসহীনতার শূন্যতা ঘোচাবার জন্যে আমরা বিদেশ থেকে আমদানি করেছিলুম মার্কসবাদ। কিন্তু লক্ষ লক্ষ যুবক যা অনায়াসে গ্রহণ করেছিল, বসন্ত তা একবার নেড়েচেড়ে দেখবারও প্রয়োজন বোধ করে নি। স্বকু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বসন্ত জিজ্ঞাসা করল, "পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও কি আমার এই বিশ্বাসের মূলটা খুঁজে পেলেন না?"

"পেয়েছি।"

[illegible] জড়িয়ে। এমন ঐকান্তিক বিচ্ছিন্ন মনস্কতা নিয়ে [illegible] [illegible]কিবার মূলে রয়েছে ভারতীয়-সর্বজনীন প্রেরণা। [illegible], আজ কাগজ থেকে [illegible]বি বার বার ক'রে ভাবছি যে, কোন দেশই কেবল আমদানি-ঐশ্বর্যে ধনী হয়ে উঠতে পারে না।"

ঘরের পশ্চিমদিকের রাস্তা দিয়ে এসে উপস্থিত হ'ল অবনী মণ্ডল। সের দুই ওজনের একটা আস্ত পোনামাছ ছুকুর হাতে তুলে দিয়ে অবনী মণ্ডল বলল, "খুব সস্তা দিদি, খুব সস্তা। আগে তো এমন আস্তমাছ দূরে দাঁড়িয়ে দেখতুম— কাছে যাওয়ার সাধ্যই ছিল না। এখন হচ্ছে গিয়ে মজুরদের রাজত্ব। হেঁ, হেঁ আট আনায় দু-সের পোনা।"

"কিন্তু আমি তো আস্তপোনা কাটতে জানি না অবনাদা।"

মাছ তো বুর্জোয়া নয়, নইলে ছুকু চৌধুরী তাও কাটতে পারত।

অবনী মণ্ডল বলল, "আচ্ছা, আচ্ছা আমিই কেটেকুটে দিচ্ছি।"

"খানিকটা মাছ রান্না ক'রে ওবাইদ মোল্লার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয় অবনীদা?" জিজ্ঞাসা করল ছুকু।

মুহূর্তের মধ্যে আবহাওয়া বদলে গেল। গম্ভীর সুরে জবাব দিল অবনী, "না, মাছ পাঠাবার দরকার নেই।"

অবনী মণ্ডলের কথাগুলো খুবই কর্কশ শোনাল। ছুকু জিজ্ঞাসা করল, "আমাদের ছোঁয়া জিনিষ ওবাইদ মোল্লারা খাবে না বুঝি?"

"এতদিন খাচ্ছিল, কিন্তু আজ থেকে আর খাবে না।"

"কেন, হঠাৎ আমরা সব অচ্ছুৎ হয়ে গেলাম না কি?"

"কি জানি দিদি, গাঁয়ের সবাই বলাবলি করছে যে, তোমাদের নাকি বিয়ে-শাদি হয় নি।" এই ব'লে অবনী মণ্ডল পোনামাছটা দাওয়ার ওপর ফেলে রেখে নেমে এল মাঠে। ছুকু জিজ্ঞাসা করল, "আমাদের তুমি ত্যাগ করলে, না অবনীদা? কোথায় যাচ্ছ?"

"হলধরের কাছে।" শ্রান্ত ও শিথিল গতিতে অবনী মণ্ডল হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে বগুড়া জেলায় গিয়ে পৌছুতে পারলে, সে বোধহয় পেছন দিকে

আর ফিরে চাইত না। কেনই বা চাইবে? ভুবতীর মাটি ছিঁড়ে মানুষ কারো ওপরেই তো সে আর নির্ভর করতে পারছে না। ওখানেই সোজা হয়তো এরই মধ্যে ভুবতীর সব সব ছেড়ে দিয়েছে সুলতানপুরের পার্টি-সেক্রেটারী শাজাহান সাহেবের হাতে। হালিশহরের অভাব এখানে এসে মিটল কই? সারা পৃথিবীর মানুষ বোধহয় সব বদলে গেছে। অবিশ্বাসের মাটিতে ভালবাসার ফসল ফলাবার চেষ্টা ক'রে লাভ কি? ফসল হয়তো ফলবে, কিন্তু ভালবাসার অভাব তাতে ঘুচবে না। মানুষ, মানুষ আর মানুষ খোঁজবার জন্যে সে আর কোথাও ছোটাছুটি করবে না। পাথরের মুখ থেকে এবার সে ভালবাসার মন্ত্র শোনবার জন্যে সোজা হয়ে ব'সে রইল হলধরের সামনে।

পঞ্চম ভাগ

কমরেড, তোমায় আবার আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, এ চিঠি আমি লিখছি ভারতবর্ষের বাইরে থেকে। তুমি পাবে কি না জানি না, কিন্তু না পেলেই বা দুঃখ কি? ভারতবর্ষকে স্বর্গে পরিণত করবার ঐতিহাসিক দায়িত্ব আর তোমার হাতে নেই। তুমি বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ। চোখে তোমার ছানি পড়েছে। তবে এ-চিঠি লেখার সার্থকতা কি? কাদের জন্যে লেখা? যাদের চোখে আজও ছানি পড়ে নি, তারাই পড়বে আমার চিঠি। উনিশ শো পঁচাত্তর খৃষ্টাব্দে ব'সে একটা মোটামুটি হিসেব করলে তুমি দেখতে পাবে যে, শতকরা নব্বইটি তরুণ-চোখের অক্ষিগোলক আজ ছানির আক্রমণ রুখতে পারে নি। বাকী দশটির জন্যেই বোধহয় এ-চিঠি আমি লিখছি। আমি আবার ফিরে যাচ্ছি বিপ্লবোত্তর ভারতবর্ষে।

মায়ের শবদেহ নিয়ে পরের দিন শোভাযাত্রা বেরবার কথা ছিল। কিন্তু ভোরবেলায়ই বিনয়প্রকাশ এসে উপস্থিত হ'ল কুইনস পার্কের বাড়িতে। সে বলল, "কাল আপনি চলে আসবার পরে আমরা একটা মিটিং করেছিলুম। মিটিং-এর ফলাফলটা আপনাকে জানানো উচিত ব'লেই ভোরবেলায় আবার আসতে হ'ল। মিটিং-এ ঠিক হয়েছে যে, শোভাযাত্রা বেরবে না।"

"কেন?"

বিনয়প্রকাশ ফাইল থেকে একখানা কাগজ বার ক'রে তাতে চোখ রেখে বলতে লাগল, "পৃথিবীর প্রথম মানুষের যখন মৃত্যু হয় তখন কেউ শোভাযাত্রা বার করেছিল ব'লে আমরা জানি না। অনুমান হয়, তখন শোভাযাত্রা বার করবার নিয়ম চালু হয় নি। কারণ, সে যুগে পুরোহিত কিংবা আত্মার অস্তিত্ব ছিল না। কমরেড চৌধুরী, কোন বিশেষ শবদেহকে আমরা কেন দেব আনুষ্ঠানিক মর্যাদা? অনুষ্ঠানের সমারোহ থাকলেই পুণ্যলোভাতুর মানুষ মৃত্যুর

পরেও আত্মার সদগতির জন্যে লালায়িত হয়ে ওঠে। মনে করে দেহটা গেছে যাক, আত্মার মরণ নেই। কিন্তু দেহহীন ছত্রিশ কোটি আত্মা দিয়ে আমরা তো পারব না আধখানা বন্দুক তৈরি করতে, পারব না কারখানা চালাতে। মার্কসবাদীর কাছে আত্মার কদর যে কতটুকু তা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু বুর্জোয়াদের ধারণা, কার্ল মার্কস হেগেলীয় মেটাফিজিক্সের বাইরে আসতে পারেন নি। সত্যিই হয়তো পারেন নি, কারণ তিনি ছিলেন একজন জার্মান। হলেনই বা জার্মান, তাতে ক্ষতি কি? ডায়লেকটিকসের হাতিয়ার রয়েছে, মেটাফিজিসিয়ান কার্ল মার্কসই আমাদের আবার ফায়ারবাখের মত সাবধান ক'রে গেছেন যে, আসলে মেটাফিজিসিয়ানরাই হয়তো কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের হবে গুপ্ত পুরোহিত। পুরোহিততন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখবার অস্ত্র হাতে নিয়ে ওরাই ঘুরে বেড়াবে আমাদের মধ্যে। অতএব আমি উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি যে—"

বাধা দিয়ে বললুম, "আমি তো তোমায় বাধ্য করি নি বিনয়? শোভাযাত্রা বেরবে কি বেরবে না, সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার জন্যে একেবারে সৃষ্টির গোড়ায় যাওয়ার দরকার ছিল না। আমার সন্দেহ হচ্ছে কেবল কার্ল মার্কসই জার্মান ছিলেন না, তুমিও একজন জার্মান।"

বিনয়প্রকাশ নিঃশব্দে ফাইলের সুতো বাঁধতে লাগল।

বিনয়ের মুখের দিকে চেয়েছিলুম আমি। রাজনীতিক্ষেত্রে বিনয়প্রকাশ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। বিরাট এই ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে আবার একটা ছোট্ট রাজ্য অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে গজিয়ে উঠেছে। সে-রাজ্যের মধ্যে বিচরণ করছে হকু, অনীতা বিনয়প্রকাশ ও রুক্মিণী। আমাকে কেন্দ্র ক'রেই ওরা বিচরণ করছে। এই ক'টি চরিত্র নিয়েই একটা বিরাট ইতিহাস রচনা করা যায়। রচিত হচ্ছে। এরই মধ্যে চলেছে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার অন্তহীন যুদ্ধ, সম্প্রসারণের গভীরতম প্রবৃত্তি। জয়-পরাজয়ের অস্ত্রের মুখ থেকে অধিকার-প্রলুব্ধ রক্তের দাগ কিছুতেই মুছে ফেলা যাচ্ছে না। ক্ষমতার সিংহাসন দখল করা চাই-ই। মানুষ বোধহয় ডায়লেকটিকস-বাহতে তার জীবনদর্শনের সত্য খুঁজে পেল না। সৃষ্টির এক হাতে সুধাভাণ্ড থাকলে, অন্য হাতে থাকবে

শিকার এবং তারই নিয়ন্ত্রণ-সংঘর্ষের কর্মভূমিতে আমরা আবার জেগে উঠি?
কেবল মৃত্যু, শুধু মৃত্যু। এমন কি মহৎ মৃত্যুও নয়।

ফাইলটা বেঁধে নিয়ে বিনয়প্রকাশ চ'লে যাচ্ছিল। একটু ভয় দেখাবার জন্যেই বোধহয় আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তোমার ভক্ত পুলিশরা কি আজো অনীতাকে খুঁজে বার করতে পারল না?"

"মীনা এবং রমলার কাছে অনীতার খবর আপনি অবশ্যই পেয়েছেন কমরেড চৌধুরী।" বিনয়প্রকাশের জবাবে এক বিন্দু অস্পষ্টতা রইল না।

গুলি আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল ভেবে সহজ গলায় জিজ্ঞাসা করলুম, "অনীতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি ভাবছ বিনয়?"

"অনীতাকে আমি বিয়ে করব কমরেড চৌধুরী।" আমার বিস্মিত হওয়ার সময় না দিয়েই বিনয়প্রকাশ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ব'সে রইলুম চুপ ক'রে। ভারতরাষ্ট্রের সিংহাসন সে দখল করবে। রাষ্ট্রের কর্ণধার আমি, আমি আজ চূড়ায় সমাসীন। ওকে উঠতে হবে, আমাকে হবে নামতে। ওপর থেকে প'ড়ে যাওয়া সহজ, কিন্তু ওপরে ওঠা খুবই কঠিন। বিনয়প্রকাশের প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত কোন্ দিক দিয়ে যে এগুচ্ছে আমি তা বুঝতে পারলুম না। যদি প্রয়োজন হয়, তা হ'লে অনীতাকে ওর বিরুদ্ধে কাজে লাগাব ব'লে ভেবে রেখেছিলুম। কিন্তু এখন তাও আর হয়ে উঠবে না। ভারতবর্ষের রাজনীতি থেকে শেষ পর্যন্ত হয়তো চৌধুরী পরিবারের শেষ সম্পর্ক মুছে ফেলা যাবে না। অনীতাকে বিনয়প্রকাশ বিয়ে করছে। অনীতাকে নিয়ে সে ঘর বাঁধতে চায়। মুকু আজ এখানে উপস্থিত নেই। থাকলে সে কি ভাবত জানি না। বিপ্লবের আগুনে মুকু তিলে তিলে নিজেকে পুড়িয়েছে বটে, কিন্তু ওর এই ভস্মীভূত হওয়ার পেছনে বিপ্লবের চেয়েও বড় কারণ ছিল বিনয়প্রকাশের বিশ্বাসঘাতকতা। মুকু বিনয়প্রকাশের বাইরে আলাদাভাবে বাঁচতে শেখে নি। খানিকটা রেখে খানিকটা দেওয়ার তপস্যা মুকুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল না। বুর্জোয়া সমাজের সাবিত্রী নাম্নী পতিব্রতার চেয়ে মুকুর ব্রত কোন অংশেও শিথিলতর ছিল কি? বিনয়প্রকাশের নতুন ঘরে আজ সেই মুকুর জন্যে এক বর্গ ইঞ্চিও স্থান নেই।

বিয়ের কথা আমার কানে [illegible] করে। একেবারে বিপরীতমুখী দু-টো মনের কেমন ক'রে যে মিলন ঘটবে তাই আমি ভাবতে লাগলুম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অনীতা বিনয়প্রকাশকে ফিরিয়ে দেবে না। কবে ক্রুশ বহন করবার জন্যে অনীতা তৈরি হয়েছে। ক্রুশের সত্য দিয়ে বিনয়প্রকাশের মার্কসবাদ মুছে দেবার জন্যে অনীতা সম্ভবত বিয়ে করতেও রাজী হবে। কিন্তু বিনয়প্রকাশ? অনীতাকে বিয়ে করবার জন্যে সে এত আকর্ষণ বোধ করে কেন? ডায়লেকটিকসের সত্য প্রমাণ করতে নাকি? হয়তো তাই। কিংবা অনীতাকে রক্ষা করবার আর কোন পথ নেই ব'লেই সম্ভবত বিনয় আজ এতবড় জুয়া খেলতে যাচ্ছে। কিন্তু অনীতাকে যে রক্ষা করতেই হবে তেমন যুক্তি আমাদের নতুন রাষ্ট্র মেনে নেবে কেন? বিনয়প্রকাশ অবশ্যই জানে যে, মার্কসবাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে অনীতার এই ক্রুশের ধর্ম। মার্কসবাদ যদি কোনদিন পৃথিবীর বুক থেকে তার তাঁবু তুলে নিতে বাধ্য হয়, তবে তা সম্ভব হবে কেবলমাত্র মানবমনের বিশ্বাস, আশা এবং ভালবাসার সেই সনাতন সহজ ধর্মের প্রতিকূলতায়। এতটা জানার পরেও, বিনয় কেন যাচ্ছে অনীতাকে রক্ষা করতে? সন্দেহ হ'ল, অনীতাকে সে ভালবাসে। এ-ভালবাসা কেবল জীববিদ্যা-বিজ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বুর্জোয়া মনের আধ্যাত্মিক আকর্ষণ বিনয়প্রকাশকে প্রলুব্ধ করেছে হয়তো ওর নিজেরই অজ্ঞাতসারে। ভারতরাষ্ট্রের প্রতাপশালী কমিশার জয় করতে পারে নি ঐই সামান্যতম প্রলোভনটুকু। দুদু ছাড়া অন্য কেউ পারবে না ওর এই প্রলোভনটুকুকে সমূলে বিনাশ করতে। বিনয়প্রকাশ নিশ্চয়ই জানে যে, দুদু বেঁচে থাকলে ওর নতুন ঘরে কোনদিনও আনন্দের হাওয়া বইবে না। বইতে পারে না। দুদুর জন্যে আজ আমার মন কাঁদতে লাগল। সে যেন তার নিজের মনের খানিকটা আমারই কাছে গচ্ছিত রেখে গেছে চিরদিনের জন্যে। দুদু আমার কাছে নেই বটে, কিন্তু আমি জানি, বিনয়প্রকাশের বিশ্বাসঘাতকতা সে ক্ষমা করবে। আমি যেন ওর অচেতন-সংবাদও শুনতে পেলুম: দীপুদা, বিনয়প্রকাশের বিয়ের খবর শুনে আমি খুবই সুখী হয়েছি।

: কি সুখ তুই এতে দেখলি রে দুদু?

: দুঃখের আমার সীমা নেই দীপুদা। বিবির কাছে বিপ্লবকালে শক্তিকারের ভালবাসায় মিলন পাবে। যাকে ভালবাসি সে যদি কন্যা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র পার হ'য়ে এসে একটা সুরক্ষিত বন্দরে আশ্রয় পায়, তা হ'লে দুঃখ করবার রইল কি? সব মত এমন সুরক্ষিত সুন্দর বন্দর আমাদেরও টানে দীপুদা। কিন্তু—কিন্তু আমি তো আজো মাঝ-দরিয়ায় হাবুডুবু খাচ্ছি।

একটা ফাইল হাতে নিয়ে এসে রুক্মিণী দাঁড়াল আমার সামনে। হাতঘড়িটা আমার দিকে তুলে ধ'রে সে বলল, "অফিসে যাওয়ার সময় হ'ল।"

"কোন্ অফিসে?" হঠাৎ একটা হাস্যকর প্রশ্ন ক'রে ফেললুম রুক্মিণীর সামনে। ধরা প'ড়ে গেলুম। সুরটা পাল্টে নিয়ে আমি নিজেই আবার বললুম, "হ্যাঁ, অফিসে যেতে হবে। কাজের কী বিরাট তালিকা তৈরি করেছি আমি, তা তুমি জান না রুক্মিণী। ছ-মাসের মধ্যে পাঁচ হাজার বছরের আবর্জনা সাফ করতে হবে।"

একটু হেসে রুক্মিণী বলল, "ছত্রিশ কোটি ঝাঁটা দিয়ে পাঁচলক্ষ বছরের আবর্জনাও সাফ করা যায়। কিন্তু ঝাঁটার প্রয়োজনীয়তা যতদিন থাকবে, আবর্জনাও থাকবে ততদিন।"

"আবর্জনা সব আমরা পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেব।"

"তারপরে আবার নতুন আবর্জনা জমে উঠবে কমরেড চৌধুরী। স্বর্গ তোমাদের যত পরিচ্ছন্নই হোক, আবর্জনা থাকবে। যতদিন না কলকারখানায় মানুষ তৈরি হচ্ছে, ততদিন তার স্বভাব থেকে আবর্জনা-প্রিয়তা মুছে ফেলতে পারবে না।" এইখানেই আলোচনা শেষ হ'ল। দেহরক্ষী কমরেড মল্লিক এসে দাঁড়িয়েছে দরজার সামনে।

কমরেড, বিপ্লবোত্তর ভারতবর্ষের প্রথম ছ-টা মাসের ইতিহাস লিখতে গেলে এ-চিঠি লেখা আমার ইহজীবনেও শেষ হবে না। কলকাতার রাস্তায় ভিখিরী নেই! বস্তিগুলো কেমন ক'রে যে ধোঁয়া হয়ে গেল কেউ তা টের পেলে না। বড়বাজারের চর্বি আর বালিগঞ্জের বাবু-সংস্কৃতি উবে গেল কর্পূরের মত। কলকাতার রাস্তাগুলো আয়নার মত ঝকঝক করছে। যুবক যুবতীদের

মিছিল চলেছে তাই ওপর দিয়ে দিনরাত। টেলিভিশনের ছবিতে মা বাবা সুদূর বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলোর রাজধানীতে বসেই সেখানকার রাজনীতিবিশারদরা মিছিলের প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছেন। দু-দশটা বিদেশী ডেলিগেশন এরই মধ্যে আমাদের রাজধানীর শোভা ও সমৃদ্ধি দেখে গেছে। কলকাতার লেন এবং বাই-লেনের মধ্যে মাথা গলিয়েও তারা দু-একটি বুড়ো কিংবা বুড়ির মুখ পর্যন্ত দেখতে পায় নি। কোথায় গেল তারা? কংগ্রেসী আমলে বুড়ো বুড়িরাই ছিল এ-শহরের শোভা। সাহিত্য-সভা থেকে প্রদেশপালের প্রকোষ্ঠ পর্যন্ত কেবল বাঁধানো-দাঁত আর রঙ মাখানো লোল-চর্মের বিরামহীন মিছিল দেখা যেত। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের এরাই ছিল শোভন সংস্করণ। কিন্তু আজ আমরা ভারতবর্ষের যৌবন এনেছি ফিরিয়ে। নকল দাঁতের মিছিল শহর কলকাতার কোথাও আর কেউ দেখতে পায় না। নতুন সভ্যতার 'ডাইনামিজম্' জন-সাধারণ গ্রহণ করেছে। তারা দেখতে চায় উন্নতি, বক্তৃতা শুনতে চায় না। আসলে জনসাধারণ কিছুই চায় না, তাদের মধ্যে চাহিদা সৃষ্টি করতে হয় প্রচারের দ্বারা। তাই প্রচারবিজ্ঞানই হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ রাজনীতি। বিপ্লবোত্তর ভারতবর্ষের উঁচু-নিচু মাটি আমরা এই রাজনীতির 'বুল ডোজার' দিয়ে সমতল ক'রে দিলুম প্রথম ছ-মাসের মধ্যেই। কেউ কোন প্রশ্ন করে নি, প্রশ্ন করবার সময় দিই নি আমরা। অবাক হয়ে সবাই কেবল দেখছে আমাদের রাজনীতির সোনার কাঠি। আজ আর গোপন করবার কিছুই নেই। শুধু সোনার কাঠি-টি আমরা তুলে ধরেছি সবার সামনে। নতুনের প্রতি আকর্ষণ মানুষের স্বভাবধর্ম। তার ওপরে সোনার কাঠির নতুনত্বে অন্ধ মানুষেরও দৃষ্টি ফিরে এসেছে। আজ আর অস্বীকার করবার প্রয়োজন নেই যে, আমরা রাজনীতি-ই করতে চেয়েছিলুম। জয়-পরাজয়ের সনাতন সত্য রীতি আমরা অনুসরণ করেছি। ছলে, বলে এবং কৌশলে শত্রুকে হারিয়ে দেওয়ার রীতি রামরাজ্যের 'সামরিক-কেতাব' থেকেও আমরা খুঁজে আনতে পারি।

সকাল আট-টায় গ্রেট ইস্টার্নের অফিসে এসে আমায় ঢুকতে হয়। বেলা তিনটে পর্যন্ত দর্শনপ্রার্থীদের ভিড় থাকে। সন্ধ্যের পর থেকে শুরু হয় কমিশারদের মিটিং। অনেক দিন কুইনস পার্কে ফিরতে পারি নে। কেবল

ছাত্রীর কাজ দিয়েই পার্টি সুরু করি। বিনয়প্রকাশের [illegible]
আমায় খাটতে হবে। তবে খাটিকটা বাড়াবার জন্যেই আমি
রুক্মিণীকে প্রাইভেট সেক্রেটারী ক'রে নিয়েছি। বিনয়প্রকাশের হিসেবে,
রুক্মিণী আমার মনের অলিতে গলিতে বিচরণের ছুরি রাখবে। ছুরি মারবার
সুযোগ দিচ্ছি আমি-ই। জীবনের বিনিময়ে রুক্মিণী [illegible] কাজ নিয়েছে
বটে, কিন্তু বিনয়প্রকাশ জানে না, তার নিজের হাতের চেয়ে রুক্মিণীর হাত আরো
অনেক বেশি শক্ত। তার মৃত পিতার রক্তিম রক্তটা আমার চরণতলে
পৌঁছে দেবার জন্যে রুক্মিণীর হাত উদ্যত হয়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষের প্রধান
নেতার আসনের চেয়ে বিনয়প্রকাশের উচ্চাকাঙ্ক্ষা উঁচু নয়, কিন্তু রুক্মিণীর
দৃষ্টি তার চেয়েও উঁচুতে প্রসারিত। সে প্রতিশোধের পথ খুঁজছে।

অফিস ঘরে ব'সে কি একটা ফাইল পড়ছিলুম। রুক্মিণী এসে বলল,
"অধ্যাপিকা সঙ্ঘের সেক্রেটারী মিস মৃদুলা ঘোষ এসেছেন দেখা করতে। তাঁকে
সময় দেওয়া হয়েছিল তিনটে পাঁচ।"

"নিয়ে এসো।"

একটু বাদেই মিস ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল রুক্মিণী। কমরেড রক্ষিক
দাঁড়িয়ে রইল আমার পেছনে। আমাদের আলোচনা লিখে নেবার জন্যে
স্টেনোগ্রাফার কমরেড বাসুদেব বসল আমার ডান দিকে।

মিস মৃদুলা ঘোষ বললেন, "বাংলাদেশের মেয়ে-কলেজগুলোতে যেসব
অধ্যাপিকারা কাজ করেন, আমি এসেছি তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে। আমাদের
বিশ্বাস, আপনি যদি নিজের কানে আমাদের সমস্যাগুলো শোনেন, তা হ'লে
সমস্যাসমাধানের জন্যে অনাবশ্যক সময় নষ্ট হবে না। সারা ভারতবর্ষ আপনার
মুখের দিকেই চেয়ে আছে।"

"সবচেয়ে বড় সমস্যাটা আগে বলুন।"

"কংগ্রেসী-শাসকরা মাইনে ব'লে আমাদের যে ভিক্ষা দিত, গত
ছ-মাসের মধ্যে তার পরিমাণ একটুও বাড়ে নি। কল-কারখানার মজুরদের
যা মাইনে বেড়েছে তাও আমাদের প্রায় সমান সমান।"

ঘূর্ণি চেয়ারটার একটু দোল দিয়ে আমি মিস ঘোষের দিকে মুখোমুখি

হয়ে বললুম। জিজ্ঞাসা করলুম, "কতদিন থেকে আপনি অধ্যাপনার কাজ করছেন?"

"দশ বছর।"

"কলেজে আপনি কি পড়ান?"

"ইংরেজী সাহিত্য। শেক্সপীয়ার আমার স্পেশাল সাবজেক্ট।"

আমি কিছু বলবার আগেই কমরেড বাসুদেব হাসতে লাগল। আমার মনে হ'ল সে ঠোঁট চেপে ভেতরে ভেতরে ভীষণভাবে হাসছে। হাসছে কমিশীরীও। মিস ঘোষ বোধহয় বুঝতেও পারলেন যে, ভারতবর্ষের পয়লা নম্বর মার্কসবাদীর সামনে অনেক শেক্সপীয়ারের নাম উল্লেখ করা উচিত হয় নি। ভুলটা শুধরে নেবার চেষ্টা করলেন মিস ঘোষ "দেখুন, শেক্সপীয়ারকে নিয়ে দশটা বছর নষ্ট করা আমার উচিত হয় নি আমি তা জানি। কিন্তু আপনি তো জানেন কমরেড চৌধুরী, কংগ্রেসী আমলে আমাদের কত অসুবিধের মধ্যে কাজ করতে হয়েছে? তবুও সুযোগ মত, আমি শেক্সপীয়ার বন্ধ ক'রে মেয়েদের কাছে মাঝে মাঝে মাউ-সে-তুঙ্-এর কবিতা পাঠ করেছি। ক্লাশ কামাই ক'রে একশ দুই ডিগ্রী উত্তাপ মাথায় নিয়ে গেছি ময়দানের মিটিং শুনতে। সর্বাধ্যক্ষা ভালোমানুষ ব'লেই পেটের পীড়ার একই অজুহাতে ছুটি পেতুম পুনঃপুনঃ। তিনি কোন কথাই মনে রাখতে পারতেন না। কমরেড চৌধুরী, আজ কেন তা হ'লে আমাদের মাইনে বাড়বে না?"

"মাইনে বাড়ানোর সমস্যাকে আমরা সমস্যাই মনে করি নে।"

"তবে?" মিস ঘোষের কণ্ঠে চঞ্চলতার বেশ শোনা গেল।

"কলেজগুলো আমরা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। পাঁচ বছর পর্যন্ত ভারতবর্ষে যদি শেক্সপীয়ার পড়ানো না হয়, তা হ'লে রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি হবে না, বরং উন্নতি হবে। আপনি হয়তো সংস্কৃতির কথা উল্লেখ ক'রে আমাদের সিদ্ধান্তের ভুল ধরবার চেষ্টা করবেন মিস ঘোষ। কিন্তু ডায়লেকটিক্যাল জড়বাদের প্রাচীরবেষ্টিত সীমানার বাইরে আমরা সংস্কৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করি না।"

চঞ্চলতার মাত্রা বাড়িয়ে মিস ঘোষ জিজ্ঞাসা করলেন, "তবে যে কংগ্রেসী-

আসলে দেখতুম, আপনারা সব সংস্কৃতি-ডেলিগেশন নিয়ে সুমাত্রা থেকে কালিম্পং পর্যন্ত ছোটাছুটি করছেন ?"

ঠোঁটের ভাঁজে সরল হাসির তরঙ্গ তুলে বললুম, "ওটা তো ছিল রাজনীতি, সংস্কৃতি নয়। নইলে আপনি কি মনে করেন কতকগুলো নৃত্যগীত এবং চিত্র-প্রদর্শনীর দল নিয়ে আমরা সংস্কৃতি বিনিময় করছি ? মিস ঘোষ, সময়ের মূল্য আমাদের কাছে এত বেশি যে, নৃত্যগীতের সংস্কৃতি নিয়ে আমরা নিউ এম্পায়ার থেকে রণজী স্টেডিয়াম পর্যন্ত ছুটে যেতাতুম না যদি এর মধ্যে রাজনীতি না থাকত।"

"তা হ'লে আমরা কি করব ?" মিস ঘোষ অসহায় বোধ করতে লাগলেন।

"কলকাতা করপোরেশনের বাইরে, আমরা কতকগুলো শ্রমিক কলেজ তৈরি করছি। কারিগরি শিক্ষা দেওয়া হবে সেখানে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উঁচু উঁচু অট্টালিকা উঠছে। ছ-মাসের মধ্যেই কাজ শেষ করব ভেবেছিলুম। কিন্তু শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না। আপনারা কেন শ্রমিক সঙ্ঘে যোগ দেন না ? মাউ-সে-তুঙের কবিতা পাঠ করলে অট্টালিকা উঁচু হবে কি ক'রে ? তা ছাড়া সিমেণ্ট আর সুরকী টানলে কি কবিতা পাঠ করা যায় না মিস ঘোষ ?"

"যায় না মানে ? নিশ্চয়ই যায়।" মিস ঘোষ হাসবার মেহনত করতে করতে পুনরায় বললেন, "মেহনতি-সভ্যতায় সাহিত্য পাঠের কি কোন ব্যবস্থাই থাকবে না কমরেড চৌধুরী ?"

"থাকবে, মেহনতি-সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে। দেখুন মিস ঘোষ, আমি জানি মধ্যবিত্তের মন ব'লে একটা পৃথক অস্তিত্ব আছে। আপনারা ঠাকুরদেব্তা মানেন না, কিন্তু সেই মনের স্বাধীনতাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে মন-পূজা নিয়ে মত্ত হয়ে আছেন দিনরাত। আপনার মন যদি আপনার সম্পত্তি হয়, তা হ'লে প্রতিক্রিয়াশীলতা বন্ধ করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। অতএব, আমাদের এই শ্রেণীহীন সর্বহারার রাষ্ট্রে মধ্যবিত্ত থাকবে না, থাকবে না তার মনের স্বাধীনতা। কেন থাকবে ? থাকবার দরকার কি, যদি আমরা পৃথিবীটাকে একটা শস্যভাণ্ডারে পরিণত করতে পারি ? মধ্যবিত্তের মনের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে না পারলে খাদ্যের অভাব আমরা মেটাতে পারব না।

সুতরাং আমাদের গৃহ-নির্মাণ-শ্রমিক-সঙ্ঘে গিয়ে আপনারা ঢুকে পড়ুন। রাষ্ট্রের উন্নতি তাতে দ্রুততর হবে এবং রাষ্ট্রের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবার সুযোগ পাবেন আপনারা।"

ঘড়ির দিকে চেয়ে কল্পিনী ঘোষণা করল, "মিস ঘোষের সঙ্গে আর এক মিনিট আপনি কথা কইবার সময় পাবেন কমরেড চৌধুরী।" মিস ঘোষ এবার নিজেই বললেন, "না, না—কথা কইবার আর রইল কি? ভারত রাষ্ট্রের প্রধানতম নেতার সঙ্গে যে দেখা করতে পারলুম, সেইটেই আমার সবচেয়ে বড় লাভ হ'ল।"

"লাভ?" আমি যেন চমকে উঠে বললুম, "আমাদের রাষ্ট্রে লাভের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। মধ্যবিত্ত-ঢেকী স্বর্গে গেলেও যে মুনাফার ধান ভানতে চায় তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত আপনার এই স্বাধীন মনের লাভ-অর্জনের স্বীকৃতি।"

মিস ঘোষকে নিয়ে কমরেড লতিফ তার জুতোর আওয়াজ তুলতে তুলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শূন্য চেয়ারের দিকে চেয়ে কমরেড বাসুদেব বলে উঠল, "মিস ঘোষ একখানা বই ফেলে গেলেন যে।"

"কি বই?"

বইখানা খুলে কমরেড বাসুদেব বলল, "শেক্সপীয়ারের গ্রন্থাবলী। এর ভেতরে দেখছি দু-খানা আলগা পাতা রয়েছে কমরেড চৌধুরী। দেখুন তো বাংলা কবিতা ব'লে মনে হচ্ছে।"

"বাংলা কবিতাই বটে। বুর্জোয়া কবির 'অর্কেস্ট্রা' বই থেকে দু-খানা পাতা ছিঁড়ে রেখেছেন মিস ঘোষ। ধাপার ধ্বংসাবশেষটুকু চোখের সামনে তুলে ধ'রে আমি মনে মনে পড়তে লাগলুম:

আমার অক্ষম বুদ্ধি দিবস-রজনী
শুনেছে অন্তরপথে বিপ্লবের নিত্য পদধ্বনি;
জানে আপনার দৈন্য। তাই ভোবে নির্বাক ধিক্কারে
বিপ্রলব্ধ হৃদয়ের দাম্ভিক বিলাপ;
তাই মোর উদ্ভ্রান্ত সন্তাপ
পায় না প্রতিষ্ঠা আজ আত্মম্ভরি অস্মিতার দ্বারে;

ভাই বোধ প্রাণ
স্মৃতিশূন্য অন্ধকারে খুঁজে মরে নিশ্চিহ্ন নির্বাণ।

অফিসের কাজ শেষ করতে প্রায় ছ-টা বেজে গেল। কোথাও কোন বক্তৃতার ব্যবস্থাও ছিল না আজ। ভাবলুম, কুইনস পার্কে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম করব। টেবিলের ওপরে শেক্সপীয়ারের গ্রন্থাবলীটা দেখলুম এখনো পড়ে আছে। মিস ঘোষ হয়তো আজ আর বইটার খোঁজ করতে আসবেন না। বাড়ি গিয়ে শেক্সপীয়রকে নিয়ে খানিকটা সময় কাটালে কেমন হয়? কি মনে ক'রে 'অর্কেষ্ট্রা'-র ছেঁড়া পাতাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। একদা সুধীন্দ্রনাথ ছিল আমার প্রিয় কবি। সুধীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতাগুলো আমায় মুগ্ধ করেছে বারংবার। কোন্ এক অচেনা-প্রিয়তমার নকল মূর্তি যেন সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় রক্ত মাংসের বাস্তব কলেবর নিয়ে উপস্থিত হ'তো। আমার প্রেমহীন জীবনের এইটুকু বাস্তবের-ই পশ্চাৎ-স্মৃতি আজ আবার যেন আমার সামনে এক নতুন মূর্তি তুলে ধরল—সচেতন 'ইমেজ'। আমি ভালবাসতে চাই, দেহ এবং দেহাতীতের সমন্বয় মাধুর্য কুড়িয়ে আনতে চাই 'অর্কেষ্ট্রা'র ছেঁড়া পাতা থেকে। কিন্তু—কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ধাপায় সমন্বয়ের সুযোগ আমরা নষ্ট করেছি। বিরাট এক বিশ্বগণদেহের গন্ধমাদনের তলায় 'অর্কেষ্ট্রার' সুর নগ্ন-নৈঃশব্দে নিমজ্জিত হয়ে গেল! মনে হচ্ছে, আমাদের ঐ বিপুলাকার শস্য ভাণ্ডারটি পাণিপথের যুদ্ধক্ষেত্রের মত বিগত-শৌর্যের মহাশ্মশান ছাড়া আর কিছু নয়। প্রতিটি চালের দানা যেন এক একটি শবদেহের মত প'ড়ে রয়েছে আমাকে ব্যঙ্গ করবার জন্যে। একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে আমি শবদেহগুলো টপকে টপকে পথ হাঁটছি—খুঁজে বেড়াচ্ছি সেই হারিয়ে-যাওয়া 'অর্কেষ্ট্রার' সুর। কোথায় সুর, সবই তো শবদেহ? তবে আমি কি অনুসন্ধান করতে বেরিয়েছিলুম? বোধহয় বিনয়প্রকাশের গুপ্ত হাতের অনুসন্ধান করবার জন্যেই আজ আমার শস্যভাণ্ডার পরিদর্শনের প্রয়োজন হয়েছে।

ঐ হাত দিয়ে বিনয়প্রকাশ হুকুর জীবনটাকে ভেঙে দিয়েছে। ধ'রে রেখেছে অনীতাকে, বেঁধে রেখেছে রুক্মিণীকেও। ইংরেজ বণিকদের হাতের মত এ-হাত

বোঝো আমার নি উপনিবেশ স্থাপনের জোর নিয়ে। এর গঠনরীতি আলাদা —রক্ত মাংসের ছিটেফোঁটা তাতে নেই। কঠিনতম ইস্পাতের আঙুলগুলো যেন সপ্ত পারিপথ অতিক্রম ক'রে এসে আজ সমগ্র ভারতবর্ষের বুকের ওপর থাবা বসিয়েছে। এ-হাত কেবল শস্ত্রভাণ্ডার তৈরি করে নি, শুরু ক'রে দিয়েছে 'অর্কেস্ট্রা'র ঐকতান। বিনয়প্রকাশের হাত আমি চিনতে পেরেছি। হঠাৎ যেন মানুষের পরিচয় আজ আমার কাছে নতুন ব'লে মনে হচ্ছে—ক্রম-বিবর্তনবাদের সত্যের মধ্যে এ-মানুষের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না।

রুক্মিণী নতুন ফাইল হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াল টেবিলের উল্টো দিকে। বলল, "রাত আট টায় অর্থনীতি দপ্তরের মিটিং আছে। বাড়ি যাওয়া হ'ল না।"

"হঠাৎ আবার মিটিং কেন? আমাদের অর্থনীতির ঝাণ্ডা তো উর্ধ্ব দিকে উড্ডীয়মান। রুক্মিণী—"

বাধা দিয়ে সে বলল, "উড্ডীয়মান সে সম্বন্ধে কোন ভুল নেই। আট-টা বাজতে এখনো ছ-ঘণ্টা বাকী, কি করবে?"

"লাউঞ্জে ব'সে মদ খাবো আর শেক্সপীয়ার পড়ব। হাতে তোমার ওটা কিসের ফাইল?"

"মন্বন্তরের ফাইল।"

"মন্বন্তর! কোথায় মন্বন্তর?"

"বাংলাদেশে। ক'দিন থেকেই তো বাংলার আকাশে শকুন উড়ছে।"

"তা হ'লে চলো লাউঞ্জে গিয়ে বিশ্রাম করা যাক।"

লাউঞ্জে এসে দুঃশাসনের মত রক্তের বদলে মদ্য পান করতে লাগলাম। কোথায় মন্বন্তর? মন্বন্তর তো ভগবানের দান নয়, মানুষের তৈরি। হঠাৎ কেন মন্বন্তরের দরকার হ'ল? বিনয়প্রকাশের গুপ্ত হাতের চাল আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলুম না। বোঝবার জন্যেই বোধহয় আমি বললুম, "এ কোন বিদেশ ভোজকা নয়? মনে হচ্ছে, কলকাতায় ভেজাল কারবার আজো বন্ধ হয় নি। বোয়—"

"বয় নয়, কমরেড—" শুধরে দিল রুক্মিণী।

ইত্যবসরে কমরেড ইউসুফ ছুটে গিয়ে একটা নতুন বোতল নিয়ে এল।

গেলাসে ঢেলে দিয়ে সে চলে যাওয়ার পরে রুক্মিণীকে বললুম, "চমৎকার দামি। স্কচ?"

"বোধহয় তাই।" জবাব দিল রুক্মিণী।

"স্কচ এল কি ক'রে? কাউন্টার রিকুইজিশন? অনুপ্রবেশ?"

"ভাল জিনিসের অনুপ্রবেশে আপত্তি কি কমরেড চৌধুরী?"

"ঠিক, আপত্তি থাকা উচিত নয়। আর কেবল ওদের শেরওয়ানীরাই নেই, হুইস্কিতেও আছে। রুক্মিণী, ওদের সঙ্গে ব্যবসা আমরা বন্ধ করব না। ওদের স্কচ আমরা কিনব।" পুরো গেলাস নিঃশেষ ক'রে কমরেড ইউসুফকে আবার বললুম, "স্কচ।"

রাত আট-টায় অর্থনীতি দপ্তরের মিটিং আরম্ভ হ'ল। পুলিশ বিভাগের কমিশনার বিনয়প্রকাশও উপস্থিত আছে। কমিশনার কমরেড রাও বলতে লাগলেন, "বাংলাদেশের চাষীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। আমাদের কৃষি-সমবায়ে এসে তারা দিন মজুরের কাজ করতে চায় না। ভয় দেখিয়েও কাউকে কাজে লাগানো যায় নি। ফলে, পঞ্চাশভাগ জমিতে ফসল হয় নি। কৃষি-সমবায়ে মজুরের সংখ্যার চেয়ে ট্রাক্টরের সংখ্যাই বেশি। বসিরহাট অঞ্চলের বিদ্রোহ অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। ছোঁয়াচে রোগের মত বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। মনে হচ্ছে, আমরা বোধহয় মন্বন্তর ঠেকাতে পারলুম না।"

স্কচে আমায় নেশাগ্রস্ত করতে পারে নি। কিন্তু কমরেড রাও যা বললেন তা শুনে আমি যেন স্কচের দরিয়ায় ভাসতে লাগলুম। তবুও উত্তেজনা চেপে রেখে আমি বললুম, "মন্বন্তর আমরা ঠেকাতে যাব কেন? মন্বন্তর আমাদের হাতিয়ার। বিদ্রোহী সমাজের ওপর এই হাতিয়ারটি আমরা ব্যবহার করব।"

কমরেড রাও হতভম্বের মত আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "মন্বন্তর আসছে তার নিজের প্ল্যান অনুসারে। আমরা কি ক'রে বিশেষ সমাজের দিকে তার মুখ ঘুরিয়ে দেব?"

বললুম, 'মন্বন্তর কমিউনিস্ট নয়। অতএব, তার কোন নিজস্ব প্ল্যান থাকতেই পারে না। সে আসবে আমাদের প্ল্যান অনুযায়ী। আমরা যেদিকে

তার মুখ ঘুরিয়ে দেব সেদিকে সে যেতে বাধ্য হবে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের মন্বন্তর ছিল রক্তপায়ী মাতাল। স্কচ হুইস্কির মাতলামি তার ছিল না। তাড়ি-খাওয়া মাতাল-মন্বন্তর তাই আড্ডা জমিয়েছিল চাষীর ঘরে, সর্বহারাদের বস্তিতে। কয়েক হাজার পুঁজিবাদীর চক্রান্ত ছিল তাতে, প্ল্যান ছিল না। আমাদের মন্বন্তরে কেবল প্ল্যানই নেই, আছে অর্থবিজ্ঞান। মোট উৎপাদন যদি মোট জনসংখ্যার পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তা হ'লে আপনি কি করবেন কমরেড রাও? বিদেশ থেকে গম আমদানি করা অসম্ভব। যুদ্ধবাজ মার্কিন রাষ্ট্রের আশঙ্কায় ইউক্রেনের গম সব স্টক ক'রে রাখতে হয়। কারণ, যারা যুদ্ধ করবে তারা খাবেও। অতএব, জনসংখ্যা যদি না কমিয়ে ফেলতে পারেন, তা হ'লে অর্থনীতির বই থেকে আপনি কোন্ নীতি গ্রহণ করবেন? এমত অবস্থায় আমাদের কর্তব্য কি? এখানে কর্তব্য করবে মন্বন্তর। বিদ্রোহী চাষী-সমাজের দিকে মন্বন্তরকে লেলিয়ে দিতে হবে। মধ্যবিত্তের মেধা যেমন ভয়ংকর, কৃষকের মেধাহীনতাও আবার তেমনি ভয়ংকর। ওরা মাটি ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। ওদের মাটিতে আছে ধর্মের মাদকতা, আছে মাটির দেবতা। তাই খাস সম্পত্তি ওদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে হবে। ট্রাক্টর চালিয়ে মাটির দেবতাকে ধুলো ক'রে দেব আমরাই। ধুলো যদি না হয়, তা হ'লে বুর্জোয়া সভ্যতার পরিবার প্রতিষ্ঠানটি গুঁড়ো করবেন কি ক'রে? কমরেড রাও, মন্বন্তরের মধ্যে কি 'ঐতিহাসিক অনিবার্যতা' আপনি দেখতে পাচ্ছেন না?"

"পাচ্ছি।" অস্ফুট স্বরে জবাব দিলেন অর্থনীতির কমিশার।

"এরপরে আর সমস্যা রইল কই?" বিনয়প্রকাশের দিকে চেয়ে আমি-ই আবার বললাম, "এরপরেও সমস্যা একটা রইল। মানুষ বিদ্রোহ করে কি দিয়ে? মন দিয়ে। বিদ্রোহী চাষীরা সব তাদের মনের স্বাধীনতা ধ'রে রাখল কি ক'রে? মধ্যবিত্তের মেধা এদের পেছনে পেছনে চক্রান্ত করছে না তো? তা যদি হয়, তবে আপনারা এবার মন্বন্তরের সুযোগ গ্রহণ করুন। গ্রহণের মধ্যে আপনাদের বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা থাকা চাই। বুর্জোয়া বায়োলজিস্ট এরিস্টোটলের মত সামাজিক জনতাকে বিভিন্ন অংশে ভাগ ক'রে নিন, ক্ল্যাসিফিকেশন। তারপর প্রয়োজনানুসারে বিদ্রোহী জনতার সংসার-আশ্রমে পাঠিয়ে দিন শকুনের দল।

নের অর্থনীতি আমাদের মস্তিষ্কপ্রসূত নয়, আমরা ধার নিয়েছি অ্যাডাম স্মিথ থেকে। বুর্জোয়া অর্থনীতিতে কিনস্ সাহেবের টাকায় সোনা আছে, আছে দুস্থ মানব জাতির মরা রক্তও। শতাব্দীর বুক চিরে তা চুইয়ে চুইয়ে পড়ছিল। আমরা অসহায়ের মত তাই দেখেছি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, কেবল একটা শতাব্দী নয়, কয়েকটা শতাব্দী। দেখে গেছেন কার্ল মার্কস নিজেও। তাঁর 'সামাজিক বিচার' বুর্জোয়া সমাজ গ্রহণ করে নি। কমরেডগণ, এবার আমরা তাই কিনস্ সাহেবের টাকা তাঁরই কাছে ফিরিয়ে দেব সুদ সমেত। কঠিন এবং হৃদয়হীন কাজ সন্দেহ নেই। কিন্তু উপায় কি? ভারতবর্ষের হৃদয় জয় করবার জন্যেই আমাদের হৃদয়হীন হ'তে হচ্ছে। আমাদের জীবনদর্শনের মধ্যে ডায়লেকটিকসের সত্য অস্বীকার করা যায় কি? যায় না। যায় না ব'লেই কিনস্ সাহেবের টাকা বিদায় নিতে বাধ্য হ'ল। এল সর্বহারার টাকা। টাকার পেছনে এল সর্বহারার সভ্যতা। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।" আমি থামলুম। বিনয়প্রকাশ বলল, "কমরেড চৌধুরীর নীতি এবং অর্থনীতি বিশ্লেষণের তাৎপর্য আমরা মেনে নিলুম। মন্বন্তরের ভয় আমাদের আর রইল না। মধ্যবিত্তের মেধা কিংবা মাথা ব'লে যে-বস্তুটির আপনি উল্লেখ করলেন তা কিন্তু রয়েই গেল।"

"তার মানে?"

"একদা শ্রেণীহীন সমাজের জন্যে এরাই আমাদের হয়ে আন্দোলন করত। এখন কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী মধ্যবিত্ত হয়েই থাকতে চাইছে। এরা কেউ কোদাল অথবা কাস্তে ধরতে চায় না—শ্রমিক জলের ওপর এরা মধ্যবিত্ত-তেল হয়ে ভেসে থাকতে চায়। এই চাওয়ার পেছনে ওদের একটা যুক্তি আছে।"

"কি যুক্তি?"

"ওদের ধারণা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেধা এবং মন থেকে পৃথিবীর সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছে।"

"কোন্ পৃথিবী কমরেড?" আমি যেন 'ঠাকুরমার ঝুলির' গল্প শুনছিলাম।

"যে-পৃথিবীটা অভিশপ্ত গোলকের মত—অথবা দেখতে অনেকটা কমলা-

লেবুর মত, উত্তর ও দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। বুর্জোয়া পৃথিবী সন্দেহ নেই, কিন্তু পৃথিবী তো বটে।"

এবার আমি বিনয়প্রকাশের দিক থেকে চোখ তুলে এনে সবাইকে উদ্দেশ ক'রে বলতে লাগলুম, "আমি একবার বহু যুগ আগে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর লেখা 'ভারতবর্ষ আবিষ্কার' নামে একখানা বই পড়েছিলুম। ঠাকুরমার ঝুলি'র মত ইন্টারেস্টিং নয়, কৌতুকপ্রদ। আজ আবার পণ্ডিত কমরেডদের মুখ থেকে নতুন এক পৃথিবীর পরিচয় শুনে আমি সেই পুরনো কৌতুকের রস পাচ্ছি। বুর্জোয়া ভারতের 'পণ্ডিত' উপাধি ছিল পারিবারিক টাইটেল্, কাশ্মীরের কোন্ এক অতি-উর্বর উপত্যকা থেকে উপাধিটা পূর্বসূরীদের পুণ্য বহন করছিল মাত্র —কিন্তু আপনাদের পাণ্ডিত্য তো সংখ্যাতীত বিগতজীবনের সমষ্টিগত ফল নয়? আপনারা কেন কমিউনিষ্ট-পৃথিবীটাকে কমলালেবুর মত দেখছেন? কমরেড, কমলালেবুর রসের শৌখিনতা সহ্য করবার মত অন্ত্র আমাদের মোলায়েম নয়। আমাদের পৃথিবী হচ্ছে শ্রমিক-পৃথিবী। এখানে মন এবং মেধার কোন পৃথক অস্তিত্ব থাকবে না। পার্টির মাথায় যা নেই সমগ্র ভারতবর্ষের মাথায় তা নেই। পার্টির মনই হচ্ছে ভারতবর্ষের মন। কমরেডগণ, আপনাদের মনে রাখতে হবে, বাংলার মধ্যবিত্ত বিস্ফোরক পদার্থের চেয়েও বেশি বিপজ্জনক। দাঁড়াবার স্থান পেলে বসতে চাইবে। বসবার জায়গা পেলে শুয়ে পড়বে। শোবার স্থান যদি পায় তাহলে আবার ওরা দাঁড়াবার জন্যে চেষ্টা করবে। অতএব, আমাদের কর্তব্য কি? এমন একটি নিম্নত সচল শ্রেণীকে একেবারে অচল ক'রে না দিতে পারলে, গণদেহের সঙ্গে এরা এক লাইনে এসে দাঁড়াতে পারবে না। এক লাইনে দাঁড়াতে না পারলে বিরুদ্ধপক্ষ গ'ড়ে উঠবে। আমাদের রাষ্ট্রে বিরুদ্ধপক্ষের জন্যে এক ইঞ্চি জায়গাও নেই। কংগ্রেসী-আমলেও কি ছিল? বুর্জোয়া ভারতের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রির একনায়কত্ব কি আপনারা অস্বীকার করতে পারেন? পারেন না। আপনাদের পাণ্ডিত্য এবার পার্টি-লাইন ধ'রে চলছে, অতএব তাতে ভুল নেই। আমরা যতক্ষণ না আগুন কে আগুন ব'লে ঘোষণা করছি ততক্ষণ তা আগুন হতেই পারে না। কিন্তু মধ্যবিত্ত-দের আর কতদিন শ্রমিকজলের ওপর ভেসে থাকবে কমরেড বিনয়প্রকাশ?"

"এক ঘণ্টাও না ?" বিনয়প্রকাশের কথায় দৃঢ়তা এসেছে।

আমি বললুম, "একঘণ্টার কাজ এটা নয় কমরেড! বাংলার কোন্ অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে সবচেয়ে বেশি ?"

"বসিরহাট অঞ্চলে।" বলল বিনয়প্রকাশ। দেওয়ালে টাঙানো বিরাট এক মানচিত্রের মধ্যে আঙুল রেখে বিনয়প্রকাশই আবার বলল, "এই অঞ্চলে ভূষণ্ডী নামে মস্তবড় একটা মাঠ আছে। এতকাল তা পতিত ব'লে কেউই তাতে লাঙল দেয় নি। এখানে জনৈক যুবক ও জনৈকা নারী এসে ঘর বেঁধেছে—বাস। গত ছ-মাসের মধ্যে সেখানে গজিয়ে উঠেছে একটা মন্দির। ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে ওরা ভূষণ্ডীর পতিত-জমিতে বপন করেছে প্রতিক্রিয়াশীলতার বীজ।"

"কাউণ্টার রিভলিউশন ?" ভুরুর দিকে চোখের মণি দুটোকে ঠেলে দিয়ে আমি চেয়ে রইলুম বিনয়প্রকাশের উত্তরের অপেক্ষায়।

"তাই মনে হচ্ছে। এরাই চাষীদের নেতৃত্ব করছে ব'লে আমি খবর পেয়েছি।"

বিনয়প্রকাশের কথা শুনে আমি গর্জন ক'রে উঠলুম, "মন্বন্তরের ঐতিহাসিক অনিবার্যতা আর অস্বীকার করা যায় না! মন্বন্তর-চাবুক দিয়ে এবার বসিরহাটের বিদ্রোহ দমন করতে হবে। শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার এই তো সুযোগ এসেছে। কমরেড, প্রতিক্রিয়াশীলতা বন্ধ্যা মাটিতেও বাসা বাঁধবে। আমি আদেশ দিচ্ছি, মন্বন্তরের চৈনিক ড্রাগনের দন্ত-দংশনে জনৈক যুবক ও জনৈকা নারীর অন্তর বিক্ষত হয়ে উঠুক। কণ্ঠনালীর লালাস্রাবও যাক শুকিয়ে। প্রতি রোমকূপের ছিদ্রপথে ঘামের বিন্দু থরথরে হয়ে উঠুক। কমরেড, গজনীর মামুদের মত আমরা মন্দির লুট করতে পারি নে, কারণ ধর্মের স্বাধীনতা না রাখলে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলো আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে প্রচার করবে। তবে আমাদের কর্তব্য কি ? বিদেশী প্রতিনিধিদের দেখাবার জন্যে সবই থাকবে, কিন্তু রাষ্ট্র চালাবার জন্যে কিছুই থাকবে না। মানুষ যদি বুঝতে পারে যে ভূষণ্ডীর দেবতা কেবল মন্বন্তর উৎপাদন করে তা হ'লে সেখানে কেউ যাবে না।" তারপর ঘরের আবহাওয়া হালকা করবার উদ্দেশে আমি হাসতে হাসতে বিনয়প্রকাশের দিকে চেয়ে

বললাম, "বিদেশ থেকে কেউ যদি আসেন আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মন্দির দেখতে, আমরা তা হ'লে পুরোহিতের পোষাক পরিয়ে বিনয়প্রকাশকে পাঠিয়ে দেব ভগবতীর মন্দিরে পূজো করবার জন্যে।"

মিটিং শেষ ক'রে কুইনসপার্কে ফিরে আসতে রাত একটা বেজে গেল। রুক্মিণীর খোঁজ নিয়ে জানলুম, সে তখনও বাড়ি ফেরে নি। আমাদের আবদ্ধ-ঘরের মিটিং-এ রুক্মিণী ছিল না। অতএব সে নিশ্চয়ই গ্রেট ইষ্টার্ণ থেকে অন্য কোথাও গিয়ে থাকবে। কিংবা রুক্মিণী হয়তো পুলিশ-দপ্তরে অপেক্ষা করছে বিনয়প্রকাশের জন্যে। বিনয়প্রকাশের গুপ্ত হাত আমি সত্যিই দেখতে পাই নি। বুঝতে পারি নি শক্রর ক্ষমতার ক্ষেত্র। কিন্তু রুক্মিণীকে বিনয়প্রকাশ বিশ্বাস করল কি ক'রে? ওকে গুপ্ত পুলিশের কাজ দেওয়ার অর্থ কি এই নয় যে, সে রুক্মিণীর কাছে ধরা পড়ল? অতএব আমার কাছেও সে ধরা পড়তে পারে? জীবনের বিনিময়ে রুক্মিণী গুপ্তপুলিশ হতে বাধ্য হয়েছে। যে-কোন রুক্মিণী-ই হয়তো বাধ্য হ'তো। কিন্তু বিনয়প্রকাশ তো যে-কোন বিনয়প্রকাশ নয়। তবে? তবে কি বিনয়প্রকাশ রুক্মিণীকে ভালবাসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে? অসম্ভব কিছু নয়। মেয়েরা বিনয়প্রকাশকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভালবাসে। ওর মধ্যে আকর্ষণের মশলা আছে প্রভূত পরিমাণে। সেই জন্যেই সে অতি সহজেই ভালবাসার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু মার্কসবাদীর জীবনে প্রতিশ্রুতির নিজস্ব কোন মূল্য নেই। নানাবিধ ঘটনার পারস্পরিক সম্বন্ধের প্রেক্ষিতে যে-কোন বস্তুর কিংবা প্রতিশ্রুতির মূল্য নিরূপিত হয়। গতকল্যের পূর্ণিমারাত্রে যে-রজনীগন্ধার সৌরভ আমার মনে তুলেছিল আবেগের তরঙ্গ, আজ আবার বিপরীত ঘটনার পারস্পরিক সম্বন্ধের ফলে সেই একই রজনীগন্ধার সৌরভ হয়ে উঠেছে বুর্জোয়া শৌখিনতার নর্দমা-উত্থিত নিশ্বাস! সেই কারণে কার্ল মার্কস হাজার চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত মার্কসবাদী হ'তে পারেন নি। বিবাহের পূর্বে যে-মহিলাটিকে তিনি ভালবাসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বিবাহের পরে অনাহার আর দারিদ্র্যের মহাসমুদ্রে ভাসতে ভাসতেও তিনি কখনই তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা ভুলতে পারেন নি। বিপরীত ঘটনার হাজার হাজার ঢেউ

লেও তাঁর ভালবাসার প্রদীপটিকে পারে নি নিবিয়ে দিতে। কিন্তু বিনয়প্রকাশ মার্কসবাদী ব'লেই সে তার প্রতিশ্রুতি রাখতে পারে না।

রাত দুটো বেজে গেল, রুক্মিণী তবু ফিরল না। বিছানায় এসে শুয়ে পড়লুম আবার। ঘুম আমার সহজে আসে না। কৃত্রিম উপায়ে তাকে ধরে নিয়ে আসতে হয়। বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগলুম বিনয়প্রকাশের কথা। গোয়াবাগানের চৌধুরী পরিবারটির শেষ সে দেখতে চায়। ক্ষমতার খেলায় সে রুক্মিণীকে আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করবার রাস্তাঘাট ঠিক ক'রে নিচ্ছে। হাসতে হাসতে শত্রুর হৃৎপিণ্ডে ছুরি বসিয়ে দেবার কৌশল করছে সে। শায়েস্তা খানের আলিঙ্গনে যদি মৃত্যুর মিষ্টতা থাকত, তা হ'লে রাজনীতির বাহুতে সেদিন মুঘল-মারাঠার ইতিহাস যেত বদলে। বিনয়প্রকাশের আলিঙ্গনে আজ আর শায়েস্তা খানের ভুলের কোন রাস্তাই থাকবে না। অনীতাকে সে বিয়ে করবে। কিন্তু সে জানে, ঝুকুকে এবং আমাকে সরিয়ে দিতে না পারলে অনীতাকে বিয়ে করা খুব সহজ ব্যাপার হবে না। আমি খুবই আশ্চর্য বোধ করলুম এই ভেবে যে, ঝুকু কেন আজো আত্মগোপন ক'রে আছে! নতুন ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ সিংহাসনও যদি ঝুকু চায়, তাই সে পাবে। এমন কোন উপঢৌকন নেই যা নাকি পার্টি আজ ওকে দিতে অস্বীকার করতে পারে। আমার বিশ্বাস, ঝুকু আত্মগোপন ক'রে থাকলে, বিনয়প্রকাশের হাত দৃঢ়তর হয়ে উঠবে প্রতিদিন। ঝুকু-কে খুঁজে বার করাই যেন আমার আজ সবচেয়ে বড় রাজনীতির কাজ ব'লে মনে হ'তে লাগল।

কখন যে আমার তন্দ্রা এসেছিল টের পাই নি। ভোরের দিকে হঠাৎ যেন শুনতে পেলুম কে কাঁদছে। চাপা কান্নার টুকরো আওয়াজ এদিক-সেদিকে ধাক্কা খেয়ে আমার ঘর পর্যন্ত এসে পৌঁচেছে। আমি বাইরে এসে দাঁড়ালুম। কলকাতার আকাশে কোথাও আর অন্ধকার নেই।

মায়ের পুজোর ঘরের দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে দিলুম। আলো আসুক, আসুক বাতাস। মানুষের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষায় আলো-বাতাস আবার চঞ্চল হয়ে উঠুক। গহ্বর-আশ্রিত অন্ধকার ঘুচিয়ে দেবার সংকেত মায়ের মত রুক্মিণীও বোধহয় দেখতে পেয়েছে জগদ্ধাত্রীর ঘরে। ঝুকু একদিন ভেবেছিল

জগদ্ধাত্রীর পেছনের জানলাটা খুলে দিতে। সে চেয়েছিল, আজবাড়ির সীমা ছাড়িয়ে কোন্ এক অজ্ঞাত স্বর্গের আলো দেখতে। আলোর তৃষ্ণা বুকের বোধহয় ইহজীবনেও আর মিটবে না। অনীতা বলত, সবটুকু দিতে না পারলে সবটুকু তৃষ্ণা মানুষের মেটেও না।

রুক্মিণী কাঁদছিল। জগদ্ধাত্রীর পায়ের কাছে লুটিয়ে প'ড়ে কাঁদছিল রুক্মিণী। মায়ের বুক থেকে জগদ্ধাত্রীকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে এল কে? ভারতবর্ষের পয়লা নম্বর কমিউনিস্টের শয়ন-কামরার পাশে এ কোন্ কামরা? দু-তলার ঘরে অনীতার নীড়কে নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলছে রমলা আর শীলা। তিনতলার ছাদে মায়ের জগদ্ধাত্রী আবার যেন ভক্তিবাদের নতুন ব্যবস্থা নিয়ে ফিরে এসেছেন কালিঘাটের দরজা থেকে। সমারোহ তাঁর উপেক্ষা করবার নয়। উপেক্ষা করলেই কি ঠেকিয়ে রাখা যায়? জীবনের এমন কোন্ নিভৃত অংশ আছে যেখানে ডায়লেকটিকসের সত্য খুঁজে পাওয়া যায় না? যে ইতিহাসের পাতায় সমন্বয়ের সিংহদরজা বন্ধ রইল সেখানে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিলুপ্তি ঘটল চিরদিনের জন্যে।

রুক্মিণীকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "এ কি হচ্ছে? এ তো মার্কসবাদ নয়? উঠে পড়ো।"

"কোথায় উঠব?" মাটিতে মাথা ঠেকিয়েই প্রশ্ন করল রুক্মিণী।

"একজন বুর্জোয়া ঠিকেদারের কন্যার ধাপ থেকে আমাদের 'ক্রেমলিনের উচ্চতম শিখরে। এক লাফে অনেকগুলো সিঁড়ি উঠে গেলে, কি বল?"

"তেমন ভাবে আমি তো উঠতে চাই নি।" বলল রুক্মিণী।

"না-উঠবার জন্যে কোন চেষ্টাও তো করলে না?"

জগদ্ধাত্রীর পায়ের কাছে ব'সেই রুক্মিণী ধীরে ধীরে বলতে লাগল, "আমি যে কত অসহায় তা তুমি বুঝতে পারবে না! বোধহয় মানুষকে অসহায় করবার জন্যেই তোমাদের ব্যবস্থায় নিশ্বাস ফেলবার একটা সাধারণ ছিদ্র পর্যন্ত [illegible] তালাই করেছ তোমরা।"

"আমরা কিছুই করিনি, ঐতিহাসিক অনিবার্যতাই সৃষ্টি করেছে তোমার পারিপার্শ্বিক। সেই পারিপার্শ্বিক থেকেই আসছে গোটা মানুষটার সমগ্র পরিবর্তন—টোটাল চেঞ্জ।"

"তা হ'লে আমার না-উঠবার জন্যে অনুরোধ দিচ্ছিলে কেন ?"

"পরীক্ষা ক'রে দেখছিলুম, আমাদের ইতিহাস-বিশ্লেষণে কোন ভুল আছে কি না।"

"কতদূর পর্যন্ত দেখলে ?"

"একেবারে বিনয়প্রকাশের শুভকক্ষ পর্যন্ত।"

"ভুল পেলে ?"

"না।"

এবার রুক্মিণী মাটি থেকে উঠল। জগদ্ধাত্রীর পেছনের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে যেন নিজের মনে মনেই সে বলতে লাগল, "ভুল করবার উপায় তোমরা রাখো নি। যদি আমি ভুল করতুম, তা হ'লে বিনয়প্রকাশের কাছে ক্ষমা পেতুম না।"

"বিনয়প্রকাশের ক্ষমা পাওয়ার জন্যে এত লোভ কেন, যদি জগদ্ধাত্রীর কাছে ক্ষমা পেয়ে থাকো ? কেবল স্থূল এই জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে কি দরকার ছিল উচ্চতম শিখরে ওঠবার ? কার ওপরে তুমি প্রতিশোধ নিতে চাইছ রুক্মিণী ? আমার ওপরে ?"

"প্রতিশোধ ? তোমার ওপরে ?" বিস্ময়ের ধোঁয়া উড়িয়ে দিয়ে রুক্মিণী হাসবার চেষ্টা করতে করতে পুনরায় বলল, "তুমি আমার 'হীরো', একেবারে ক্ল্যাসিকেল অর্থেই বলছি। একদিন তুমি আমায় বৃহত্তর সীতা ব'লে উপহাস করবার চেষ্টা করেছিলে······রামায়ণের সীতা যদি তোমার উপহাসের পাত্রী না হয়, তা হ'লে বিংশ শতাব্দীর নব-রামায়ণের আগুনে প্রবেশ করবার দ্বিতীয় পরীক্ষার জন্যে আমি প্রস্তুত আছি।"

"যুক্ত-প্রদেশে জমানোর জন্যেই রামায়ণের আগুন তোমায় প্রলুব্ধ করছে।"

"কুইনস পার্কে ভাড়াটিয়া হয়ে না এলে, যুক্ত-প্রদেশের রুক্মিণী আজ এত বড় লাভ করতে পারত না। বাংলার মধ্যবিত্তকে যে দেখে নি, সে কি ক'রে নব-রামায়ণের সবচেয়ে বড় চরিত্রের সন্ধান রাখবে ? সন্ধান আমি পেয়েছি ব'লেই, স্বপ্ন দেখবার সৌভাগ্য আমার শত্রু মাইতি নষ্ট করতে পারে নি।

এবারকার বনবাসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত আমিই গ্রহণ করছি—চলো বনেজঙ্গলে পালিয়ে যাই। যাবে?"

আমি কেমন যেন অভিভূতের মত বললাম, "ছুটু আর অনীতাকে ফেলে রেখে আমি তো এক পা-ও নড়তে পারি না।" গাড়ীর শব্দ পেয়ে রুক্মিণী কার্নিশের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বলল, "পুলিশ কমিশনার বিনয়প্রকাশ এসেছে।"

মনে হ'ল, কুইন্স পার্ক কাঁপছে।

ষষ্ঠ ভাগ

হটো সভ্যতার হারজিতের খেলা দেখবার হুজুর আর সাধ নেই। দেখবার সুবিধেও নেই ওর। হুজুর বিশ্বাস ছিল, মার্কসবাদের খেলা হবে কেবল অর্থনীতি বা সমাজতত্ত্বের ময়দানে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, জীবন ও জগতের এমন কোন ময়দান নেই যেখানে মার্কসবাদী নতুন মানুষটি প্রবেশ করে নি। তার খেলার ক্ষেত্র সর্বত্র প্রসারিত। ভূবতীর মাঠেও নতুন মানুষটি প্রবেশ করেছে। নড়বড়ে ভাঙা-বাস্তটা ধ'রে রাখা চলবে না। ধ'রে রাখতে পারবে না সে বসন্তকেও। কেমন ক'রে পারবে? বাস্তর খুঁটিগুলো ধ'রে রাখবার স্বাধীনতা যদি হুজুর হাতে থাকত, তা হ'লে মার্কসবাদী নতুন মানুষটির জন্ম সম্ভব হ'তো না।

ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে হুজু বসন্তকে আর দেখতে পায় নি। হয়তো সে গেছে বসিরহাট কিংবা রহমতপুরের বাজারে। আজ ক'দিন থেকে ওরা সব এক রকম উপোস ক'রেই দিন কাটাচ্ছিল। সুলতানপুরে মাটি ছাড়া সুলভে কিনবার মত কোন কিছুই আর পাওয়া যায় না। চাষীরা সব বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সময়মত জমিতে কেউ লাঙল দেয় নি। রাষ্ট্রের কৃষি-সমবায়ে যারা কাজ করে তারা সবাই চালের পারমিট পেয়েছে। পারমিট ছাড়া কেউ আর চাল কিনতে পারে না।

উনোনে আগুন দেবার প্রয়োজন নেই হুজুর। সে চুপ ক'রে ব'সে রইল দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে। বিরুদ্ধ-সভ্যতার হারজিতের ফলাফল জানবার উৎসাহ নেই। ভূবতীর ভাগ্য সে দেখতে পাচ্ছে। জীবনের রহস্য মৃত্যুর রহস্যের চেয়ে যেন জটিলতর মনে হচ্ছে। সবটুকু বিদ্যাবুদ্ধির অহংকার বুঝি ফেলে যেতে হবে ভূবতীর মরা মাটিতে, ভাবছে হুজু। হুজুর ভাবনার শেষ নেই। মরা মাটির গর্ভ থেকে কোনো এক দিন সে কি পারবে আবার উঠে

আসতে নতুন দেহ নিয়ে ? এ কি তার প্রথম মৃত্যু ? কিংবা জন্মান্তরবাদ প্রমাণ করতে হবে ব'লে হুহু চৌধুরীকে হয়তো আবার আসতে হবে মহন্তর মৃত্যুর স্রোতে। দেহ-সর্বস্ব জীবনের মধ্যে ধ'রে রাখবার মত নির্ভরযোগ্য স্বপ্ন এজন্মে সে আর দেখতে পেলে না। বসন্ত স'রে যাচ্ছে। যাচ্ছে সে তার প্রাচীন সভ্যতার ল' এ্যাণ্ড অর্ডারের রাস্তা ধরেই। নারায়ণশিলা সামনে রেখে বসন্তকে বিয়ে করে ফেললে হয়তো একটা নতুন সংগ্রামের সুবিধে পেত হুহু। কিন্তু তা আর হবার নয়, বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

লাল টুপিটা তেরছাভাবে মাথার ওপর টেনে দিয়ে কমরেড শাজাহান এসে উপস্থিত হ'ল হুহুর সামনে। মিষ্টি হাসির হিল্লোল তুলে সে জিজ্ঞাসা করল, "কেমন আছেন ?"

মিষ্টতর হাসির প্রয়াস ফুটে উঠল হুহুর ঠোঁটে। সে জবাব দিল, "ভাল আছি।"

"বড্ড শুকিয়ে গেছেন দেখছি ? ভূষণ্ডীতে কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না বুঝি ?"

"যাচ্ছে। প্রচুর আলোবাতাস পাওয়া যাচ্ছে কমরেড।"

"বলেন কি, এবারের মত এত বেশি তাপের মাত্রা আমরা তো গত বিশ বছরের মধ্যে কখনই দেখি নি।"

"বিশ বছর ? আমার তো মনে হয় গত পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে সূর্যের তাপ এত বেশি গরম হয় নি। আলোর সবটুকুই আগুন! যাক, রাষ্ট্রের কাজ অনেক কমলো। আলোবাতাস নিয়ন্ত্রণের জন্যে দপ্তর খুলতে হয় নি। অতএব, আলোবাতাসের পারমিট আনবার জন্যে আপনার কাছে আমরা কেউ যাব না।"

"তা যা বলেছেন," হাসতে হাসতে কমরেড শাজাহান একবার আকাশের দিকে চেয়ে নিয়ে পুনরায় বলল, "আপনারা তো সূর্যকেও দেবতা ব'লে মানেন। বিদ্রোহী চাষীদের শায়েস্তা করবার জন্যে আপনাদের দেবতা পর্যন্ত আমাদের পার্টিকে সাহায্য করছে। ইচ্ছে করলে, আপনাদের তেত্রিশ কোটি দেবতাকে পার্টির মেম্বার ক'রে ফেলতে পারি।"

"এত ভিড় বাড়িয়ে লাভ কি কমরেড ? ছত্রিশ কোটির ভিড় কমাবার

অস্ত্র সম্বর এসেছে। কিন্তু সম্বর দিয়ে তো দেবতার জিভ কামড়াতে পারবেন না। যাক এসব কথা। কলকাতা থেকে কবে ফিরলেন?"

"কাল রাত্রে।" কমরেড শাজাহান আমন্ত্রণের অপেক্ষায় না থেকে বসে পড়ল দাওয়ার ওপর। পকেট থেকে সিগারেট বার ক'রে কমরেড শাজাহান তাতে আগুন ধরালো। হৃহু লক্ষ্য করল দেশলাই-এর বাক্সটার ওপরে একটা ছবি লাগানো আছে। ছবিটা বিনয়প্রকাশের। ছবিটা দেখবার সঙ্গে সঙ্গে হৃহু একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। জীবনের প্রথম প্রেম ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল গোয়াবাগানের সেই স্মরণযোগ্য দিনগুলোর মধ্যে। একটা দিন তো দূরের কথা, একটা মুহূর্তও ভোলবার নয়। গোয়াবাগানের লিবারেল পরিবেশের শিথিলতার মধ্যে হৃহু দেখতে পেয়েছিল বিনয়প্রকাশের শক্ত মেরুদণ্ড। বুর্জোয়া সমাজের পার্থিব ভোগের সহস্র প্রলোভন তাকে ক্ষণকালের জন্যেও প্রলুব্ধ করতে পারে নি। হৃহু নিজেই তো বিনয়প্রকাশের কাছে কম লোভনীয় ছিল না। বিনয়প্রকাশকে সে সবই দিতে চেয়েছিল। কিন্তু মার্কসবাদী এই নতুন মানুষটি তরুণ তাপসের মত নীতির চূড়া থেকে একদিনও স্খলিত হয়ে পড়ল না!

হৃহুর অন্যমনস্কতা লক্ষ্য ক'রে কমরেড শাজাহান আলোচনা শুরু করল, "ছ-মাসের মধ্যে কলকাতার চেহারা বদলে গেছে।"

"কার চেহারা বদলে গেছে?" প্রশ্নটা করবার সঙ্গে সঙ্গে হৃহু তার ভুল বুঝতে পেরে গলার স্বরে স্বাভাবিকতা আনবার চেষ্টা করতে করতে পুনরায় বলল, "হ্যাঁ, বদলাতে বাধ্য। প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তনের প্রগতি রয়েছে। প্রতিটি বস্তু স্বয়ং-গতিশীলতার আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্বয়ং-গতিশীলতা মানে অটোডাইনামিজম্। কমরেড শাজাহান, মার্কসবাদ একটি চৌদ্দ-পাতার পুস্তিকা নয় যে, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিট থেকে আট পয়সায় কিনে নিয়ে আসবেন। কিংবা ভূমণ্ডীর মাঠে ট্রাক্টর চালালেই মার্কসবাদ সৃষ্টি করা যায় না। বীজ থেকে গাছ হয়। গাছ থেকে ফল। ধরুন আপেল ফল। একটি আপেল পেকে ক্ষয়প্রাপ্ত হ'লেই তবে তা থেকে বীজ আসবে। সেই বীজ থেকে সৃষ্টি হবে অনেক গাছ। অতএব অনেক ফল। বীজ থেকে ফলের প্রগতি কি কারুর

এর? এল সেই স্বয়ং-গতিশীলতার আইন থেকে। এই আইনের সঙ্গে বস্তুর যোগাযোগ নিবিড় ব'লেই আপেলটি পাকতে বাধ্য হ'ল। যেহেতু আপেলই আপেলটি আপেল হয়ে জন্মেছে সেইহেতু তাকে পাকতেই হবে। অতএব, স্বয়ং-গতিশীলতাই হচ্ছে পরিবর্তনের হেতু। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন এবার যে, আপেলের প্রগতিটা কি একটা বিরাট বৃত্ত (আপেল-গাছ-আপেল) হ'য়ে উঠল না? আমি বলব, না। কারণ, প্রতিটি সৃষ্টি-চক্রের সঙ্গে সঙ্গে স্তর বদলে যাচ্ছে। শুরুতে একটি আপেল থেকে হাজার হাজার আপেল তৈরি হয়েছে বটে, কিন্তু এই সৃষ্টি-চক্রটি যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন নূতন চক্রের সূচনায় আমরা আর শুরুর স্তরে থাকব না, থাকব উন্নততর স্তরে। তাই বলছিলাম, ক্রম-উন্নতিই হচ্ছে প্রকৃতির স্বভাব ধর্ম। আশা করি আপনি ব্যাপারটা সব বুঝতে পেরেছেন।"

"মার্কসবাদ বুঝবার জন্যে এত উত্তাপ মাথায় নিয়ে এখানে আমি আসি নি।"

"তবে?" কেবল অনাহারের জন্যে নয়, আতঙ্কের উত্তাপে হুকুর বুকের ভেতরটা শুকিয়ে বাঁশপাতার মত হাল্কা হয়ে উঠেছে। কলকাতার খবরের মধ্যে ভয়ের বীজ লুকনো আছে ভেবেই হুকু সহসা মার্কসবাদের স্বয়ং-গতিশীলতার আইন বিশ্লেষণে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। সিগারেটের শেষ অংশটা কমরেড শাজাহান ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, "ভাবছি আপনার মত একজন শিক্ষিত মেনানার পক্ষে বসন্ত দাসকে শাদি করা সম্ভব কি না।"

"আমি শিক্ষিত?" হুকু যেন নিরক্ষরতার আসমান থেকে পড়ল, "আমার কোন শিক্ষাই নেই কমরেড। আমি একজন নিরক্ষর বাস্তুহারা।"

"আপনার সঙ্গে বসন্তর শাদি হ'ল কবে?"

"একবের আগের জন্মে। আমরা হিন্দু শাজাহান সাহেব। আমরা বহুজন্মে বিশ্বাসী। ইসলাম ধর্মে এরকম কোন সুবিধে নেই। আমরা উভয়ে উভয়কে ভালবাসতুম—"

বাধা দিয়ে কমরেড শাজাহান বলল, "সেই তারিখটাই বলুন।"

"কোন্ তারিখটা?"

"ঐ যে বললেন, কেমনে আপনাদের মধ্যে মতভেদ হ'ল।"

"সে তো উপনিষদের যুগ কমরেড। সক্রেটিস, প্লেটো কিংবা এরিস্টটলের যুগ তখনও আসে নি।" কমরেড শাজাহানকে তাওতার দরিয়ায় ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল হুহু চৌধুরী। কিন্তু কমরেড শাজাহান পার্টি-লাইনের নিরাপদ-ভুটোর ওপর ভাসতে ভাসতে জিজ্ঞাসা করল, "কেমন ক'রে এবং কোথায় বসন্তর সঙ্গে আপনার প্রথম সাক্ষাৎ হয়?"

"বসন্তদাস তখন একাই জীবন যাপন করছিল। কেউ তার সাথী ছিল না। আহা বেচারা বসন্ত!" এই পর্যন্ত ব'লে হুহু ভেবেছিল একটা বড় রকমের অজুহাত দেখিয়ে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দেবে। কিন্তু কমরেড শাজাহান পুনরায় তার জেরা শুরু করল, "বসন্তদাস বললেন একাই ছিল। আপনি তখন কোথায় ছিলেন?"

"ও, হ্যাঁ—ছিলুম উপনিষদেই।"

"কোন্ জেলা?"

হুহু হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারলে না। এতক্ষণ সে কেবল সৃষ্টির ইতিহাস আলোচনা করছিল, ভূগোলের কথা ভাবে নি। তাই সে এবার পাল্টা প্রশ্ন করল, "মার্কসবাদে আপনি ভূগোল পেলেন কোথায়? কমরেড, সুলতানপুরে কি ষ্টাডি সারকেল্ নেই?"

"আছে। কিন্তু আপনাদের সঙ্গে ষ্টাডি-সারকেলের কি সম্পর্ক? আমার সন্দেহ হচ্ছে, বসন্ত আপনার স্বামী নয়। প্রতিরোধ আন্দোলন চালাবার জন্যে আপনারা এখানে গা ঢাকা দিয়ে আছেন।"

"আমরা রিফিউজী, ঢাকা দেবার মত গায়ে আমাদের কিছু নেই। আমরা আদিম মানব-মানবীর মত ভূষণ্ডীর স্বর্গে বিচরণ করছি। কমরেড, আমাদের জন্যে কোথাও তো ফুলশয্যা পাতা নেই—আমাদের মিলনশয্যাটি তাই ভূষণ্ডীর বিচালীশয্যায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছে। আমাদের দৈন্য ঘোচাতে না পারেন অনুযোগ দেব না, কিন্তু বাস্তহারার কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দেবেন না শাজাহান সাহেব। আপনি সুলতানপুরের পার্টি-সেক্রেটারী। খোদার চেয়েও আপনি বেশি শক্তিশালী। ভূষণ্ডীর এই ভাঙা-বাক্সটা দিয়ে আপনি কি

করবেন ? আমরা প'ড়ে আছি অতি সাধারণভাবে, আপনি কেন এই বাজটা ধরে টানাটানি করছেন ?"

"আমরা কাউকে প'ড়ে থাকতে দেব না।"

"কি করবেন আমাদের নিয়ে ?"

"এক লাইনে দাঁড় করিয়ে দেব।"

"তারপরে ?"

"তারপরে—ঐ অবনীমণ্ডল আসছে। আলোচনাটা আমাদের এখন মুলতুবী রইল।"

"কোন্ আলোচনাটা কমরেড ?"

"ঐ আপনাদের শাদির আলোচনা, মানে কবে মহব্বত হ'ল, আর কবে এবং কোথায় শাদি হ'ল। কেবল তাই নয়, শাদির পরে ক' রোজের মধ্যে হামু জন্মাল তাও আমায় জানতে হবে। এখন আমি চললুম।" কমরেড শাজাহান দাওয়া থেকে নেমে এসে দাঁড়াল মাঠের ওপর। হুকু বলল, "দেশলাই ফেলে যাচ্ছেন, এই নিন।" বিনয়প্রকাশের ছবিটা হাত দিয়ে ছোঁবার জন্যে হুকু অনেকক্ষণ থেকে চেষ্টা করছিল। এবার সে সুযোগ পেয়ে দেশলাইটা হাতে নিয়ে তুলে ধরল শাজাহান সাহেবের দিকে। কমরেড শাজাহান তার হাতটা হুকুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "দিন।" ফিরিয়ে দিতে দেরি করতে লাগল হুকু। কমরেড শাজাহান বলল, "দেশলাইটা আপনি না হয় রেখেই দিন। ছবিটা বুঝি আপনার চোখে খুব ভাল লাগছে ?" সহসা ছবি থেকে চোখ দুটো তুলে নিয়ে হুকু বলল, "এঁ্যা ? ও, হ্যাঁ, ভাল লাগছে। কী সুন্দর চেহারা !"

খুশী হয়ে কমরেড শাজাহান বলল, "পুলিশবিভাগের কমিশনার কমরেড বিনয়প্রকাশ। শিগগিরই শাদি হবে। দাওয়াৎ দেবে সবাইকে।"

"সারা দেশে চলেছে মন্বন্তর, এই সময়ে তিনি শাদি করছেন কেন ?"

"আমাদের পার্টি-অফিসে মন্বন্তর নেই।" কথাটা শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গে হুকু ও কমরেড শাজাহান চোখ ঘোরাল আকাশের দিকে। চারটে চোখ বিস্ফারিত ক'রে ওরা দেখল, আকাশের সর্বত্রই অসংখ্য শকুন উড়ছে, যেন নতুন অর্থনীতির পাখা নাড়াতে নাড়াতে ওরা নেমে আসছে অতি দ্রুত গতিতে।

শহরদেহের মাধ্যাকর্ষণে ওরা ঝুলে পড়ছে শহরের দিকে। কমরেড শাজাহান বলল, "খুব বড় দাওয়াৎ দেবেন কমরেড বিনয়প্রকাশ। আমার কাছে নেমন্তন্ন-চিঠি আসবে। আমাদের প্রধান নেতা কমরেড চৌধুরীর বোনের সঙ্গে তাঁর শাদি হচ্ছে, বড় দাওয়াৎ না দিলে মান থাকবে কেন? হেঁ, হেঁ—আমি এবার চলি।"

হুজুর হাত থেকে দেশলাইটা প'ড়ে গেল কোন্ এক অসতর্ক-মুহূর্তে। কমরেড শাজাহান তা লক্ষ্য করল না। সাইকেলে চেপে সে ফিরে চলল সুলতানপুরের দিকে।

খানিকটা পথ চলে আসবার পরে কমরেড শাজাহান স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। হুজুর সঙ্গে কথা বলবার সময় সে কোন রকমেই পার্টি লাইন ধ'রে চলতে পারছিল না। হুজুর অধিকাংশ কথাই সে বুঝতে পারে নি। আর কোন দিনও সে যাবে না ভূস্বামীর মাঠে। কিন্তু না গিয়েই বা উপায় কি? কলকাতা থেকে সে হুকুম নিয়ে এসেছে ভূস্বামীর এই পরিবারটির ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখবার। কি ভেবে কমরেড শাজাহান সাইকেল থেকে নামল।

চারিদিকে ধূ ধূ করছে মাঠ। জমিতে ফসল হয় নি। চাষীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সেদিন বসিরহাট শহর থেকে লালপুলিশরা এসেছিল অনেকগুলো গাড়ি নিয়ে। গাড়ি ভর্তি ক'রে তারা চাষীদের গোটা পরিবারদেরই সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছে। বিদ্রোহী চাষীদের মধ্যে আর যারা আছে সুলতানপুরে তাদের কি যে হবে কমরেড শাজাহান তা জানে না। পরিচিত চাষীরা সবাই যদি চলে যায় তা হ'লে সুলতানপুরের উন্নতি দেখে তার জীবন কাটবে কি ক'রে? নিঃসঙ্গ জীবনের কল্পিত-অবস্থা চিন্তা ক'রে সে সত্যিই খুব বিচলিত হ'য়ে উঠল। পার্টি-সেক্রেটারী হওয়ার বিড়ম্বনা বড় কম নয়। লেখাপড়া শিখতে পারলে সে কলকাতায় গিয়ে প্রধান নেতার সঙ্গে এই সব নতুন কানুন সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারত। কিন্তু সে সুবিধাও তার নেই। ভূস্বামীর ঐ শিক্ষিত জেনানার কথাও সে বুঝতে পারে না।

মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে সে ভাবতে লাগল ছেলেবেলাকার কথা। নির্বিঘ্নে লেখাপড়া করার সুযোগ তার হয় নি কোন দিনও। সুলতানপুরের প্রাইমারী ইস্কুলে সে ভর্তি হয়েছিল। পান্‌তা খেয়ে বই-কেতাব হাতে নিয়ে সে বেত

মাষ্টার সাহেবদের কাছে পড়তে। বছর দুই পরে বাপজান তার পড়া বন্ধ ক'রে দিলেন। একদিন ইস্কুলে যাবার পথে বাপজান আশমানের দিকে চেয়ে বললেন, "শাজু, আশমানে দেখছি অনেক মেঘ। অসময়ের পানিতে ফসল সব পচে গেল রে!"

"আজ আর বোধহয় পানি আসবে না আব্বা। মেঘ সব পালিয়ে যাচ্ছে।"

"এসেছে যখন, সহজে পালাবে না। গত দুদিনের পানিতে নদিবের সবটুকুই ডুবে গেছে রে শাজু।"

বাপজানের কথা শুনে সে বইগুলো সব বুকের ওপর চেপে ধরল। বই-কেতাবগুলো বুঝি হাত থেকে ফসকে যাচ্ছে! ইস্কুলের ঘন্টা শুনে শাজাহান বলল, "পড়া সব শুরু হয়ে যাবে, আমি এবার যাই, আব্বা।" বাপজান তার হাত ধরে বললেন, "সুলতানপুর ভেসে যাচ্ছে, চারদিকে অনেক পানি। সারা বছর উপোস করতে হবে। চল্, আমার সঙ্গে মাঠে। কাজ শিখবি। বুক দিয়ে যদি বন্যার পানি ঠেকিয়ে রাখতে না পারিস, তা হ'লে হাড়গিলের মত সরু সরু ক'খানা কেতাব বুকের ওপর চেপে ধ'রে লাভ হবে কি শাজু? চাষীর বুকে কেবল হিম্মত নেই, ইজ্জৎ-ও আছে। চল্।"

আকাশ ভেঙে ঝুপ ঝুপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল। সমস্তটা দিন সে বাপজানের সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আলের লাইন ধ'রে মাটির বাঁধ দিতে লাগল। ও-পাশের উঁচু-জমি থেকে পানির স্রোত গড়িয়ে গড়িয়ে এ-পাশের জমিতে আর আসতে পারবে না। সমস্তটা দিন সে মাঠে কাজ করল বটে, কিন্তু কান খাড়া ক'রে রাখল ইস্কুলের দিকে। আলের মাটিতে রেখা টেনে টেনে সে ইস্কুলের ঘন্টা বাজার হিসেব রাখল, দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত। ইস্কুল এবার ছুটি হয়ে গেল। বাপজানের সঙ্গে কাজ করতে করতে ঘন্টার শব্দ শুনে ওর হাত কেঁপে উঠেছে কতদিন। আগাছা তুলতে গিয়ে তুলে ফেলেছে কচি ধানের চারা। তবুও সে কাস্তের বদলে কলম ধরবার সুযোগ পায় নি কোন দিনও। আজ তার দুঃখ হচ্ছিল সেই ছেলেবেলাকার কথা ভেবে। যদি সে লেখাপড়া শিখতে পারত, তবে বোধহয় কমরেড শাজাহানের চেয়ে যোগ্যতর সেক্রেটারী পাওয়া যেত না গোটা বশিরহাট সাব-ডিভিশন এলাকায়।

সেদিনকার মেঘ তার ভাগ্যাকাশে জমাট বেঁধে রইল সারাটা জীবন। কমরেড শাজাহানের মনের মাটিতে অসময়ের বৃষ্টি প'ড়ে প'ড়ে লেখাপড়ার ফসল আর কোনদিনও গজাতে পারলে না। সুলতানপুরে আজ সমাজতন্ত্রের রং ধরলাছে। সে নিজেই আজ এ-অঞ্চলের পার্টি-সেক্রেটারী। অসময়ে আকাশে মেঘ উঠল ব'লে কারো আর লেখাপড়া বন্ধ হবে না। ইস্কুলের ঘণ্টা বাজাবে রাষ্ট্র এবং ঘণ্টা শোনার দায়ও নেবে রাষ্ট্র। কারো নদিবের এক ইঞ্চিও সে জলের নিচে ডুবতে দেবে না। দেবে না পুড়তে এক ইঞ্চি জমিও। ভাগ্যের রোদ-বৃষ্টি সে নিজেই পারবে নিয়ন্ত্রণ করতে। পার্টি-সেক্রেটারীর হাতের মুঠোয় সব কিছুই আজ ধরা পড়েছে। ধরা পড়েছে খোদায় খোদকারীও। কমরেড শাজাহানের দুঃখ, এ হাত সে তার বাপজানকে দেখাতে পারলে না! অসময়ের রোদ-বৃষ্টিতে পু'ড়ে পু'ড়ে এবং ভিজে ভিজে তিনি ইন্তেকাল করলেন পার্টি-সেক্রেটারী হওয়ার আগেই। আমেন! আমেন! হাজার হাজার শকুন ছুটে চলেছে কাজীপাড়ার ময়দানের দিকে। কমরেড শাজাহান পুনরায় সাইকেলে চেপে বসল।

শাজাহান সাহেব চলে যাওয়ার পরে হুরু দাওয়ার সামনে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। বসন্ত এখনো কেন ফিরল না? অবনীমণ্ডল হাবুকে নিয়ে সেই সকাল বেলায়ই বেরিয়ে গেছে। হাবুর জন্তে সে নিশ্চয়ই ভিক্ষা করতে বেরিয়েছে। গতকাল থেকে পারমিট ছাড়া কেউ এক ছটাক দুধও কিনতে পারছে না। এত অল্প সময়ের মধ্যেই রাষ্ট্রের আইনকে ভয় করতে শিখেছে সবাই। কি মনে ক'রে হুরু হাঁটতে লাগল সুলতানপুরের দিকে।

অবনীমণ্ডলের জমির কাছে এসে থেমে গেল হুরু। মাথার ওপর দিয়ে শকুনের শোভাযাত্রা চলেছে। মাথার ওপর ঘোমটা টেনে দিয়ে সে অবনীদার মাঠ পার হ'তে লাগল। কচি কচি ধানের গাছগুলো ওর পায়ে লাগছে। তা লাগুক, হাঁটতে ওর ভালই লাগছে। হুরু একা হাঁটছিল না, সে কল্পনা করতে লাগল বসন্তও ওর পাশে রয়েছে। বসন্তর হাত ধ'রে কনেবৌটির মত হুরু চলে যাচ্ছে ভূখণ্ডীর বাইরে। বৃহত্তর বাস্তব পরিকল্পনার দিকে তাক

বাড়িয়েছে হুকু। শুধু বাঁচা এবং বেঁচে থাকার অর্থের মধ্যে সে সমন্বয় খুঁজছে। রাজনীতিকে শিল্পের পর্যায়ে তোলা যায় কি? শিল্পকে নিয়ে যাওয়া যায় কি রক্তমাংসের বাস্তব অনুভূতির মধ্যে দিয়ে অতি-বাস্তব তুরীয়লোকের স্বর্গদ্বারে? অবনীমণ্ডলের ফসলের স্বর্গ পার হচ্ছে হুকু। ছ-ইঞ্চির মত বড় হয়েছে ধান-গাছের চারা। শত শত বিঘে তৃণশূন্য মাঠের মধ্যে অবনীদার জমিটুকু মরূদ্যানের মত সুন্দর দেখাচ্ছে। হুকু দেখল, অল্প বাতাসে ধানগাছের মাথাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে। আর কিছুটা লম্বা না হ'য়ে উঠলে, কম্পনের মধ্যে ছন্দ আসবে না। ওরা দোলাতে পারবে না ফলভারানত মাথার সম্পদ। ধানের সম্পদের মধ্যে হুকু বোধহয় আজ কেবল চালের সম্ভাবনাই দেখছে না, দেখছে সম্ভাবনার মূলের রহস্য। দেখছে মেকানিজম্‌ আর এপোসের যুগল-মিলন। চারাগাছগুলোর মাথায় আলগোছে হাত বুলতে লাগল হুকু চৌধুরী। বিপ্লব-বর্জিত নরম হাতের স্পর্শ ধানগাছের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ভূষণ্ডীর ফসলের মধ্যে হুকুরও কৃতিত্ব থাকবে।

একটু পরেই হুকুর হুঁশ ফিরে এল। বেলা হয়েছে, বসন্ত এখনো ফিরল না। ভয় বাড়তে লাগল হুকুর। সে পা চালিয়ে হাঁটতে লাগল সুলতানপুরের দিকে। বসন্তকে আর সে একা কোথাও যেতে দেবে না। বেকার হয়ে বসন্ত ব'সে থাকুক ওরই পাশে চব্বিশ ঘণ্টা। বসন্তকে কেবল ধ'রে রাখবার আদিম বিজ্ঞান নিয়েই হুকু সুখী হতে চায়।

মাইল খানেক রাস্তা চ'লে আসবার পরে হুকু দেখতে পেলে খোলামাঠের একধারে বসে নবীন কামার শকুন তাড়াচ্ছে। সামনের দিকে দুটো শকুনকে তাড়া করতে না করতে পেছন থেকে গোটা চার শকুন এসে ঝুঁকে পড়ছে একটা মৃতদেহের ওপর। কাছে গিয়ে হুকু জিজ্ঞাসা করল, "কি করছ, নবীনদা?"

"শকুন তাড়াচ্ছি।" চশমাটা তার নাকের এত নিচে ঝুলে পড়েছে যে, নবীন কামার চশমার তলা দিয়ে হুকুকে আর দেখবার চেষ্টাই করল না।

"শকুন তাড়াচ্ছ কেন, নবীনদা?"

"ভাগো ছিল, তাই তাড়াচ্ছি দিদি। মেজো আর সেজো ছেলেটা গেছে কাঠ যোগাড় করতে।"

হু দেখল, ঘামের মত বিন্দু পরিমান জল জমেছে নবীন কামারের চোখের পাশে। শোক প্রকাশের জন্যে এক বালতি জল ফেলবার দরকার নেই। দরকার হ'লে নবীন কামার তা ফেলতেও পারত না। ঐটুকু ঐ কেটোর মধ্যে বালতি জল ধরে রাখা অসম্ভব হ'তো। জনসংখ্যা বাড়ল ব'লেই শকুনগুলো কাছে আসতে আর সাহস করল না। একটু নিশ্চিন্ত হয়েই নবীন কামার আবার বলল, "দেখুন তো কি অত্যাচার এদের?"

"কাদের?" জিজ্ঞাসা করল হুহু।

"এই শকুনগুলোর কথা বলছি দিদি। ওরা তো কাজীপাড়ার ময়দানে যেতে পারত। সেখানে খাদ্যের কোন অভাব ছিল না। মুসলমানেরা মাটি দেবার সময় পায় নি, হিন্দুরা পায় নি কাঠ কিনবার পয়সা। তাই কাজীপাড়ার ময়দানে মড়ার একটা পাহাড় গজিয়ে উঠেছে।"

"তোমার সামনে এটা কার মড়া নবীনদা?"

"এ তো আমার বড়ছেলে দিদি! ব্যামো হয়েছিল। ডাক্তার রামতনু বাবু আগেই আমায় বলেছিল যে, এসব ব্যামোতে অনেক পয়সার দরকার হয়। জাতজাতির নিন্দে করতে নেই, কিন্তু মেয়েমানুষের কাছ থেকেই ব্যামোটা ও নিয়ে এসেছিল। হঃ, পুরনো আমলের সরকারী-সনদ পাওয়া মেয়েমানুষ! আমি তো মুখ্খু দিদি, আইনকানুনের মানে বুঝতে পারি নে।"

"কিন্তু ও-অসুখে তো এত তাড়াতাড়ি ম'রে যাওয়ার কথা নয় নবীনদা?"

"চিকিৎসা হ'ল না। ক্রমে ক্রমে আরও কত রকমের ব্যাধি এসে ধরল ওকে। ব্যাটা আর ক'টা দিন বেঁচে থাকলে আমি নিজেই ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারতুম।"

নবীন কামারের কথায় হুহু এবার রাজনীতির গন্ধ পেল। তাই সে তাড়াতাড়ি ক'রে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি ক'রে ব্যবস্থা করতে?"

"দিদি, আমাদের সুলতানপুরে হাসপাতাল হবে। গরীব রুগীর জন্যে আমাদের গভর্ণমেন্টো কী না করছে! হাসপাতাল-কমিটির আমি একজন মেম্বোর দিদি—এই মলো যা, শকুনগুলো দেখছি আবার আসছে তেড়ে! কিন্তু হাসপাতাল হলেই কি ছেলেটা বাঁচত? বাঁচত না। ওপারের ডাক

এসে গেলে, হবীব-হবীবের প্রতিবেশীরা ধ'রে রাখতে পারে না। এ বড় মজার খেলা দিদি!" একটা অনুভবের খানিকটা দূর পর্যন্ত তাড়িয়ে দিয়ে এসে নবীন কামার আবার বলল, "এ বড় মজার খেলা। মানুষ হচ্ছে গিয়ে ভগবানের হাতের পুতুল। তিনি কখন্ যে কাকে নিয়ে খেলবেন আমরা তা বুঝতে পারি নে। তুমি পার দিদি?"

জবাব দেওয়ার আগেই হুকু দেখল, নবীন কামারের মেজো আর সেজো ছেলে মাথায় ক'রে কাঠ নিয়ে এসেছে।

পরের দিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দুধ দোয়াতে বসল ওবাইদ মোল্লা। প্রতিদিন সকালবেলা দুধের বালতি হাতে নিয়ে সে গিয়ে উপস্থিত হ'তো হামুর সামনে। ওবাইদ মোল্লার হাতে বালতি দেখে হামু আনন্দের আতিশয্যে হাতপা ছুঁড়ত। কিন্তু আজ ক'দিন থেকে গাইটা দুধ দিচ্ছে না। অতএব, ওবাইদ মোল্লা হামুর কাছে আর যায় না। লজ্জায় ও দুঃখে সে তার বালতি-শূন্য হাতের হাড়গুলো ভেঙে ফেলতে চায়। কি হবে এমন হাতের বোঝা বহন ক'রে? বিছানায় শুয়েই সে আজ ঠিক ক'রে রেখেছে যে, বেলা বাড়বার আগে সে চলে যাবে শাজাহান মিঞার কাছে। ভূষণ্ডীর সত্ব সমর্পণ ক'রে আসবে বিনা শর্তে। কৃষি সমবায়ে দিন মজুরের কাজ নেবে সে। মজুরীর পয়সা দিয়ে সে দুধ কিনবে হামুর জন্তে এবং শাজাহান মিঞার কাছ থেকে চালের পারমিট আদায় ক'রে নিতে কোন কষ্টই হবে না।

দুধ দোয়াতে ব'সে ওবাইদ মোল্লা ঘেমে উঠল অপরিমিতভাবে। গাইটার বাঁট ধ'রে টানাটানি করতে লাগল, কিন্তু দু-চার ফোঁটার বেশি দুধ বেরল না। হামুর কথা ভেবে সে তার নিজের কপালে বার বার ক'রে করাঘাত করতে লাগল। আজান-মসজিদ সব ভুলে দিয়ে শাজাহান মিঞা এ কি সর্বনাশ ডেকে আনলো? সবুজ রং-এর ঘাসপাতা পর্যন্ত সুলতানপুরের লোকেরা সব খেয়ে শেষ ক'রে ফেলেছে! গত পনরোদিন থেকে সে গরুটাকে এক মুঠো ঘাস কিংবা বিচালি খেতে দিতে পারে নি।

দু-হাঁটুর মাঝখানে বালতিটাকে ধ'রে রেখে ওবাইদ মোল্লা অবাক হয়ে

ছিল গাইটার বাঁটের দিকে। চামড়াটা কেমন ঝাপী বছরের বুড়ীর মত (কুঁচ)কে গেছে। হাত দিয়ে টান মারলে রবারের মত লম্বা হয়ে যায়, দুধ আসে এক ফোঁটা। হঠাৎ ওর নিজের পেটের দিকে নজর পড়তেই ওবাইদ মোল্লা আরও বেশি অবাক হ'ল। গরুটার পেটের চেয়েও ওর নিজের পেট-টা (চুপ)সিয়ে গেছে অনেক বেশি। মেহের বিবি এসে দাঁড়াল ওর পেছন দিকে, বলল, "দাও, বালতিটা আমায় দাও।"

"দুধ আর নেই রে মেহের।" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল ওবাইদ মোল্লা।

"তোমার ঐ শক্ত হাতের গুঁতো খেলে ও দুধ দেবে না।"

"দুধ না থাকলে নরম হাতের আদর খেলেও দেবে না। আর টানাটানি ক'রে লাভ নেই, খুন পড়ছে। মেহের আজ আমি কি করব? খালি বালতি নিয়ে কেমন ক'রে গিয়ে দাঁড়াব হামুর সামনে?"

বিবি মেহেরউন্নিসা এগিয়ে এসে বসল স্বামীর পাশে। ওবাইদ মোল্লা এবার বাঁটের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "বড্ড শুকিয়ে গেছিস, মেহের। সব চালটুকু ওদের সেদিন না দিলেই পারতিস।"

"আমার আর ভাত খেয়ে গতরে জোর বাড়িয়ে লাভ কি? তারচেয়ে ফুদিদিকে খাইয়ে খাইয়ে তাজা ক'রে রাখতে পারলে হামুর খানিকটা সুবিধে হ'তে পারে।"

"নাঃ, ফুফুদিদির ওপর কোন ভরসাই নেই। মেহের, খোদাতালা সবই সহ্য করেন, কিন্তু অধর্ম কখনো তিনি সহ্য করেন না। হামুর এত কষ্ট কেন জানিস?"

"হামুর সঙ্গে খোদার কি সম্পর্ক?" একটু উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করল বিবি মেহেরউন্নিসা।

"বলিস কি! সম্পর্ক নেই? সম্পর্ক না থাকলে মানুষ কিংবা কাক পক্ষীরা সব নড়েচড়ে কি ক'রে? মেহের, তোরা সব খোদার বিরুদ্ধে জিগির তুলেছিস কেন?"

"তুলব না? মন্বন্তর তবে এল কেন? অমন একটা দুধের শিশু চোখের ওপর শুকিয়ে মরছে তাও কি তোমার খোদা দেখতে পান না?"

"কাফির রে, কাফির সে মেহের। খোদা সবই দেখছেন। একটু পানি নিয়ে আয় তো—"

"কেন?"

"নামাজ পড়া হয় নি। আজান দিই নি অনেক দিন। বিশ্বাস রাখ্ মেহের, ধৈর্য ধর্……।" এই ব'লে ওবাইদ মোল্লা নামাজ পড়তে বসল। মুহূর্তের মধ্যেই আজানের ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল দিক বিদিকে। বিবি মেহেরউন্নিসা অবাক হয়ে চেয়ে রইল স্বামীর দিকে। শুকনো ঐ দেহটা থেকে অত বড় একটা আওয়াজ বেরুচ্ছে কি ক'রে? একটু পরেই মেহের বিবির মনে হ'ল, পাইটার বাঁটগুলো ফুলছে! তবে কি আসমান থেকে দেবদূত জিব্রাইল নেমে আসছেন ওবাইদ মোল্লাকে আলিঙ্গন করবার জন্যে? বাঁট-গুলো ফুলে উঠছে! দুধের বন্যায় সুলতানপুর বুঝিবা ভেসে যায়!

পা টিপে টিপে কমরেড শাজাহান এসে উপস্থিত হ'ল গোয়ালের সামনে। মেহের বিবি বালতিটা ফেলে দিয়ে দ্রুতপদে স'রে গেল ঘরের পেছন দিকে। মহাজন ওসমান গণি রান্নাঘরের দরজা দিয়ে শাজাহান মিঞাকে দেখতে পেল।

কমরেড শাজাহান বলল, "আজান শুনে তোমায় একটু দেখতে এলাম মিঞা সাহেব।"

ওবাইদ মোল্লা কথা কইল না। নামাজ শেষ না ক'রে কথা কইবার প্রয়োজন বোধ করল না সে। কমরেড শাজাহান একটু বিরক্তভাবেই বলল, "খোদার আইন সব বাতিল হয়ে গেছে।" কাঁচা চামড়ার মোটা জুতো দিয়ে মোল্লা দাড়ির মাটিতে পদাঘাত ক'রে সে পুনরায় বলল, "পার্টি-সেক্রেটারী যা পারে, তোমাদের খোদা তা পারে না। খোদা কি চালের পারমিট দিতে পারে? পারে না। কিন্তু আমি পারি। বদনার পানি দিয়ে ওজু ক'রে ক'রে তোমার হাতের চামড়া গেছে ঢিলে হয়ে, বদন গেছে শুকিয়ে। দাড়িতে আর রেশমী সুতোর জেল্লা মারছে না। নারকেলের দড়ির মত দাড়ির গোছা যে শুকিয়ে গেল হাজী সাহেব?"

ওবাইদ মোল্লা পারমিটের লোভ তবু উপেক্ষা ক'রে হাত বাড়িয়ে রইল আসমানের দিকে। সাড়া দিল না সে। সবচেয়ে বড় নামাজ সে আজ পড়তে

ছে সবচেয়ে বড় বামভক্তিওরা ভুল পাবে ব'লে। কেবল রাসুলেই বাঁচাবে না, বাঁচাতে হবে অন্ধকার যুগের সেই অবিনাশী শাহ্ সাহেবের নতুন বয় কমরেড শাজাহানকেও। প্রায় তেরশো বছর পরে পুনরুজ্জীবিত কোরেশরা যেন সুলতানপুরে নতুন মঠের পত্তন করেছে শাহের শাজাহানের পার্টি-অফিসে।

কমরেড শাজাহান পকেট থেকে পিস্তল বার ক'রে নলটাকে তুলে ধরল ওবাইদ মোল্লার চোখের সামনে। তাতেও ওবাইদ মোল্লার বিন্দুমাত্র চঞ্চলতা এল না, এল না ভয়। কমরেড শাজাহান পিস্তলের নল দিয়ে ওর ধবধবে দাড়ির গোছায় খোঁচা মারতে মারতে বলল, "দাড়িতে দেখছি ধুলো জমেছে অনেক। ভূতত্ত্বীর ধুলো নিশ্চয়ই। বিবি সাহেবার অসুবিধে হয় না এতে? বলি ও হাজী সাহেব, নয়ন দুটো এবার মেলো।" এই ব'লে সে ফাঁকা আকাশে গুলি ছুঁড়ল। ভয় পেয়ে মেহের বিবি বেড়ার ওপাশ থেকেই উঁকি দিয়ে দেখল যে, স্বামী তার এখনো নামাজ পড়ছে। আড়ালে দাঁড়িয়েই সে বলল এবার, "আমরা তো কারো পাকা ধানে মই দিতে যাই নি। রাজা উজীর হওয়ার মতলব আমাদের নেই। তবে কেন আমাদের অন্দরে ঢুকে ফৌজী-কসরত দেখাচ্ছ মিঞাসাহেব?"

"বিবি সাহেবার গলার কসরত আমার পিস্তলের চেয়ে কিছু কম নয় দেখছি। আমাদের নয়ারাষ্ট্রে কোন অন্দরমহল নেই, সবটাই বাইরের মহল। আমরা কাউকে আলাদা থাকতে দেব না। গোপন থাকতে দেব না মিঞাবিবির খাট পালঙ্কও। আমাদের রাষ্ট্রে স্বার্থপর হওয়ার সুযোগ অবিশ্যি নেই বিবিসাহেবা। মিলেমিশে, দিয়েথুয়ে সবাইকে বেঁচে থাকতে হবে। পর্দার অন্ধকার আমাদের রাষ্ট্র থেকে উঠে গেছে।" কথা শেষ ক'রে কমরেড শাজাহান দু-পা এগিয়ে এল অন্দরের দিকেই। ভয় পেল মেহের বিবি। পর্দা হারাবার ভয় নয়, মেহ্মান ওসমান গণি বুঝি ধরা পড়ল এবার। কিন্তু বেড়ার এপাশে দাঁড়িয়েই কমরেড শাজাহান বলল, "পারমিট দিতে এসেছি, বিবিসাহেবা।"

"পারমিট!!" বিবি মেহেরউন্নিসা ওপাশ থেকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "আমাকে দিন। চাল পাওয়া যাবে তো?"

"আমার এই আছে, পাসপালা চাল পাওয়া যাবে।"

ওবাইদ মোল্লা এবার বলল, "লোভে প'ড়ে তুই পর্দা ভাঙিস নে মেহের, স'রে যা।"

"আমরা আইন ক'রে পর্দার অন্ধকার তুলে দিয়েছি, মোল্লা সাহেব।" এই ব'লে মাটিতে পা ঠুকলো কমরেড শাজাহান।

"তা দাও আমরা তোমায় বাধা দিতে যাব না। কিন্তু পারমিটের লোভে মেহেরকে আমি পর্দা ভাঙতে দেব কেন? তোমরা রাজাউজীর লোক, নরকে ভয় পাও। আমরা কিন্তু অধর্মের চাল খেয়ে বেঁচে থাকতে ভয় পাই, শাজাহান মিঞা।"

"না, না অধর্মের চাল তোমায় খেতে বলছি না।" গলার স্বর নরম ক'রে ফেলল কমরেড শাজাহান। পিস্তলটা পকেটে রেখে সে এবার ওবাইদ মোল্লার নামলেখা পারমিটখানা ওরই চোখের সামনে নাড়াচাড়া করতে লাগল। ওবাইদ মোল্লা চোখ ঘুরিয়ে নিল পারমিটের দিক থেকে। কমরেড শাজাহান বলল, "চোখ তো ফিরিয়ে নিলে, চাইবে কোন্ দিকে? তোমার ঘরের চালের ওপর দুটো শকুন এসে বসল।···ওটা বুঝি তোমার রান্নাঘর?"

"জী।"

"দরজা বন্ধ কেন? ক'দিন থেকে উনোন জ্বলে নি?" কমরেড শাজাহান রান্নাঘরের দিকে যাবার জন্তে আগ্রহ দেখাতে লাগল। পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে পেরে ওবাইদ মোল্লাও খানিকটা নরম স্বরে বলল, "তুমি নিজে কেন পারমিটখানা নিয়ে এলে, আমায় খবর দিলেই তো পারতে।" কমরেড শাজাহান নরম স্বরের মনস্তত্ব বুঝতে পেরে পারমিটখানা ওবাইদ মোল্লার হাতে দিয়ে বলল, "এখুনি গিয়ে চাল নিয়ে এসো। উপোস ক'রে ক'রে দেহে তোমার এক ছটাক মাংস নেই আর! মিঞা বিবিতে মিলে আজ পেট ভ'রে খাও। এবার থেকে মানুষ আর মানুষকে শোষণ করতে পারবে না।" ওবাইদ মোল্লা পারমিটের কাগজখানাতেই যেন ভাতের স্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। চাল কিনবার আগেই মুঠো মুঠো নরম ভাত যেন ওর গলা দিয়ে পিছলে পড়ছে পেটের মধ্যে। তলিয়ে-যাওয়া চোখের মণি দুটো ওপর দিকে

এনে ওবাইদ মোল্লা চেয়ে রইল শকুন দুটোর দিকে। পারমিটের সার্থে মনুষ্যত্ব ফিরে আসছে ক্রমে ক্রমে। শকুনের মর-চৈতন্যে মৃতপ্রায় ওবাইদ মোল্লা কখন জীবিত হয়ে উঠেছে। জীবনের বলিষ্ঠতা শকুন দুটো আর সহ্য করতে পারল না। উড়ে গেল এক এক ক'রে দুটোই। চ'লে গেল মেলে মৃত্যুর ডানা আসমানের দিকে। বেড়ার ওপাশে দাঁড়িয়ে থেকে ছবি সবাই শুনলো, দেখতে পেল পারমিট। স্বয়ং খোদাতালা যেন কথা শেষ না হ'তেই শাজাহান সাহেবকে পাঠিয়ে দিয়েছেন পারমিট হাতে দিয়ে। ওবাইদ মোল্লার আজানের আর্তনাদ বুঝি খোদা আজ শুনতে পেয়েছেন।

ওবাইদ মোল্লা নিজেও নিঃশব্দে কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি জানাচ্ছিল করুণাময় খোদাতালার কাছে। সারা জীবনের নামাজ-পড়া ওর ব্যর্থ হয় নি। সে একটু পরেই জিজ্ঞাসা করল, "চাল পাব কোথায়? বসিরহাট যেতে হবে বুঝি?"

"সবাই যাচ্ছে বসিরহাটে, সরকারী অফিসে। কিন্তু তুমি চলে এসো আমার অফিসে, সেখান থেকেই চাল আমি দিয়ে দিতে পারব। দাম লাগবে না তোমার।" বলল কমরেড শাজাহান।

কথা শুনে ওবাইদ মোল্লার মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করতে লাগল। এতখানি সহৃদয়তা খোদাতালা ছাড়া আর কে দেখাতে পারে? স্বয়ং খোদাতালাই বুঝি আজ শাজাহান সাহেবের মধ্যে দিয়ে কথা কইছেন। মানুষের অন্তরে তিনি আর একরত্তি ময়লা থাকতে দেবেন না। আজ যেন চালের দানাগুলো চাষীর পোড়া কপালের নিবন্ধ-চুল্লিতেও অতি অনায়াসে সেদ্ধ হয়ে যাবে। রোদবৃষ্টির সমস্যা আর সমস্যাই নয়। নতুন রাষ্ট্রের হৃদয় জুড়ে খোদাতালার শাসন আজ কায়েম হ'ল।

"তা হ'লে তোমার সঙ্গেই যাই চলো, শাজাহান মিঞা। চাল নিয়ে আসব, আর সেই সঙ্গে তোমাদের মজুর-খাটবার খাতায় নাম লিখিয়েও আসব। ভুখরী তোমরা নিয়ে নাও।" ওবাইদ মোল্লা যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। বাধা দিয়ে কমরেড শাজাহান বলল, "একটু দাঁড়াও। তুমি যা বলবে আমরা সবই মেনে নেব। কিন্তু আমাদেরও দু-একটা কথা যদি না রাখো, তা হ'লে তোমার দর্দ

বাঁচবে কি ক'রে? ইসলাম থেকে যদি ইসলাম উঠে যায় তবে মুসলমানের আর থাকবে কি, হাজী সাহেব?"

"তা ঠিক, তা ঠিক—যথার্থ কথা বলেছ তুমি মিঞা সাহেব। আমার এখন কি করতে হবে বলো?"

"বলছি—"কমরেড শাজাহান এগিয়ে এল ওবাইদ মোল্লার হৃদপিণ্ডের কাছে, পিস্তলের নলটা ঠেকিয়ে রাখবার মত দূরত্ব বজায় রেখে বলল, "কলকাতার বড় দফতর থেকে হুকুম এসেছে কাজীপাড়ার ময়দানে বিচার-আদালত খুলতে হবে। তোমরাই সব বিচার করবে ওবাইদ মোল্লা। কিন্তু বিচার করবার আগে বড় বড় দু-একজন আসামীকে ধরতে না পারলে কাজী-পাড়ার ময়দানে আড্ডা জমিয়ে লাভ কি? তা ছাড়া ওসমান গণিকে ধরতে না পারলে আমার যে আর চাকরী থাকে না, মিঞাভাই!" কণ্ঠস্বরে করুণরসের প্লাবন বইয়ে দিল কমরেড শাজাহান। নতুন রাষ্ট্রে কেবল পরীক্ষা-পাশের তালিকা পেশ করলেই চাকরী পাওয়া যায় না। সত্যিকারের কাজ করবার কৃতিত্ব দেখাতে হয়। চাকরী বজায় রাখবার সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে কমরেড শাজাহান আজ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছে। একজন সাধারণ খোঁড়া মানুষকে খুঁজে বার করবার কৃতিত্ব যার নেই, সে কি ক'রে পার্টি-সেক্রেটারী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করল? ওবাইদ মোল্লা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে দেখে, কমরেড শাজাহান দ্বিতীয়বার অনুনয়ের সুরে বলল, "ওসমান গণির ঠিকানা তুমি জানো। ঠিকানাটা আমায় ব'লে দাও, তোমায় আমি ডবল পারমিট দেব।"

উপোস ক'রে ক'রে ওবাইদ মোল্লার মুখের ভেতরে থুথু পর্যন্ত শুকিয়ে উঠেছে। জিভের ওপর দিয়ে একটা কথাও আর গড়িয়ে পড়তে চায় না। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল যে, ইংরেজ আমলেও সুলতানপুরে একবার মন্বন্তর এসেছিল। কিন্তু এবারকার মন্বন্তরের মধ্যে কোথায় যেন একটা নিষ্ঠুর হাত রয়েছে লুকিয়ে। খাদ্যের অভাবটাই সবচেয়ে বড় আতঙ্ক নয়, সেই হাতটাই হচ্ছে সত্যিকারের ভয়। পারমিটখানা কমরেড শাজাহানের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে ওবাইদ মোল্লা বলল, "খোদা তোমার ভাল করুন, পারমিট আমি নিতে পারলুম না। মেহমানকে রক্ষা করা মুসলমানের ধর্ম।"

"শকুনগুলো যখন ঘরের মধ্যে ঢুকে গায়ের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে, তখন তোমার ধর্ম থাকবে কোথায় ?" ভেংচে উঠল কমরেড শাজাহান।

"মরবার পরে তা তো আমি আর দেখতে আসব না। কিন্তু তুমি আমার অন্দরে ঢুকে আজ যা করছ তার জন্যে নালিশ জানাব কার কাছে ? শাজাহান সাহেব, ওসমান গণি সুদ ছাড়া আমাদের কাছে আর কিছুই চাইত না। চড়া হারের সুদ, তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু তোমরা আজ পারমিটের বদলে চাইছ ভূষণ্ডী, পা দিয়ে মাড়িয়ে দিচ্ছ আমার অন্দরমহল, হাতের মুঠোয় টানতে চাইছ মিঞাবিবির খাটপালঙ্ক। বাকী রাখলে কি ? ওসমান গণির চেয়েও বেশি সুদ তোমরা নাও, আমি দেব। তুমি কেবল আমাদের ছেঁড়া মাদুরের মহব্বতটুকু ছেড়ে দাও, মেয়ের বিবির পর্দাটুকু থাক। আমাদের এই ভাঙাঘরের সুখটুকু কেড়ে নিয়ো না, মিঞা সাহেব।"

"ওবাইদ মোল্লা—"

"শাজাহান সাহেব, বড়লোকদের জুলুম তুলে দেওয়ার জন্যে আমাদের তো লোভ দেখালে। তুমি বললে, মানুষ আর মানুষকে শোষণ করতে পারবে না, কিন্তু—"

"ওবাইদ মোল্লা, বক্তৃতা শোনবার সময় আমার নেই। জন্তুরা কখনো মানুষকে শোষণ করতে পারবে না। মানুষ যতদিন মানুষ থাকবে, ততদিন সে শোষণ করবে মানুষকেই। কিন্তু আমরা যখন তোমাদের খাওয়া পরার ভাবনা থেকে মুক্তি দিচ্ছি, তখন তোমার অন্দরমহলে ঢুকবার অধিকার আমাদের থাকবে না কেন ? তর্ক আমি করব না। কিন্তু ওসমান গণির ঠিকানা কি ক'রে বার করতে হয় তার ব্যবস্থা আমি করব।" এই ব'লে কমরেড শাজাহান চ'লে এল মোল্লাবাড়ির বাইরের মহলে। সাইকেলে চেপে বসল সে। মাঠের ঢালুতে এসে সাইকেলটাকে দিল ছেড়ে। গড়িয়ে গড়িয়ে নিচের দিকে নামতে লাগল নতুন সভ্যতার পার্টি-সেক্রেটারী কমরেড শাজাহান।

একটু পরে ওবাইদ মোল্লাও চলে এল বাইরের মহলে। ঢালুর দিকে চেয়ে দেখল, শাজাহান মিঞাকে আর দেখা যাচ্ছে না। সামনের দিকে ধু ধু করছে ভূষণ্ডীর পোড়ামাঠ। বড্ড অসহায় বোধ করতে লাগল ওবাইদ মোল্লা।

ঘরের মেহমানকে আর বোধহয় রক্ষা করা চলবে না। বুড়ো বাদুরটা খিদের জালা আর কতদিন সহ্য করবে? এর চেয়ে শাজাহান মিঞার করেখানাই তার পক্ষে ভাল ছিল। দুবেলা দুটো ভাত জুটতো নিশ্চয়ই। বেইমানী ক'রে সে ধর্ম হারাবার ভয়ে মরি বটে, কিন্তু তারই ঘরের তলায় ওসমান গণি যদি উপোস ক'রে মরে তা হ'লে সে কি ধর্ম বাঁচাতে পারবে? বসিরহাট থেকে কিছু খাবার সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আসতে চেয়েছিল কাল। পয়সার অভাবে যাওয়া হয়ে ওঠে নি। হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়তে ওবাইদ মোল্লা চলে এল রান্নাঘরে, ওসমান গণির কাছে। দরজাটা ভেজান ছিল। ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলতেই ওসমান গণি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "কে? কে?"

"আমি।"

ওসমান গণিকে দেখে আর সহজে চেনা যায় না। একটা ছেঁড়া কাঁথার ওপর গুটিশুটি মেরে শুয়েছিল সে। দূর থেকেই পাঁজরার হাড়গুলো গুনতে পারা যায়। চোয়ালের হাড় দুটো ঘুড়ির কোণার মত চোখা হয়ে বেরিয়ে পড়েছে বাইরের দিকে। আঙুলগুলো পাটখড়ির মত সরু সরু হয়ে উঠেছে। সুদের অঙ্ক কষবার মত আঙুলগুলো হয়তো শক্ত আছে আজো, কিন্তু সুদের টাকা ধ'রে রাখবার জন্যে ওতে আর এক বিন্দু শক্তি নেই।

ঘরে ঢুকতেই ওসমান গণি জিজ্ঞাসা করল, "ও ব্যাটা শাজাহান এসেছিল কেন রে? ধরিয়ে দেবার মতলব নেই তো তোর?"

"না, গণি সাহেব। আমাকে সে পারমিটের লোভ দেখাচ্ছিল। তোমাকে ধরিয়ে দিলে আমার ডবল পারমিট মিলত।"

"ডবল পারমিট! কক্ষনো নিস নি। ঐ হাত দিয়ে ও কোর-আন, হাদিস ছুঁয়ে দিয়েছে।"

"সেই জন্যেই ভাবছি—"

বাধা দিয়ে ওসমান গণি জিজ্ঞাসা করল, "ভাবছিস? তুই আবার ভাবতে শিখলি কবে থেকে ওবাইদ? তুই কি লাল ছোঁড়াদের ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিস না কি?"

"হ'লেই বা তোমার ভয় কি গণি সাহেব? তোমাদের হিসেবে আমরা হলুম

দিয়ে যাক। গরুকে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে ওরা তো আমাদের আর মানুষ করতে পারবে না।"

"যাক! তাই ভাবছি কবে থেকে?"

"তোমাদের আমল থেকে গণি সাহেব। তোমাদের ঋণ শুধতে হবে বড়ো খাঁসাহেব তো আমায় ইস্কুলে পাঠাতে পারলেন না। লাল ছোঁড়াদের দোষ দিয়ো না। যতই ওরা ঠেঙাক, আমাদের আর মানুষ করতে পারবে না। সে যাক। আমি বলছিলুম কি, বসিরহাট থেকে কিছু চাল যোগাড় ক'রে আনি।"

"পারবি?" ভাতের লোভের ওসমান গণি সোজা হয়ে বসল।

"চেষ্টা করব ভাবছি।"

"যা, বেরিয়ে পড় ওবাইদ। যতক্ষণ না ফিরে আসবি, আমি এখানে ব'সে আল্লার কাছে দোয়া মাঙব।"

"কিন্তু পয়সা যে নেই। তোমার সেই সোনার লাঠিটা কোথায় গণি সাহেব?"

"মাটির তলায় পুঁতে রেখেছি।"

"ঠিকানা বলো, নিয়ে আসি।"

"বলিস কি ওবাইদ? ষড়যন্ত্রির রাজত্ব যখন আবার শুরু হবে, তখন আমি টাকা পাব কোথায়? লাল ছোঁড়ারা সবই আমার লুঠ করেছে, এই সোনাটুকুর দিকে তুই কেন নজর দিচ্ছিস?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ওবাইদ মোল্লা চলে এল ঘর থেকে। তর্ক ক'রে কোন লাভ হবে না। লাভ? বাপ দাদারা সারা জীবন ওসমান গণিদের পায়ের তলায় মাথা ঠুকে ঠুকে একটা তামার পয়সা বার করতে পারেনি, আর আজকে সে গিয়েছিল সোনা বার ক'রে আনতে! কিন্তু মাটির তলায় সোনা লুকিয়ে রেখে ওসমান গণির লাভ হবে কি? মানুষের কাজে লাগবার জন্যেই তো সোনার পয়দা হয়েছে। মাটির তলায় মানুষ আর সোনার মধ্যে তো কোন ফারাকই নেই। ভাবতে ভাবতে ওবাইদ মোল্লা পুনর্বার চলে এল বাইরের মহলের বেড়ার ধারে। সেখানে দাঁড়িয়ে সে কি যেন ভাবছিল? ওসমান গণির কথা নয়। ওবাইদ মোল্লা ভাবছিল তার দ্বিতীয় অস্তিত্বের কথা।

দু-মাস আগে যে ভুঁইটার মাঠে একতাল সোনা দেখতে পেয়ে ভেবেছিল, সারা ভুঁইটা জুড়ে এবার ফলবে সোনার ফসল। কিন্তু ভুঁইটার সেই এক তাল সোনা গত ক-দিনের মধ্যে ক'রে ক'রে এক কাচ্চা ধুলোয় এসে পরিণত হয়েছে। এক মুঠো ধুলোর মত তাও বোধহয় উড়ে যেতে আর বেশি দিন সময় লাগবে না। বেড়ার ও-পাশ থেকে মেহের বিবি জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাচ্ছ?"

"হামুর কাছে। সেও আমার মেহ্‌মান। মেহের, তোর কাছে কোন লুকনো দুধের হাঁড়ি নেই রে?" ওবাইদ মোল্লার দৃষ্টিতে ফুটে উঠল পাওয়ার প্রত্যাশা। কথা শুনে বিবি মেহেরউন্নিসা মাথা নিচু ক'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। কি জবাব দেবে সে? নিজের দেহটাকে নিঙড়ে নিঙড়ে যদি সে আজ এক ফোঁটা দুধেরও সন্ধান পেত, তা হ'লে মেহের বিবি ওবাইদ মোল্লাকে শুধু হাতে ফিরিয়ে দিত না।

"বিশ্বাস রাখিস মেহের, খোদার ওপর বিশ্বাস রাখিস।" এই ব'লে ওবাইদ মোল্লা নেমে এল মাঠের ঢালুতে। বিবি মেহেরউন্নিসা বেড়া ধ'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। দেখল চেয়ে, জোয়ানমর্দ স্বামী তার হঠাৎ বুড়ো হয়ে গেছে। ঢালুর টানে সে যেন হুড়মুড় ক'রে গড়িয়ে পড়ছে, দুর্বল পা দিয়ে গতির টান রুখতে পারছে না। ওবাইদ মোল্লা চলেছে তার বাচ্চা অতিথির কাছে। ওবাইদ চাচার দুধের বালতির জন্যে অপেক্ষা করছে হামু।

দু-মাইলের পথ ওবাইদ মোল্লার কাছে আজ খুবই দীর্ঘ মনে হ'তে লাগল। প্রতি পদক্ষেপে ভুঁইটার দূরত্ব যেন বেড়েই যাচ্ছে। পৌঁছুতে পারবে তো? দুনিয়ার রাস্তায় কত মানুষই তো হাঁটছে। কিন্তু সবাই কি পৌঁছুতে পারছে তাদের গন্তব্যে? ক-জন মানুষই বা তাদের গন্তব্যের ঠিকানা জানে। জানলেই বা কি? দুনিয়ার ভুঁইটাতে মানুষ তো চিরদিনের জন্যে ঘর বাঁধতে আসে নি। ওবাইদ মোল্লার মনে অশান্তির ঝড় বইতে লাগল। সুলতানপুরের কোথাও যেন মানুষ পাওয়া যাচ্ছে না। এত বড় একটা অজগর দুনিয়ায় সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ল না কি? মানুষের মজলুম

শাজাহান রিক্সা ঘোরাতে পারবে না। এ-বছরের পারমিট মোবারকালীর হাতে।

মাইল খানেক হাঁটবার পরে ওবাইদ মোল্লা দেখতে পেল পূব দিক থেকে অনেকগুলো সাইকেল আসছে। এতদূর থেকে মানুষগুলোকে চেনা যাচ্ছে না। মাথায় যেন প্রত্যেকেরই লাল টুপী আছে। ঘাড়ের ওপর দিয়ে কি যেন সব তাদের উঁচু হয়ে আছে। বন্দুক না কি? সারা আসমান জুড়ে ধুলো উড়ছে। দিনের বেলাতেই অন্ধকার নেমে আসছে ব'লে মনে হ'ল ওর। পথ হাঁটতে হাঁটতে ওবাইদ মোল্লার মনে পড়ল কোর-আন-হাদিসের কথা। মনে পড়ল, এমনই এক অন্ধকার যুগে হেরা পর্বতের গুহায় কোর-আনের ওহি নাজেল হয়েছিল। মাথা নাড়তে নাড়তে ওবাইদ মোল্লা সবেগে আবৃত্তি করতে লাগল : আইয়ামে জাহেলিয়াত, আইয়ামে জাহেলিয়াত……আবার বুঝি দুনিয়ার বুকে অন্ধকার-যুগ ফিরে আসছে!

ঘুম থেকে উঠে হামুকে কোলে নিয়ে অবনী মণ্ডল চ'লে এল মাঠের দিকে। হামুর দিকে চাইতে গিয়ে চোখ ফেটে ওর জল আসছিল। গায়ের শাদা চামড়া তামাটে হ'য়ে উঠেছে। ইচ্ছে করলে অবনী মণ্ডল দু-আঙুল দিয়ে ছ-মাসের বাচ্চাটাকে ইঁদুরের মত আলগা করে দোলাতে দোলাতে সারা সুলতানপুরটাই প্রদক্ষিণ ক'রে আসতে পারে। ছকুদিদি বলে, হামু শক্ত হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে নতুন বিপ্লবের পুরোহিত হবার জন্তে। কিন্তু ছকুদিদির কথা শুনলে বাচ্চাটাকে আর বেশি দিন বাঁচিয়ে রাখা চলবে না। কি করবে অবনী মণ্ডল? পালিয়ে যাবে না কি? হামুকে নিয়ে বগুড়া জেলার দিকে পথ ধরলে কেমন হয়? গতকাল সে পালিয়ে যাবার পথ খুঁজতে গিয়েছিল। হিন্দুস্থানের সীমান্ত পর্যন্ত গিয়ে সে উঁকি দিয়ে দেখে এসেছে পালাবার পথ আছে কি না। পথ সে পায় নি। কাঁটা-তার দিয়ে সীমান্ত ভাগ করা রয়েছে। কাঁটা তারের দু-দিকেই কড়া পাহারা। পৃথিবীটার এমন হাল হয়েছে কেন? দু-মাইল রাস্তা হাঁটতে গেলে দশবার হোঁচট খেয়ে প'ড়ে যেতে হয়! একই দেশের মধ্যে আবার খণ্ড খণ্ড দেশ। কাঁটা-তার দিয়ে প্রতিটি খণ্ড আলাদা ক'রে রাখা

হয়েছে। এমন পৃথিবীতে মানুষ কি ক'রে মানুষের মত বাস করবে, ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়ে উঠল অবনী মণ্ডল।

হামুকে কোলে নিয়ে অবনী মণ্ডল এসে দাঁড়াল তারই জমির পাশে। কচি কচি ধানের চারাগুলো শুয়ে পড়েছে মাঠের ওপর। ফল আসবার আগে কে এবং কারা যে চারাগুলোকে কেটে দিয়ে গেছে অবনী মণ্ডল তা জানে না। ধান গাছের গোড়ায় কাস্তে মেরে খতম ক'রে দিয়ে গেছে ওর ফসলের সবুজ স্বপ্ন। মাথা মুড়নো বিশ তিরিশটা ধানগাছের চারা সে তুলে নিয়ে এল। গোড়ার দিকটা টিপে টিপে রস বার করবার চেষ্টা করতে লাগল অবনী। বাচ্চা-হামু তাই দেখতে পেয়ে জিভটা লম্বা ক'রে নাড়াতে লাগল রসের প্রত্যাশায়। ঘাসের মত ভেজাভেজা ধানগাছের গোড়াগুলো হামুর জিভের ডগায় ঘসতে ঘসতে অবনী মণ্ডল ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে লাগল। হুঃ, হুকুদিদি বলে, হামু না কি শক্ত হচ্ছে!

বিছানায় শুয়ে বসন্ত ভাবছিল, এমন একটা মাথা-মুড়নো পৃথিবীতে আর কিছুই করবার নেই। নিরিবিলিতে ঘাসপাতা খেয়ে জীবনযাপন করবার সুবিধে পর্যন্ত লোপ পেয়েছে। বিলুপ্ত পৃথিবীর ল এ্যাণ্ড অর্ডার ধ'রে রেখে সে তো কোন কিছুই বাঁচিয়ে রাখতে পারছে না। সারা সুলতানপুর ঘুরে ঘুরে হামুর জন্যে সে পারে নি এক ছটাক দুধ যোগাড় করতে। হামুকে আর মানুষের বাচ্চা ব'লে চেনাই যায় না! বসন্ত উঠে বসল। হুকু জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাচ্ছ?"

"সুলতানপুরে।"

"বসন্ত, বিদ্রোহী-চাষীদের গুপ্ত মিটিং-এ তুমি যোগ দিচ্ছ আমি তা জানি। তুমি ওদের নেতৃত্ব করছ সে খবরও আমি পেয়েছি। কিন্তু এতবড় একটা মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে দু-দশজন মূর্খ চাষীকে নিয়ে তুমি কোন্ দেশ দখল করতে যাচ্ছ?"

"দেশ দখল করতে যাচ্ছি না, যাচ্ছি হামুর জন্যে দুধ চুরি করতে।"

"পাপ হবে না, বসন্ত?"

"হামু মরে গেলে আমার ধর্ম বাঁচবে না। হামুর জন্যে আমি আজ ডাকাতিও করতে পারি।"

"অথচ আমাদের জনসাধারণের জন্যে থাকলে না। তোমার চরিত্রের বাহির ও শৃঙ্খলার বিদ্রোহ উচ্ছৃঙ্খলতা আনছে। তোমার নীতির নিয়ম আমাদের বিদেশী-সভ্যতার সীমান্ত দিয়ে ঘোরাফেরা করল, কিন্তু সীমান্ত অতিক্রম করতে পারল না একবারও। আমি জানি, এবার তুমি আমার কাছ থেকে স'রে যাবার জন্যে নতুন রাস্তা ধরেছ। তুমি ধরা পড়তে চাইছ শাজাহানের হাতে। কয়েদখানার ব'সে কোন্ যুদ্ধ জিতবে তুমি? কোন্ শিশুর জন্যে যুদ্ধ?"

"মানবশিশুর জন্যে।" সংক্ষিপ্ত জবাবটা ছুছুর সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বসন্ত চলে এল ঘরের বাইরে। ছুছুও এল পেছনে পেছনে। কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না সে। সারা অন্তর জুড়ে কান্নার ঢেউ উঠেছে আজ। ছুছু বুঝতে পারছে, বসন্তকে সে আর ধরে রাখতে পারবে না। বিনয়প্রকাশের বিশ্বরাষ্ট্রের চেয়ে বসন্তর রাষ্ট্র বৃহত্তর। বিশ্বরাষ্ট্রের আয়তন গণনায় ধরা যায়, বসন্তর রাষ্ট্র গণনাকে অতিক্রম করেছে। ছুছু ব'সে ব'সে দেখতে লাগল, বসন্ত চ'লে যাচ্ছে। ভূবণ্ডীর মাটিতে অভাবের গর্তটা যেন ক্রমশই বড় হয়ে উঠতে লাগল। দুটো বিপরীতমুখী সভ্যতার সমন্বয়ের স্বপ্ন দেখেছিল ছুছু। বসন্তকে সে হারাতে চায় নি। হারাতে চায় নি বিনয়প্রকাশকেও। বিনয়প্রকাশ জানে, মানুষের মধ্যেই জীবন-সমস্যার শুরু ও শেষ। বসন্ত জানে, মানুষ-উত্তীর্ণ মহাকাশে জীবনের বিস্তৃতি রহস্যাবৃত। দুটো মানুষকে ছেঁটেকেটে একটা মানুষে দাঁড় করবার পরিকল্পনা ছিল ওর। ছুছুর মনের বিস্তৃতি যত বড়ই হোক, দুই নায়কের স্থান সেখানে নেই। অতএব, সমস্যা ও রহস্যের মধ্যে সমন্বয় খুঁজছিল ছুছু। প্রবলের ও নিষ্ক্রিয় সমন্বয়। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে ভূবণ্ডীর মাঠ থেকে সব কিছু সম্ভাবনা অন্তর্হিত হয়ে গেল কিছু কালের জন্যে। সম্ভাবনাকে সত্য ক'রে তুলবার দায়িত্ব নেবে বিপ্লবোত্তর ভারতবর্ষের নতুন দার্শনিক। এইটেই হবে তার কাছে মহত্তম কাজ। বোধহয় হামুর জন্যেই সে এই মহত্তম কাজটা রেখে যাচ্ছে। এতবড় দায়িত্ব হামু নিতে পারবে কি? পারলেও, ছুছুর জীবনে তা আর দেখবার সুযোগ আসবে না।

সপ্তম ভাগ

সাতদিন কলকাতায় ছিলুম না। ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করতে গিয়েছিলুম। বিমান-ঘাঁটি থেকে সোজা চ'লে এলুম কুইনস পার্কে। বাড়ি পৌঁছে শুনলুম, রমলা আর লীলা চ'লে গেছে তাদের মার কাছে। ওল্গা পিসিমা নিজেই এসেছিলেন নেবার জন্যে।

দু-তলার ঘরগুলো সব খালি প'ড়ে রয়েছে। প্রত্যেকটা ঘর আমি ভাল ক'রে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলুম। খুঁজতে লাগলুম, কোথাও কেউ আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে কি না। দেহ-রক্ষী কমরেড ঘোষও আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘরগুলো দেখছিল। একটু পরে সে বলল, "আমরা তো চব্বিশ ঘণ্টাই চোখ খুলে রেখেছি। বুর্জোয়া শত্রু তো দূরের কথা, বুর্জোয়া ভূত পর্যন্ত এখানে ঢুকতে পারবে না। আপনি এবার একটু বিশ্রাম করুন।"

আসবাবগুলোতে হাত বুলতে বুলতে বললুম, "ভূতটুতের জন্যে আমার কোন ভয় নেই কমরেড।"

"তবে?"

"ভাবছিলুম, বাবার জন্যে মা যেমন অপেক্ষা ক'রে থাকতেন, তেমনি আমার জন্যেও কেউ অপেক্ষা করছে কি না। ঘরের আসবাবগুলোতে প্রাণ নেই, থাকলে একটু নড়েচড়ে উঠত।"

"আমি কমরেড রুক্মিণীকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" সামরিক কায়দায় স্যালুট ক'রে কমরেড ঘোষও স'রে পড়ল।

রমলা আর লীলার ঘরে গিয়ে দেখলুম, ওরা আমার জন্যে কিছুই রেখে যায় নি। ভুল ক'রে ফেলে যায় নি এক পাটি জুতোও। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে ঘর। ওদের এক ফোঁটা চোখের জলও মেজেতে প'ড়ে নেই, বড্ড বেশি বৈজ্ঞানিক পরিচ্ছন্নতায় ঘরটা যেন এক নম্বর সিমেন্টের কৃতিত্ব প্রকাশ

রয়েছে। প্রাণের স্পর্শ কোথাও নেই। রমলা ও শীলার বোধহয় কৃতজ্ঞতা বোধও নেই। থাকলে, ঘরটাকে এলোমেলো ক'রে রেখে যায় নি কেন? ফেলে যায় নি কেন দু-একখানা জামাকাপড়? ধ'রে রাখবার মত আমি তো কিছুই পেলুম না। মেয়ে দুটো যেন হুইলস পার্কের হোটেলে এসেছিল রাত কাটাতে! 'বাপুরা' ব'লে ঐ শীলাটা আমার কোলে এসে লাফিয়ে পড়ত। আমার দশ বিশটা জামায় শীলার নোংরা পায়ের দাগ বোধহয় এখনো আছে। তিন তলায় এসে আমি সত্যি সত্যি আলমারী থেকে আমার কাপড়চোপড় সব টেনে টেনে বার ক'রে ফেললুম। তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজতে লাগলুম শীলার একটা পায়ের দাগ। একটা চিহ্নকে সামনে রেখে কোটি কোটি হিন্দু, মুসলমান আর খৃষ্ট ভক্তরা কাটিয়ে দেয় সারাটা জীবন। একটা সামান্য চিহ্নের মূল্যবোধ আজ যেন জগতের সব কিছু মূল্যকে ছাপিয়ে যেতে চাইছে! ব্যর্থ অভিমানে আমি আমার নিজের বুকে আঁচড় কাটতে লাগলুম। একটা যে-কোন রকমের দাগ থাকলেই আমি বোধহয় বাকী জীবনটা কাটিয়ে যেতে পারতুম। কিন্তু যাবার আগে রমলা আমার জামাকাপড়গুলো সব ধুইয়ে রেখে গেছে। পায়ের একটা নোংরা দাগ পর্যন্ত ওরা রেখে যায় নি!

হঠাৎ যেন আমার পেছনে হাত তালির আওয়াজ পেলুম। লক্ষ লক্ষ লোকের হাততালি। ছুটে এলুম অন্ধকার ছাদে। মনে হ'ল, ময়দান ভর্তি লোক। কমরেড চৌধুরীর বক্তৃতা শুনে কোটি হাতে তালি বেজে উঠেছে। আমার ইস্পাতের বুকে কোন প্রতিধ্বনি উঠল না, আমি কেবল বক্তৃতা দিয়েই যাচ্ছি। এ হাততালি কেন? ইস্পাতের বুকে আঁচড় কাটছি দেখে ওরা বোধহয় হাতের চেটোয় বিদ্রুপের আওয়াজ তুলেছে আজ! ছাদের কার্নিশে বুক ঠেকিয়ে চেয়ে রইলুম সামনের দিকে। এখান থেকে গোয়াবাগান অনেক দূর। গজ কিংবা মাইলের মাপ দিয়ে গোয়াবাগানের দূরত্ব আর হিসেব করা যাবে না। গাছের কাঁটা-শেকড় থেকে সব চেয়ে উঁচুতে যে-পাতাটা চেয়ে রয়েছে আকাশের দিকে, তার দূরত্ব গজের মাপে ধরা যায় না। এ-দূরত্বের মধ্যে রয়েছে মৃত্যুর ব্যবধান।

মনে হ'ল, একটা প্রকাণ্ড সার্চলাইটের আলো এসে পড়েছে হুইলস পার্কের রাস্তায়। আমি ঝুঁকে দাঁড়ালুম কার্নিশের ওপর। সার্চলাইটের আলোয়

ভেসে উঠল এক নূতন জগৎ। কালো আলখিল্লা প'রে কে যায় ঐ? অনীতা নয় তো? হ্যাঁ, অনীতাই বটে। মুখের মৃদু হাসি এখনো ম'রে যায় নি। দেহটা খুবই শীর্ণ হয়ে পড়েছে। আলখিল্লাটা খুলে ফেললে হাড়গুলো গুনে গোনা যেত। ফিরে আয় বোন আমাদের স্বর্গে। এখানে অনেক খাদ্য। হাড়ের জালা নিয়ে এ কোথায় তুই ঘুরে বেড়াচ্ছিস, অনীতা? তোর সঙ্গে আমাদের কোন শর্ত থাকবে না, রেশনকার্ড দেব। এ কংগ্রেসী আমলের রেশনকার্ড নয় বোন, এর মধ্যে রয়েছে রাজনীতি, দর্শন ও অর্থবিজ্ঞান। খ্রীষ্টের পেছনে তো দু-হাজার বছর ধ'রে ঘুরে মরছিস, কি পেলি? এমন দুর্লভ রেশন কার্ড যোগাড় করতে পারলি একখানা? আমরা মাত্র পঁয়ত্রিশ বছরের সাধনায় রেশন কার্ডের রহস্য হাতের মুঠোয় নিয়ে এলাম। রহস্যটা জানিস বোন? ডায়লেকটিক্যাল জড়বাদ।

আমার গলার আওয়াজ শুনে অনীতা পেছন দিকে ফিরে চাইল। দেখল আমাকে। অনীতা বলল, "তোমার ঘরে তো অনেক খাদ্য, তবে কেন ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে চেয়ে আছ? আমাদের জগতে আসবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছ, না দাদা?"

"ব্যগ্র? তা উঠেছি বৈ কি! তোদের জগৎটা জয় করতে না পারলে বিশ্বরাষ্ট্র গ'ড়ে তুলতে পারছি না, অনি।" আমার কথা শুনে অনীতার মৃদুহাসি মৃদুতর হ'ল। হাসির মধ্যেও ওদের কী সংযম!

জিজ্ঞাসা করলুম, "হাতে ওটা কি রে, অনি?"

"আজকের রুটি।" জবাব দিল অনীতা।

"তোদের রেশন কার্ড নেই?"

"না।"

"বলিস কি, কাল কি খাবি?"

"আজকের ঝামেলাই অনেক—"

বাধা দিয়ে আমি বললুম, "আমাদের এখানে কোন ঝামেলা নেই। শস্যের প্রত্যেকটা দানা গোনা আছে। তুই যদি ফিরে আসিস, তোকেও একটা রেশন কার্ড দেব।"

"দরকার হবে না। আমাদের এখানে যিনি গড়নকীর জন্য খাবার যোগাড় ক'রে দিচ্ছেন, তিনিই জানেন আমরা কাল কি খাব।"

"আমাদের ইকনমিক্স্ লেকচর নয়। কারো খামখেয়ালির ওপর আমরা নির্ভর করতে পারি নে।"

"আমরা পারি।" বলল অনীতা।

"সেই জন্যেই চেহারা তোর এত খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু...... কিন্তু অনীতা, বলতে পারিস্ কেমন ক'রে তোদের জগৎ-টাকে জয় করতে পারি?"

'ভালবাসা দিয়ে। এক কাজ করলে কেমন হয়, দাদা? তুমি চ'লে এস না আমাদের এখানে?"

কার্ণিশের ওপর আরও একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বললুম, "অপরাধ আমার ক্ষমা করতে পারবি বোন?"

"ক্ষমা করতে না পারলে, তোমার মঙ্গলের জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি কি ক'রে?"

"করিস!! আমার জন্যে আজ আর কেউ কিছু করে না, অনীতা। ভাবছি একটা কুকুর পুষব। বাড়ি ফিরে এলে কুকুরটা লাফিয়ে লাফিয়ে কোলে উঠবার চেষ্টা করবে। কিছু একটা ধরতে না পারলে, আমি বোধহয় আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।"

"তা হ'লে চলে এস এখানে। এমন জিনিস ধরিয়ে দেব যে, জীবনে আর প'ড়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না।"

"জিনিষটা কি রে?" কান খাড়া ক'রে রাখলুম অনীতার দিকে। সার্চ-লাইটের আলোটা কাঁপতে লাগল। ক্রমশই কমে আসতে লাগল আলোর তেজ। কোথা থেকে কতগুলো ভিক্ষুক এসে হাত পাতল অনীতার সামনে। ক্ষীণকণ্ঠে ওরা আবেদন করতে লাগল, "একটু ফেন দাও গো, ফেন দাও।" অনীতা ওর রোজের রুটি ভাগ ক'রে দিল সবাইকে।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "তোদের ওখানেও মন্বন্তর শুরু হয়েছে না কি? ওরা কারা?"

"তোমরা যাদের বুর্জোয়া ব'লে তাড়িয়ে দিলে তারা আর যাবে কোথায়?

তুমিও চ'লে এস বাবা। কাউকে আমরা ফেলব না, কাউকে আমরা তাড়িয়েও দেব না।"

"কি ক'রে আসব? আমার আসা-যাওয়ার রাস্তা সব আগে থেকেই ছককাটা থাকে। আমি ভারতরাষ্ট্রের সর্বশক্তিমান কি না। তাই আমার নিজের কোন স্বাধীনতা নেই। তোদের ওখানে যাওয়ার জন্যে আমি বোধহয় অনেক দিন থেকেই অপেক্ষা ক'রে আছি। অনীতা—"

সার্চলাইটের আলোটা ক্ষীণ হ'য়ে এল। আমি যেন দেখলুম, কে একজন লোক ছুটতে ছুটতে অনীতার দিকে আসছে। খালি পা, খালি গা—লোকটা অত্যন্ত শীর্ণকায়। গামছার মত ক'রে এক টুকরো চট পেঁচিয়ে রেখেছে কোমরের চারদিকে। ফরসা রঙ রোদে পুড়ে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। লোকটা অনীতার দিকেই আসছিল। কিন্তু কাঁটা-তারের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে প'ড়ে গেল মাটিতে। লোকটা বোধহয় কয়েদী। মাটি থেকে উঠে সে চীৎকার ক'রে বলতে লাগল, "আমি রুটি চাই নে, ভাত চাই নে, এমন কি এক গণ্ডূষ ফেনও চাই নে—"

পেছন থেকে অন্য একজন দাড়িওয়ালা কয়েদী এমন সময় বিকট অট্টহাস্য ক'রে উঠল। হাসতে হাসতে সে জিজ্ঞাসা করল, "কি চাও তুমি?"

"আমি একটু ভালবাসার উত্তাপ চাই। আমি আমার সন্তানদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে চাই, বিশু। ঐ, ঐ অনীতা—"

কুইনসপার্কের রাস্তায় অন্ধকার। সার্চলাইট নেই। অতিক্লান্ত পথচারীর মত আমি থেমে থেমে ডাকতে লাগলুম, "বাবা! বাবা!!"

"বাবা কোথায়?" পেছন থেকে প্রশ্ন করল রুক্মিণী।

"বাবাকে যেন দেখলুম কুইনস পার্কের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে!"

"ওটা ইল্যুশান। বিনয়প্রকাশ এসেছে তোমার সঙ্গে দেখা করতে।"

"রাত এখন ক'টা রুক্মিণী?"

"প্রায় দশটা। জরুরী দরকার নিশ্চয়ই, নইলে সে তোমার বিশ্রামের সময় আসত না।"

আমি দোতলায় নেমে এলুম।

বিনয়প্রকাশ একাই বসেছিল। আমি ঘরে ঢুকতেই সে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ ক'রে দিল। আজ যেন সে একটু বেশি সতর্কতা অবলম্বন করছে ব'লে মনে হ'ল আমার।

বিনয়প্রকাশ বলল, "বাংলাদেশের প্রতিরোধ আন্দোলন ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। এ-আন্দোলনের পেছনে কেবল বিগতদিনের বুর্জোয়ারাই নেই। কৃষক ও শ্রমিকরাও বিক্ষোভ প্রকাশ করছে।"

"কেন ?"

"দেশকে জবরদস্তি শিল্পায়িত করার নীতি ওরা মানতে চাইছে না।"

"ওরা কারা ?"

"জনসাধারণ।"

"বিনয়, আমরা তো জনসাধারণের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করি নি ? পরিকল্পনা আমাদেরও নয়। বুর্জোয়া বৈজ্ঞানিকদের জবরদস্তি শিল্পায়িত করার নীতি আমরা গ্রহণ করেছি। তা ছাড়া, আমাদের অর্থনীতির মধ্যে কেবলমাত্র একটাই নীতি আছে। সেটা হচ্ছে দশ বছরের কাজ ছ-মাসের মধ্যে শেষ করা। দেশের মঙ্গলের জন্যেই তো এ-নীতি আমরা গ্রহণ করেছি। তবে কেন প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়েছে ? আগামী দশ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষে যেন কোন রকম আন্দোলন না হয় তার ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে। প্রতিটি লোকের মনে যদি আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারো তাহলেই কাজ হবে।"

বিনয়প্রকাশ চুপ ক'রে বসেছিল। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলুম, সে তার আসল বক্তব্য এখনো প্রকাশ করে নি। কি যেন ভাবছিল ও নিজের মনে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্যে ভয় পাচ্ছো না কি ?"

"ভয় ? না, ভয় পাবো কেন ?"

"যারা আন্দোলনের নেতৃত্ব করছে তাদের কি এখনো ধরতে পারো নি ?"

"দু-এক জন বাকী আছে। আজ রাত্রে তারাও ধরা পড়বে। ধরবার জন্যে আমাদের রেড-গার্ডরা এতক্ষণে রওনা হয়ে গেছে। কিন্তু সেসব কথা বলবার জন্যে আমি এখানে আসি নি।"

"তবে ?"

"আমি আপনাকে বলতে এসেছিলাম যে, অনীতা আজ রাত্রেই কলকাতায় এসে পৌঁছুবে।" এই ব'লে বিনয়প্রকাশ উঠল। আর কোন কথা বলবার প্রয়োজন বোধ করল না সে। ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল দরজার দিকে। ঘরের আবহাওয়া রহস্যাবৃত হয়ে উঠল। আমি পেছন থেকে ডাকলুম, "বিনয়—" আমার ডাক শুনে বিনয়প্রকাশ দরজার কাছেই দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করলুম, "একটা কথার জবাব দেবে ?"

"বলুন।"

"অনীতার মত একজন খৃষ্টভক্তকে তুমি বিয়ে করছ কেন ?"

"প্রমাণ করবার জন্যে যে জীবন ও মৃত্যুর দুই সীমানার বাইরে আর কোন রহস্য নেই।"

"গত কয়েক শো বছর ধ'রে তেমন প্রমাণের চেষ্টা তো কম হয় নি, কিন্তু কই মানুষ তো তা স্বীকার করল না ? কোন কিছু একটা প্রমাণ করবার জন্যে অনীতাকে বিয়ে করা উচিত হবে না। আমি নিজে এ-বিয়ে অনুমোদন করব না।"

একটু হেসে বিনয়প্রকাশ বলল, "পার্টির অনুমোদন আমি পেয়েছি।"

"কিন্তু—" অসহায় সুর ভেসে উঠল আমার গলায়, "কিন্তু হুহুর কি হবে ?"

"হুহুর ব্যবস্থা করবে পিপলস্-কোর্ট।" বিনয়প্রকাশের কথা কয়টা কুইনস পার্কের বাড়িতে ক্রমাগত প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল। প্রতিধ্বনিটা যেন ক্রমশই চীৎকারের মত শোনাতে লাগল। আমি কান বন্ধ ক'রে রইলুম কয়েক মুহূর্ত। বিনয়প্রকাশ চ'লে যাচ্ছিল দেখে আমি এগিয়ে গেলুম দরজার কাছে। জিজ্ঞাসা করলুম, "হুহু কি অপরাধ করেছে, বিনয় ?"

সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে সে জবাব দিল, "প্রতিরোধ-আন্দোলনের নেতৃত্ব করছে গোয়াবাগানের হুহু চৌধুরী।" বিনয়প্রকাশ আর অপেক্ষা করল না। দুজন দেহ-রক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে সে বেরিয়ে গেল কুইনস পার্কের বাড়ি থেকে। কয়েক মিনিট পর্যন্ত আমি ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হ'ল, একটা বিষাক্ত-বৃত্ত ঘুরতে ঘুরতে আমাকে ঘিরে

কেবল এক নিষেধের মধ্যে। বৃত্তটিকে ভেদ করবার চেষ্টা করতে লাগলুম আমি। এ-বৃত্তটি আমারই তৈরি। তৈরি করেছি মার্কসবাদের ফরমূলা দিয়ে। গোটা মানুষটাকে কেটে ছেঁটে অঙ্কের হিসেবের মত একটা ফরমূলায় রূপান্তরিত করতে গিয়ে আজ দেখছি আমি নিজেই সেই বৃত্তটির মধ্যে ধরা প'ড়ে গেছি। আজকের এই বিশেষ মুহূর্তটির বুকের ওপরে যেন একটা সর্বকালীন সত্য জেগে উঠল আমারই জ্ঞানবিজ্ঞানের পাহাড়টিকে ধূলিসাৎ করবার জন্যে। আমি দেখতে পেলুম, কোন ফরমূলার ছক দিয়ে মানুষকে বেঁধে ফেলা যাচ্ছে না। মানুষের সমস্যা কেবল অর্থনৈতিক নয়। প্রতিটি সমস্যা ও জীবনের মধ্যে কারণিক সম্বন্ধ রয়েছে। ফরমূলার ছক দিয়ে সমস্যাসমাধানের ব্যবস্থাগুলো আজ আমায় যেন উপহাসের পাত্র ক'রে তুলেছে।

রুক্মিণী আমার পাশে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করল, "এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছ? বুর্জোয়া-ভূত না কি?"

"ভূত নয়, দেখছি বিনয়প্রকাশের ছায়া।"

"ভয় পাচ্ছো না কি?"

"ভয়? তা একটু পাচ্ছি বৈ কি। ছায়ার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করব কি করে তাই ভাবছি। বড্ড অসহায় বোধ করছি রুক্মিণী।"

"ভারতরাষ্ট্রের সর্বশক্তিমানের মুখ থেকে অসহায় কথাটা উচ্চারিত হওয়া খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার সন্দেহ নেই। তোমাদের এই ট্র্যাজিডির মূল কোথায় জানো? একটা গল্প মনে পড়ল, শুনবে?"

"আশা করি তোমার সেই কোন্ এক কাল্পনিক ভূষণ্ডীর গল্প নয়?"

"হ'লই বা ভূষণ্ডীর গল্প, তাতে তোমার আপত্তি কেন?"

"না, আমি আর আপত্তি করব না, তুমি বলো।"

"তা হ'লে চলো, খাবার ঘরে গিয়ে বসি। তোমার লালপ্রহরীদের জুতোর আওয়াজ যেন গোটা শতাব্দীটার বুকে আজ লুটোপুটি খাচ্ছে! ওদের ছুটি দিয়ে দাও না আজ।"

"ছুটি দেবার মালিক আমি নই, বিনয়প্রকাশ। কিন্তু ওদের তুমি ছুটি দিতে চাইছ কেন রুক্মিণী?"

"অন্ধকার উন্মোচনের সময় এসেছে, কবি এবার সত্যের আলো দেখতে পাবেন—" কথাটা শেষ না ক'রে রুক্মিণী হাঁটতে লাগল খাবার ঘরের দিকে। ইচ্ছে ক'রেই ও যেন আমার দিক থেকে মুখটা ঘুরিয়ে নিল তাড়াতাড়ি। ওর চোখের ভাষায় আমি নতুন সংবাদের আভাস পেয়েছি। কেবল একটা সাধারণ গল্প বলার আগ্রহ ছিল না রুক্মিণীর আনত চোখে।

খাবার ঘরের টেবিলে এসে বসলুম আমি। পূবদিকের খোলা জানলা দিয়ে রুক্মিণী একবার দেখে এল বাইরের কটকটা। তারপরে আমার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করল, "গল্পটা শুনবে?"

"শুনব। কিন্তু জানলা দিয়ে তুমি কি দেখে এলে?"

"আকাশ। এমন কালো আকাশ আমি কোনদিনও দেখি নি। আজ কেবল অমাবস্যা নয়, সবচেয়ে কালো এবং কুটিল অমাবস্যা ভারতবর্ষের আকাশকে পঙ্কিল ক'রে তুলেছে। তারাগুলো মিট মিট করছে বটে, কিন্তু তাতে আলো নেই। প্রতিটি তারার বুকে ভেসে উঠেছে কতগুলো চেনা মুখ।"

"বলো কি! মুখগুলো কাদের রুক্মিণী?"

"হাজার হাজার রাজনীতিজ্ঞদের। এরা কারা? বিংশ শতাব্দীটাকে যারা নরকের মত কুৎসিত ক'রে তুলেছে। এরা সবাই আধুনিক রাজনীতিজ্ঞ নয়, এদের মধ্যে অনেকেই আজ উপস্থিত হয়েছে বিগত শতাব্দীর অন্ধকার থেকে। সবার মুখেই সেই এক বুলি: মানুষের দুঃখ আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি।" বাধা দিয়ে বললুম, "এটা তো গল্প নয় রুক্মিণী?"

আমার পাশেই চেয়ারটায় ব'সে প'ড়ে রুক্মিণী বলল, "আমি একটি মেয়েকে চিনতুম। ছেলেবেলা থেকে তার বাবা মেয়েটিকে এমন শিক্ষা দিতে লাগলেন যে, যার মধ্যে বিয়ের প্রস্তুতি ছাড়া আর কিছুই শিখবার রইল না। লেখাপড়া শেখালেন মেপে মেপে। দু-চারখানা প্রেমের উপন্যাস পড়বার মত বিদ্যা হ'ল তার। গান শিখল, তাও গুনে গুনে পাঁচখানা। সেতার বাজাতে পারত মেয়েটি, কিন্তু তিনটে গৎ ছিল ওর সেতার বিদ্যার শেষ সীমা। হেঁসেলেও ঢুকেছিল মেয়েটি। বালচচ্চড়ি আর লাউ-চিংড়ির মত দু-চারটে রান্না ওর হাতে ভালই লাগত। মালাই-কারী কিংবা দো-পেঁয়াজী রাঁধবার কৌশল ওর শিক্ষার

জানিবার থাকবার কথা নয়। চৌদ্দ বছর বয়স থেকে মেয়েটি ফিরে পরীক্ষা দিতে লাগল। কথামত সেই পাঁচটি গান, তিনটে গৎ ও কয়েকখানা উপন্যাস পড়া বিদ্যার মহড়া দিতে দিতে মেয়েটির বয়স হ'ল কুড়ি। এই সময় শিক্ষাদাতা ওর বাবা হঠাৎ হৃদ-রোগে মারা গেলেন। মেয়েটি এবার বাস্তব জীবনের মুখোমুখী হ'য়ে দাঁড়াতে বাধ্য হ'ল। যখন যা করতে যাচ্ছে তখনই সে তার পিতৃদত্ত শিক্ষার বাইরে এক পা-ও হাঁটতে পারছে না, যেন বহু ধরবার জন্যে সে আজও ব'সে আছে সেতার হাতে নিয়ে! লোক দেখলেই গৎ বাজাতে আরম্ভ করে, লেখাপড়ার কথা উঠলেই উপন্যাস ক'খানা গড়গড় ক'রে মুখস্থ ব'লে যায়! এই অসহায়তার মূল তুমি কোথায় খুঁজবে? এত বড় একটা ট্র্যাজিডির জন্যে দায়ী কি তার বাবা নন? তাঁর শিক্ষার প্রকৃতি রয়েছে মেয়েটির পুরো গঠনটার মধ্যেই। গত দু তিনটে শতাব্দী ধ'রে মানুষ যে-জ্ঞানবিজ্ঞানের একটা নূতন প্যাটার্ন তৈরি করছিল, তোমাদের ট্র্যাজিডি সেই প্যাটার্নটারই অংশ। ভূষণ্ডী একদিনে গ'ড়ে ওঠে নি, শতাব্দীর খণ্ড খণ্ড বন্ধ্যাত্ব আর মায়া ভূষণ্ডীর দেহটাকে ক'রে তুলেছে পণ্ডিত। তোমাদেরও অসহায়ত্ব ঐ তিনখানা গৎ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে। পালাবে কোথায়? ভয় পেলে চলবে কেন? ভূষণ্ডীর রাষ্ট্র তোমাদেরই সৃষ্টি, তিনখানা গৎ-এর বন্ধ্যাত্ব ভূষণ্ডীর সবচেয়ে বড় ফসল। বন্ধ্যা-ভূষণ্ডীর বিশ্ব তাই এ-শতাব্দীর স্বাভাবিক পরিণতি।"

"তোমার ইতিহাস-বিশ্লেষণ আমরা মানব কেন?"

"তোমরা না মানো, তুমি তো মানবে? মানবে এই জন্যে যে, বিশ্বগণদেহের মধ্যে তোমার নিজের দেহ আজো মিশে যেতে পারে নি। কোন দিন মিশবেও না। আশা করি এবার তুমি তোমার ট্র্যাজিডির মূল খুঁজে পেয়েছ।"

"হ্যাঁ, ভূষণ্ডীর গল্পটা শুনতে ভালই লাগল বটে, কিন্তু ট্র্যাজিডির মূল তুমি দেখালে কই, রুক্মিণী?"

আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সে উঠে গেল জানলার কাছে। কুইন্স পার্কের রাস্তাটা ভাল ক'রে দেখে নিয়ে রুক্মিণী আবার ফিরে এল। ওর মুখে কি রকম একটা চঞ্চলতার ভাব লক্ষ্য করলুম আমি। ও চুপ করে দাঁড়িয়ে

কাছে গেলে আমি আবার জিজ্ঞাসা করলুম, "ট্র্যাজিডির মূলটা আমায় বোঝাবে না, রুক্মিণী?"

"ট্র্যাজিডির মূল রয়েছে মার্কসবাদের মধ্যে।"

"কি রকম?"

"মার্কসবাদের খণ্ড সত্যকে তোমরা যেদিন পুরো সত্যের রূপ দিতে গেলে সেদিন থেকেই শুরু হ'ল তোমাদের আসল ট্র্যাজিডি। সেই মেয়েটির মত তোমরাও জীবন ও জগতের সব রকম সমস্যাই সমাধান করতে চাইছ ক-খানা শখ বাজাবার প্রচেষ্টার দ্বারা। আজ আর এসম্বন্ধে বিতর্কের প্রয়োজন নেই। কারণ, আর বেশি দেরি করলে হুকু-কে রক্ষা করতে পারবে না।"

মুহূর্তের মধ্যে ঘরের আবহাওয়া থমথমে হয়ে উঠল। জানলার দিকে মুখ ক'রে রুক্মিণী বলল, "তোমার দেহ-রক্ষী কমরেড ঘোষকে আসতে বলেছি সাড়ে দশটায় সময়।"

"এত রাত্রে?" আমি গিয়ে ওর পাশে দাঁড়ালুম।

"হাঁ, আমাদের এক্ষুনি বেরুতে হবে।···যেতে হবে ভুবণ্ডীর মাঠে। কমরেড, তুমি কি এখানে দাঁড়িয়ে বিরাট একটা আর্তনাদের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছো না?"

"আওয়াজ? কই, না! এ-আর্তনাদ কাদের রুক্মিণী?"

"হুকুর। কেবল হুকুর নয়, বন্দী-মানব-মনের নবতম আর্তনাদ।"

"এই সব বন্দী-মানুষরা কারা রুক্মিণী?"

"ধনী, দরিদ্র, কৃষক, মজুর, মধ্যবিত্ত কেউ বাদ নেই। এমন কি কংগ্রেসী আমলে যারা বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে দু-দিক থেকে দই মারবার চেষ্টা করেছিল তারাও আজ ধরা পড়েছে। কিন্তু এসব কথা ভেবে আর কি হবে? হুকুকে ধরবার জন্যে বিনয়প্রকাশের পুলিশরা গেছে ভুবণ্ডীর মাঠে। ধরবার আদেশ দিয়েছ তুমি। চলো, আমি তোমায় সেখানে নিয়ে যাব।"

"বিনয়প্রকাশের অনুমতি লাগবে না?"

"আসবে, কিন্তু আজ আমি তার অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করব না।" ঘরের বাতাসে আবেগের ঢেউ বইতে লাগল। মনে হ'ল, বিনয়প্রকাশ ও

রুক্মিণী দু-জনেই বুঝি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। দু-জনের কাউকেই বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। জানলা দিয়ে স্বর্গের আলো আসবার আশা দিয়েছিল রুক্মিণী। কিন্তু কই আলো? আমি কি এক আলো-অন্ধকার থেকে অন্যতর অন্ধকারের দিকে পা বাড়িয়েছি?

আমি রুক্মিণীকে জিজ্ঞাসা করলুম, "বিনয়প্রকাশের আদেশ অমান্য করার অর্থ জানো?"

"জানি, পিপল্স্-কোর্ট। সেই জন্যেই তো এক বুর্জোয়া ঠিকেদারের মেয়ে তার নিজের মাথাটাও আজ তোমার চরণকমলে নিবেদন ক'রে দিচ্ছে। গ্রহণ করবার সাহস তোমার আছে কি না জানি না, কিন্তু নিবেদন করবার সাহস আমার আজ তোমাদের নিষ্ঠুরতম শাস্তির সীমাও অতিক্রম করেছে। এ আমার শর্তহীন নিবেদন। কমরেড, আমি জানি, বন্দী-মনের যন্ত্রণার চেয়ে পিপল্স্ কোর্টের দণ্ডবিধান নিষ্ঠুরতর নয়। আর আমার কোন ভয় নেই। ভয় মানেই মৃত্যু। তা ছাড়া, বিনয়প্রকাশকে ভয় করব কেন? উচ্চতায় সে যত বড়ই হোক, একজন কমিশারের চেয়ে বড় নয় বিনয়প্রকাশ।" কুইনস পার্কের রাস্তায় একটা গাড়ির শব্দ পেয়ে রুক্মিণী ছুটে গেল জানলার কাছে। বলল, "বোধহয় তোমার দেহ-রক্ষীরা এসেছে।" গাড়িটা চ'লে যাওয়ার পরে সে-ই আবার বলল, "না, ওরা নয়। মনে হচ্ছে বিনয়প্রকাশ আজ নিজেই পাহারা দিচ্ছে কুইনস পার্কের রাস্তায়। তা দিক, আমরা লুকিয়েই আজ যাব ভুবণ্ডীর মাঠে।"

পালাবার পথ খুঁজতে লাগল রুক্মিণী।

ভুবণ্ডীতে এবার সত্যিকারের বিপ্লব এসেছে। আজ দু-দিন থেকে বসন্তকে পাওয়া যাচ্ছে না। হাবুর জন্যে সে দুধ চুরি ক'রে নিয়ে আসবে ব'লে সেই যে একটা গেলাশ হাতে ক'রে বেরিয়ে গিয়েছিল, তারপর বসন্ত আর ফিরে আসে নি। ফিরে আসে নি অবনী মণ্ডলও। বগুড়া জেলায় যাবার জন্যে সে যেমন ক'রে পারে ভারতবর্ষের সীমান্ত অতিক্রম করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ভুবণ্ডী ছেড়ে গেছে দু দিন আগেই। মধু তাকে বাধা দেয় নি। কেন দেয় নি, তার কারণটা ভাবতে গিয়ে মধু আজ নিজের মনেই হেসে উঠল। কি যেন

কাজটা? অবনী রক্ত ঝরাতে সক্ষম হ'লে, হুকুর বিশ্বাস, নতুন বিপ্লবের মন্ত্র শোনাবে অবনী। বিপ্লব-বর্জিত নরম মাটিতে শুয়ে হুকুর ঘুম আসে না। তাই সে আজো নতুন বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছে ভুবতীর দাওয়ায় ব'সে।

কি মনে ক'রে হুকু উঠে এল দাওয়া থেকে। মেহের বিবির দেওয়া সেই পুরনো কাঁথাখানার ওপর হামু শুয়েছিল চুপ ক'রে। শব্দ করবার শক্তি আর নেই ওর। সওদাগরি জাহাজ বাঁধবার দড়ির মত খানিকটা লম্বা-অস্তিত্ব যেন প'ড়ে রয়েছে দাওয়ার ওপর। হুকু একবার পরখ ক'রে দেখল লম্বা-অস্তিত্বটি এখনো বেঁচে আছে কি না। কেবল পরখের দ্বারা সে তা বুঝতে পারলে না। পরীক্ষা করা দরকার। কি ক'রে পরীক্ষা করবে হুকু? কাতুকুতু দেবে, না চিমটি কেটে দেখবে? আলগোছে হাতটা গায়ের ওপর রাখতেই হামু চোখ মেলল। হামু এখনো বেঁচে আছে দেখে হুকুর আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। হামু মরে নি! শেয়াল কিংবা শকুন হামুকে টেনে নিয়ে যেতে পারে মনে ক'রে হুকু ওকে ঘরের ভেতরে রেখে এল। বাইরে থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সে চলল ওবাইদ মোল্লার বাড়ির দিকে। আজ দু-দিন থেকে সেও আসে নি কুমতীর মাঠে।

সুলতানপুরের দিকে চলবার মুখে হুকুর আবার মনে পড়ল, হামু এখনো মরে নি। এখনো যখন মরে নি, তা হ'লে আর বোধহয় মরবে না। দু-দু বার মরবার সুযোগ পেয়েছিল হামু। প্রথমবারের কথাটা মনে পড়তেই গাড়োয়াল পাহাড়টা ভেসে উঠল হুকুর চোখের সামনে। হোটেল থেকে বেরিয়ে একদিন সে ভেবেছিল পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়বে। হোটেলের পূব দিকটায় ছিল সবচেয়ে নিচু ঢালু, প্রায় দু-হাজার ফুট। দেহের মধ্যে হামু ক্রমশই বড় হয়ে উঠছিল। কত বড়? বোধহয় পাঁচ মাসই হবে। কিন্তু একদিন ওর হঠাৎ মনে হ'ল, হামু কেবল পাঁচ মাসের নয়, পাঁচ হাজার বছরের কলঙ্ক নিয়ে পাহাড়ের মত ভারি হয়ে উঠেছে। বুর্জোয়া-নীতিবোধকে সে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলে না। দু-হাজার ফুট উঁচু থেকে হুকু চাইল গড়িয়ে পড়তে। কিন্তু পারলে না। পেছন থেকে হুকু-কে টেনে তুলে নিয়ে গেল সিমেনস। হ্যাঁ, সিমেনসই বটে।

আত্মহত্যা না ক'রে হুদু ভালই করেছে। সিমেনদের কাছে হুদু কৃতজ্ঞ। সে ওকে মরতে দেয় নি। আত্মহত্যার পাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে হুদু। কেবল তাই নয়, সে হামুকে আজো বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে। নতুন বিপ্লবের পৌরোহিত্য করবে হামু। ভুখণ্ডীর মাঠে ফসল হ'ল না বটে, কিন্তু হামুর মধ্যে হুদু বিরুদ্ধ বিপ্লবের বীজ ফেলে গেল। মানুষ-ফসলের গর্ব নিয়ে হুদু এসে পৌঁছুল ওবাইদ মোল্লার বাড়িতে।

মেহের বিবি গোয়ালের সামনে পায়চারি করছিল। পায়চারি করছে সে গত দু-দিন থেকেই। ওবাইদ মোল্লা সেই যে ভুখণ্ডীতে যাচ্ছে ব'লে রওনা হয়ে গিয়েছিল আর সে ফেরে নি। জীবনে এই তো প্রথম মিঞাবিবি আলাদাভাবে দিন কাটাচ্ছে!

সুলতানপুরে মেহের বিবির এমন কেউ নেই যার কাছে সে ওবাইদ মোল্লার খবর আনবার জন্যে যেতে পারত। সে ভেবেছিল, ভুখণ্ডী থেকে কেউ না কেউ আসবে। পাইকারদের দুধ নেবার জন্যে গফুরও আর আসে না। অতএব, মেহের বিবি আজ দু-দিন থেকে মোল্লা বাড়ির সীমানার মধ্যে পায়চারি ক'রে চলেছে। বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে সে ভুখণ্ডীর দিকে চেয়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কিন্তু ওবাইদ মোল্লার চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যায় না। দেখা যায় কেবল শকুনের শোভাযাত্রা। হ'ল কি মিঞাসাহেবের? ঘরের মেহমানকে সে খাওয়াবে কি? গোয়ালের পেছন দিকের আম গাছটায় আর একটাও পাতা নেই! আজ ভোরবেলা গোয়ালের মধ্যে উঁকি দিতে গিয়ে মেহের বিবি দেখতে পেল, গরুটাও উধাও হয়েছে। বাছুরটা কেবল শুয়ে আছে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে। বাছুরটার গর্দানে মাংস আছে বটে, কিন্তু মাথা তুলবার মত শক্তি নেই। মানুষের চেয়ে খিদের জ্বালা বাছুরটার একরত্তি কম নয় ব'লে ভাবল মেহের বিবি। ভেবেই বা সে কি করবে? খাবার আসবে কোথা থেকে তা সে জানে না। মেহের বিবি শুনেছে, গরু বাছুরের জন্যেও শাহাজান মিঞার কাছে যেতে হচ্ছে পারমিট আনতে। পারমিট ছাড়া এক গণ্ডা বিচালী পর্যন্ত গরুর মুখে ঢুকিয়ে দেওয়া চলছে না!

ঢালু রাস্তা দিয়ে হুদু ওপরে উঠে এল। মেহের বিবি দাঁড়িয়েছিল বেড়ার

থাকে। হুরু জিজ্ঞাসা করল, "ওবাইদ সাহেব কোথায়? সে তো আজ দু-দিন থেকে আমাদের ওখানে যায় না। মেহের বিবি, আমার শাদি হয় নি বলেই কি বুঝি আমায় মুখও দেখবে না? তোমাদের ধর্ম নষ্ট হবে বুঝি?"

"ধর্ম? না, মিঞাসাহেবের ধর্ম এত সহজে নষ্ট হয় না। তার ধর্ম নষ্ট করবার জন্যে শাজাহান মিঞা তো কম চেষ্টা করে নি! কিন্তু সে তো আজ দু-দিন থেকে বাড়ি নেই। আমার সন্দেহ হচ্ছে, শাজাহান মিঞা ওকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেছে।"

"ওবাইদ সাহেবকে কেন গ্রেপ্তার করবে?"

"জনমান গণির ঠিকানা বার করবার জন্যে।……একটু আগেই এখান দিয়ে ঢোল পিটিয়ে গেল যে, আজ রাত্রিতে না কি কাজীপাড়ার ময়দানে বিচার-আদালত বসবে। সবাইকে দলে দলে যোগ দেবার জন্যে চিৎকার করছিল লোকটা।"

হাসবার চেষ্টা ক'রে হুরু বলল, "দলে দলে যোগ দেবার মত সুলতানপুরে আর জনসংখ্যা নেই! মেহের বিবি, আমারও বিশ্বাস শাজাহান মিঞা ওবাইদ সাহেবকে ধ'রে রেখেছে। চলো, আমরা যাই তার কাছে। আজ তো কারো ভিক্ষা করতে লজ্জা করছে না। সবাই তার কাছে পারমিট ভিক্ষা করছে কিন্তু তুমি চাইবে তোমারই—"

বাধা দিয়ে মেহের বিবি বলল, "না, শাজাহান মিঞার কাছে আমি ভিক্ষা চাইতে পারি নে।"

"কেন? স্বামী-ভিক্ষায় লজ্জা কি, মেহের? আমি তো স্বামী পাওয়ার জন্যে সবই দিলুম, সবই। আঃ, স্বামী-পাওয়ার চেয়ে দুনিয়ায় আর কী বড় পাওয়া আছে!" হুরুর কথায় স্বামী না-পাওয়ার আফশোসটা যেন খুবই স্পষ্টভাবে কানে এসে লাগল মেহের বিবির। সে বলল, "আমাদের কাছে ইজ্জৎ হচ্ছে ধর্ম। গরীব লোকের সংসারে ইজ্জৎ ছাড়া আছেই বা কি? ধর্ম সোনার চেয়েও দামী।"

"স্বামীর চেয়ে দামী নয় নিশ্চয়ই", এই ব'লে হুরু মেহের বিবিকে জবাব দেওয়ার সুযোগ না দিয়ে নিজেই আবার বলল, "মানুষ হ'লেই তার একটা ধর্ম থাকবে, এ-কথা তুমি কেমন ক'রে জানলে, মেহের?"

মরুভরের দুটি মেয়ে-জন্তর মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়িয়ে ধর্মালোচনা করছিল।
হাল কেবল ধর্মালোচনাই করে না, হালেও। মেজর বিবিও একটু থেমে
দূর প্রশ্নটার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, "পশু হ'লেই যেমন
নার চারটে পা থাকে, মানুষ হ'লেও তার তেমন ধর্ম থাকে। বড় বিবিজা
তা তাই বলে।"

একটু পরেই হুদু ফিরে এল ওবাইদ মোল্লার বাড়ি থেকে। সুলতানপুরের
রাজনীতি সে এবার বুঝতে পেরেছে। ভূষণ্ডীর নাটক শেষ হ'তে আর বেশি
বিলম্ব হবে না। কাজীপাড়ার ময়দানে আজ বিচার-আদালত বসবে।
আসামীদের চেহারাগুলো হুদুর চোখের সামনে ভেসে উঠল। শাজাহান কিন্তু
কি একটা মারাত্মক রকমের ভুল করে নি? তার বিচার-আদালতে সবাই
আজ উপস্থিত থাকবে বটে, কিন্তু সবচেয়ে বড় আসামীটি সেখানে থাকবে না।
কয়েক শাজাহান তাকে ধরতে পারে নি। বাড়ি ফিরবার মুখে হুদু হাসতে
লাগল বার বার। বড় আসামীটির সন্ধান ওরা পায় নি। সন্ধান পায় নি
ব'লে হুদুর এত আনন্দ কেন? আনন্দের কারণটা হুদু বুঝতে পেরেছে। সে
ধরা দেবার জন্যে দীপুদার বন্দী-শিবিরের ফটকে গিয়ে স্বইচ্ছায় উপস্থিত হবে।
দীপুদার বিশ্বরাষ্ট্রের চেয়ে তার বন্দী-শিবিরের আয়তন ছোট নয়। হুদুর মনের
আকাশে আনন্দের হাওয়া বইতে লাগল! দীপুদা ভুল বুঝেছে—কে যে বন্দী
আর কে যে মুক্ত তার খবর সে আজো জানে না। কাঁটা-তার দিয়ে চারদিকে
বেড়া তুলে দিলেই তা বন্দী-শিবির হয় না। দীপুদার ভুলগুলো ধরে দেবার
জন্যে হুদু হাঁটতে হাঁটতে চলে যাবে সোজা সেই কয়েদখানায়। এটাই হবে হুদু
চৌধুরীর শেষ যুদ্ধ। কোন্ কোন্ অস্ত্র দিয়ে হুদু লড়াই করবে তাও সে ভাবতে
লাগল। ওর অস্ত্রের মধ্যে থাকবে এবার ক্ষমা ও ভালবাসার নৈতিক মহিমা।
জীবনে যদি ইজ্জৎ না রইল, না রইল নৈতিক মহিমার মূল্যবোধ, তা হ'লে
ভূষণ্ডীর বাস্তটাকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি? জড়বাদের ভূষণ্ডীতে হুদু
হোঁচট খেয়ে প'ড়ে যাচ্ছিল। সামনে দিয়ে সে ভাবল, হামুকে একবার দেখে,
সে চলে যাবে কাজীপাড়ার ময়দানে। সন্ধ্যে হ'তে আর ঘণ্টা খানিক বাকি।
ভূষণ্ডীর মাঠের ওপর দিয়ে পা টেনে টেনে হাঁটতে লাগল হুদু। হুদু একা

হাঁটছে না। বর্তমানকেই শতাব্দীও হুতুর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে। ওরা হুতুর চেয়েও বেশি পরিশ্রান্ত। ওরা হাঁটছে ভুলের বোঝা মাথায় নিয়ে। হুতু সত্যের আলো দেখতে পাচ্ছে—মনের অন্ধকার বিদূরিত হ'ল—অন্ধকারের শবযাত্রা নেমে গেল মন থেকে। মন? থমকে দাঁড়াল হুতু চৌধুরী। বিংশ শতাব্দীর ঘাড়ে হাত রাখল সে। কি দেখছে হুতু? মানব মনের ব্যাধি। বিরাট একটা বিশৃঙ্খলা সেখানে তৈরি করেছে ব্যাধির ক্ষেত্র। এ ব্যাধি সারবে কি ক'রে? মনের সজীব জীবনীশক্তি দিয়েই মনের রোগ দূর করতে হবে। রোগ সম্বন্ধে মন যদি একবার সচেতন হয়ে ওঠে তা হ'লে আরোগ্যের দাওয়াই খুঁজে বার করতে কষ্ট হবে না। দীপুদা ভুল করেছে। ভুল করেছে পেছনের চারটে শতাব্দী-ই। বিজ্ঞানের সত্যকে ওরা প্রজ্ঞার পথে নিয়ে যেতে পারে নি, নিয়ে গেছে পুরোপুরি জড়বাদের রাস্তায়। তাই আজ সে দেখতে পাচ্ছে একটা হৃদয়হীন মিথ্যে জগৎ। দীপুদাদের জগৎ। এ-জগৎটাকে ভেঙে ফেলবার অস্ত্র পেয়েছে হুতু। একটা জগৎ ভেঙে ফেলা মানে একমাত্র জগৎ ভেঙে ফেলা নয়। দীপুদাদের জগৎ সম্বন্ধে শেষ মন্তব্য প্রকাশ করতে করতে হুতু পৌঁছুল এসে ঘরের দাওয়ায়।

কখন্ যে সন্ধ্যে পার হয়ে গেল মেহের বিবি তা টের পেল না। জেনানা মহলের সীমান্তে বেড়ার পাশে সে দাঁড়িয়ে রইল। ওবাইদ মোল্লা দুর্বল দেহ নিয়ে ঢালু রাস্তাটা হয়তো উঠে আসতে পারবে না, ভাবছে মেহের বিবি। তাকে ধ'রে ধ'রে ওপরে তুলে আনবার জন্যেই সে বোধহয় এখানে সারাটা দিন দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে তাকে থাকতেই হবে যতদিন না স্বামী তার ফিরে আসে। কে যেন আসছে? পা-এর শব্দ পেয়ে মেহের বিবি বেড়ার বাইরে এসে দাঁড়াল। স্বামী বোধহয় তার ফিরে এসেছে। পা-এর শব্দ ক্রমশই ওপর দিকে উঠে আসছিল। শাজাহান মিঞা নিশ্চয়ই তার স্বামীর ইজ্জৎ কেড়ে নিতে পারে নি। শাজাহান মিঞাকে হারিয়ে দিয়েই আসছে সে। মেহের বিবি জানে, স্বামী তার ধর্মচ্যুত হ'য়ে কিছুতেই ঘরে ফিরে আসবে না। এমন স্বামীকে কে না চায় এগিয়ে গিয়ে অভিনন্দন জানাতে?

ঢালু রাস্তা দিয়ে ওপরে উঠে এল গফুর। মাংস না খাবারে ঢুকিয়ে কি একটা চিবতে চিবতে গফুর বলল, "আপা, কেমন আছো? এতদিন আসতে পারি নি ন নিজে। দুধে পানি মেশাতো ব'লে পাইকারদের সব জেল হয়েছে জানো?"

"আমায় জেনে আর লাভ কি গফুর? গরুটা আর দুধ দিত না।"

"এখন থেকে দুধ পাওয়া যাবে সব সরকারী খাটালে। শাজাহান সাহেব একটা চিরকুট লিখে দিলেই ব্যস্‌, দুধের আর অভাব থাকবে না।"

"তুই চিরকুট পাস নি গফুর?" জিজ্ঞাসা করল বিবি মেহেরউন্নিসা।

"পেয়েছি।"

"কি করবি তুই দুধ দিয়ে?"

"দুধভাত খাবো গো আপা! হেঁ, হেঁ—কি মজা, দেখেছ আমার বুকের ছাতি কত চওড়া হয়েছে?" গফুর মাংস চিবতে চিবতে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল এসে একেবারে মেহের বিবির মুখের সামনে।

"তোরা তো দুধ খেয়ে খেয়ে বুকের ছাতি চওড়া ক'রে ফেললি, কিন্তু কোলের বাচ্চারা যে দুধ পাচ্ছে না গফুর, তাদের কি হবে?"

"যারা দুধ পাচ্ছে না, তারা সব বুর্-জ-য়াদের বাচ্চা গো আপা। আমাদের গরীব বাদশা তাদের জন্যে দুধের ব্যবস্থা করেন নি। কিন্তু তোমার এত ভাবনা কেন, তোমার তো আধখানা বাচ্চাও নেই?"

জবাবটা এবার ঠিক মত গুছিয়ে উঠতে পারছিল না বিবি মেহেরউন্নিসা। তাই সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। স্বামীর কথা সে এরই মধ্যে ভুলে গেছে। চোখের সামনে ভেসে উঠেছে একহাত লম্বা একটা দড়ির মত শুকনো শিশুর চেহারা। হ্যাঁ, হাসুর চেহারাই বটে। না-ই বা হ'ল একটা গোটা শিশু, আধখানা হ'লেও মেহের বিবির কাজ চ'লে যাবে। গফুরের প্রশ্নের জবাব একটা দেওয়া যাবে, ভাবল মেহের বিবি। কিন্তু তার আগেই গফুর বলল, "আপা, জানো তোমার গরুটাকে কাল ওরা চুরি ক'রে নিয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ, জানি।"

"গরুটাকে কেটেকুটে ওরা সব শিক-কাবাব তৈরি ক'রে ফেলেছে।"

"ওরা কারা গফুর?"

"ঐ সব শালা চৌকিদাররা। সুলতানপুরে সব নতুন নতুন চৌকিদার এসেছে কেন জানো? গরীব-দুঃখীদের ওপর নজর রাখবার জন্যে। আমাকে একটু খোঁচা দাও দিদি, দেখবে ওরা এসে তোমায় ধ'রে নিয়ে যাবে। হেঁ, হেঁ— কী মজা!"

মেহেরবিবি এর মধ্যেই আঁচল দিয়ে একবার চোখ মুছে ফেলেছে। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকলে গফুর তার দুর্বলতা ধরে ফেলবে মনে ক'রে মেহের বিবি জিজ্ঞাসা করল, "ওরা তো সবাই দুধ খাচ্ছে বললি, আমাদের গরুটাকে তবে খেয়ে ফেলল কেন?"

"সবটা খায় নি, আরও ছ-সাত দিন চলবে। তুমি একটা শিক-কাবাব খাবে, আপা?" এই ব'লে গফুর তার পকেট থেকে দু-টুকরো ভাজা-মাংস বার ক'রে তুলে ধরল মেহের বিবির দিকে। মেহের বিবি তার দু-হাত দিয়ে বেড়ার বাঁশটাকে শক্ত ক'রে ধ'রে ফেলল। কপালটা ঠেকিয়ে রাখল বেড়ার গায়ে। গফুর অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল, মেহের বিবি কাঁদছে!

"তুমি কাঁদছ, আপা? তোমায় আমি কি বললুম? আমি তোমায় শিক-কাবাব খেতে বলেছি।"

চোখের জল মুছে মেহের বিবি বলল, "এতদিন তুই ভাল ক'রে খেতে পাস নি, শিক-কাবাব তুই-ই পেট ভ'রে খা।"

"খাব?……সবটা?……তা হ'লে আমি খাই?"

অনুমতির অপেক্ষা না রেখে গফুর প্রাণপণে চিবতে লাগল শিক-কাবাব। চিবতে চিবতেই সে বলল, "চৌকিদারদের দোষ নেই কিছু। তোমরা তো গরুটাকে এক মুঠো ঘাস পর্যন্ত খেতে দিতে পারছিলে না। বেচারী কী কষ্টই না পাচ্ছিল! দু-চার দিনের মধ্যেই গরুটা মরে যেত। বিশ্বাস করো আপা, খোদার কসম, গরুটার গায়ে আর এক রত্তি চর্বি ছিল না! থুঃ—" মুখ থেকে কতকগুলো ছিবড়ে বার ক'রে গফুর ছুঁড়ে মারল চালুর দিকে। মাংসের দু-একটা টুকরো ওর দাঁতের ফাঁকে আটকে ছিল। তাই সে আঙুলের আগাটা মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে পুনরায় বলল, "যাই, আপা। বিপদে পড়লে কাকপক্ষীর মুখে একবার খবর দিয়ো আমায়।"

"বিপদ আমাদের কেটে গেছে, গফুর। খবর দেওয়ার দরকার হবে না।"

"বলো কি, দুলাভাই ছাড়া পেয়েছে নাকি? কাজী-পাড়ার ময়দানে রাজা হাটটার নম্বর তার বিচার হবার কথা আছে। আপা, ওসমান গণির ঠিকানাটা আমায় ব'লে দাও না—"

"না।"

"আমি গিয়ে দুলাভাইকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসতে পারব, ঠিকানাটা আমায় বলো, তোমার পা-এ পড়ি—" গফুর সত্যি সত্যি এগিয়ে এল মেহের বিবির পায়ের কাছে। মেহের বিবি বলল, "না, ঠিকানা তার আমি বলব না।"

"বড্ড শুকিয়ে গেছ আপা!" সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গফুর তার গলার সুর বদলে জিজ্ঞাসা করল, "পেটের ব্যামো না কি? হজমটজম হচ্ছে না বুঝি?"

"হজমের একটু অসুবিধে হচ্ছে বৈ কি গফুর।"

"অসুবিধে? কি রকমের অসুবিধে? খুব বেশি তেল-ঘী খাচ্ছ বুঝি?"

"না, তা ঠিক নয়। ক'দিন থেকে অবেলায় ভাত খাচ্ছি কি না!"

"ভাত? ভাতের পারমিট তোমায় দিলে কে?" গফুরের গলার আওয়াজ যেন দ্বিগুণ জোরে কাজী পাড়ার ময়দান থেকে ফিরে এল ধাক্কা খেয়ে। ভয় পেল মেহের বিবি। ভাতের হিসেব নেবার জন্যে গফুর হয়তো ঢুকে পড়তে পারে রান্নাঘরে। গফুর তো জানে না যে, মোল্লা বাড়ির রান্নাঘরে আজ আর একদানা ভাত নেই, আছে ওসমান গণি। দশ পুরুষ ধ'রে যারা মোল্লাবাড়ির মুখের অন্ন কেড়ে নিচ্ছিল, তাদেরই সর্বশেষ বংশধর আজ আত্মরক্ষা করছে ওবাইদ মোল্লার রান্নাঘরে! ভাত খাবার মিথ্যে সংবাদটা মিথ্যে প্রমাণ করবার জন্যে মেহের বিবি এবার বলল, "ভাতের পারমিট আমরা পাই নি গফুর।"

"তবে তুমি ভাত খাওয়ার কথা বললে কেন?"

"ভাত ভাত ক'রে খানিকটা চেঁচাতে ভাল লাগছে, তাই। যাদের চালের পারমিট নেই তারা আর কি করবে, বল্? আমি তো চেঁচাতেও পারি নে। তোর ওবাইদ ভাইয়ের জন্যে আমি পথ চেয়ে থাকি সারাটা দিন। এই বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে দিনরাত পথ চেয়ে থাকার পেরেশানী তো কম নয় গফুর!"

"চিন্তা ক'রো না, ওসমান গণির ঠিকানাটা দিয়ে দিলেই দুলাভাই ফিরে আসবে। আগেই সে ফিরে আসতে পারত……কিন্তু—"

"চুপ ক'রে গেলি যে ?"

"ওবাইদ মিঞার জান্ বড্ড শক্ত, আপা।"

"কি ক'রে বুঝলি রে ?"

"মুখে তার আর্ একটাও দাড়ি নেই! চৌকিদারেরা সব টেনে টেনে উপড়ে ফেলেছে। তবু সে ওসমান গণির ঠিকানাটা বাৎলে দেয় নি! তাকে দেখবার জন্যে আমি কাজী পাড়ার ময়দানে যাচ্ছি। তুমিও যাবে না কি, আপা ? চিনতে পারবে তো ? একটাও দাড়ি নেই—" হি হি ক'রে হেসে উঠল গফুর। ডান হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখটা চেপে ধ'রে হাসি থামিয়ে গফুর বলল, "চলি, আপা।"

"যাচ্ছিস ? এসেছিলি কেন ?"

"ও, হ্যা, আসল কথাই ভুলে গিয়েছিলাম! তোমাদের বাছুরটা আমায় দিয়ে দাও না ? একটু দান-খয়রাৎ না করলে খোদা খুশী হবেন কেন ? দিয়ে দাও বাছুরটা, আপাগো, তোমার দু-টি পায়ে ধরছি—খোদা খুশী হবেন, বেহ্শতের দরজা খুলে দেবেন। তোমরা মিঞাবিবিতে মিলে বেহ্শতে যাবে—"

"বাছুরটা চাইছিস কেন, ক্ষিধে তোদের মেটে নি ?" গর্তে-ডোবা চোখের মণি দুটো বাইরে টেনে এনে প্রশ্ন করল বিবি মেহেরউন্নিসা।

সোজাসুজি জবাব দিল না গফুর। কিন্তু মেহের বিবিকে শোনাবার জন্যে গফুর একটা ঢেঁকুর ছাড়ল। তারপর সে বলল, "আপা, না খেয়ে মরার চাইতে বেশি খেয়ে মরা ঢের ভাল।"

"না রে গফুর, না-খেয়ে মরা আর বেশি-খেয়ে মরা দুটোই খারাপ।"

"বেশ তাই সত্যি। তর্ক করতে আমি আসি নি। আমি এসেছি বাছুরটাকে নিয়ে যেতে। কি করবে বাছুরটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে ? ওকে তোমরা না খাইয়ে মেরে ফেলছো। দিয়ে দাও না বাছুরটা…নইলে চৌকিদারেরা এসে নিয়ে যাবে।"

হের বিবি কি যেন ভাবছিল। গফুরের শেষের কথাটা শুনে বলল, তাকে পেট ভ'রে খেতে দিতে পারবি ?"

ারব, আপা। ওকে আমি ভাতের ফেন খাওয়াব, তুমি খাওয়াবে। কচি ঘাস কেটে আনব ওর জন্যে।" গোয়ালের দিকে ছুটবার জন্যে ছটফট করতে লাগল।

হের বিবি বলল, "ওয়াদা কর্ যে, বাছুরটাকে দু-টাকায় ওদের কাছে বেচে ফেলবি না ?"

খোদার কসম, দশ টাকার কমে আমি ওর গায়ে আঙুল ছোঁয়াতে ।!" গফুর অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে, ছুটে গেল গোয়ালের দিকে। পরেই সে বাছুরটাকে টানতে টানতে বেরিয়ে এল বেড়ার কাছে। দিকে হড়হড় ক'রে নামতে নামতে গফুর সজোরে ঘোষণা ক'রে গেল, া, খোদা তোমার ভাল করবে।"

হের বিবি উল্টোদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ভাঙা-বেড়ার গায়ে চোখ ঠেকিয়ে ।

মিনিট পাঁচেক পরে ওসমান গণি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। পায়ের পেয়ে মেহের বিবি সরে গেল বেড়ার ডান দিকে। ঘোমটা দিয়ে মুখ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সে। ওসমান গণি বলল, "বিবিসাহেবা, আমার ম গ্রহণ করুন।"

ঘোমটার ফাঁক দিয়ে মেহের বিবি দেখল, ওসমান গণি আজ 'বোরকা' নি। বড্ড বেশি রোগা আর বুড়ো লাগছে গণিসাহেবকে। মেহমানকে আশ্রয় দিয়েছে বটে, কিন্তু পেট ভ'রে খেতে দিতে পারে নি।

গণিসাহেব হঠাৎ কেন যে তাকে সালাম জানাচ্ছে ভেবে বিস্মিত বোধ বিবি মেহেরউন্নিসা।

দু-পা ঢালুর দিকে হেঁটে গিয়ে ওসমান গণি বলল, "আমি চললুম। বহুৎ শুকরিয়া—" থেমে গেল গণিসাহেব। মেহের বিবি এখনো ওসমান র মতলব বুঝতে পারছে না। বুড়োটা পাগল না কি ? রাস্তায় দেখলে চৌকিদারেরা ধ'রে নিয়ে যাবে। তাকে আশ্রয় দেবার জন্যেই তো স্বামী

তার শাস্তি পাচ্ছে। একটু আগে তার ঠিকানা জানবার জন্যে প্রচুর এসে মেহের বিবির কাছে। বুড়োটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে শত্রুর হাতেই তো চালুর চলে যাচ্ছে! কি করবে মেহের বিবি? বুড়োটাকে সাবধান না ক'রে বিপদে পড়বে যে! তাই সে বলল, "আপনাকে ধরবার জন্যে আমার লোক সব চার দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে—"

"বহুৎ, বহুৎ শুকরিয়া বিবিসাহেবা, আমি তো ওদের কাছেই যা যাচ্ছি কাজীপাড়ার ময়দানে।"

"কেন! ওরা যে আপনাকে মেরে ফেলবে!"

"তা ফেলুক, আমার ওবাইদ ভাইকে ফিরিয়ে আনতে হবে!" এই ওসমান গণি একটু এগিয়ে এল মেহের বিবির দিকে। গলার স্বরটা ক'রে সে বলল, "ওবাইদ ভাইয়ের কাছে শুনে থাকবেন যে, আমার একটা ছিল। তার মাথাটা ছিল সোনা দিয়ে মোড়ানো। লাঠিটা আর নেই—"

ব্যস্ত হয়ে মেহের বিবি বলল, "লাঠি ছাড়া আপনি এতটা পথ হাটা কি ক'রে?"

"আজই তো আমার শেষ হাটা বিবিসাহেবা। কাজীপাড়ার ময় পর্যন্ত পৌঁছুতে পারলে হাটবার আর দরকার হবে না। সেই জন্যেই আ ওবাইদ ভাইকে সোনা দিয়ে মোড়ানো লাঠির মাথাটা দিয়ে গেলুম। সো প্রতি লোভ তার নেই জানি। সে সোনা, জহরৎ চায় না, সে চায় খোদার রহমত। সোনাটুকু রান্নাঘরেই ফেলে এসেছি। মেরা কসুর মা [illegible] বিবিসাহেবা—" বলতে বলতে ওসমান গণি নেমে গেল ঢালু রাস্তা মেহের বিবি ঢালুর ওপর পর্যন্ত ছুটে এল তৎক্ষণাৎ। ওসমান গণি মোকাবা সীমানার বাইরে চলে গেল। মেহ্‌মানকে রক্ষা করার ধর্ম-[illegible] সব চুকে গেল এ জীবনের মত। ওখানে দাঁড়িয়েই সে শুনতে পেল, ওস গণি পথ চলতে চলতে কেবলই ব'লে চলেছে: মেরা কসুর মাফ কিজিয়ে কার কাছে মাফ চাইছে সে? ওসমান গণি কেন মেহের বিবির কাছে চাইতে যাবে? তার কাছে তো ওসমান গণির কোন কসুরই হয় নি। জন্যে [illegible] বিবি এমন কী কঠিন কাজ করেছে? মেহ্‌মানকে রক্ষা কর

েল কর্তব্য ছাড়া ওসমান গণির জন্যে আর কিছুই তাকে করতে হয় নি,
ল মেহের বিবি। তবে? তবে কেন সে তার কাছে মাফ চাইল?
ান গণি ভুল করেছে। নিশ্চয়ই ভুল করেছে ভেবে, বিবি মেহেরউন্নিসা
র ওপর সন্তুষ্ট হ'য়ে ব'সে মনে মনে বলতে লাগল, "গণিসাহেবের কসুর
। মাফ ক'রো খোদা।"

চারদিন আগের যোগাড়-করা কেরোসিনতেলের শেষ বিন্দুটুকু কুপির মধ্যে
া দিয়ে হুকু আলো জ্বালাল। আলো জ্বালিয়ে কুপিটা সে তুলে ধরল
র মুখের সামনে। সলতের আগুনে বেশি জোর ছিল না, নিবনিব করছে।
নিব করছে হাঁমুও। হুকু দেখল, হামুর চোখ দুটো বন্ধ হয়েছে। ঠোঁটের
র মধ্যস্থলের ক্ষত। শুকনো জিভ দিয়ে চেটে চেটে হামু তার ক্ষতের পরিধি
ড়িয়ে ফেলেছে। কেবল হামুর একলার চেষ্টাতেই ক্ষতের পরিধি বাড়েনি,
তীর মাছিগুলোও চেটে চেটে ক্ষতটাকে টেনে নামিয়ে এনেছে চিবুকের
া পর্যন্ত। হামুর বিছানার পাশে কুপিটাকে নামিয়ে রাখল হুকু। এক
তে সে চেয়ে রইল হামুর দিকে। কি দেখছে হুকু চৌধুরী? দেখছে,
যেন নতুন এক মেনিফেস্টোর দেহ নিয়ে প'ড়ে আছে দ্বিতীয় বিভাগী-
ায়। পাটোয়ারবাগানের মেনিফেস্টো আলাদা ছিল বটে, কিন্তু দু-টোর
াই খণ্ড সত্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারল না হুকু চৌধুরী।
দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে হুকু বেরিয়ে এল ঘর থেকে। কাজীপাড়ার
ানে তাকে যেতে হবে। এতক্ষণে হয়তো বিচার আদালত ব'সে গেছে।
ার দেখবার কৌতূহল ওর ছিল না। কলকে একবার শেষবারের মত
ং নিতে চায় ও। জীবনের বাকী ক'টা দিন হুকু কি নিয়ে থাকবে?
পা চালিয়ে হাঁটতে লাগল কাজীপাড়ার ময়দানের দিকে।
সুলতানপুরের সবাই এসেছে বিচার দেখতে। দেখাতে নিয়ে এসেছে
রত শাজাহান। গণ আদালতে 'গণের' সংখ্যা বেশি হওয়া চাই। কলকাতা
ক কয়েকজন বিচারকরা সব আসছেন। ভিড় বেশি না হ'লে ফাঁকা-ময়দানে
া বিচার করবেন কি ক'রে?

[illegible]

... এই বলতে চান। শুধু থাকবার জন্যেই সে একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মত বসবাস করছিল ভূবণ্ডীর মাঠে। আসামী কি অস্বীকার করতে পারে যে, সে বিবাহিত নয়? জবাব দাও।"

"কি জবাব দেব?" গেলাশটার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল বসন্ত।

"তুমি বিবাহিত?"

জবাব শুনবার জন্যে গণ আদালতের প্রতিটি গণ কান খাড়া ক'রে রাখল। কমরেড প্রসিকিউটার ধমকে উঠলেন, "জবাব দাও, তুমি বিবাহিত?"

"না।" জবাব দিল বসন্ত।

ভিড়ের মধ্যে উত্তেজনায় শুরু হ'ল। প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে বসন্তর বিবাহের কোন সরাসরি যোগ ছিল না বটে, তবুও বসন্তর বিরুদ্ধে অভিযোগটা যেন প্রমাণিত হ'য়ে গেছে এমন একটা মানসিক আবহাওয়া সৃষ্টি হ'তে এক মিনিটও লাগল না। বিচারের ফলাফল জানবার জন্যে সুবু আর অপেক্ষা করল না। সে বেরিয়ে এল কাজীপাড়ার ময়দান থেকে। ফিরে চলল ভূবণ্ডীতেই।

একা একা অন্ধকার রাস্তায় হাঁটতে সুবুর আর আজকে ভয় করছিল না। ভয় করলেই বা সাথী সে পাবে কোথায়? সাথী পাওয়ার জন্যে চেষ্টা তো সে কম করে নি। গোয়াবাগানকে ভেঙে দিয়ে সে ঘুরে বেড়াল সারা ভারতবর্ষে।

[illegible] বছর ধরে, [illegible]
[illegible] ইল না। [illegible]
[illegible] হয় না। [illegible]
[illegible]।

[illegible]

[illegible] তার [illegible] হয়ে যায়। [illegible]
[illegible] একবার ফিরে চাইল। [illegible]
। তা পারবে, তার করবার কি আছে? [illegible]
[illegible] করবার কিছু নেই। ছুছু থামল এসে নিজের বাড়ির কাছে।
[illegible]? বাড় কোথায়? বাড়ির কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই। [illegible]
[illegible]নের লোকেরা এসে সব ভেঙে দিয়ে গেছে। এদিকে, ওদিকে চাইতে ছুছু। গত ছ'মাসের পরিচর্যাটা যেন ওরা হিসেব ক'রে, বুঝে ক'রে [illegible]রে বুঝেসুঝে দিয়ে গেছে। সাবেক সম্পর্কের ছ-পাতা বিচালী পর্যন্ত ওরা [illegible]য় নি! কিন্তু হামু? হামু গেল কোথায়? একটু দূরে একটা বাবলা তলায় কুপিটা তখন পর্যন্ত জলছিল। ছুছু এগিয়ে গেল সেইদিকে।

[illegible]হের বিবির কোলে শুয়েছিল হামু। পেছনে দাঁড়িয়ে ছুছু দেখল, হামু [illegible] বিবির আঁচলের তলায় মুখ ঢুকিয়ে দুধ খাওয়ার চেষ্টা করছে। চেষ্টা [illegible] মেহের বিবি নিজেই। পেছনে দাঁড়িয়েই ডাকল ছুছু, "মেহের—"

[illegible] উঠে মেহের বিবি হামুর মাথাটাকে টেনে নিয়ে এল আঁচলের বাইরে। [illegible] মাথাটা নিচু ক'রে রাখল।

"[illegible]হের, এতে লজ্জার কিছু নেই। হামু তোমারই ব্যাটা। ওকে তোমার [illegible] তুলে দিয়ে গেলুম।"

"[illegible]াপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

"[illegible]লকাতায়।" ডানদিকে ছুছু চেয়ে দেখল, অবনী মণ্ডলের ছলাঘরও [illegible] থেকে উধাও হয়েছে।

[illegible]হের বিবি বলল, "ওরা মজিদটাকেও ভেঙে দিয়ে গেছে।"

"[illegible]মি এখানে কেন এসেছিলে, মেহের?"

মাথায় তাদের দিয়ে হুহু [illegible] বহুর কাছ চুরি করতে পারছিল? আছে ওবাইর মোল্লাও, [illegible]লো না। দূর থেকে একটা গাড়ি আসছিল ওপারে একটা হেড[illegible]টের আলোটা হুহু দেখতে পেয়েই বলল, "মেহের, ক'রে বেড়িয়ে[illegible] নিয়ে ঘরে চ'লে যাও। পর্দা-তাঙার অধর্মের মধ্যে আজ হুহুর[illegible]র বড় ধর্ম পেলে। কোন্ সুড়ে তোমার ধর্ম এল—বোধহয় মুখে [illegible]পালে। তুমি পালাও, মেহের।"

হেড-লাইটের আলো মেহের বিবিও দেখতে পেয়েছিল। হামুকে বুকের ওপর জড়িয়ে ধ'রে বিবি মেহেরউন্নিসা দ্রুতপদে হাঁটতে লাগল সুলতানপুরের দিকে।

ফাঁকা মাঠে হুহুই বা দাঁড়িয়ে থেকে আর কি করবে! দীপুদার রাষ্ট্র এবার ত্যাগ করাই ভাল। কোথায় যাচ্ছে হুহু? দীপুদার বন্দী-শিবিরে। দীপুদার শিবিরটাকে আর বন্দী-শিবির ব'লে মনে হচ্ছে না ওর। হুহু হাঁটতে লাগল পশ্চিম দিকে। হেড লাইটের আলোটা ক্রমশই নিকটতর হচ্ছে। হেড-লাইটের আলোয় হুহু যেন দেখতে পেল, একটা ইস্পাতের মত শক্ত হাতের পাঞ্জা হাঁ ক'রে রয়েছে। কার হাত এটা? বিনয়প্রকাশের হাত। হুহু ভুল করল না। এ হাত দিয়ে বিনয়প্রকাশ হুহুর পরিচয়টুকু মুছে দিতে এসেছে। দেবেও হয়তো। কিন্তু মানুষের পরিচয় তবু রয়েই যাবে। যাবেই। হুহুকে গ্রাস করবার জন্যেই গাড়িটা যেন এবার এগিয়ে আসছে খুব দ্রুত গতিতে। হুহুও আর চলার গতি বাড়িয়ে দিল গাড়িটার কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছবার জন্যে।

বিনয়প্রকাশের হাতের পাশে আরও একটা হাত এবার দেখতে পেল হুহু। গণআদালতের আসামী বসন্ত দাসের হাত। বসন্তর হাত থেকে দুধের গেলাসটা বুঝি ওরা ছিনিয়ে নিতে পারে নি।

আহা, গণ-আদালতের কাঁটার-মুকুট বসন্তর মাথায় মানিয়েছে ভাল! ওর হাতের শূন্য গেলাসটাও এবার-বুঝি পূর্ণ হয়ে উঠল—গেলাস ছাপিয়ে গরম দুধ উপচে পড়ছে সারা বিশ্বময়। হামুর দুধ কেড়ে নিতে পারে নি সুলতানপুরের পার্টি-সেক্রেটারী। বসন্ত দাসের হাতের গেলাসের মধ্যে শুধু কেবল বিশ্বরাষ্ট্রই

ন মাতৃহীন ছবি। আহা, হায় এখন কাছে নেই, থাকলে এ-দিন
দেখাতে পারত!

র তার নিজের শূন্য বুকে হাত রাখতে গিয়ে অনুভব করল, বুকটা
। দীপ ঝাড়টার আলোয় নয়, নিজের অন্তরের আলোয় ভরে
কে যেন ওর বুকের ওপর শুয়ে পরম নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিচ্ছে।

ওকে বুকে জড়িয়ে ধরল গোয়াবাগানের হরু চৌধুরী।

—